ইবনে বতুতার সফরনামা

মোহাম্মদ নাসির আলী
অনূদিত

প্রসংগ কথা

ইব্‌নে বতুতার সফরনামা একখানা মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলস্বরূপ। এ গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করতে হলে ইব্‌নে বতুতার জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস ইব্‌নে বতুতার চরিত্র সব চাইতে জীবন্ত। তিনি তাঁর সফরনামার মধ্যে দোষে-গুণে মণ্ডিত নিজের এবং সমসাময়িক যুগের যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা সে যুগের অবক্ষয় থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত পূর্ণাংগ যুগ-মানসেরই প্রতিচ্ছবি। তবে এ কথাও ঠিক যে, ইব্‌নে বতুতার সফরনামায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব অল্প কথাই জানা যায়। তাঁর গ্রন্থের সম্পাদক ইব্‌নে জুজায়ী লিখেছেন যে, ইব্‌নে বতুতা ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে তান্‌জিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে লিখিত ইব্‌নে বতুতার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তাঁর পরবর্তী বছরে মরক্কোয় ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো মুহম্মদ-বিন-আবদুল্লাহ্‌।

ইব্‌নে বতুতার চরিত্রে প্রকৃত ইসলামী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধও ছিলো অপরিসীম। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো বলেই মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি সফরের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি তাঞ্জির ত্যাগ করেন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে যে সব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন তারই ফলশ্রুতি 'ইবনে বতুতার সফরনামা'। তবে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাই ছিলো গ্রন্থখানা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইব্‌নে বতুতার এ উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সাধারণও ইব্‌নে বতুতার সফরনামা পাঠ করে নিজেদের কৌতুহল মেটাতে সক্ষম হবেন মনে করে বাংলা ভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

৭ই অক্টোবর, ১৯৬৮

ড. কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক, বাংলা একাডেমী
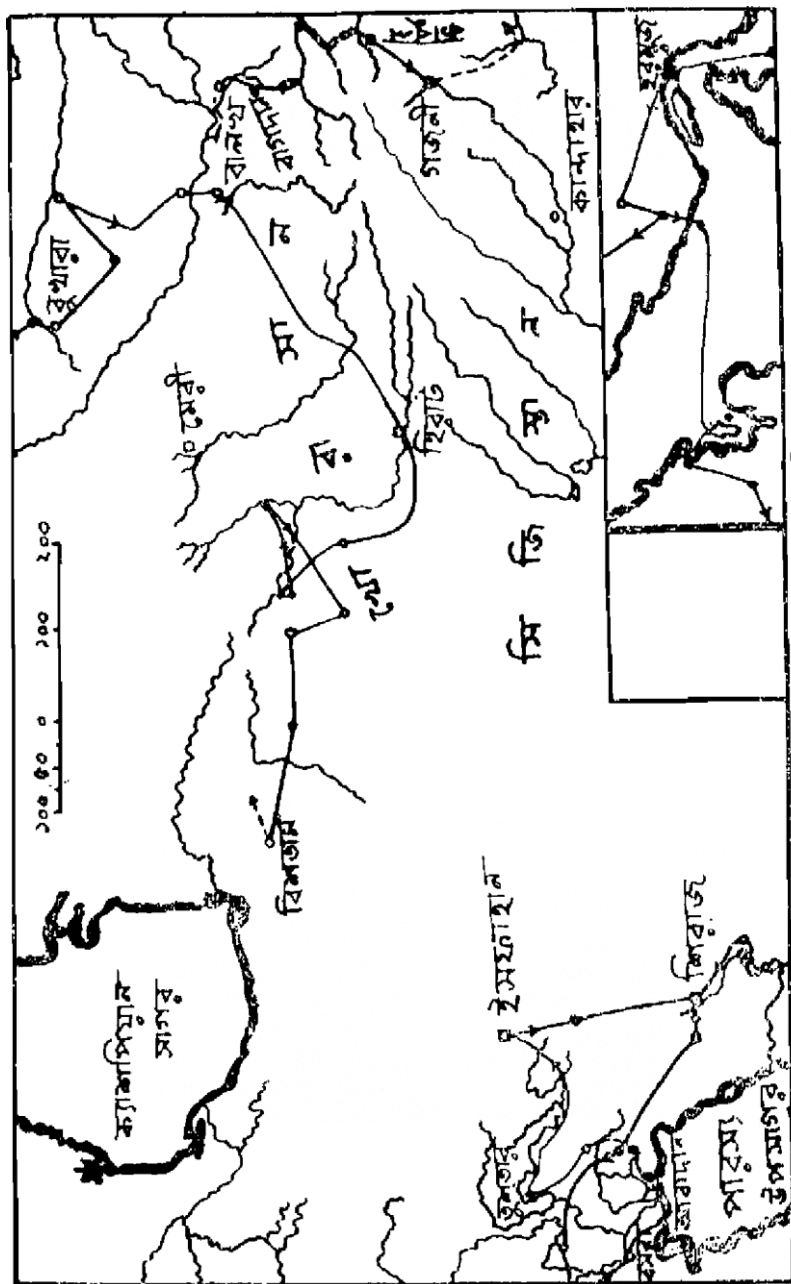
ইব্‌নে বতুতার পারস্য সফরের খসড়া মানচিত্র
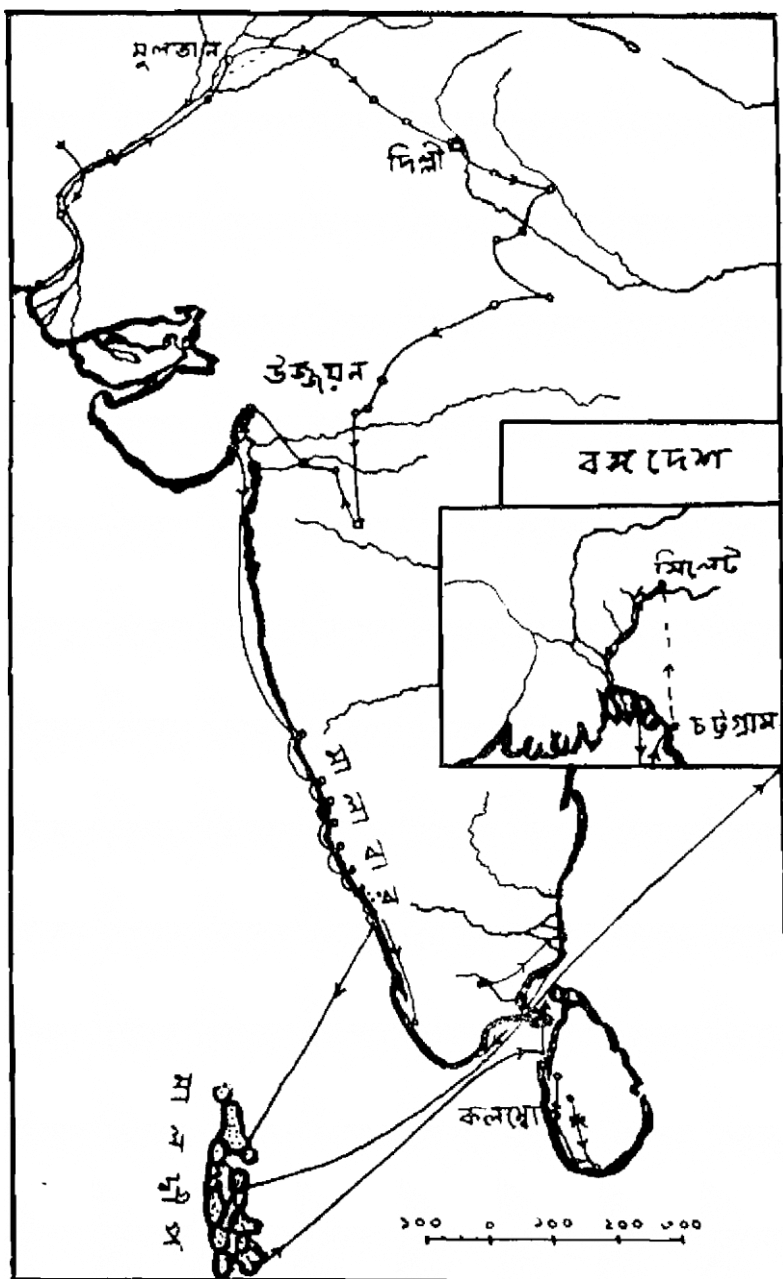
ইব্‌নে বতুতার পাক-ভারত সফরের খসড়া মানচিত্র
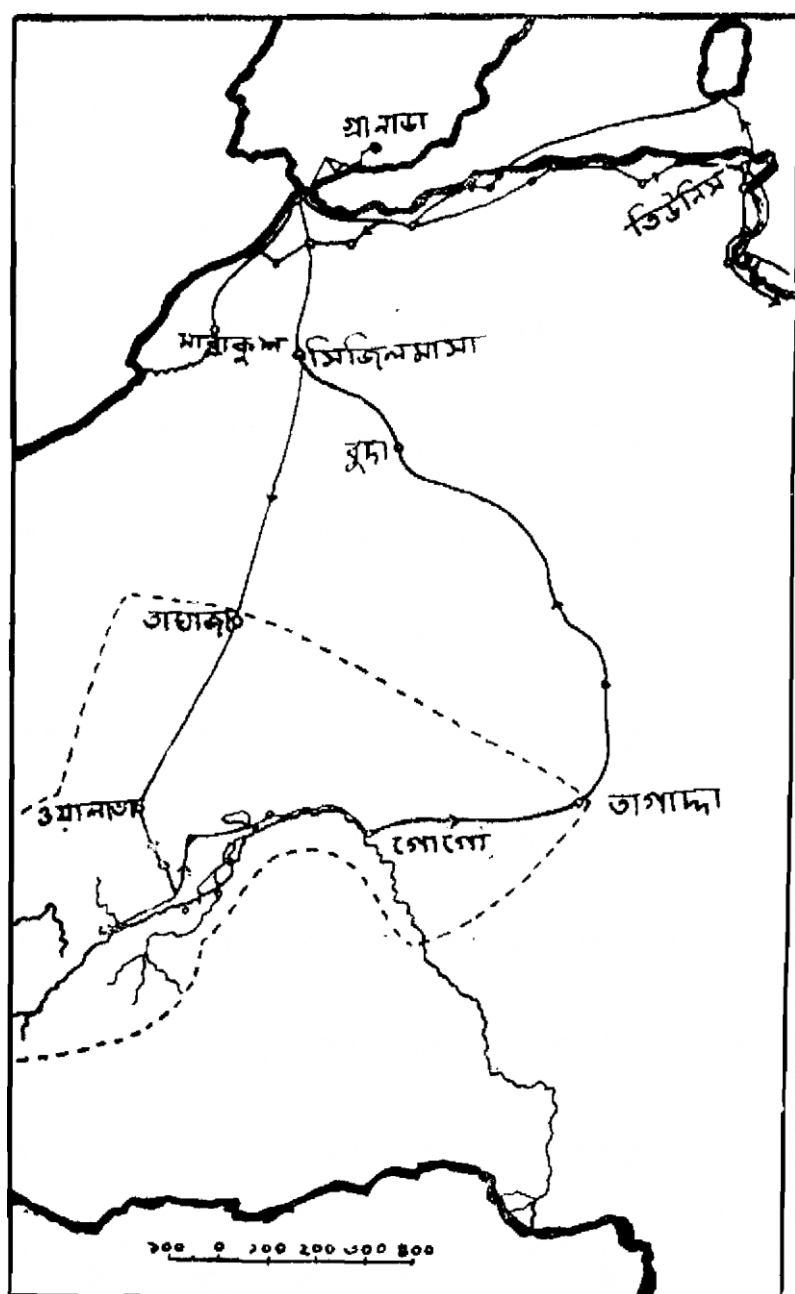
ইব্‌নে বতুতার পশ্চিম আফ্রিকা সফরের খসড়া মানচিত্র
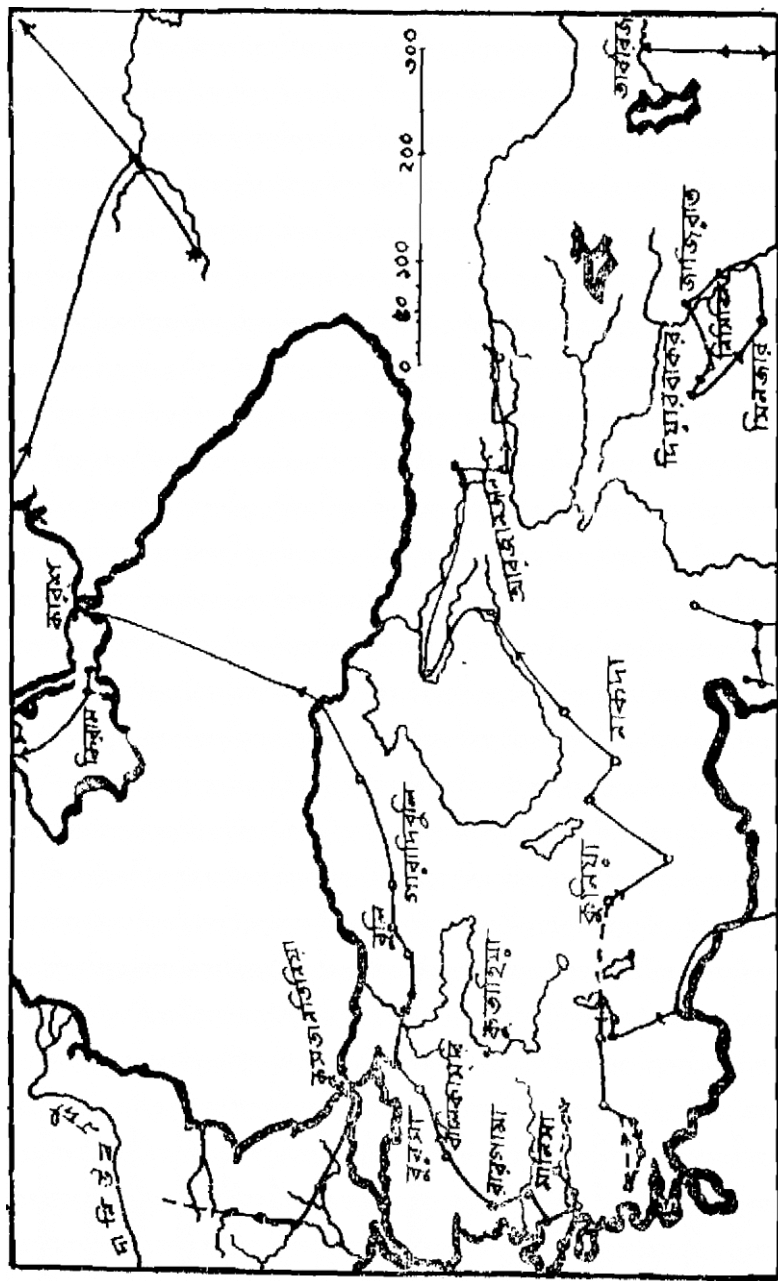
ইব্‌নে বতুতার এ্যানাটোলা সফরের খসড়া মানচিত্র

অবতরণিকা

বর্তমান দুনিয়ার কাছে মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সভ্যতার সময়কার মানুষকে মনে হয় অতি দূরবর্তী ও একান্ত অবাস্তব বলে। তাদের নাম ও কার্যকলাপের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে আমাদের ইতিহাসের পাতায়, তাদের গঠিত স্মৃতিসৌধ আজও আমাদের নগরসমূহ সুশোভিত করছে। তবু তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কসূত্র আজ এত ক্ষীণ যে কিছুটা কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাদেরকে বুঝবার উপায় নেই। সে তুলনায় বিরাট মুসলিম সভ্যতার প্রভাব সম্যক উপলব্ধি করতে হলে কল্পনার সহায়তা যে বহুগুণ বেশি প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। যদিও সে যুগের মুসলিম সভ্যতা মধ্যযুগীয় ইউরোপের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার অস্তিত্বকেই সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছিল এবং শত বন্ধনে জড়িত থেকেও যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভয়-ভীতি অগ্রাহ্য করে শত রকমে তার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ ছিল, তবু তা আজ আমাদের কল্পনার বিষয়বস্তু। যে সকল ভাগ্যবান লোক দেশভ্রমণে সক্ষম তাঁরা আজও মুসলিম সভ্যতার স্মৃতিসৌধ সমূহ পরিদর্শন করতে পারেন; কিন্তু সে যুগের মানুষ ও তাদের আচার-ব্যবহার আজ আমাদের কাছে হয়তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অথবা মানসপটে ওঠা আরব্যরজনীর রহস্যময় দৃশ্যের মতই তা ক্ষীণ। এমনকি বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত আলেখ্য উদ্ধার করা একটি সুকঠিন কাজ। ইতিহাস ও জীবনচরিত্রের বিশেষত্ব এবং অতীত যুগের নরনারীদের পুনরায় চোখের সামনে রূপায়িত করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু সুদূর অতীতের চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে নিবিড় স্পর্শে জীবন্ত করে তোলার ভিতরেই রয়েছে ইবনে বতুতার বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার পটভূমিতে জনমানুষের যে দৃশ্য আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে তার ভেতর ইবনে বতুতার নিজের চরিত্রটিই সবচেয়ে মূর্ত ও জীবন্ত। তাঁর বর্ণনায় তিনি যে আমাদের চোখের সামনে নানা দোষ-গুণে মণ্ডিত নিজের একটি অবিকল প্রতিকৃতি তুলে ধরেছেন তা নয়, বরং মনে হয়, অতীতের পূর্ণাঙ্গ একটি যুগই যেন মৃতের জগৎ থেকে উদ্ধার পেয়ে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠেছে আমাদের সামনে। ইবনে বতুতার এ সফরনামা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণের দ্বারা অফুরন্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু তাঁর এ গ্রন্থটি যে প্রধানতঃ মানবচরিত্রের একটি রোজনামচা বিশেষ এবং এতে যে ঘটনাবলীর বিবরণ দান বা তথ্য সংগ্রহের স্পৃহার চেয়ে রোজনামচা লেখক ও তার শ্রোতাদের পছন্দ-অপছন্দকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি এ কথাটি যে সমালোচনায় স্থান পায়নি সে সমালোচনা এ গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে আদৌ সক্ষম হয়েছে বলা যায় না। ইবনে বতুতার চরিত্রের যে রূপটি এ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে তার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ-বোধ না করে পারা যায় না। তাঁর চরিত্র ছিল বদান্যতার আতিশয্য। জীবনের মূল্যবোধ যে যুগে ছিল ন্যূনতম সে যুগেও

তিনি ছিলেন মনুষ্যোচিত ভাবপূর্ণ দয়ালু নির্ভীক (মধ্যযুগের সফরকারীরা কি সমুদ্রকে কম ভয় করতেন ?) আমোদপ্রিয় এবং কিছুটা স্ত্রৈণ। এসব সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে পরিস্ফুট রয়েছে অটল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুরাগ। মানবসুলভ পাপাচারের স্বাভাবিক বাসনা অন্তরে নিহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একান্ত সদাচারী।

ইবনে বতুতার নিজের বর্ণনার বাইরে তাঁর বাহ্যিক জীবন সম্বন্ধে আমরা খুবই কম জানতে পারি। তাঁর সফরনামার সম্পাদক ইবনে জুজায়ী (Juzayy) লিখেছেন ঃ ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইবনে বতুতা তানজিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে লিখিত একখানা সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত গ্রন্থে দেখা যায় সফর হতে মরক্কোয় প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি মরক্কোর কোন-কোন নগরে কাজী বা বিচারক নিযুক্ত হন। এবং পরলোক গমন করেন ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা পরবর্তী বছরে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ বিন আবদুল্লাহ। ইবনে বতুতা ছিল তাঁর বংশগত পদবী যা আজও মরক্কোয় প্রচলিত দেখা যায়। তাঁদের এ বংশ কয়েক পুরুষ পূর্ব থেকেই তানজিয়ারে বসবাস করছিলেন এবং তাঁরা লুবাতার বারবার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ সম্প্রদায়ের নাম প্রথমে ইতিহাসে স্থান পায় সাইরেনাইকা ও মিসরের সীমান্তবর্তী একটি যাযাবর জাতি হিসাবে।

দিল্লী নগরীতে কাজীর পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ তাঁদের বংশে বহুসংখ্যক কাজী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁর বর্ণনার এক জায়গায় স্পেন দেশের রনদাহ্ নামক নগরে তাঁর এক জ্ঞাতিভ্রাতার কাজী-পদে অধিষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। এসব দেখে তিনি উচ্চবংশীয় মুসলিম ধর্মানুরাগী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া তিনি সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক বিশেষ শিক্ষায়ও নিশ্চয় শিক্ষিত ছিলেন। একস্থানে তিনি স্বরচিত একটি কবিতা উদ্বৃত করেছেন, যদিও অন্যান্য স্থানে তাঁর উদ্ধৃত কবিতাগুলি আরবী ভাষার উৎকৃষ্ট কবিতার নিদর্শন বলে গণ্য হবার যোগ্য নয়। তাঁর গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ও বিষয়ের প্রতি তাঁর অসামান্য আকর্ষণ আমরা লক্ষ্য করি। এ আকর্ষণ আরও পরিস্ফুট হয় তাঁর ভ্রমণ পথের প্রতি শহরে বন্দরে তিনি যে সব কাজী ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন শুধু তাদের ফিরিস্তি দেখে (সময় সময় অন্য সব কিছুর বর্ণনা বাদ দিয়েও) এবং বিশেষ করে তাঁর ভ্রমণপথের সর্বত্র প্রসিদ্ধ শেখ ও তাপসদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ দেখে ও তাঁদের অলৌকিক অবদানের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা শুনে।

সুতরাং কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতানুসরণ করে ইবনে বতুতাকে মুসলিম তাপস ও তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া বা মুসলিম ধর্ম শাস্ত্রজ্ঞদের প্রতি 'নির্বোধের' মত আকৃষ্ট হওয়া এবং সফরকালে দৃষ্ট শহর ও স্থানের বিশদ বিবরণ দানে অবহেলার দোষে দোষারোপ করার প্রশ্ন একান্ত অপ্রাসঙ্গিক। ধর্ম বিষয়ক এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণীতে তাঁর ও তাঁর শ্রেণীমণ্ডলীর প্রবল আগ্রহ ছিল। এমন কি আজ আমাদের কাছেও সে সব নিরর্থক বা মূল্যহীন নয়। অধিকন্তু এ সব বিবরণী থেকেই আমরা তাঁর সবচেয়ে প্রাণবন্ত বর্ণনার পরিচয় পাই। কোয়েল (আধুনিক আলীগড়) হতে পলায়ন এবং শরীফ আবু ঘুররার বিবরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে, তিনি নিজে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বলেই তিনি দেশভ্রমণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং জীবনে তা সমাপনও করেছিলেন। মাত্র একুশ বছর বয়স্ক এক যুবক স্বল্প সম্বলের উপর নির্ভর করে হৃষ্টচিত্তে যেদিন তার জন্মভূমি ত্যাগ করে সেদিন তার মনে একমাত্র অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল মক্কায় হজব্রত পলন করা এবং অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শন করা। সাধ্যায়ত্ত হলে সারাজীবনে অন্ততঃ একবার মক্কায় গিয়ে হজব্রত পালনের যে পবিত্র কর্তব্য প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর ন্যস্ত রয়েছে তাই হল সর্বযুগে মুসলিমদের দেশ ভ্রমণের স্পৃহার চেয়ে বহুগুণে প্রবল। তার ফলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলিমগণ যাতে তীর্থ ভ্রমণের এ পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কালে-কালে গড়ে উঠেছে। হজযাত্রীরা উটের কাফেলা নিয়ে যাত্রা করতেন এবং মঞ্জিলে-মঞ্জিলে যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেত। যাত্রী তার যাত্রাপথের সর্বত্র এবং বিশ্রাম স্থানে সকল ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই সম্পন্ন দেখতে পেত। যাত্রাপথ বিপদ-সঙ্কুল দেশের মধ্য দিয়ে হলে উটের কাফেলাগুলিকে সশস্ত্র বাহিনীর পাহারাধীনে জায়গায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত বৃহৎ কেন্দ্রে এবং মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতর কেন্দ্রগুলিতে বিশ্রামাগার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির খরচে প্রতিষ্ঠিত মুসাফিরখানা ছিল। সে সব স্থানে তীর্থযাত্রীরা সাদর অভ্যর্থনা এবং বিনাব্যয়ে আহার ও সাময়িক আশ্রয় লাভ করত। এসব মুসাফিরখানার ব্যয় নির্বাহ হত দানশীল ব্যক্তিগণের বংশ-পরম্পরা দান করা সম্পত্তির আয় হতে। সাধারণ হজযাত্রীদের জন্যই যখন এসব সুব্যবস্থা ছিল তখন ধর্মতত্ত্বজ্ঞানী লোকদের জন্য ছিল আরও বিশেষ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শহরে তাঁর মুসলিম ভ্রাতৃগণ তাঁকে আপনজন বলে সাদরে গ্রহণ করত, তাঁর অভাব-অভিযোগ পূরণ করত এবং পরবর্তী মঞ্জিলের লোকদের কাছে তাঁর জন্য সুপারিশ করে পাঠাতে। এরূপ অনুকূল পরিস্থিতিতে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের—যার ভেতর বংশগত বা শ্রেণীগত কোন প্রভেদ নেই, পরাকাষ্ঠা সাধিত হয় এবং দেশ ভ্রমণের স্পৃহা জাগায়—তার তুলনা অন্য কোন যুগে কোন জাতির ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়নি।

একমাত্র হজযাত্রার মাধ্যমে যে দেশভ্রমণের পথ সুগম হত তা নয়। মধ্যযুগের প্রায় সব সময়েই এশিয়া ও আফ্রিকার বাণিজ্য পথসমূহ এবং ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ছিল মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের করতলগত। মুসলিম বণিকদের কর্মতৎপরতা যে কিরূপ ব্যাপক ছিল তা জানবার বহুবিধ উপায়ের মধ্যে ইবনে বতুতার সফরনামাও একটি উপায় মাত্র। অরাজকতার সময় সওদাগরদের পণ্যবাহী উটের কাফেলাগুলি হজযাত্রীদের কাফেলার চেয়ে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হলেও সাধারণ পথিকদের জন্য তাদের কাফেলা ছিল কিছুটা নিরাপদ। আমাদের বিবরণী হতেই প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সব সময়ে যে দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় এ সব সওদাগরও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দিতেন না। প্রয়োজনের সময় তাঁরা তাঁদের সহযাত্রীদের সঙ্গে নিজেদের খাদ্যসম্ভার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভাগাভাগি করে নিতেন।

পরবর্তীকালে ইবনে বতুতা এ-সকল মুসলিম বণিকের বদান্যের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন; কিন্তু যাত্রার শুরুতে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না।

ইবনে বতুতা যখন মিসরে উপনীত হন তাঁর মন আকৃষ্ট ছিল মক্কার পুণ্যভূমির দিকে, এখানে এসেই তিনি সর্বপ্রথম নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাস পান দু'জন তাপসের নিকট থেকে। এ-সময় থেকেই তাঁর অস্পষ্ট ও ক্ষীণ অভিলাষগুলি স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। যদিও সময়-সময় তিনি ইতস্ততঃ করতেন তবু সাধু ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের সহজতা খোদাভক্তির উৎস সজাগ হয়ে উঠত। পশ্চিম থেকে হজযাত্রীদের সাধারণ পথ ছিল উত্তর মিসরের মধ্য দিয়ে। সে পথে সরাসরি মক্কা গমণের প্রথম ইচ্ছা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং দামেস্কের হজযাত্রী কাফেলার সঙ্গে মক্কা রওয়ানা হতে মনস্থ করেন। দামেস্ক যাবার পথেই সর্বপ্রথম তিনি দেশ ভ্রমণের অনাবিল আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করেন। সময়ের কোন অপ্রতুলতা ছিল না বলে দামেস্কে এসে হজযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বেই তিন নিশ্চিত মনে সমগ্র সিরিয়া দেশ পরিভ্রমণ করে এশিয়া মাইনরের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন।

মক্কায় প্রথম বার হজ্জ যাপনের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পুনরায় যাত্রা করেন ইরাক পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে; কিন্তু বাগদাদ পৌঁছবার পূর্বেই অন্য পথ ধরে খুজিস্তানের মধ্যে তিনি দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করেন। তিনি বলেছেন, এ সময়ে তিনি যতটা সম্ভব এক জায়গায় একাধিকার গমন করবেন না বলে স্থির করেন। তাঁর মনে তখনও পুনর্বার হজ্জব্রত পালনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল এবং তিনি স্থির করেন বছরের শেষে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বাকাল পর্যন্ত তিনি দেশভ্রমণেই কাটাবেন। এ-সময়ে তিনি তিন বছর কালের জন্য দেশভ্রমণ স্থগিত রাখেন এবং বিদ্যাচর্চায় ও ধর্মালোচনায় লিপ্ত থেকে মক্কায় বাস করেন। ধর্ম শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে হজ্জব্রত পালন যে মুসলমানদের অন্যতম অবশ্য পালনীয় কর্তব্য শুধু তাই নয়, বরং তাঁরা হজের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মের প্রাণকেন্দ্রের বহুবিধ কর্মতৎপরতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। তখনকার মক্কা ছিল জ্ঞানী ও সুধীজনের সংস্রবে বাস করে জ্ঞানচর্চার একটি আদর্শ কেন্দ্রস্থল। এ সকলের চিন্তা যে ইবনে বতুতার মনেও ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এছাড়া অন্য উদ্দেশ্যের কথাও আমরা ভাবতে পারি। মক্কায় অবস্থানকালেই তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হবেন বলে স্থির করেন। তখনকার দিল্লীর সুলতানের অসীম বদান্যতা স্বভাবতঃই বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ লোকদের আকর্ষণ করত। মক্কায় কয়েক বছর অবস্থানের ফলে তাঁর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, সাধারণভাবে যে পদ তিনি পেতে পারেন তার চেয়ে উচ্চপদ লাভ করবেন এই ছিল ইবনে বতুতার মনের আকাঙ্ক্ষা।

মক্কায় কয়েক বছরের অধ্যয়নকাল কাটিয়ে তিনি সঙ্গী-সাথী সহ আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করতে বের হন এবং পূর্বের মতই মক্কায় ফিরে

আসেন। অতঃপর পবিত্র মক্কা নগরী পশ্চাতে রেখে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু প্রথমে তিনি যেরূপ অনুমান করেছিলেন তাঁর যাত্রাপথ তার চেয়ে দীর্ঘতর ও বিপদ সঙ্কুল হয়। জেদ্দা পৌছে তিনি দেখতে পান সেখানে ভারত গমনের জন্য কোন জাহাজ প্রস্তুত নেই। ফলে কোন এক অদৃশ্য শক্তির তাড়নায়ই উত্তরাভিমুখে চলতে আরম্ভ করেন এবং এখান থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ। এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণকালে তিনি বিপুল সমাদর লাভ করেন স্থানীয় মুসলমানগণের দ্বারা। অতঃপর কৃষ্ণসাগর পার হয়ে তিনি প্রবেশ করেন মঙ্গল খাঁর রাজ্যে। কনস্টান্টিনোপল দেখবার সুযোগ লাভ করে এবং মধ্যএশিয়া তৃণভূমি অঞ্চল পাড়ি দিয়ে তিনি খোরাসান পৌছেন। এ-সময় হতে তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে পরিচিত হন। তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর ধন-সম্পদ ও এ-সময়ে এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তিনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ 'আমার সঙ্গে আমার অশ্বের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা উল্লেখ করতে আমি সাহস করতাম না— পাছে সন্দেহপ্রবণ লোকেরা আমার কথা অবিশ্বাস করে।'

এভাবে অবশেষে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতে এসে হাজির হন এবং বিশেষ শান-শওকতের সঙ্গে তাঁকে দিল্লীতে অভ্যর্থনা জানান হয়। দিল্লীতে তিনি বাদশাহের বিশেষ আগ্রহ ও সাহায্য লাভ করেন এবং উচ্চ বেতনে দিল্লীর মালিকাইত কাজীর পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এতে তাঁর বৈশিষ্ট্যের কিছুই প্রকাশ পায়নি। কারণ, অনেকের ভেতর তিনিও একজন কাজী মাত্র ছিলেন। কাজীর উক্ত পদে ইবনে বতুতা সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিল্লী অবস্থান কালে কখনও-কখনও তিনি বাদশাহের সমরাভিযানের সাথী হতেন, কখনও দরবারে নিজ কার্যে বহাল অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর সেই অভিজ্ঞতার যে বিচিত্র বর্ণনা দান করেন তা মধ্যযুগীয় যে কোন মুসলিম দরবারের বর্ণনার চেয়ে বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ। সেদিন স্বয়ং সুলতান বা তাঁর আমীর ওমরাহ্ কি ভাবতে পেরেছিলেন যে ষষ্ঠ শতাব্দী কাল পরে তাঁদের খ্যাতি-অখ্যাতি নির্ভর করবে পশ্চিম দেশীয় একজন অজ্ঞাতনামা অমিতব্যয়ী কাজীর ক্ষুদ্র স্মারকলিপি ও স্মৃতিকথার উপর ? অবশেষে একদিন শাহী দরবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরল। রাজরোষের অশুভ ফলাফল স্বভাবতঃই হয় দ্রুত এবং মর্মান্তিক।

ইবনে বতুতা তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ও চাকরি বর্জন করে শেষ অবলম্বন স্বরূপ বেছে নিলেন দরবেশের জীবন যাপন। পার্থিব জগতের প্রতি তাঁর এ নির্লিপ্ততা ছিল অকৃত্রিম। মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ব-জ্ঞানিগণ জগতের প্রতি এ নির্লিপ্ততাকে বিশেষভাবেই পছন্দ করতেন। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, সুলতান মুহম্মদ ইবনে বতুতার অকৃত্রিম সততা ও ধর্মনীতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কেন না কিছুদিন পরেই যখন রাষ্ট্রদূত হিসাবে চীনে প্রেরণের জন্য একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হল, তখন সুলতান ডেকে পাঠালেন ইবনে বতুতাকে। ইবনে বতুতা এক রকম অনিচ্ছার সঙ্গেই দরবেশী খেরকা পরিত্যাগ করে পুনরায় 'পার্থিব জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন!' কিন্তু এ-কাজে সম্মত

করার জন্য যে উৎকোচ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার মূল্যও কম ছিল না। প্রায় রাজকীয় জাঁকজমকের সহিত ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে সে আমলের পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক মুগল সম্রাটের দরবারে ইবনে বতুতাকে পাঠানো হল।

দিল্লী শহরের প্রাচীরের বাইরে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় নানা রকম বিপদ-আপদ। পলাতক বলে তাঁকে ধরবার জন্য ক্রমাগত আট দিন অবধি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যদিও তিনি তাঁর দলের সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হন, তখন তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ও জায়নামাজ ছাড়া কালিকটের উপকূলে পৌছে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এ অবস্থায় মিশনে যাওয়া সম্ভব পর নয়। এদিকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেও সুলতানের রোষে পতিত হবার সমূহ সম্ভাবনা। তার পরিবর্তে তিনি মালাবার উপকূলে দেশীয় স্বাধীন রাজদরবারে ভাগ্য পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন এবং মালদ্বীপপুঞ্জ উপস্থিত হয়ে অচিরেই সেখানকার কাজী পদে বহাল হয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হলেন। প্রায় আঠার মাস কাল আলস্যে সময় কাটানোর পর সংস্কারমূলক কার্যে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাবার ফলে কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি বিরাগ ও সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন। তখন সে দ্বীপ ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়া তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাঁর অন্তরে যে সর্বত্যাগী তাপসের মূর্তি ছিল সে যেনো আবার জেগে উঠল। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সিংহলের সর্বোচ্চ পর্বত শিখরে অবস্থিত আদমের কদম মোবারক জেয়ারত করা। সে কাজ সমাধা করে তিনি পুনরায় ফিরে এলেন করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে এবং স্বল্পকালের জন্য মালদ্বীপে পুনরায় গমন করে চীন যাত্রার জন্য একাগ্রভাবে প্রস্তুত হতে থাকেন।

সমুদ্র যাত্রার পথে অনুকূল আবহাওয়া শুরু হতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। এ সময় তিনি সমুদ্র পথে বাংলাদেশ সফর করবেন, মনস্থ করলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁর এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল আসামবাসী একজন প্রসিদ্ধ শেখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। অতঃপর তিনি সুমাত্রা থেকে চীনগামী জাহাজে আরোহণ করেন। এসব জাহাজের মালিক ছিলেন মুসলমান সওদাগরেরা। জাহাজের খালাসীরা ছিল মালয় ও চীনের অধিবাসী। ইবনে বতুতার সফরনামা ব্যাখ্যাকারীদের মতে তিনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর চীনের 'সাংহাই' অবধি গমন করেন। সাংহাই বন্দর তখন বিদেশী বণিকদের কাছে শওয়ান-চৌ-ফু বা জয়তুন নামে পরিচিত ছিল। এই সফরকালে ইবনে বতুতা রাজদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আজ আমাদের কাছে অবশ্যই কিছুটা অদ্ভুত বলে মনে হবে যে দূতাবাস ও পরিচয়বিহীন এ রাজদূতকে কেউ কোন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন নি। চীনের ভেতর দিয়ে তিনি যাতে অবাধে অগ্রসর হতে পারেন সেজন্য রাজদূতের ভূমিকা ছিল তাঁর একটি কৌশল মাত্র। অবশ্য চীনের বাণিজ্য বন্দরগুলিতে তাঁর স্বধর্মী মুসলমানদের কাছে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি এ-কাজে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। পিকিং যাতায়াতের পথে প্রতি শহরে তিনি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। কিন্তু পিকিং পৌছে সম্রাটের অনুপস্থিতির দরুন তাঁর সাক্ষাতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কিছুটা হতাশ হন।

জয়তুনে ফিরে তিনি পুনরায় সুমাত্রার জাহাজে আরোহণ করেন এবং সেখান থেকে যাত্রা করেন মালাবার। এবারে তিনি দিল্লীর মায়াময় শান-শওকতে পুনরায় প্রলুব্ধ হতে যাবেন না বলে স্থির করেন এবং পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথমবার যখন সিরিয়ায় 'কালা মড়ক' আরম্ভ হয় তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকটি মাত্র বাক্যে তিনি সে মড়কের ভয়াবহতার একটি পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। এ সময়ে ভবিষ্যতের জন্য তাঁর কোন পরিকল্পনা স্থির করা ছিল না। তিনি তখন তাঁর সপ্তম বারের হজ সমাপনের চিন্তাই শুধু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি কারণে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তা বুঝা যায় না। তাঁর প্রত্যাবর্তনের কারণস্বরূপ নিজের বিবরণে তিনি তদানীন্তন সুলতান আবু হাসান ও তাঁর পুত্র আবু ইনানের অধীনে মরক্কোর দ্রুত উন্নতি ও শক্তিশালী হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁর প্রত্যাবর্তনের কারণ পরিজনের প্রতি আকর্ষণই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ অতিরঞ্জন ও চাটুকারিতার অংশ বাদ দিয়া তাঁর কথায় আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কিন্তু তানজিয়ারে তাঁর স্বল্পকাল অবস্থিতি এবং যেমন ভাবলেশহীনভাবে তিনি সে বিষয় উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি যে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিছুমাত্র কাতর ছিলেন তা আদৌ ভাবা যায় না। মধ্যযুগের ইসলামের সেই বিশ্বনাগরিক সমাজ বন্ধনের দিনে ইবনে বতুতার গৃহাভিমুখী হওয়ার বিশেষ কারণও ছিল না।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বার্বারি উপকূল অবধি সফর নিরাপদ ছিল না। দু'বার তিনি খ্রীস্টান সৈন্যদের কবলে পড়তে পড়তে কোনক্রমে রক্ষা পান এবং প্রায় ফেজের কাছাকাছি গিয়ে তাঁর কাফেলা একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু তবু তাঁর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি। তখনও দুইটি মুসলিম রাষ্ট্র—আন্দালুসিয়া ও নাইজার নদীর তীরস্থ নিগ্রো দেশ তাঁর সফর করা হয়নি। কাজেই পুনরায় তিনি তাঁর ভ্রমণের যষ্টি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন এবং তিন বছরকালের মধ্যে যে পর্যন্ত না ন্যায়ত 'ইসলামের সফরকারী' আখ্যায় আখ্যায়িত হলেন সে পর্যন্ত যষ্টি হাত থেকে নামালেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন মধ্যযুগের একমাত্র সফরকারী যিনি তৎকালীন মুসলিম শাসিত সব দেশ তো সফর করেছেনই, অধিকন্তু সফর করেছেন বিধর্মীদের দেশ কনস্টান্টিনোপল, সিংহল ও চীন। মিঃ ইউল নির্ণয় করেছেন, ইবনে বতুতা কমপক্ষে ৭৫ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করেছেন। বাষ্পীয় যান আবিস্কারের আগে কারও পক্ষেই এত দীর্ঘপথ পরিভ্রমন সম্ভব হয়নি।

দুঃখের বিষয়, সেকালে সফরকালে যারা তাঁকে দেখেছেন এমন কারও বিবরণ, যতদূর জানা যায়, আজ পর্যন্ত আমরা পাইনি। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের লেখায় মাত্র দু'টি স্থানে তাঁর বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়। সে উল্লেখও আবার তাঁর বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে বিতর্কতামূলক। ব্যক্তিগতভাবে ইবনে বতুতার প্রতি তাঁদের ধারণা কিরূপ ছিল তা' আমরা জানতে পারি না; কিন্তু তাঁর নিজের অকপট বিবৃতি থেকে আমরা তাঁর সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পারি। আমরা দু'বার—একবার দিল্লীতে এবং

আরেকবার মালদ্বীপে, বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েও— ইবনে বতুতাকে বিরাগ ও সন্দেহভাজন হতে দেখি। তার প্রথম কারণ ছিল তাঁর অসামান্য অপব্যয়িতা এবং দ্বিতীয় কারণ ছিল তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং স্বাধীনচেতা মতবাদ। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, ইবনে বতুতা চাইতেন, রাজ-রাজড়া ও উজিররা হবেন অতিমাত্রায় দানশীল ও বদান্য। তাঁদের পক্ষে দিল-দরাজী ও দস্তদরাজীই হবে লোকের চোখে তাঁদের সম্মান লাভের যোগ্যতার মাপকাঠি। ইবনে বতুতা কোন সুলতান সম্বন্ধে যখন বলেছেন, 'তিনি ভাল সুলতান বা ভাল শাসনকর্তাদের একজন, তখনই বুঝে নিতে হবে, সে সুলতান ধর্মীয় বিধানসমূহ যথাযথ পালন করেন এবং বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ লোকদের প্রতি তিনি মুক্তহস্ত। আমরা সহজেই বুঝতে পারি তাঁর এ মনোভাব তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের বিরক্তির উদ্রেক করেছিল, ফলে অপ্রীতিকর ঘটনা অথবা পরস্পরের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের দু'একটি ঘটনা বাদ দিয়ে ইবনে বতুতা যেখানেই পদার্পণ করেছেন সেখানেই পেয়েছেন বিপুল সমাদর ও সম্মান।

ইবনে বতুতার সফরনামার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করতে গেলে অবশ্যই তাঁর গ্রন্থটির মোটামুটি বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। যে-সব জায়গা তিনি পরিভ্রমণ করেছেন সে-সব জায়গার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হয়তো তিনি লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, তেমন কিছুই তিনি করেননি। সুদীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনীর মাত্র একটি স্থানে তাঁর কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখার উল্লেখ দেখা যায়। তিনি বলেছেন, বোখারা সফরকালে সেখানকার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কবরের উপরস্থ প্রস্তর ফলকের লেখাগুলি তিনি নকল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন ভারতীয় জলদস্যুরা তাঁর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে তখন সেগুলিও হারিয়ে যায়। কবরের প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ লেখাগুলি পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ লোকদের কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিল, কারণ, ঐগুলি ছিল পরলোকগত লোকদের লেখার তালিকা। ইবনে বতুতা নিজে লেখক ছিলেন না এবং তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণী যে একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হতে পারে তাও তিনি ধারণা করেননি। মনে হয় তিনি সেগুলি লিপিবদ্ধ করার কথাও চিন্তা করেননি।

ফেজ শহরে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর অভিযানের বিষয় সুলতানের ও তাঁর দরবারের লোকদের নিকট বর্ণনা করেন। ইবনে বতুতার সমসাময়িক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খলদুনের গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, তাঁর বর্ণিত কাহিনীর অধিকাংশই অবিশ্বাস্য বলে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু দরবারের ক্ষমতাশালী উজিরের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন এবং উজিরের পরামর্শ মতই সুলতান তাঁর অন্যতম প্রধান কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইবনে জুজায়ীকে সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখতে আদেশ দেন। তখন ইবনে বতুতার বর্ণনানুযায়ী ইবনে জুজায়ী এ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার ফলে বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ এ-গ্রন্থখানা আমরা পেয়েছি। লেখক কিন্তু সর্বদা ইবনে বতুতার বর্ণিত বিষয় অবিকল লিপিবদ্ধ করে সন্তুষ্ট হননি। প্রতিটি বিদেশী নামের সঠিক উচ্চারণ তিনি বিশেষ যত্নে লিখে নিতেন। আরবী হরফের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে বিদেশী এই নামগুলির সঠিক উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা একটি গুরত্বপূর্ণ কাজ বলেই গণ্য হবে। কিন্তু

অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারে ইবনে জুজায়ীর গ্রন্থ সম্পাদন পদ্ধতি সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। তাঁর নিজ উক্তি হতেই জানা যায় যে, গ্রন্থটি সংক্ষেপ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে দু'একটি অংশ সংক্ষিপ্ত হবার এই কারণ। কোন-কোন স্থানে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া ভ্রমণ বৃত্তান্তের অধিকাংশই বিবৃতি-দানকারীর কথা সরল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। যুগোপযোগী ও রুচিসম্মত করার উদ্দেশ্যে ইবনে জুজায়ী মার্জিত ভাষা ব্যবহার ও কবিতাংশ উদ্ধৃত করে বিবৃতিটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে সফলকাম হননি। স্বীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা দান কালে ইবনে বতুতা যদি অন্য কোন বিষয়ের অবতারণা করে থাকেন তবে তা বরং ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু অন্যের বেলায় অনুরূপ কার্য সমর্থনযোগ্য নয়। ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁর সম্মুখে ছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে মিসর, হিজাজ ও সিরিয়া ভ্রমণকারী আন্দালুসিয়ার পণ্ডিত ইবনে জুবাইয়ের ভ্রমণ বিবরণী। পাশ্চাত্য জগতে সে গ্রন্থখানা বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। যে-সব স্থান ইবনে বতুতা ও ইবনে জুবাইর উভয়েই ভ্রমণ করেছেন সে-সব স্থানের বিবরণ করতে গিয়ে ইবনে জুজায়ী ইবনে জুবাইয়ের ভ্রমণ বিবরণী থেকে অকৃপণভাবে সংক্ষিপ্তাকারে নকল করেছেন। বিশেষ করে হজের সময় এবং বছরের অন্যান্য সময় যেসব অনুষ্ঠান পালন করা হয় তার বিবরণসমূহ ইবনে জুবাইয়ের গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ ইবনে বতুতার অনুমোদন ক্রমেই এ-কাজ করা হয়েছে। কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইবনে বতুতার গ্রন্থের সম্পূর্ণটা তাঁর নিজের বর্ণনা নয়। বিশেষ করে পারস্য ভাষা থেকে অনূদিত বাক্যাংশ দেখে মনে হয় আমাদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থখানা পাঠ করে দেখেননি অথবা পাঠ করে থাকলেও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেননি।

গ্রন্থখানা সমগ্রভাবে বিচার করে দেখলে আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে, চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশের মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বিবরণ দানই ছিল এ-গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য। আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করেছি যে, কোন বিশেষ স্থানের চেয়ে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই ইবনে বতুতার আকর্ষণ ছিল সমধিক। তাঁর বিবেচনায় ভূগোলের চেয়ে সব সময়েই মানুষ ছিল বড়। তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞান বলতে ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৈবক্রমে পরিচিত লোকদের কাছে সংগৃহীত সংবাদ। কোন বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিতে হলেই তিনি নির্ভর করতেন স্মৃতিশক্তির উপর। ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর স্মৃতিশক্তিও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বেশ কিছুসংখ্যক পুস্তক কণ্ঠস্থ করণই ছিল শিক্ষার পদ্ধতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইবনে বতুতার বর্ণনায় ভুলভ্রান্তির অবকাশও ছিল যথেষ্ট। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনের ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি পরের বিবরণ পূর্বে এবং পূর্বের বিবরণ পরে দিয়েছেন। দু'বার এমনও হয়েছে যে তিনি যেন নিজেকে হাওয়ার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন— শত শত মাইল পরিভ্রমণের কোন বিবরণই তিনি দেননি। কোন-কোন স্থানে তিনি ভুল নাম উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে ভুল করেছেন অমুসলমান দেশের বিবরণ দিতে গিয়ে। কারণ, ঐ সব স্থানে তাঁর আরবী ও ফারসী ভাষার জ্ঞান বিশেষ

কার্যকরী হয়নি। তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণী সাধারণতঃ যাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, নির্ভুল নয়। অবশ্য তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত অসংখ্য ব্যক্তি ও স্থানের বিষয় বিবেচনা করলে ভুলত্রুটির সংখ্যা যে অতি নগণ্য তা অনস্বীকার্য। তারিখ সহ তাঁর ভ্রমণ বিবরণী যে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারা এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। অনেকগুলি তারিখ দেখে মনে হয় সম্ভবতঃ সম্পাদকের অনুরোধে সেগুলি যেখানে-সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সব তারিখ পরীক্ষা ও সংশোধন করা এতই কষ্টসাধ্য যে, এ-গ্রন্থ প্রণয়নে সে চেষ্টাই করা হয়নি।

সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে ইবনে বতুতার বিবরণীর সত্যতা। এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, তার অতিশয়োক্তি ও ভুল বুঝার অংশ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম দেশগুলি সম্বন্ধে তিনি যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন অকপটে তারই বর্ণনা দিয়ে গেছেন। কিছু সংখ্যক সমালোচক অবশ্য ইবনে বতুতার কনস্টান্টিনোপল ও চীন ভ্রমণের দাবী সন্দেহের চোখে দেখেন। কনস্টান্টিনোপল দর্শনের বিষয়ে প্রধান অসুবিধা হল ভ্রমণ পথের বিবরণের অস্পষ্টতা এবং প্রাক্তন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের উল্লেখ। কারণ ইবনে বতুতার নিজের দিনপঞ্জী অনুযায়ী দেখা যায় প্রাক্তন সম্রাট এক বছর আগেই পরলোক গমন করেছেন। পথের বিবরণের অস্পষ্টতার কারণ হয়তো অপরিচিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আরবী ভাষাভাষী পরিব্রাজকের বুঝতে অসুবিধা বা অক্ষমতা এবং দ্বিতীয় অসঙ্গতির কারণ সম্ভবতঃ তারিখের ভুল। শহরের বিবরণ কিন্তু এত বিশদ ও নির্ভুল যে, তা ইবনে বতুতার মত সর্বপ্রকার সুবিধা সহায়তা লাভের অধিকারী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির হতেই পারে না। এমন কি, প্রাক্তন সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণের মধ্যেও সত্যের নির্ভুল ছাপ রয়েছে।

চীন যাত্রার পথের ও চীনের অভ্যন্তরে বিবরণীর ব্যাপারে একই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তার পূর্ণ বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হবে। এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, ইবনে বতুতার চীনে যাওয়া ও চীন ভ্রমণের বিবরণ অস্বীকার করতে গেলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং একই রকম যুক্তি দ্বারা সহজে 'প্রমাণ' করা সম্ভব হয় যে, তিনি ভারতেও যান নাই, যদিও ভারতে তিনি অবশ্যই গিয়েছিলেন। ইবনে বতুতা যখনই পরের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন তখনই দেখা যায় তাঁর বিবরণী সন্তোষজনক হয়নি। অথচ অন্যের দেওয়া তথ্যের কিছুটা না নিয়ে শুধু নিজের দেখা বিষয়ের উপর নির্ভর করে এত বড় গ্রন্থ রচনা করা প্রায় অসম্ভব। তাঁর চীন ভ্রমণের স্বপক্ষে কতকগুলি জোরালো যুক্তিও রয়েছে। দিল্লীর সুলতানের দূত হিসেবে তাঁর চীন গমণের যথেষ্ট কারণ আছে এবং চীনের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণের তাঁর যে সুযোগ-সুবিধা ছিল তা অন্য কোন সাধারণ সওদাগরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত: খানসা (হ্যাং চাও) অবস্থানকালীন কার্যকলাপের বিবরণের এক স্থানের অস্পষ্টতা আসামে শেখ জালাল উদ্দীন সন্দর্শনে গমনের বিষয়ে প্রদত্ত পূর্ববর্তী এক বিবরণীর দ্বারা দূরীভূত হয়। তাঁর চীন ভ্রমণের সঙ্গে আসাম ভ্রমণের সম্পর্ক খুব নিবিড়। তৃতীয়ত: তাঁর চীন ভ্রমণের দাবী যদি মিথ্যা হয় তবে তাঁর ধরা পড়বার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। উত্তর

চীনে ভ্রমণ কালে তিনি যে সিউটা হতে আগত একজন সওদাগরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সে কথা জোর দিয়ে বলেছেন। উক্ত সওদাগর ছিলেন মরক্কোর অন্তর্গত সিজিল মাসার জনৈক অধিবাসীর ভ্রাতা। তার সঙ্গে পরবর্তীকালেও ইবনে বতুতার পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেকালেও মরক্কোর সঙ্গে উক্ত বণিকের যোগাযোগ ছিল তা অসম্ভব নয়। কারণ এক সময়ে ইবনে বতুতা নিজেও ভারত থেকে কিছু টাকা মেকুইনেজে পাঠিয়েছিলেন। অতএব ইবনে বতুতার চীন ভ্রমণ আমার কাছে মোটের উপর প্রকৃত বলেই মনে হয়, যদিও এ বিবরণ সংক্ষেপ করা হয়েছে অস্বাভাবিকভাবে। সম্ভবতঃ এর কারণ ছিল চীনের নামগুলি ইবনে বতুতা শিখে থাকলেও আরবী ফারসী নামের মত তা সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে সক্ষম হননি কিংবা গ্রন্থ সম্পাদকই এ বিবরণটি সরাসরিভাবে সংক্ষেপ করেছেন। বস্তুতঃ আমাকে ইবনে বতুতার চীন সফরের বিবরণী বিশ্বাস করতে হয়, নতুবা ধরে নিতে হয় যে, ভারতে তিনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যে দরবেশের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁরই সম্মোহন শক্তির প্রভাবে তিনি চীন সফর করেছেন বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ইবনে বতুতার নাম সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডা. স্যামুয়েল লি কর্তৃক অনূদিত একখানা সংক্ষিপ্ত পুস্তকের দ্বারা। তাঁর ভ্রমণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণীটি কয়েক বছর পরে আলজিরিয়ায় পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে ডিফ্রিমারী ও সাঙ্গুইনেটির ব্যাখ্যাসহ উক্ত ভ্রমণ বিবরণীর একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পাণ্ডুলিপিগুলির একখানাতে ইবনে বতুতার বিবরণীর দ্বিতীয় অর্ধাংশ পাওয়া যায়। সে অংশটি ছিল মূল সফরনামা সম্পাদক ইবনে জ্জায়ীর স্বহস্ত-লিখিত । ফরাসী অনুবাদটিকে মোটের উপর আরবী গ্রন্থের সঠিক অনুবাদ বলে গ্রহণ করা গেলেও তাতে ব্যাখ্যা সম্বলিত টীকার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফরাসী ভাষায় অনূদিত সফরনামার বিভিন্ন অংশে উল্লেখিত দেশগুলির বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পণ্ডিতগণ এতে অনেক টীকাটিপ্পনী যোগ করেছেন, কিন্তু তা'হলেও বহুলাংশের টীকা এখনও বাকি রয়েছে। বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে সরাসরি আরবী হতে। এ-গ্রন্থে ইবনে বতুতাকে ভূগোল রচয়িতা রূপে না দেখিয়ে পরিব্রাজকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এ-গ্রন্থে এবং টীকাটিপ্পনীতে এমন যথেষ্ট ইংগিত দেওয়া হয়েছে যার সাহায্যে যে কোন একটি বৃহদাকার মানচিত্রের মাধ্যমে ইবনে বতুতার ভ্রমণপথ সহজে অনুধাবন করা যাবে। অবশ্য এ বিবরণীর নানা ভৌগোলিক সমস্যা সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে।

বর্তমান অনুবাদে এলিজাবেথের আমলের মার্জিত ভাষা বাদ দিয়ে ইবনে বতুতা মূল গ্রন্থের সহজ ভাষাই যতদূর সম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। তাঁর মূল গ্রন্থের বর্ণনা কাহিনীর অফুরন্ত সম্পদ থেকে সংকলন করা সহজসাধ্য কাজ নয়। কাজেই বহু বিচি অধ্যায়কে বাদ দিতে হয়েছে অথবা সংক্ষেপ করতে হয়েছে। তথাপি আশা করা যায় যতদিন মূল গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ (যা হাফলুইট সোসাইটির জন্য লেখক বর্তমানে তৈরী করেছেন।) প্রকাশিত না হয় ততদিন এ সংকলন গ্রন্থটিই ব্যাপকভাবে ইংরেজ ভাষার পাঠকদের কাছে ইবনে বতুতার যুগের অথবা যে কোন যুগের সর্বশ্রে পরিব্রাজককে পরিচিত করতে সহায়ক হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম জাহান তার বিস্তৃত ও বাহ্যিক জাঁক জমকের দিক দিয়ে অষ্টম শতাব্দীর দামেশ্‌ক ও বাগদাদের খলীফা শাসিত বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় বিশেষ নগণ্য ছিল না। পশ্চিম দিকে স্পেন ও সিসিল থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার সঙ্কুচিত হলেও ভারত ও মালয়েশিয়ার দিকের বিস্তৃতির দ্বারা সে ক্ষতির পূরণই শুধু হয়নি, অতিরিক্ত বিস্তৃতিও ছিল। ধর্মযুদ্ধেরত ফ্রাঙ্কদের হস্তে পরাজয়ের গ্লানির শেষ চিহ্ন মুসলিম জাহান সম্প্রতি অপনোদনে সক্ষম হয়েছিল। এবং ইউরোপে তুরস্কের তরবারি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণেও উদ্যত হয়েছিল। তথাপি একথাও সত্য যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে এ সকল উন্নতির চিহ্ন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামো মারাত্মক ভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কালের প্রভাবে ইসলামের বিরাট সৌধে জীবনীশক্তির অতীব অপচয় ঘটেছিল এবং তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েও তার মূলে আঘাত লেগেছিল।

সিরিয়ার উপকূল থেকে সর্বশেষ জেহাদীদের অবশ্যই বিতাড়িত করা হয়েছিল, কিন্তু সে বিতাড়নের জন্য কি উচ্চমূল্যই না দিতে হয়েছিল। জেহাদের প্রারম্ভে পূর্বপুরুষের যোদ্ধাগণ যাকে সীমান্তের সামান্য সংঘর্ষ বলে মনে করেছিল তাই প্রতিহত করতে পূর্ণ দুই শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন হয়েছিল। নমনীয় আরব ও কৃষ্টির অধিকারী পারসিকদের হস্ত থেকে রাজশক্তি চলে গিয়েছিল কঠোর ও অনুদার তুর্কীদের হস্তে। খ্রীষ্টীয় ১০০০ শতাব্দীর পর প্রায় দুইশত বছর ধরে ক্ষমতালোভী তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষদের আক্রমণে মুসলিম জাহান ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তাদের আক্রমণ ও কুশাসনের ফলে দেশের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তা কোন বিদেশী শত্রুর দ্বারাও সম্ভব হয়নি। আলোড়নের পর আলোড়ন চলতে থাকে, অতঃপর মধ্য এশিয়ার বর্বর মঙ্গোলগণ এসে তুর্কী সিংহকে পরিণত করে মেষশাবকে। তারা ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে ইসলামের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডকে তাদের বিরাট সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করে।

এ ঘটনা মুসলমানদের কাছে রোজকেয়ামতের খোদাই গজবের মত প্রথমে মনে হলেও পরবর্তী কালে এ ঘটনার অভিশাপই আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল। পুনরায় পূর্বাঞ্চলের মুসলিম প্রদেশগুলি সুদৃঢ় শাসনাধীনে থেকে নিরাপত্তা উপভোগ করতে লাগল। ফলে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির যে আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়েছিল তাও পুনরায় আশাপ্রদ হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে মিসর ও সিরিয়া মঙ্গোল আক্রমণের মুখে যারা অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল পর পর কয়েকজন ক্ষমতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত শাসকের অধীনে শান্তিতে ও নিরাপদে থেকে ক্রমশঃ বিশেষ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তুর্কী সিপাহীসালারগণ একদিন শুধু মধ্য প্রদেশগুলির

ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরাসমূহ নিয়ে হানাহানি করেছিলেন। এবার তাঁরা বিতাড়িত হলেন সীমান্তের দিকে। অতঃপর তাঁরা বিধর্মী ও কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমরলিপ্সা মিটাতে লাগলেন। এ উপায়ে পার্থিব সম্পদের কিছুটা অংশ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন ও জেহাদী'র খ্যাতি অর্জন করে নিজেদের জন্য পরলোকে সম্মানজনক আসন লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। মঙ্গোল বিজয় এভাবে ভারতের ও তার কয়েক বছর পরে থ্রেস ও বলকান উপদ্বীপে ইসলামের বাহু সম্প্রসারণে সহায়তা করে। এ সফলতা পুষ্ট হয়েছিল ইসলাম প্রচারক ও দরবেশদের কর্মতৎপরতার দ্বারা।

ফলে ইবনে বতুতা যখন ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে সফরে বের হন তখন মুসলিম শাসিত ভূখণ্ডে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশেষভাবে অনুকূল। আসওয়ান থেকে সাইলিসিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মিসরের সুলতানের হুকুম ছিল অপ্রতিহত। খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধাদের স্মৃতির তিক্ততা মাত্র অবশিষ্ট ছিল এবং মঙ্গোলদের সঙ্গে সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ না হলেও ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে দামেশ্‌কে পরাক্রমশালী নাসিরের শেষ বিজয়ের সময় হতে আর কোন যুদ্ধবিগ্রহই দেখা দেয়নি। ইরাক ও পারস্য তখনও মঙ্গোল খানদের শাসন মেনে চলত। খানগণ অবশ্য পুরোপুরি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। অবশেষে অল্পদিনের ভেতরেই মঙ্গোল খানদের প্রভুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটল। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সুবর্ণ দলের (Golden herde) ও জাগহাটের (jaghatay) মঙ্গোল খানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে অসমসাহসিক ও প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশের উপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। বিশাল রাজ্যগুলির প্রান্তভাগে, আনাতোলিয়া ও আফগান প্রভৃতি দূরবর্তী অংশগুলিতে এবং ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় এমন বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সুলতান ও আমীর ছিলেন যাঁরা অপরের প্রভুত্ব স্বীকার করতেন না। বাণিজ্য অথবা জলদস্যুবৃত্তিলব্ধ অর্থে তাঁরা তাঁদের বিপদসঙ্কুল মসনদ টিকিয়ে রাখতেন। ইচ্ছা করলেও তাঁরা সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা রাখতেন না। মুসলিম জাহানের সীমান্তের ভেতরে ও বাইরে ব্যবসায় বাণিজ্য অবাধ গতিতেই চলছিল, যদিও কর দিতে হত অত্যধিক হারে এবং সময়-সময় অন্যবিধ অসুবিধাও দেখা দিত। স্থানীয় শিল্পাদির যদিও অবনতি ঘটেছিল বা বিলুপ্তি হয়েছিল তবু ইউরোপীয় বাজার খুলে যাওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের অপ্রত্যাশিত উন্নতি এসেছিল। কারণ, ঐ সকল ব্যবসায়কে তখনও প্রাচ্য সমুদ্রে ইউরোপীয় বণিকদের প্রবল প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে হয়নি।

পরবর্তী যুগের মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত দুর্বলতা দেখা যায় বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রের মধ্যকার কৃষ্টির অসামঞ্জস্যে। পুরাতন সাম্রাজ্যের পক্ষে ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নকারী শক্তির মোকাবিলা করার অক্ষমতার ভেতরেই এই কৃষ্টিগত বৈষম্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীতে মুসলিম কৃষ্টি যখন মধ্যাহ্ন গগনে তখন আটলান্টিক থেকে মধ্য এশিয়ার পর্বতমালা অবধি বিস্তৃত ভূভাগের সর্বত্র মুসলিম কৃষ্টি প্রায় সমভাবে বিরাজমান ছিল। কিন্তু আমরা ইবনে বতুতার পূর্বাঞ্চলের দিকে অগ্রগতির অনুসরণ করলেই দেখতে পাই, কৃষ্টিগত ভূমি তখন কত অনুর্বর এবং কৃষ্টির মূল কতই না দুর্বল । অথচ এক

সময়ে এই কৃষ্টিই মুসলিম সামাজিক জীবন বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং বজায় রেখেছিল চতুর্দশ শতাব্দীর রাজ্যগুলির শান-শওকত। আরবদের নিকট উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা পরিচিত ছিল মাগরীব বা পশ্চিম নামে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মাগরীব মুসলিম অধিকৃত স্পেন সহ একত্র করা হয়েছিল আলমোরাভিস (Almoravids) ও আলমোহাদ (Almohads) রাজ্যের সঙ্গে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ রাজ্যই ভাগাভাগি হয়েছিল তিনটি বিভিন্ন বংশের মধ্যে। সুদূর পশ্চিমে ছিল মারি নিডস (marinids) অথবা মরক্কো; মধ্য পশ্চিমে ছিল জিয়া নিডস (Ziyanids) যার রাজধানী ছিল লেমসেন (Tlemsen) ; তিউনিস পড়েছিল হাফসিডসদের (Hafids) অংশে যার ইফরিকিয়া (Ifriqiya) প্রদেশ বিস্তৃত ছিল আলজিয়ার্স থেকে ত্রিপলী পর্যন্ত।

এভাবে সাম্রাজ্য বিভক্ত হবার ফলে যে বিপদ দেখা দিয়েছিল তা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের দরুন। একদিকে ছিল রাজ্যের চাষোপযোগী ভূমিখণ্ডের উপর যাযাবর আরব ও বারবারদের উৎপাত, অন্যদিকে নৌশক্তির অধিকারী খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ভীতি। রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে নিস্ফল হানাহানির ফলে বিপদের মোকাবিলা করার উপযোগী শক্তিসামর্থ্য তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। উপরি-উক্ত তিনটি রাজ-বংশের ভিতর সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল তিউনিসের হাফসিডগণ। এমন কি তাঁদের কর্তৃত্বেও অনবরত এসে বাধার সৃষ্টি করত রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রদেশ সমূহের শাসনকর্তাগণ। যদিও তাঁরা ১২৭০ খ্রীস্টাব্দে সেন্ট লুইর ক্রুসেড প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তথাপি অনধিক বিশ বছরের মধ্যেই তাঁরা সিসিলিয়ানদের কবলে জেবরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরে ১৩৩৪ খ্রীস্টাব্দে জেবরা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন নিয়াপলিটান ও জেনোইসদের সহায়তায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল কেবল সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় এবং অভ্যন্তর ভাগে ছিল মাত্র কয়েকটি সুরক্ষিত শহর। তিউনিসের সমৃদ্ধির মূলে ছিল তার সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান। অভ্যন্তর ভাগ থেকে প্রসারিত প্রধান বাণিজ্যপথগুলির মুখে ছিল তিউনিসের অবস্থান এবং তার ফলেই তিউনিস হয়েছিল মাগরিবের প্রধান বাণিজ্য শহর। ভূমধ্য সাগরাঞ্চলের মুসলিম বন্দরগুলির মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার পরেই ছিল তিউনিসের স্থান। মাগরিবের অন্যান্য অংশের ন্যায় তিউনিসের কৃষ্টি ও তমদ্দুন রক্ষিত হয়েছিল স্পেন হতে বিতাড়িত মুসলিম মোহাজেরদের দ্বারা।

মরক্কোর মারিনিদ (Marindi) রাজবংশ ছিল অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ভূখণ্ডের অধিকারী। তা সত্ত্বেও তাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। তাদের ইতিহাস খুন-জখমের রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস। শাসকবর্গের খুব কম সংখ্যকই তাঁদের উচ্চাভিলাষী আত্মীয়গণের বিদ্রোহ ও চক্রান্তের হাত থেকে রেহাই পেতে সমর্থ হতেন। যাঁরা রেহাই পেতেন তাঁরাও নিজেদের অবসর সময় কাটাতেন প্রতিবেশী রাজ্যের অথবা স্পেনের খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করে। এ রাজবংশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে আবুল হাসানের (১৩৩১-৪৮) ও তৎপুত্র আবু ইনানের (১৩৪৮-৫৮) অধীনে।

তাঁদের নাম ইবনে বতুতার সফরনামার শেষাংশে বারবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়। আবুল হাসান সিজিল মাসা ও লেমসেন অধিকার করতে সমর্থ হন এবং ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দে তারিফায় এক রক্তাক্ত যুদ্ধে স্পেনবাসীদের দ্বারা পরাজিত হবার পরেও ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে তিউনিসে প্রদেশটি স্বরাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি তিউনিস ও তাঁর সিংহাসন—উভয়ই হারাতে বাধ্য হন নিজের বিদ্রোহী পুত্র আবু ইনানের হস্তে। ১৩৫৭ খ্রীস্টাব্দে লেমসেন ও তিউনিস পুনরাধিকারের পর আবু ইনান তার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হন এবং ফেজে প্রত্যাবর্তনের পর নিহত হন। তার ফলে রাজ্যটি এক ভয়াবহ অরাজকতার শিকার হয়ে পড়ে। তা হলেও উক্ত দুই ব্যক্তির রাজত্বকালে মরক্কো বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে, তার নগরগুলি বহু সরকারী সৌধমালায় শোভিত হয়। তখনকার দিনে সে সৌধমালা মিসর ও ভারতের স্মৃতিসৌধাবলীর প্রায় সমকক্ষ ছিল বললেই চলে। কাজেই আবু ইনানের শাসনকাল সম্পর্কে ইবনে বতুতা যে প্রশংসা করেছেন তার সমর্থন এখানে পাওয়া যায়। বিশেষ করে তিনি তখনকার প্রাচ্য যে অরাজক অবস্থা দেখে এসেছেন তার সঙ্গে তুলনা কালে ইবনে বতুতার বিবরণীর সত্যতা সহজে প্রমাণিত হয়।

ধর্মীয় পটভূমি

সাধারণতঃ মুসলিম জগতের কাছে রাজনৈতিক ব্যাপার একেবারে নিরর্থক না হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে অধিঞ্চিৎকর। মধ্যযুগের মুসলিম সমাজ ছিল সর্বাগ্রে একটি ধর্মীয় সমাজ। এ সমাজের অস্তিত্বই ছিল ধর্মের উপর, কারণ ইসলাম ধর্মই ছিল মুসলিম সমাজের একতার একমাত্র বন্ধন। ধর্মের নিকট থেকেই ঐ সমাজ পেয়েছিল তার ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সাধারণ ভাষা, কারণ ইসলাম আরবী ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে সব সময় বাধা দান করত। মুসলিম সমাজ পারসিক ও তুর্কীদের বাধ্য করেছিল আরবী শিখতে। সাহিত্যের উত্তরাধিকারের জন্যও তারা ধর্মের কাছেই ঋণী, কারণ একমাত্র কবিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় অধ্যয়নের প্রেরণা তারা ধর্মের মধ্যেই পেয়েছে। সমগ্র সামাজিক কাঠামো এবং আইন-কানুনগুলি ছিল ধর্মভিত্তিক। অন্ততঃ সভ্য দেশগুলি থেকে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা এবং সামাজিক অসমতা মুছে ফেলে ইসলাম এক নতুন আইন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ধর্মের কাছেই মুসলিম সমাজ পেয়েছে একত্ববোধের ধারণা, কারণ ইসলাম প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের অপূর্ব অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। বস্তুতঃ ধর্ম শুধু মুসলিম সমাজের কৃষ্টিগত পটভূমি ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনই সৃষ্টি করেনি বরং স্বসমাজের সভ্যদের জন্য একটা জীবনদেহ দান করেছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতি সাধারণ কর্মতৎপরতাগুলিও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র আরবী সাহিত্য এ সকল সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত করে এবং ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে যে বিশেষ উৎসাহ

দেখানো হয়েছে তা আধুনিক পাঠকদের ধৈর্য ও জ্ঞানের উপরে চাপ দেয়। ইব্‌নে বতুতার গ্রন্থ সম্পর্কে একথা বিশেষ উৎসাহ দেখানো হয়েছে তা আধুনিক পাঠকদের ধৈর্য ও জ্ঞানের উপরে চাপ দেয়। ইব্‌নে বতুতার গ্রন্থ সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, সে গ্রন্থের কোন ব্যাখ্যাই ধর্মীয় বিষয়ের উল্লেখ বাদ দিতে পারে না। এ কারণে ইসলামের অনুষ্ঠানাদি এবং মুসলিম ভূখণ্ডের উপর গঠিত প্রতিষ্ঠানাদি সম্বন্ধে একটা বিবরণ দিলে ইংরেজ পর্যটকদের পথ কিছুটা আলোকিত হতে পারে।

ইসলাম যে সব নীতিতে বিশ্বাসী তার কোন ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। মূল বিশ্বাসের ভিত্তি হল ঃ আল্লাহ এক; তিনি মহাশূণ্য ও পৃথিবীর স্রষ্টা; একমাত্র উপাস্য; তাঁর সমৃদ্ধ সৃষ্টির তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভূ, যিনি তাদের সকলের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁর অসীম প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা। শেষ বিচারের দিনে তিনিই বিচার করবেন। তাঁর সৃষ্ট জীবনের পথনির্দেশের জন্য তিনি পর-পর সৃষ্টি করেছেন পয়গম্বর যার শুরু হজরত আদম থেকে হজরত নূহ্‌, হজরত ইব্রাহিম, হজরত মূসা, হজরত দাউদ, হজরত সুলেমান, হজরত ঈসা ও বহুসংখ্যক অনামী পয়গম্বর সহ, হজরত মোহাম্মদের পর যার পরিসমাপ্তি। এসব পয়গম্বর যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন, স্থান ও কাল ভেদে তার সামান্য রদবদল হলেও মূলতঃ তা এক এবং তাই ইসলাম অথবা আল্লার ইচ্ছার উপর পূর্ণ আত্মসমপর্ণ। এ ধর্ম আল্লাহ্‌ কর্তৃক ফেরেস্তার মাধ্যমে কয়েকজন পয়গম্বরের নিকট উদঘাটিত হয়। তাওরাত গ্রন্থ (পেন্টাটিক্‌) প্রেরিত হয় হজরত মুসার নিকট; জব্বুর (সমান্‌) হজরত দাউদের নিকট; ইঞ্জিল (ইভাঞ্জেল—যা' নিউ টেস্টামেন্টের গসপেলের অনুরূপ নয়) হজরত ঈসার নিকট এবং সর্বশেষে পবিত্র কোরআন আল্লার বাণীর চূড়ান্ত এবং ক্রুটী-বিহীন আধার হিসাবে নাজেল হয় হজরত মোহাম্মদের উপর। এ সকল ঐশী বাণী পয়গম্বরদের নিকট সরাসরিভাবে প্রেরিত না-হয়ে প্রধান ফেরেস্তা জিবরাইলের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। মানুষ ও ফেরেস্তা ব্যতীত তৃতীয় এক শ্রেণীর জীব রয়েছে। তারা জীন্‌ নামে পরিচিত। জীনের সৃষ্টি অগ্নি হতে, কাজেই মানুষের দেহের চেয়ে তাদের দেহের উপাদান সূক্ষ্ম এবং তারা অমানুষিক শক্তির অধিকারী কিন্তু মহা বিচারের দিনে তাদেরও হিসাব-নিকাশ দিতে হবে মানুষের মতই।

কিন্তু 'ইসলাম' অর্থে কতিপয় ধর্মবিশ্বাসের স্বীকৃতি ছাড়াও অনেক বেশি কিছু বুঝায়। ধর্মীয় নির্দেশানুযায়ী আরোপিত কতকগুলি কর্তব্য নিয়মিতভাবে পালন না-করা পর্যন্ত কেউ প্রকৃত মুসলমান বলে পরিগণিত হতে পারে না। ধর্মবিশ্বাসের প্রধান স্তম্ভ চারটি; (১) দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া বা উপাসনা করা; —প্রত্যেকবার নামাজের সময় কিবলা অর্থাৎ কাবার দিকে মুখ করে নির্ধারিত সংখ্যক একই ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়াসহ কোরআনের শ্লোক বা সুরা আবৃত্তি করতে হয়। নির্ধারিত সময়ে জমাতে অথবা একা নামাজ আদায় করবার নিয়ম; ঠিক সূর্য উদয়ের পূর্বে; দ্বিপ্রহরের পর; বিকালের মাঝামাঝি সময়ে; সূর্যাস্তের ঠিক পরে এবং রাত্রির দু' বা তিন ঘন্টা অতিবাহিত হবার পরে। জামাতের নামাজ সাধারণতঃ পড়া হয় মসজিদে। এ নামাজের পেশ-ইমাম মোক্‌তাদিদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে। মসজিদে কোন মূর্তি বা তস্‌বির

রাখা হয় না। এক আল্লার নিষ্ঠাবান উপসনাকারীদের চিত্তবিভ্রম ঘটাতে পারে এমন কিছুই মসজিদে রাখা হয় না। খুব বেশি কিছু থাকলে মসজিদের দেওয়ালে জ্যামিতিক নকশা দ্বারা এভাবে অলঙ্কৃত থাকতে পারে যাতে বাহ্যদৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি গভীরতর হয়। সাপ্তাহিক প্রধান জামাত শুক্রবার মধ্যাহ্নে জুমা মসজিদ গুলিতে আনুষ্ঠানিক সাধারণ নামাজ ব্যতীত মিম্বার বা বেদীর উপর দাঁড়িয়ে পেশ-ইমাম সাপ্তাহিক খোৎবা পাঠ করেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ক্ষমতায় আসীন বাদশাহ বা শাসকের জন্য মঙ্গল কামনান্তে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করা হয়। পবিত্র রজমান মাসের পরদিন এবং জিলহজ্ব মাসের ১০ই তারিখে দু'টি প্রধান উৎসবের দিনেও অনুরূপ খোৎবা পাঠ হয়ে থাকে। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের পূর্বে প্রার্থনাকারী বা নামাজীকে মসজিদের কুয়ার পানিতে মুখ, হাত ও পা ধুয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র হতে হয়। (২) সমগ্র সম্পত্তির মূল্যের উপর হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হয়। (৩) রজমান মাসে বাৎসরিক রোজা বা উপবাসব্রত উদযাপন করা অর্থাৎ রমজানমাসের সম্পূর্ণ চন্দ্র মাস ধরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি আহার, পান ও ধুমপানে বিরত থাকা। (৪) বয়স্ক ও সঙ্গতিপন্ন লোকদের জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কায় হজ্জব্রত পালনের জন্য গমন করা।

ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুষ্ঠান ছাড়াও ইসলামের কোরআন ও হাদিস অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের বাণী ও কার্যের উপর ভিত্তি করে একটি আইন ও সমাজ-ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে। হিজরীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলিম আইন বিশারদ পণ্ডিতদের চারটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়ের ব্যাখ্যায় ভিন্ন-ভিন্ন মত পোষণ করে কিন্তু নিষ্ঠার দিক দিয়ে সবগুলিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম বিচারপতি বা কাজী আইনের কাজ পরিচালনা করতেন এবং প্রাচ্যের প্রধান নগরগুলিতে প্রত্যেক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য একজন করে প্রধান কাজী থাকতেন। কার্যতঃ ফৌজদারী মামলাগুলির বিচারকার্য প্রায়ই সুলতান স্বয়ং কিংবা তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারাই সম্পন্ন হত এবং কোন-কোন সময়ে উক্ত কার্যাদি কাজীর অনুমোদনক্রমে আইনসিদ্ধ করে নেওয়া হত। ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থা হতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল পার্থক্য হল বিবাহ এবং বিচ্ছেদ বা তালাকের ক্ষেত্রে। সকলেই জানে যে একজন মুসলিম একই সময়ে একই সঙ্গে চারিটি স্ত্রী এবং সে সঙ্গে খরিদা বাঁদীও রাখতে পারে এবং আইনের কতকগুলি সাধারণ রক্ষাকবজের শর্তাধীনের স্ত্রীদিগকে ইচ্ছানুযায়ী তালাক দিতে পারে এবং খরিদা বাঁদীদের ভেতর যাদের কোন পুত্র সন্তান হয়নি তাদের বিলি-ব্যবস্থা করে দিতে পারে। ভ্রাম্যমাণ জীবনের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী ছিল এবং ইব্‌নে বতুতা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। একজন খ্রীস্টান পাদ্রী তো দূরের কথা একজন ইউরোপীয় যা করতে অক্ষম ইব্‌নে বতুতা তা সম্ভব করেছেন। সহজ ও সাবলীল ভাষায় তিনি সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়— যেহেতু তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু নৈতিক জীবনের বাইরে অবস্থিত সেহেতু তিনি এগুলিকে দৈনন্দিন জীবনের পানাহারের

সতের

সমপর্যায়ভুক্ত বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এজন্যই তাঁর এসব বর্ণনা এত সুন্দর ও স্বাভাবিক। এছাড়াও অনেক সময় ইব্‌নে বতুতা তাঁর ভার্যাগণকে কেন্দ্র করে অনেক উক্তি করেছেন কিন্তু সে সব উক্তি উপলক্ষ্য করে কারও পক্ষেই সহসা কোন অসংলগ্ন মন্তব্য করা সঙ্গত হবে না। সাধারণতঃ একজন মুসলমানের পক্ষে সামাজিক কথাবার্তা বা আচরণের মধ্যে নারীজাতির উল্লেখ করা নীতিবিগর্হিত, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ইবনে বতুতা এ নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি শুধু একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারকে যথার্থ ব্যাখ্যা করবার জন্যই এই চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করেছেন।

মুসলিম সামাজিক কাঠামোর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে তার দাসপ্রথা। অবশ্য একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে একজন দাস সাধারণতঃ তার প্রভুর ভৃত্য অথবা বিশেষ অনুচর মাত্র ছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে কোন অবস্থায়ই দাসপ্রথা মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল না। কাজেই মুসলিম সমাজব্যবস্থায় প্রভু-দাস সম্পর্ক রোমী জমিদার বা আমেরিকান ঔপনিবেশিকদের দাস ব্যবসার চেয়ে অনেক মানবিক ও পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই মুসলিম সমাজে দাসপ্রথা খুব বেশি নিন্দনীয় ছিল না। মুসলিম সমাজের সমতুল্য দাসপ্রথা তৎকালীন কোন সমাজেই বিদ্যমান ছিল না। এমন কি শ্বেতকায় দাসগণ একটি বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত গোষ্ঠিতে পরিগণিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্য হতেই উচ্চ-ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্মচারী সেনানায়ক শাসনকর্তা এমন কি সুলতান পর্যন্ত নিয়োজিত হতেন।

খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে জনৈক ধর্ম-তত্ত্বোপদেষ্টা কর্তৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত উপখ্যানটি প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন আরবী সাহিত্যে আমরা প্রভু-ভার্যা দাস সম্পর্কের যে পরিচয় পাই তার নির্ভুল প্রতিফলন দেখা যাবে এ উপাখ্যানে।

উপাখ্যানটি হল ঃ একদা আমি দেখলাম একটি বালক দাসকে নিলামে বিক্রি করা হচ্ছে। নিলামে ডাক উঠল মাত্র ত্রিশ দিনার। অথচ এ বালকটির ন্যায্য মূল্য হওয়া উচিত ছিল তিনশ' দিনার। সুতরাং আমি বালকটিকে খরিদ করে নিয়ে এলাম। সে সময়ে আমি একটি গৃহ-নির্মাণ করছিলাম। একদিন শ্রমিকদের দেবার জন্য বালককে আমি বিশটি দিনার দিলাম। সে বিশ দিনারে দশটি দিনার দিয়ে নিজের জন্য একটি জামা কিনে নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ তোমার কেমন কাজ ?' তাতে সে বলে উঠল, 'হঠকারিতা করবেন না। কোন ভদ্রলোক কখনো তাঁর ক্রীতদাসদের গালাগাল করে না।'

তখন আমি মনে-মনে বললাম, 'আমি নিজের অজান্তে, আজ স্বয়ং খলিফার একজন শিক্ষককে কিনে এনেছি।' পরে আমার প্রথমা স্ত্রীকে (সে ছিল আমার জ্ঞাতি বোন) না জানিয়ে একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করব স্থির করলাম। এ ব্যাপারে গোপনতা রক্ষা করতে বালকটিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলাম এবং তাকে কিছু 'হাজিবা' নামক মাছ ও অন্যান্য জিনিস কিনে আনতে একটি দিনার দিলাম । কিন্তু সে তা না কিনে অন্যান্য জিনিস কিনে নিয়ে এল। তখন তার উপর রাগান্বিত হওয়ায় সে বলল, 'আমি দেখলাম হিপোক্রেটিস হাজিবা মাছ পছন্দ করে না।'

আমি বললাম, 'তুই একটা অপদার্থ মুর্খ। আমি বুঝতে পারিনি যে আমি একটা 'গ্যালেন, (galen) কিনে নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে তাকে চাবুক দিয়ে দশটি ঘা দিলাম। কিন্তু সে আমাকে ধরে চাবুকের সাতটি ঘা মেরে বলে উঠল, 'হুজুর শাস্তির জন্য তিন ঘা মারাই যথেষ্ট। কাজেই সাত ঘা মেরে আমি প্রতিশোধ নিলাম।'

এ-কথা শুনে আমি তার দিকে ছুটে গিয়ে মাথায় আঘাত করতেই মাথা জখম হয়ে গেল। তাতে সে আমার প্রথমা স্ত্রীকে গিয়ে বলল, 'সততা রক্ষা করা আমাদের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। যে সত্যের অপলাপ করে সে অধার্মিক। আমার মনিব পুনরায় একটি বিয়ে করেছেন এবং আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছেন সে কথা গোপন রাখতে। কিন্তু আমি যখন বলেছি যে, আমাদের বিবি সাহেবাকে একথা নিশ্চয়ই জানাতে হবে তখন তিনি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন।'

অতঃপর যে পর্যন্ত না আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিই সে পর্যন্ত আমার স্ত্রী আমাকে ঘরেও ঢুকতে দেয়নি এবং ঘরের কোন জিনিস বের করতেও দেয়নি। তারপর থেকে আমার স্ত্রী তাকে বলত, 'ছেলেটি সৎ।' অথচ আমি তাকে কিছুই বলতে পারতাম না। সুতরাং আমি মনে-মনে বললাম, "ছেলেটাকে আজাদ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

ইসলামী ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তার ধর্মীয় সংস্কার। ধর্মীয় সংস্থা দু'টি এবং তা কিছুটা পরস্পর বিরোধী। ইসলামের ধর্মীয় বিধানে কোন পুরোহিতের স্থান নেই, ফলে পৌরহিত্যের শাসনও নেই, ইসলামে সংস্কার বা কোন গুপ্ত রহস্যের প্রতীকও নেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সকল মুসলমানেরই সমান অধিকার। সমাজের সম-অধিকার নেই এমন কোন প্রাধান্য কেউ দাবী করতে পারে না। বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ সমতা রক্ষা করে চলা অবশ্য অনেক সময় অসম্ভব ছিল। যে সমাজ ধর্মীয় ব্যবস্থা, যাজক বিধান রচনাকারী বিচারক প্রভৃতি অংশে বিভক্ত সে সমাজের কোন একটি অংশ অপর অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ অংশের উপর অপরিহার্যরূপেই কিছু-না কিছু নৈতিক প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিস্তার করে। বাহ্যত কোন প্রকার আইনগত সমর্থন না থাকায় একে অত্যাচার বা স্বেচ্ছাচারিতাও বলা চলে। শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস পালনের ফলেই একটি ধর্মীয় অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের এই বিশেষ শ্রেণী অবশ্য খ্রীস্টান ধর্মীয় যাজকশ্রেণী হতে পৃথক ছিল। কারণ, ইসলাম ধর্মে কোন নির্দিষ্ট বা লিখিত শ্রেণীবিভাগ ছিল না অথবা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কোন বিশেষ সুবিধা বা একাধিপত্য ছিল না। এ ছাড়া ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম। উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে ইসলামের দ্বার সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত। অপরপক্ষে দেখা যায়, ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থার গুণাগুণ অনেকাংশে খ্রীস্টীয় পৌরহিত্যের সমতুল্য। একথা সত্য যে, ইসলাম ধর্মোপদেষ্টাগণ খ্রীস্টীয় যাজকগণের ন্যায় রাজ্য শাসনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না এবং একটি বিশেষ স্বকীয় মতবাদকেই তাঁরা পছন্দ করতেন কিন্তু তাঁদের এ মনোভাব পরবর্তীকালে গীর্জা ও প্রশাসনিক উভয় ব্যবস্থার জন্যই ধ্বংস ডেকে এনেছিল । রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব বলতে কিছুই ছিল না। ধর্মবিশ্বাস কায়েম রাখবার দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল সমগ্র

সমাজের উপর। ধর্মোপদেষ্টারা সমাজেরই একটি অঙ্গ বলে তাঁরা নিজেদের প্রকৃত গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করলেন। তাঁরা দেখলেন যে জনমত গঠনের জন্য নিজেদের প্রভাব তাঁরা সহজেই কাজে লাগাতে পারেন এবং জনমত গঠিত হলে হাতিয়ার স্বরূপ তা ব্যবহার করতে পারেন আইন ভঙ্গকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের বিরুদ্ধে। কারণ, প্রবল পরাক্রমশালী কোন শাসকও যে কদাচিৎ জনমতের বিরোধিতা করতে সাহস করেন তার প্রমাণ আমরা পাই ইবনে বতুতা বর্ণিত কতিপয় কাহিনীতে । পক্ষান্তরে দিল্লীর সম্রাট সুলতান মোহাম্মদের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট যে তিনি একদিকে ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট থাকতেন কিন্তু অপর দিকে যা করতেন তার কৈফিয়ত তলবের সাহস কারও ছিল না।

এমন আরও একটি কর্তব্যভার সমগ্র সমাজের উপর ন্যস্ত ছিল যে ভার কোন পেশাদার ধর্মোপদেষ্টার উপর দেওয়া সম্ভব নয়। সে কর্তব্য হল তরবারীর দ্বারা ইসলামের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা। কতিপয় ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ জেহাদ'কে নামাজ ও রোজার সমপর্যায়ের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান বলে গণ্য করেছেন এবং ইসলামের প্রথম যুগে প্রতিটি মুসলমান জেহাদকে আত্মরক্ষার পরিবর্তে আক্রমণাত্মকভাবেই সর্বক্ষণের পেশা বলে গ্রহণ করেছেন । 'ক্রুসেডের' যুদ্ধের দ্বারা এবং খ্রীস্টানদের স্পেন বিজয়ের দ্বারা জেহাদ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য ইসলামের রক্ষার্থে প্রতি মুসলমানের অস্ত্রধারণ করা কর্তব্য, এ ধারণা অতঃপর বেশি দিন বজায় থাকেনি। সিরিয়া ও আন্দালুসিয়া রক্ষার ভার তখন দেশের অধিবাসীদের উপরই ন্যস্ত হয়। এতৎসত্ত্বেও ধর্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির লোভ স্বেচ্ছাসেবীদের বরাবরই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করেছে, বিশেষতঃ সে যুদ্ধ যদি খ্রীস্টানদের বা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে হয়। এসব স্বেচ্ছা সেবক সীমান্তবর্তী দুর্গ বা 'রিবাত' নামক সুরক্ষিত স্থানে বাস করত এবং এরা পরিচিত ছিল 'গাজী' বা 'মুজাহিদ', নামে যার কাছাকাছি ইংরেজী প্রতিশব্দ হওয়া উচিত 'অশ্বরোহী সীমান্ত সেনা'। সম্ভবতঃ এই অতীত ঐতিহ্য একমাত্র আন্দালুসিয়াতেই যথাযথভাবে বজায় ছিল। অন্যান্য স্থানে জেহাদ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। একদিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের দুর্ধর্ষ লোকেরা ঝুঁকে পড়ল যুদ্ধবিগ্রহের দিকে এবং গাজীরা দ্রুত গ্রহণ করতে লাগল তস্করবৃত্তি যার ফলে বিধর্মীদের চেয়ে মুসলিম শাসকদেরই অধিক বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল এসব গাজী।

অপর দিকে ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও কৃচ্ছ্র সাধনার সঙ্গেও ইহা যুক্ত ছিল। প্রথম দিকে নরকবাসের ভীতিই মুসলমানদের কৃচ্ছ্র সাধনায় নিয়োজিত করতঃ জেহাদ স্বর্গলাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায় ভেবে ইসলামের অধিকাংশ কৃচ্ছ্র সাধকই সীমান্ত-যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করত। পরবর্তী-কালে জেহাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে পার্থিব লালসার বিরুদ্ধে যুদ্ধরূপে এবং সূফীরা (অধ্যাত্মবাদীদের আধুনিক নাম) ধর্মীয় যুদ্ধ থেকে নিজেদের বিরত রাখলেও তাঁরা পূর্বের নামেই পরিচিত হতে থাকেন। এ সময় রিবাতগুলি পরিণত হয়েছিল ভজনালয় বা মঠে যেখানে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা একত্র বসবাস

করতেন। কালক্রমে এসব পুরাতন দলই বিশেষ একটি যাজকশ্রেণীতে পরিণত হন। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা চতুর্দশ শতাব্দীর সূফী বা দরবেশদের কার্যক্রমের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি।

এ সময়ে অধ্যাত্মবাদীরা সাধারণতঃ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বা জমাতে বিভক্ত হয়ে কোন প্রসিদ্ধ শেখের নামে পরিচিত হতে থাকে, তখন শেখকেই গণ্য করা হয় 'তরিকা, বা বিধানের প্রতিষ্ঠাতা রূপে। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা জমাতের জিকিরও ছিল ভিন্ন, এক জমাত থেকে অপর জমাতকে চিনবার উপায়ই ছিল তাদের জিকির। প্রতিষ্ঠাতার ধর্মশালাকে বেষ্টন করে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষালয় গড়ে উঠে কারণ এ জমাতের শিষ্যরা তখন সারা মুসলিম জগতে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিষ্ঠাতার বংশধর বা উত্তরাধিকারীকে (ইসলামে চিরকৌমার্যের কোন বিধান নেই) নিজেদের দলপতি মনে করে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা একক কৃচ্ছ্র সাধন মুসলিম জগৎ থেকে এখনও নির্মূল হয়নি। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও সাউথ লেবাননে এমন এক শ্রেণীর সংসারত্যাগী লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা দরবেশ না হলেও নিজেদের সূফী সাধকের বংশধর বলে দাবী করে। তাদের চেয়েও অবাধে ধর্মশালার বাইরে বিচরণ করে শতচ্ছিন্ন খিরকা পরিহিত দণ্ডধারী এক শ্রেণীর দরবেশ বা ফকির। তারা অন্নসংস্থানের জন্য খোদার উপর এবং ইমানদার লোকদের উপর নির্ভর করে থাকে। তারা ধার্মিক ভিক্ষুক না-হয়েও এসব পেশাদার দরবেশের চেয়ে বেশি ধৃষ্ঠতা প্রকাশ করে।

সূফী মতবাদের মূল আদর্শ হচ্ছে মানবসমাজকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রভাবমুক্ত করে ঐশ্বরিক চিন্তায় নিয়োজিত করা এবং খোদার সাহচর্যলাভে তাদের সাহায্য করা। প্রার্থনা, ধ্যান, উপবাস ও কৃচ্ছ্র সাধনায় তারা অহোরাত্র কাটাত। কিছু দিন পর-পর ধর্ম-শালার অধিবাসীরা বা তরিকার সভ্যরা একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের রীতি অনুযায়ী জিকির করত। তারা অনেক সময় মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ত এবং ক্ষণিকের জন্য খোদার সহিত পুনর্মিলনের আনন্দ উপভোগ করত। ইবনে বতুতার বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়, প্রাচ্য জীবনাদর্শের ধারা অনুযায়ী এসব জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান এক অবাস্তব ও ঐন্দ্রজালিক কৌশল-প্রদর্শনীতে পর্যবসিত হত। কেহ-কেহ একই স্থানে দাঁড়িয়ে একাদিক্রমে ঘন্টার পর ঘন্টা তাণ্ডব নৃত্য করত, কেউ বা সর্প ও কাঁচ-চর্বণ করত; আগুনের উপর হাঁটত অথবা নিজের কোন অঙ্গ ছুরকাবিদ্ধ করত এবং তার ফলে সাময়িক ক্লান্তিবোধ ছাড়া আর কোন অসুবিধার লক্ষণ দেখা যেত না।

আধুনিক পর্যটকদের মধ্যে যাঁরা হজরত ইমাম হোসেনের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের শোক-কান্নার দৃশ্য দেখেছেন অথবা পরলোকগত লর্ড কার্জনের মত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার দরবেশ সম্মেলন দেখেছেন, তাঁরা এ অস্বাভাবিক আত্মপীড়ন এবং তা সত্ত্বেও শারীরিক কোন ক্ষত পরিলক্ষিত না হওয়ার বিষয় অবগত আছেন। ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বিবরণের ইউরোপীয় ব্যাখ্যাকারীদের সবাই ইবনে বতুতার অতি বিশ্বাসপ্রবণতা ও প্রখ্যাত শেখ বা সাধুপুরুষদের অতি প্রাকৃত বা অলৌকিক কার্যকলাপের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তির বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে বতুতার

বিশ্বাসপ্রবণতা যে সীমাহীন ছিল না তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর বর্ণনার একাধিক স্থানে; অলৌকিক ব্যাপারের কাহিনী তিনি অন্যের কাছে শুনে বর্ণনা করেছেন। সে-সবের জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। মুসলিম জনসাধারণ ফকির দরবেশদের কেরামতি বা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে আগে যেমন বিশ্বাস করত এবং ঐসব অলৌকিক কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করছেন বা নিজেকে দেখেছেন বলে দাবী করেছেন সে সব স্থানে তাঁর বর্ণনার সত্যতার বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে। কৈফিয়তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ঐসব ঘটনা হিপনোটিজম বা সম্মোহন-বিদ্যার সাহায্যে ঘটেছিল। অনুরূপ একটি ঘটনার বিষয় মুসলিম ধর্মোপদেষ্টা উল্লেখ করছেন হ্যংচো শহরে একজন চীনা-যাদুগীরের ভোজবিদ্যার কৌশল প্রদর্শন প্রসঙ্গে। অন্ততঃ ব্যাপারগুলিকে আমরা যাদুগীরের হাতের কলাকৌশল বলেই মনে করতে পারি। কিন্তু তাতেই এ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁর ভারত-ভ্রমণের সময় কোয়েল হতে পলায়নের বিষয় এখানে উল্লেখ করতে পারি। আমরা এ অলৌকিক কার্য-কলাপ পুরোপুরি বিশ্বাস করব নতুবা পর্যটককে অসত্য ভাষণের দোষে দোষী করব। উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী ও যান্ত্রিক মানব মন সহজে কিছুই বিশ্বাস করতে চায় নি, কারণ তখনও ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বিবরণকে তারা পুরোপুরি কল্পনাপ্রসূত বলতেও কসুর করেনি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পাঠকের মনে খোদা ও মানুষের শক্তির উপর বিশ্বাস প্রবলতর। সে তাই সমালোচনা করতে পারে কিন্তু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে পারে না। কঠোর শারীরিক মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা একজন দরবেশ যে পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে অসাধারণ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতিপ্রাকৃত এই মানসিক ক্ষমতার প্রথমাবস্থাকে বলা যায়—টেলিপ্যাথি (পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া কোন অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বলে মানসিক যোগাযোগ)। সন্দেহপ্রবণ পাঠকের জন্য প্রফেসার ডি. বি. ম্যকডোনাল্ডের আসপেক্টস অব ইসলাম (Aspects of Islam P. 170) গ্রন্থখানার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন ভূতপূর্ব দরবেশ খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা নিবার পরেও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সে বিবরণই তিনি উক্ত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন বিস্তৃতভাবে। এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে রায় মূলতবী রাখা এবং ইবনে বতুতা সত্য বলে বিশ্বাস করে যা কিছু লিখে গেছেন তার কৃতিত্ব স্বীকার করা।

অবশ্য ইবনে বতুতা যে দরবেশ ও সুফীদের প্রতি একটু অতিরিক্ত অনুরাগী সহানুভূতিশীল হবেন তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। মোটামুটি প্রায় সব ধর্মোপদেষ্টাই এসব দরবেশের প্রতি বিরোধভাবাপন্ন না হলেও সন্দেহপ্রবণ। এর মূলে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয়বিধ একাধিক কারণ রয়েছে। পক্ষান্তরে 'মিষ্টিক' বা অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাও এ সমস্ত ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীদের অহরহ অবজ্ঞার চোখে দেখতেন বিশেষ শ্রেণীর ধর্মমতকে তাঁরা আঁকড়ে ধরে থাকতেন বলে। ধর্মীয় শিক্ষার প্রকারভেদই এদের মধ্যে বিরোধের প্রথম কারণ ছিল। ধর্মতত্ত্বোপদেষ্টাদের জন্য সত্যোপলব্ধির পথ ছিল মাত্র একটি এবং তা ছিল ইল্‌ম বা ধর্মতত্ত্ব বিজ্ঞান—যার অঙ্গীভূত রয়েছে যথারীতি কোরআন ও হাদিসের চর্চা। পক্ষান্তরে দরবেশদের মতে সত্যদর্শনের উপায় ছিল 'মারিফা'। তারা

বরং বাধার সৃষ্টিই করে। সূফী মতবাদ ছিল প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিপন্থী। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যাঁরা আস্থাবান তাঁরা সূফীমতবাদ মেনে নিতে পারেন না। কারণ তাঁরা ছিলেন ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলার একান্ত পক্ষপাতী। অধিকন্তু শেখের শিষ্যগণ যেভাবে জীবিতাবস্থায় তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত এবং সাধুর পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টায় তাঁদের নামে খোতবা পর্যন্ত পাঠ করত, ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে তা ছিল ধর্মীয় অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ, এমনকি একেশ্বরবাদের বিরোধী, ইসলামের দৃষ্টিতে যা ঘোর পাপ বলে পরিগণিত। প্রথমাবস্থায় সূফী এবং ধর্মোপদেষ্টাদের মধ্যে বিরোধে ফাটল প্রশস্তই ছিল কিন্তু কালক্রমে তা সংকীর্ণ হয়ে আসে। কারণ, সূফীমতবাদ কিছুটা জনপ্রিয়তালাভ করে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিপূজার ব্যাপারে আপোষ-মীমাংসায় আসতে বাধ্য হয় ধর্মীয় ক্ষেত্রের বাইরেও সূফীমতবাদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল এবং সে প্রাধান্যই সূফীমতবাদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল। দেখা যাচ্ছে, তারা একটি পৃথক ধর্মীয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিল। জনপ্রিয়তা লাভের প্রচেষ্টায় এ উভয় মতবাদের মধ্যেই একটা প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান ছিল। অতঃপর ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তুর্কীদের অনুপ্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গে সূফীমতবাদই জনপ্রিয়তালাভে সমর্থ হয়। তার ফলস্বরূপ ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানীরা এতদিন যা মানেনি তার অনেক কিছুই মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই তাদের এ আত্মসমর্পণ চূড়ান্তভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করে সূফীমতবাদবিরোধীদলের পুরোধা ইবনে তায়মিয়ার আত্মবিলুপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে। ইবনে বতুতা দামেশ্‌কে ইবনে তায়মিয়ার সাক্ষাৎলাভ করেন। কিন্তু উভয় মতবাদের এ বৈরীভাব প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে চলতেই থাকে। অন্যান্য জায়গার তুলনায় উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এভাব ছিল কম। সম্ভবতঃ বারবার জাতির স্বধর্মের প্রতি জন্মগত আনুগত্যই ছিল তার মূল কারণ। ধর্ম ও ধর্মপ্রাণ পূণ্যাত্মা ব্যক্তিদের প্রতি তাদের আনুগত্য বা 'মুরাবিত' আজও বিদ্যমান আছে। ইবনে বতুতা নিজে একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্ম তত্ত্বোপদেষ্টা হয়েও কেন যে বারবারদের মত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিলেন তার জবাব আমরা সম্ভবতঃ এখানেই পেতে পারি।

সূফী এবং ধর্মশাস্ত্রানুসারী দলের ভেতর যে বৈরীভাব ছিল তা শিয়া ও সুন্নীগোত্রের বিরোধের তুলনায় একান্ত নগণ্য ছিল বলতে হবে। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে উমাইয়া বংশের খলিফাদের বিপক্ষে রসুলুল্লাহর জামাতা হজরত আলীর পক্ষে যে প্রচারণা চলে তাকে কেন্দ্র করেই শিয়াগোত্রের উৎপত্তি। এ-সময়ে প্রচলিত ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে শিয়া মতাবলম্বীদের বিরোধিতা প্রবল রূপ ধারণ করে। তার ফলে জনসাধারণ শিয়া-দর্শনের ঐতিহাসিক মূল্যবোধ উত্তমরূপে উপলব্ধি করে নিন্দিত উমাইয়া বংশের মূলোৎপাটনে সহায়তা করে। কিন্তু প্রকারান্তরে জনসাধারণ অধিকতর স্বৈরাচারী শাসনের কবলে নিপতিত হল আব্বাসীয় আমলে। এই সময়ে শিয়া মতবাদ ভিন্ন একরূপ পরিগ্রহ করল। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রচলিত রীতিতে খলিফা নির্বাচন বাদ দিয়ে তারা খোদা কর্তৃক নিযুক্ত নিষ্পাপ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী একজন ধর্মীয় নেতা বা 'ইমাম' নিয়োগ করল। তারা বংশানুক্রমে হজরত আলীর গোষ্ঠী হতেই 'ইমাম' গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু কতিপয় উপগোষ্ঠীর বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হল না। এসব গোষ্ঠীর প্রধান ছিল 'দ্বাদশী দল'। ইরাক ও ইরানের শিয়া সম্প্রদায়

আজও এ-গোষ্ঠীভুক্ত বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। তাদের বিশ্বাস, ৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বাদশ ইমাম হিল্লার নিকটবর্তী এক পর্বতগুহায় অন্তর্ধান করেন, আজও তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আত্মিক ও পার্থিব কার্যের পথপ্রদর্শকরূপেই আছেন। অধিকন্তু তিনিই একদিন প্রতিশ্রুত ইমাম মেহ্‌দীরূপে আবির্ভূত হয়ে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাবেন। 'লুক্কায়িত ইমামের'—যাঁকে 'যুগশ্রেষ্ঠ' আখ্যাও দেওয়া হয় অপূর্ব মতবাদ স্মরণীয় করা হয় হিল্লার পাদদেশে আয়োজিত উৎসবের নানা রকম অনুষ্ঠানে। ইবনে বতুতা এ উৎসবের একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে।

শিয়া মতবাদ বরাবরই গোঁড়া বা প্রচলিত মতাদর্শ অপেক্ষা অধিকতর উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পরিবাহক। পূর্ব হতেই শিয়া মতবাদের প্রভাবে শিয়াগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখার জন্য। বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব শিয়াগোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখা কালে হজরত আলী ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এক চরম মত পোষণ করতে থাকে, এমন কি তাঁদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতেও দেখতে আরম্ভ করে। এই চূড়ান্ত পন্থীরা (ghulat) সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল বলে মনে হয়। আজও সেখানে বাস্তবিক পক্ষে দ্রুস্ (Druse) ও নুসাইরিন (অধুনা আলাবিস) নামক সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র দু'টির পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় দ্বাদশী দলের অধিকাংশকে যারা স্থানীয় লোকদের কাছে 'মোতাওয়াল্লি' নামে পরিচিত। এই সহ-অবস্থানের ফলেই তাদের ভেতর এ অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। শিয়ারা যেখানে ঘৃণার চোখে দেখে সুন্নীরা সেখানে অপছন্দ মাত্র প্রকাশ করে। শিয়াদের ঘৃণা যে কেবল অমুসলমানদের প্রতি তা নয়, ভিন্ন পথাবলম্বী মুসলমানদের—বিশেষ করে সুফিদেরও তারা ঘৃণা করে। কারণ, সুফিরাও শিয়া মতবাদ অনুমোদন করে না। এক সম্প্রদায়ের প্রতি অপর সম্প্রদায়ের এ-ধরনের বিরূপ মনোভাবের দরুনই মামলুক শাসনামলেও সেখানে দলাদলি ও বিভেদ মাথা তুলে আছে। ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বিবরণীতে শিয়া-সুন্নীর শত্রুতার কথা একাধিক বার উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য যদিও ইবনে বতুতা শিয়া বা আলবিন এর স্থলে কুখ্যাত 'রাফিজ' বা প্রত্যাখ্যানকারী শব্দ ব্যবহার করেছেন তবু তাঁর ব্যক্তিগত মতামত বা বিদ্বেষ মূল বক্তব্যকে কোন অংশে বিকৃত করেনি। 'ইমাম' বা ধর্মীয় নেতা নিয়োগে শিয়া সম্প্রদায় যে নীতি অনুসরণ করত তাতে পরোক্ষভাবে এসব নামের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শিয়া সম্প্রদায় মনে করত যে একমাত্র হজরত আলীই তাঁর জাতি ভ্রাতা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্য ছিলেন এবং পূর্বে যে তিন জন খলিফা রাজ্য চালনা করে গেছেন তাঁদের শিয়ারা বিশ্বাসঘাতক ও পরস্বাপহারী বলে আখ্যায়িত করেছে। ধর্মপ্রাণ সুন্নী মুসলমান হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকট-অনুচর বা আস্‌হাব হিসাবে উক্ত খলিফাদের নামের পরে সম্মানসূচক আশীর্বাণী উচ্চারণ করে কিন্তু তৎপরিবর্তে শিয়ারা করে অভিশাপ। শিয়াদের বিভিন্ন বিরোধী রীতি-নীতি ও মতামত অপেক্ষা খলিফাদের প্রতি তাদের অপমানসূচক আচরণই সুন্নী মুসলমানদের ক্রোধ ও বিদ্বেষের উদ্রেক করেছে বেশি।

এইচ. এ. আর. গিব

এক

হিজরী ৭২৫ সালের ২রা রজব, বৃহস্পতিবার (১৪ই জুন, ১৩২৫ খ্রী:) বাইশ বৎসর বয়সে[১] মক্কার কা'বা শরীফে হজব্রত পালন ও মদিনায় রসুলের রওজা মোবারক জেয়ারতের উদ্দেশ্য আমি জন্মভূমি তাঞ্জির ত্যাগ করি। পথের সাথী হিসাবে কোন বন্ধু বা ভ্রমণকারী না পেয়ে আমাকে একাকীই রওয়ানা হতে হয়। উল্লিখিত পবিত্র স্থানগুলি দর্শনের অদম্য আবেগ ও বাসনা নিয়া আমি প্রিয় বন্ধুবান্ধব ও গৃহের মায়া কাটাইতে সংকল্প করি। তখনও আমার পিতামাতা জীবিত ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার মনে যেমন কষ্ট হয়েছিল তাঁদের মনেও ঠিক তেমনি কষ্টই হয়েছিল।

তিলিম্যান (Tlemsen) শহরে পৌঁছে আমি তিউনিসের সুলতানের দু'জন রাষ্ট্রদূতের দেখা পেলাম। তখন তিলিম্যাসনের সুলতান ছিলেন আবু ওশিফিন।[২] আমি যেদিন সেখানে পৌঁছলাম সেদিনই রাষ্ট্রদূত দু'জন শহর ত্যাগ করে রওয়ানা হয়ে গেছেন। আমার একজন বন্ধু তাঁদের সঙ্গী হতে আমাকে পরামর্শ দিলেন। আমি এ বিষয়ে ইতিকর্তব্য চিন্তা করতে লাগলাম [৩] এবং তিন দিন সে শহরে কাটিয়ে যাত্রার সমুদয় আয়োজন শেষ করে ঘোড়া নিয়ে দ্রুত তাঁদের অনুগমন করলাম। তাঁদের নাগাল পেলাম মিলিয়ানা শহরে। অত্যধিক গরমে দু'জন রাষ্ট্রদূতই পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন বলে আমাদের দশ দিন সে শহরে কাটাতে হল। আমরা পুনরায় রওয়ানা হবার পরে একজন রাষ্ট্রদূতের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। মিলিয়ানা শহর থেকে চার মাইল দূরে একটি নদীর পারে তিন রাত্রি কাটাবার পরে তিনি এন্তেকাল করলেন। আমি তাঁদের সঙ্গ সেখানেই ত্যাগ করলাম এবং তিউনিসের সওদাগরদের একটি কাফেলায় যোগদান করে পথ বলতে লাগলাম। এভাবে আল-জাজাইর (Algiers) পৌঁছে শহরের বাইরে আমাদের দিন কয়েক কাটাতে হল। আমাদের আগে একটি দল রওয়ানা হয়ে এসেছিল। তারা এসে পৌঁছলে একত্র হয়ে আমরা মিটিজার[৪] ভেতর দিয়ে ওয়াকস্ (জুরজুরা) পর্বত পার হয়ে বিজায়া (Bougie)[৫] পৌঁছলাম। তখন বিজয়ার সেনানায়ক ছিলেন ইব্‌ন সাইয়েদ আন্‌নাস। সেখানে পৌঁছবার পর আমাদের সঙ্গে তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিনার ছিল। তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সে আগেই তা

আলজিয়ার্সের একজন লোকের হাতে সঁপে দিয়েছিল। ইব্‌নে সায়ইদ আন্‌নাস এ খবর পেয়ে বলপ্রয়োগে সে অর্থ আত্মসাৎ করে নিলেন। তিউনিসিয়া সরকারের কর্মচারীদের অত্যাচারের দৃষ্টান্ত এই প্রথম দেখলাম। বিজায়া থাকতে আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তাই দেখে আমার এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন আরোগ্য না হওয়া অবধি সেখানে থেকে যেতে। কিন্তু আমি সে প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে বললাম, "আমার মৃত্যু যদি খোদার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে মক্কার দিকে মুখ করে পথেই মৃত্যুবরণ করব।"

জবাবে তিনি বললেন, "তোমার সঙ্কল্প যদি তাই হয় তবে তোমার গাধাটা এবং ভারী বোঝা বিক্রি করে ফেলো। তোমার প্রয়োজনীয় সবকিছু আমি তোমাকে ধার দিব। তা হলে তুমি হালকা হয়ে সফর করতে পারবে। আমাদের দ্রুত পথ চলতে হবে, কেন না, পথে আরব দস্যুদের ভয় আছে।"[৬]

তাঁর পরমর্শ মতই আমি কাজ করলাম এবং তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। আল্লাহ্ তাঁর কল্যাণ করুন!

কুসানটিনায় (Constantise) পৌছে আমরা তাঁবু ফেললাম শহরের বাইরে কিন্তু রাত্রে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় আমরা তাঁবু ত্যাগ করে নিকটবর্তী একটি গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। পরের দিন শহরের শাসনকর্তা এলেন আমাদের দেখতে। বৃষ্টির দরুন আমার পরিধেয় জামা কাপড় অপরিষ্কার হয়েছে দেখে তিনি সে সব তাঁর গৃহে পরিষ্কার করবার হুকুম দিলেন। আমার পুরাতন ও ছিন্ন পাগড়ীর পরিবর্তে তিনি সিরিয়ার উত্তম কাপড়ের একটি পাগড়ী দিলেন। সেই পাগড়ীর এক খুঁটে বাঁধা ছিল দু'টি সোনার দিনার। সফরে বেরিয়ে এই প্রথম আমি অন্যের সাহায্য গ্রহণ করলাম। কুসানটিনা থেকে আমরা গেলাম বোন। এখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর আমাদের সঙ্গী সওদাগরদের রেখে আবার আমরা যাত্রা করলাম এবং দ্রুত পথ চলতে লাগলাম। পথে আমি আবার জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তাই, শারীরিক দুর্বলতার জন্য পড়ে যাই ভয়ে পাগড়ীর কাপড় দিয়ে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে হয়েছিল। আমার এত ভয় হয়েছিল যে তিউনিসে পৌছবার আগে আর আমি ঘোড়ার থেকে নিচে নামিনি। সমস্ত শহরের বাসিন্দা এসে জমায়েত হল আমাদের দলের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে। চারদিকেই আদর আপ্যায়ন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার ছড়াছড়ি। কিন্তু আমিও একমাত্র অপরিচিত লোক বলে একটি প্রাণীও আমার দিকে ফিরে তাকাল না। নিজের এই একাকিত্বে আমি এতটা অভিভূত হয়ে পড়লাম যে অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না; আমি কেঁদে ফেললাম। তখন অপর একজন হজযাত্রী আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে এগিয়ে এলেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে। তিনি আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করলেন এবং শহরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চললেন।

তখন তিউনিসের সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় আবু জাকারিয়ার পুত্র আবু ইয়াহিয়া। শহরে সে সময়ে কয়েকজন খ্যাতনামা জ্ঞানীলোকও ছিলেন।[৭] আমার সেখানে অবস্থিতিকালেই রমজানের শেষে ঈদল ফেতর উদ্‌যাপিত হয়। আমি জমায়েতে যোগদান করি।[৮] শহরের বাসিন্দারা মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বিপুল সংখ্যায় এসে

উৎসবে যোগদান করে। সুলতান আবু ইয়াহিয়া এলেন অশ্বারোহণে। তাঁর পশ্চাতে মিছিল করে পদব্রজে এলেন সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং সরকারী কর্মচারীগণ। ঈদের নামাজ ও খোত্‌বার শেষে সবই স্ব-স্ব গৃহে ফিরে গেল।

কিছুদিন পরে হেজাজ গমনেচ্ছু যাত্রীদের একটি কাফেলা ঠিক হল। আমাকে তারা মনোনীত করল কাজী। নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমরা তিউনিস ত্যাগ করে সমুদ্রোপকূলের পথে মুসা, স্ফাক্স (sfax) ও কাবিস [৯] অতিক্রম করলাম। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্য কাবিসে আমাদের দশ দিন কাটাতে হল। সেখানে থেকে আমরা ত্রিপলী রওয়ানা হলাম। একশ' বা আরও অধিক অশ্বারোহী এবং একদল তীরন্দাজ অনেক দূর অবধি আমাদের সঙ্গী ছিল। স্ফাক্‌সে থাকতে তিউনিসের একজন রাজকর্মচারীর কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের কথাবার্তা স্থির হয়। ত্রিপলীতে তাকে আমার নিকট আনা হয়। কিন্তু ত্রিপলী ত্যাগ করবার পরেই তার পিতার সহিত আমার মনোমালিন্যের ফলে তাকে আমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হই। অতঃপর আমি ফেজের একজন ছাত্রের এক কন্যাকে বিবাহ করি। বিবাহের সময় একদিন অপেক্ষা করে সবাইকে আমি এক ওয়ালিমার ব্যবস্থা করি।

অবশেষে ৫ই এপ্রিল, ১৩২৬ খ্রীস্টাব্দে আমরা আলেকজান্দ্রিয়া এসে পৌছলাম। চারটি সিংহদ্বার [১০] বিশিষ্ট একটি সুন্দর বন্দর—যেমন সুগঠিত তেমনি সুরক্ষিত। সারা দুনিয়ায় যে সব বন্দর আমি দেখেছি, তার ভেতর কাওলাম (Quilon), ভারতের কালিকট্‌, তুর্কীর সুডাক এবং চীনের জয়তুন ছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ার সমকক্ষ আর কোন বন্দর নেই। এসব বন্দরের বিবরণ আমি পরে প্রদান করব। এখানে এসেই আমি বাতিঘর দেখতে গেলাম। এর একটি দিক তখন প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বেশ উঁচু একটি অট্টালিকা। মাটীর চেয়ে অনেক উঁচতে এর প্রবেশদ্বার। বাতিঘরের উল্‌টা দিকে আছে সমান উঁচু অপর একটি দালান। সেখান থেকে প্রবেশদ্বার অবধি একটি কাঠের পুল। এটি সরিয়ে নিলে বাতিঘরে প্রবেশের আর কোন উপায় থাকে না। দরজার পরেই বাতিঘর রক্ষকের বাসস্থান। বাতিঘরের ভেতরের অনেকগুলি কামরা। বাতিঘরের ভেতরের রাস্তাটি নয় বিঘত প্রশস্ত এবং দেওয়াল দশ বিঘত পুরু। বাতিঘরের প্রতিটি পাশের মাপ ১৪০ বিঘত। শহর থেকে তিন মাইল দূরে সমুদ্রের দিকে শহরের প্রাচীর ঘেষে লম্বা হয়ে এগিয়ে গেছে একখণ্ড ভূমি। তার একটি উঁচু ঢিবির·উপর এ বাতিঘর। কাজেই শহর থেকে ছাড়া বাতিঘরে স্থলপথে পৌছবার আর কোনই পথ নেই। ৭৫০ হিজরীতে (১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দ) পশ্চিম অঞ্চলে ফিরে এসে পুনরায় আমি বাতিঘরটি দেখতে যাই। তখন এটি এমন জীর্ণ দশায় এসে পৌছেছে যে এতে প্রবেশ আর নিরাপদ মনে হল না।[১১] আল-মালিক আন-নাসির পাশেই অপর একটি বাতিঘর নির্মাণ আরম্ভ করেন কিন্তু বাতিঘরের নির্মাণ কার্য শেষ হবার আগেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

এ শহরের আর একটি বিস্ময়কর বস্তু এর মার্বেল স্তম্ভ। শহরের বাইরে অবস্থিত এ স্তম্ভটি একখণ্ড মার্বেলে সুকৌশলে খোদিত। স্তম্ভটি স্থাপন করা হয়েছে বিরাটকায়

প্রস্তরের ইট বেদীর উপর। কি ভাবে কর দ্বারা এ স্তম্ভ বেদীর উপর স্থাপিত হয়েছে কেউ তা বলতে পারে না।[১২]

আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানী লোকদের একজন ছিলেন সেখানকার কাজী। তিনি ছিলেন বাগ্মিতায় সুপটু। বিরাটাকারের একটি শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন তিনি। পাশ্চাত্যের বা প্রাচ্যের কোথাও আমি এত বড় পাগড়ী ব্যবহার করতে দেখিনি। সেখানকার জ্ঞানী লোকদের ভেতর আরেকজন ছিলেন ধর্মপ্রাণ তাপস বোরহান উদ্দিন। আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকাকালে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম এবং তাঁর আতিথ্যে তিনদিন কাটিয়েছিলাম। একদিন তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেই তিনি বললেন, "আমি দেখছি বিদেশে সফর করতে তুমি খুব ভালবাস।"

আমি উত্তর দিলাম, "জী, হাঁ।" (যদিও তখনও ভারতের বা চীনের মত দূরদেশে সফরে যাবার সঙ্কল্প আমার ছিল না।)

তখন তিনি পুনরায় বললেন, "ভারতে কখনো গেলে তুমি নিশ্চয়ই আমার ভাই ফরিদ উদ্দিনের[১৩] সঙ্গে দেখা করবে, সিন্ধে দেখা করবে ভাই রোকনউদ্দিনের সঙ্গে এবং চীনে গেলে দেখা করবে বোরহান উদ্দিনের সঙ্গে। দেখা করে তাঁদের কাছে আমার শুভেচ্ছা জানাবে।"

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি বিস্মিত হলাম। তখন থেকেই এসব দেশে যাবার ইচ্ছা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়। উল্লিখিত তিন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা না-করা পর্যন্ত আমি সফরে রত ছিলাম।

আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান কালে শেখ আল মুরসিদি নামক একজন ধার্মিক লোকের কথা শুনেছিলাম। তিনি অলৌকিক উপায়ে যে কোন জিনিস তৈরি করে প্রার্থীর সামনে হাজির করতে পারতেন। একটি নির্জন স্থানে গহ্বরে তিনি বাস করতে যেতেন। নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক দল বেঁধে যেত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাদের সবার আহার্য সরবরাহ করতেন তিনি নিজে, তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন রকমের মাংস, ফলমূল, মিষ্টি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করত। সে সব দুষ্প্রাপ্য হলেও এবং মৌসুমের অনুপযোগী হলেও তিনি তা সামনে এনে হাজির করতেন। মানুষের মুখে-মুখে তাঁর খ্যাতি এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে সুলতান নিজেও একাধিক বার তাঁর আস্তানায় এসে দেখা করেছেন।

শেখের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে আমি একদিন আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে রওয়ানা হলাম। সামানহার ছাড়িয়ে সুন্দর শহর ফাবা (fva) গিয়ে পৌঁছলাম। শহরের পাশে একটি খাল। খালের অপর পারে শেখের আস্তানা। দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝি সময়ে আমি গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে। শেখকে সালাম করে দেখতে পেলাম সুলতানের একজন দেহরক্ষী রয়েছে তাঁর কাছে। একটু দূরে দলবল সহ তিনি তাঁবু ফেলেছিলেন। শেখ উঠে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং কিছু ফল আনিয়ে আমাকে খেতে দিলেন।

আসরের নামাজের সময় হলে তিনি আমাকে এমামের পদে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যতদিন তাঁর সঙ্গে ওখানে ছিলাম তিনি প্রতি ওয়াক্তেই আমাকে এমামতি করতে

বলেছেন। শোবার সময় হলে তিনি আমাকে বললেন, "ছাদের উপরে গিয়ে শুয়ে থাকো।" (তখন গ্রীষ্মের গরম কাল)।

আমি বললাম, "বিস্‌মিল্লাহ্"।[১৪] তিনি কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে জবাব দিলেন, "আমাদের ভেতর এমন কেউ নেই যার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট নেই।"

আমি তখন গিয়ে আস্তানার ছাদের উপরে গিয়ে উঠলাম। সেখানে দেখতে পেলাম একটি খড়ের তোশক, চামড়ার বিছানা, একপাত্র উজুর পানি, এক সোরাহী খাবার পানি, আরেকটি পানপাত্র। আমি সেখানেই শুয়ে পড়লাম।

সেই রাত্রে শেখের বাসস্থানের ছাদে ঘুমন্ত অবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখলাম, বিরাটাকার একটি পাখির ডানার উপর চড়ে আমি মক্কার দিকে উড়ে চলেছি। সেখান থেকে ইয়েমেন, ইয়েমেন থেকে পূর্ব দিকে। তারপরে কিছুদূর দক্ষিণে গিয়ে দূর পূর্বাঞ্চলের দিকে। সর্বশেষে নামলাম গিয়ে কালো ও সবুজ এক দেশে। এ স্বপ্ন দেখার পর বিস্মিত হয়ে আমি মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, "শেখ যদি আমার এ স্বপ্ন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন তবেই বুঝব লোকে যা বলে সত্যিই তিনি তাই।"

পরের দিন ভোরে সমস্ত দর্শনেচ্ছু লোক বিদায় নিলে শেখ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার স্বপ্নের বিবরণ শুনে তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "তুমি মক্কায় হজ ব্রত পালন করবে, মদিনায় হজরতের রওজা মোবারকও জেয়ারত করবে। তারপর সফর করবে ইয়েমেন এবং তুর্কীদের দেশ ইরাক। সেখান থেকে যাবে ভারতে। আমার ভাই দিলশাদের সঙ্গে ভারতে তোমার সাক্ষাৎ হবে। ভারতে তোমাকে অনেকদিন কাটাতে হবে। সেখানে গিয়ে তোমার এক মুসিবৎ হবে এবং আমার ভাই দিলশাদ তোমাকে উদ্ধার করবে সেই মুসিবতের কবল থেকে।" এই বলে পথের সম্বল স্বরূপ তিনি আমাকে ছোট-ছোট কয়েকখানা পিঠা দিলেন আর দিলেন কিছু অর্থ। আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের পরে পথে কখনও আর বিপদে-আপদে পড়তে হয়নি। তাঁর শুভেচ্ছা সর্বক্ষণ আমার পথের সাথী হয়ে রয়েছে।

এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে আগের অনেকগুলি শহর পার হয়ে পৌছলাম গিয়ে ডামিয়েট্টা। পথে প্রতি শহরেই আমরা সেখানকার ধর্মনেতার সঙ্গে দেখা করেছি। ডামিয়েট্টা শহর নীলনদের তীরে অবস্থিত। নদীর তীরস্থ গৃহের বাসিন্দারা বালতি করে নদীর পানি নিয়ে ব্যবহার করে। অনেক বাড়ির সিঁড়ি নেমে এসে নদীর পানি ছুঁয়েছে। লোকদের ছাগল-ভেড়া সারা দিন-রাত স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে দেখতে পেলাম। সেজন্য ডামিয়েট্টা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, "এ শহরের দেয়ালগুলো মিঠাই, কুকুরগুলো ভেড়া।" এ শহরে একবার প্রবেশ করলে শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া শহর ত্যাগ করে যেতে পারে না। খ্যাতনামা লোকদের কাছে শাসনকর্তার শীলমোহরাঙ্কিত এক টুকরা কাগজ থাকে যাতে তাঁরা দ্বাররক্ষীকে তা দেখিয়ে দরকার মত বাইরে যেতে পারেন। অন্যান্য লোকদের শিলমোহর আছে তাদের নিজ-নিজ বাহুতে। এ শহরে অনেক সামুদ্রিক পাখি আছে। এসব পাখির গোশ্‌ত আঁঠার মত। এছাড়া এখানকার মহিষের দুধ যেমন মিষ্টি তেমনি সুস্বাদু। এখানকার বুড়ি[১৫] নামক মাছ সিরিয়া, আনাতোলিয়া,

কায়রো প্রভৃতি শহরে চালান হয়ে যায়। বর্তমান শহরটি হালে নির্মিত। পুরাতন ডামিয়েট্টা শহর আল-মালিক আস্-সালের[১৬] আমলে ফ্রাঙ্কদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

ডামিয়েট্টা থেকে আমি পৌঁছলাম ফারিস্কোর শহরে। এ-শহরটিও নীলনদের তীরে অবস্থিত। শহরের বাইরে থাকতেই ডামিয়েট্টা থেকে একজন অশ্বারোহী এল আমার কাছে। তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ডামিয়েট্টার শাসনকর্তা। অশ্বারোহী আমাকে কিছু অর্থ দিয়ে বলল, "আমাদের শাসনকর্তা আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আপনি চলে এসেছেন শুনে এই অর্থ আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করুন।"

সেখান থেকে আমি আসমুনে গিয়ে পৌঁছলাম। নীলনদ থেকে বেরিয়ে আসা একটি খালের পারে আসমুন একটি পুরাতন বড় শহর। শহরে একটি কাঠের পুল আছে। অনেক নৌকা এসে এ-পুলের সঙ্গে লঙ্গর থাকে। বিকেলে পুলটি খুলে দেওয়া হয় এবং নৌকাগুলি উজান-ভাঁটির পথে যাতায়াত করে। এখান থেকে আমি গেলাম সামালুদ। সামালুদ থেকে গেলাম উজানের দিকে কায়রো। একটানা অনেকগুলি শহর ও গ্রামের মধ্যস্থলে কায়রো। নীলনদ অঞ্চলে সফর কালে পথের সম্বল না নিলেও অসুবিধা হয় না। নীল-নদের তীরে ওজু, গোসল, নামাজ বা আহারের জন্য যেখানে খুশী তা পাওয়া যায়। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কায়রো এবং সেখান থেকে মিসরের উষ্ণমণ্ডল অবধি অন্যান্য পথে রয়েছে অসংখ্য বাজারের সারি।

অবশেষে শহুরকুল জননী অত্যাচারী ফেরাউনের বাসস্থান কায়রোতে এসে পৌঁছলাম। কথিত হয় যে,[১৭] কায়রোতে বার হাজার ভিস্তি আছে। তারা উটের সাহায্যে পানি সরবরাহ করে। এ-ছাড়া ত্রিশ হাজার আছে গাধা ও খচ্চর ভাড়া দেবার লোক। নীলনদের বুকে সুলতানের এবং তাঁর প্রজাদের নৌকা আছে ছত্রিশ হাজার। মিসরের উষ্ণাঞ্চল থেকে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও ডামিয়েট্টা অবধি এ-সব নৌকা পাল খাটিয়ে যাতায়াত করে বাণিজ্যের নানা বেসাতি নিয়ে।

নীলনদের তীরে পুরাতন কায়রোর অপর দিকে একটি জায়গার নাম বাগিচা।[১৮] অনেকগুলি মনোরম বাগান এখানে আছে। কারণ, কায়রোর লোকেরা আমোদ-প্রমোদের ভক্ত। একবার সুলতানের হাত ভেঙ্গে যায়। তাঁর আরোগ্য উপলক্ষ্য করে সেবার যে আমোদোল্লাস হয় আমি তাতে যোগদান করেছিলাম। শহরের সমস্ত ব্যবসায়ী তাদের দোকানপাট কয়েকদিন অবধি সজ্জিত করে রেখেছিল এবং রেশমী কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছিল প্রতিটি দোকানের সম্মুখে। এখানকার মসজিদ আমর-এর প্রতি যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শুক্রবারে এখানে নিয়মিত জুমার নামাজ হয়। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ পথ পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে প্রসারিত। কায়রোতে মাদ্রাসা রয়েছে অসংখ্য। দু'টি দূর্গের মধ্যস্থলে সুলতান কালাউনের সমাধির নিকটে কায়রোর মারিস্তান বা হাসপাতাল। হাসপাতালটির সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সাজসরঞ্জাম ও ঔষধপত্রও আছে প্রচুর। হাসপাতালের দৈনিক আয় হাজার দিনারের কাছাকাছি।[১৯]

এখানে খানকাহ্ আছে অনেকগুলি। সম্ভ্রান্ত বাসিন্দারা খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার ব্যাপ্যারে এখানে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এক একটি খানকাহ্ ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের দরবেশদের জন্য নির্দিষ্ট। দরবেশদের অধিকাংশই শিক্ষিত পার্শিয়ান। তাঁরা মারেফতী বা গুপ্তমতাবলম্বী। প্রত্যেক খানকাহ্‌র একজন প্রধান ব্যক্তি এবং একজন দ্বাররক্ষী আছে। তাঁদের কাজকর্ম সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। তাঁরা কতকগুলি বিশেষ ধরনের রীতিনীতি মেনে চলেন। একটি প্রচলিত রীতি আছে আহারের ব্যাপারে। ভোরে বাড়ির খানসামা এসে দরবেশদের কে কি সেদিন আহার করবেন তা জেনে যায়। পরে আহারের জন্য যখন তাঁরা একত্র হন তখন ভিন্ন-ভিন্ন থালায় প্রত্যেকের রুটি ও সুরুয়া পরিবেশন করা হয়। দৈনিক তাঁরা দু'বার আহার গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে শীতের ও গরম কালে ব্যবহারোপযোগী কাপড় দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিশ হতে ত্রিশ দেরহাম অবধি মাসোহারাও তাঁরা পেয়ে থাকেন। বৃহস্পতিবার রাত্রে তাঁদের দেওয়া হয় বাতাসা এবং কাপড় ধোবার সাবান। গোসলের উপকরণ এবং বাতির জন্য তৈল। এঁদের সবাই অকৃতদার। বিবাহিতদের জন্য রয়েছে পৃথক খানকাহ্।

কায়রোতে আছে আল্-কারাদার কবরস্তান। এটি একটি পবিত্রস্থান বলে গণ্য। এখানে অসংখ্য জ্ঞানী, গুণী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কবর আছে। এখানকার লোকেরা কারাদার কবরগুলি এমনভাবে দেওয়াল দিয়ে ঘেরে যে দেখতে ঠিক অট্টালিকার মতই দেখায়।[২০] তারা কামরাও তৈরি করে এবং কোরআন তেলায়তের জন্য লোক নিযুক্ত করে। সুললিত কণ্ঠে তারা রাত্রদিন সেখানে পবিত্র কোরআন আবৃত করে। অনেকে সমাধি প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও ধর্ম চর্চার স্থান ও মাদ্রাসা স্থাপন করে এবং বৃহস্পতিবার রাত্র সপরিবারে সেখানে অতিবাহিত করে এবং প্রসিদ্ধ কবরগুলি প্রদক্ষিণ করে। শাবান মাসের মধ্য-ভাগেও তারা একদিন সেখানে নিশা যাপন করে। দোকানদাররা সেদিন সেখানে যায় নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে।[২১]

শহরের পবিত্র স্থানগুলির ভেতর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল হজরত আল হুসাইনের[২২] সমাধি। সমাধির ধারেই একটি সুদৃঢ় অট্টালিকা। অট্টালিকার দরজার আংটাগুলি রৌপ্য নির্মিত।

সুপেয় পানির জন্য, দীর্ঘতার জন্য এবং প্রয়োজনীয়তার জন্য নীলনদ[২৩] পৃথিবীর অন্যান্য নদীর অগ্রগণ্য। পৃথিবীর অন্য কোন নদীর তীরে এত একটানা শহর ও গ্রাম নেই অথবা এমন শস্য শ্যামল উর্বর ভূমিও নেই। নদীটি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত। অন্যান্য প্রসিদ্ধ নদীর গতির পক্ষে এটি একটি ব্যতিক্রম। এ নদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল গরমের মৌসুমে যখন অন্যান্য নদনদী প্রায় শুকিয়ে ওঠে তখন এর পানি বৃদ্ধি পায়। নীলনদের পানি যখন কমতে থাকে তখন অন্যান্য নদনদীর পানি বৃদ্ধি পায়। এ-ব্যাপারে নীলনদের মিল আছে একমাত্র সিন্ধু নদের সঙ্গে। পৃথিবীর পাঁচটি প্রসিদ্ধ নদী-নীল, ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস, সির দরিয়া এবং আমু দরিয়া। আরও যে পাঁচটি নদীর সঙ্গে নদীগুলির তুলনা চলে সেগুলি হ'ল— সিন্ধু, যা'র অপর নাম পাঞ্জাব (পঞ্চ নদী), গ্যাঙ (গঙ্গা) নামক ভারতীয় নদী, —যাকে হিন্দুরা তীর্থ বলে

মনে করে, মৃতদেহের ভস্মাবশেষ এ নদীতে নিক্ষেপ করে এবং নদীটির উৎপত্তিস্থান স্বর্গ বলে মনে করে, ভারতের যুন (যমুনা অথবা ব্রহ্মপুত্র), তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলের ইটিল (ভলগা) নদী যার তীরে রয়েছে সারা শহর এবং কেথের সারু (হোয়াং হো) নদী। এ-সব নদীর উল্লেখ আমি যথাস্থানে করব। কায়রো থেকে নিম্নদিকে কিছু দূর গিয়ে নীলনদ ভাগ হয়েছে তিনটি শাখায়[২৪] শীতে বা গ্রীষ্মে এ নদী তিনটি নৌকা ব্যতীত পার হওয়া যায় না। নীলনদ থেকে প্রতি শহরের বাসিন্দারা খাল কেটে নেয় এবং নীলনদের পানি বৃদ্ধি পেলে এ-সব খাল মাঠের ভেতর দিয়ে বয়ে যায়।

হেজাজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি কায়রো থেকে মিসরের উষ্ণাঞ্চলে যাই। এখানে আমি প্রথম রাত্রি যাপন করি দাইর আত-তিন দরগায়। কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন রক্ষণের জন্য এ দরগাটি নির্মিত হয়। হজরত (সাঃ) একটি কাঠের গামলার অংশ, তাঁর সুর্মা ব্যবহারের একটি শলাকা, পাদুকা শেলাইর একটি সূচ বা ফুরনী। এ-ছাড়া আছে হজরত আলীর স্বহস্ত লিখিত একখানা কোরআন। কথিত আছে লক্ষ দিরহাম ব্যয় করে দরগার নির্মাতা এগুলি ক্রয় করেন। এ-ছাড়া আগন্তুকদের খাদ্যদানের জন্য এবং স্মৃতি চিহ্নগুলি রক্ষণাবেক্ষণকারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু অর্থেরও ব্যবস্থা করে গেছেন।

এখান থেকে আসবার পথে শহর ও গ্রাম পার হয়ে আমি হাজির হলাম মুনিয়াত ইবনে আসিব (Minie) শহরে। মিসরের উচ্চাঞ্চলে নীলনদের তীরে নির্মিত এটি একটি বড় শহর। এখানে আসবার পথে আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে মানফুলুর, আসিউত, ইয়মিম, কিনা, কুস, লুক্সার, এস্না এবং এডনফু। ইখমিমে একটি বারবা[২৫] বা প্রাচীন মিসরীয় মন্দিরে প্রস্তর মূর্তি ও খোদিত লিপি আছে কিন্তু এখন তার পাঠোদ্ধার করা সাধ্যের অতীত। অপর একটি বারবা ভেঙ্গে যাবার পর তার পাথর দিয়ে একটি মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে। কুসে মিসরের উচ্চাঞ্চলের শাসনকর্তা বাস করেন। লুক্সার নামক এই সুন্দর ছোট শহরটিতে ধর্মপ্রাণ তাপস আবুল হাজ্জাজের[২৬] সমাধি বর্তমান। এস্না থেকে একদিন ও এক রাত্রি মরু পথে চলে আমরা হাজির হই এডনফু। এখানে নীলনদ পার হয়ে আমরা উট্ ভাড়া করে একদল আরবের সঙ্গে জনমানবহীন অথচ নিরাপদ মরু পথে রওয়ানা হই। পথে আমাদের একবার বিশ্রাম নিতে হয়েছিল হুমেথিরা নামক স্থানে। এ-স্থানের আশেপাশে অনেক হায়েনার বাস। সারারাত তাই আমাদের হায়না তাড়িয়ে কাটাতে হয়। তবু একটি হায়না কোন ক্রমে এসে আমার জিনিসপত্রের উপর চড়াও করে একটি বস্তা নিয়ে যায় এবং তার ভেতর থেকে এক থলে খেজুর নিয়ে সরে পড়ে। পরের দিন শূন্য থলেটি আমরা কুড়িয়ে পাই ছিন্ন অবস্থায়।

পনর দিন পর আমরা পৌঁছি 'আইধার[২৭] শহরে। এখানে প্রচুর দুধ ও মাছ পাওয়া যায়। খেজুর ও শস্যাদি আমদানি হয় মিসর থেকে। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় বেজা। অধিবাসী সবাই কৃষ্ণকায়। এরা হল্‌দে রঙের কম্বলে শরীর আবৃত করে রাখে এবং মাথায় এক আঙ্গুল পরিমাণ চওড়া ফিতা বেঁধে রাখে। এখানকার মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পায় না। আইধারের বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্য ছিল উটের দুধ। এ শহরের এক তৃতীয়াংশের মালিক মিসরের সুলতান, বাকি অংশের মালিক বেজাদের আল-হুদরুকি[২৮] নামক রাজা।

আইধারে পৌঁছে আমরা জানতে পারলাম, আল-হদরুবি তখন তুর্কিদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তুর্কীরা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের পক্ষে তখন সমুদ্র পাড়ি দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা অগত্যা আমাদের আয়োজিত সমুদ্র পাড়ির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রি করে জঙ্গী আরবদের সঙ্গে কুসে ফিরে এলাম। সেখান থেকে পালতোলা নৌকায় নীলনদ দিয়ে আট দিন পরে আমরা কায়রো এসে পৌঁছলাম। সেখানে একরাত্রি কাটিয়েই আমি সিরিয়ার পথে রওয়ানা হই। তখন ১৩২৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাইর মাঝামাঝি।

আমাদের পথে ছিল বিলবেস ও আস-সালিহিয়া। সেখান থেকে বালুকাময় পথের শুরু, মধ্যে-মধ্যে সফর বিরতির স্থান। বিরতির স্থানে সরাইখানা আছে। এখানকার লোকেরা তাকে খান[২৯] বলে। খানে মুসাফেররা তাদের বাহন পশু নিয়ে বিশ্রাম করে। প্রত্যেক খানেই পানির ব্যবস্থা আছে এবং মুসাফের ও পশুর প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রির জন্য এক একটি দোকান আছে। কাটিয়া[৩০] (Qatya) নামক স্থানের সরাইখানায় আবগারী শুল্ক আদায় করা হয়। সওদাগরদের কাছ থেকে এবং তাদের মালপত্র তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করা হয়। এখানে অফিস গৃহ আছে, তাতে অফিসার, কেরানী ইত্যাদি আছে। এখানকার প্রাত্যহিক আয় হাজার সোনার দিনার। মিসর থেকে প্রবেশপত্র (পাসপোর্ট) ছাড়া কেউ সিরিয়ায় যেতে পারে না। ঠিক তেমনি সিরিয়ার প্রবেশপত্র না নিয়ে কেউ মিসরে প্রবেশ করতে পারে না। প্রজাদের মালামাল ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য এবং ইরাকের গুপ্তচর প্রবেশের বাধা দেবার জন্যই এ ব্যবস্থা। এই রাস্তাটি রক্ষার দায়িত্বভার দেওয়া আছে বেদুঈনদের উপর। সন্ধ্যা হলে তারা পথের বালিরাশি এমন করে মসৃণ করে রাখে যাতে কোন পদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, পরের দিন ভোরে শাসনকর্তা এসে বালুকাময় পথ পরীক্ষা করেন। তিনি তখন সে পথে কোন পদচিহ্ন দেখলেই আরবদের হুকুম করেন তাকে ধরে আনতে। তারা তৎক্ষণাৎ সে লোকের পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে তবে ফিরে আসে। তাকে যথারীতি শাসনকর্তার সামনে হাজির করা হয় এবং তিনি তার শাস্তি বিধান করেন। শাসনকর্তা আমার সঙ্গে মেহ্‌মানের মত ব্যবহার করেন, সদয় ব্যবহার করেন এবং আমার সঙ্গে যারা ছিল তাদের সবাইকে যাওয়ার অনুমতি দেন। এখান থেকে আমরা সিরিয়ার প্রথম শহর গাজায় পৌঁছি। মিসর সীমান্ত পার হলেই গাজা শহর।

গাজা থেকে আমি যাই ইব্রাহিম-এর শহরে (Hebron). এখানকার মসজিদটি বেশ সুন্দর, মজবুত ও উঁচু এবং চতুষ্কোণ প্রস্তরে প্রস্তুত। এ মসজিদের একটি কোণে এমন একটি পাথর রয়েছে যার একটা ধার সাতাশ বিঘত লম্বা। কথিত আছে পয়গম্বর সোলেমান জিনদের[৩১] হুকুম দিয়ে এ মসজিদ তৈরি করান। এ মসজিদের ভেতর ইব্রাহিম, ইছহাক ও ইয়াকুবের পবিত্র কবরও রয়েছে। এ-গুলির উল্টাদিকে তিনটি কবর আছে তাঁদের বিবিদের। মসজিদের ইমাম একজন বোজর্গ ব্যক্তি। এ কবরগুলি সম্বন্ধে তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "যত জ্ঞানীজনের সঙ্গে এ পর্যন্ত আমার দেখা হয়েছে তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, এ-গুলিই হজরত ইব্রাহিম, ইছহাক এবং

ইয়াকুবের ও তাঁদের বিবিদের কবর। মিথ্যার যারা সমর্থনকারী তারা ছাড়া এ-বিষয়ে আর কেহ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে না। বহুদিন থেকে বংশানুক্রমে সবাই এ বিশ্বাস করে আসছে এবং কেউ এতে কোনদিনও সন্দেহ প্রকাশ করেনি।"

এ মসজিদে ইউসুফের কবরও রয়েছে এবং তার কিছু পূর্বে রয়েছে হজরত লূত[৩২] এর কবর। কবরটি সুন্দর একটি অট্টালিকার অভ্যন্তরে। অদূরে আছে লোতের হ্রদ (Dead sea)। এ হ্রদের পানি লবণাক্ত। কথিত আছে লূতের লোকেরা যেখানে বাস করত সেখানেই এ হ্রদটির সৃষ্টি হয়েছে।

হেব্রন (ইব্রাহিমের শহর) থেকে জেরুজালেম যাবার পথে বেথ্লেহেম—হজরত ঈসার জন্মস্থান। স্থানটি প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকায় আবৃত। খ্রীস্টানরা স্থানটিকে তীর্থ হিসাবে গণ্য করে এবং সেখানে যারা গমন করে তাদের অতিথির মত যত্ন করে।

অতঃপর আমরা জেরুজালেমে পৌঁছলাম। খ্যাতির দিক থেকে পবিত্র তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনার পরে জেরুজালেমের তৃতীয় স্থান এবং এখান থেকেই আমাদের পয়গম্বর মেরাজ[৩৩] গমন করেন। খ্রীস্টানরা এ নগরটি অধিকার করে সুরক্ষিতভাবে বসবাস আরম্ভ করতে পারে আশঙ্কা করে বিখ্যাত সম্রাট সালাহউদ্দিন ও তাঁর পরবর্তিগণ[৩৪] এর প্রাচীরগুলি নষ্ট করে ফেলেন। জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদটি অতি সুদৃশ্য এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মস্জিদ বলে খ্যাত। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য ৭৫২ রাজ হাত[৩৫] এবং প্রস্থ ৪৩৫ হাত। মসজিদের তিনদিকে অনেকগুলি প্রবেশ পথ আছে। যতদূর দেখেছি, মসজিদটির দক্ষিণদিকে আছে মাত্র একটি দরজা। এ-দরজা দিয়ে শুধু এমাম প্রবেশ করেন। এ মসজিদটি অনাবৃত একটি বৃহৎ চত্বর বিশেষ। কিন্তু আল-আক্সা মসজিদটি এর ব্যতিক্রম। আল-আক্সা মসজিদের ছাদটি কারুকার্য খচিত এবং সোনালী ও বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত। মসজিদের অংশ বিশেষ ছাদ দ্বারা আবৃত। মসজিদটির গুম্বজ গঠনের শোভা সৌন্দর্য ও দৃঢ়তায় অতুলনীয়। গুম্বজটি মসজিদের মধ্যস্থানে অবস্থিত। মার্বেল পাথরের একটি সিঁড়ি দিয়ে গুম্বজে পৌঁছা যায়। গুম্বজের চারটি দরজা, চতুষ্পার্শ্ব এবং অভ্যন্তর মার্বেল পাথরে মণ্ডিত। ভিতরের এবং বাইরের কারুকার্য এবং সাজসজ্জা এত সুন্দর যে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। এর অধিকাংশই স্বর্ণাবৃত। কাজেই এর দিকে চাইলেই চোখ ঝল্সে যায়, বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হয়। গুম্বজের মধ্যস্থলে পবিত্র প্রস্তরখণ্ড। এখান থেকেই আমাদের প্রিয় পয়গম্বর মেরাজে গমন করেন। এ প্রস্তরখণ্ড একটি মানুষের সমান বাইরের দিকে বাড়ানো। তার নিচেই রয়েছে ছোট একটি প্রকোষ্ঠ। সেটিও একটি মানুষের সমান নিচু। নিচে নেমে যাবার সিঁড়িও রয়েছে। প্রস্তরখণ্ড ঘিরে আছে দু'প্রস্থ আবেষ্টনী। যে আবেষ্টনীটি প্রস্তরখন্ড থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে সেটি অতি সুন্দরভাবে লোহা[৩৬] দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। অপরটি কাঠের তৈরি।

জেরুজালেমে যে-সব পবিত্র দরগা আছে তার একটি জাহান্নাম (Gehenna) উপত্যকায় শহরের পূর্বপ্রান্তে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। কথিত আছে হজরত ঈসা যেখান থেকে বেহেস্তে[৩৭] গমন করেন সেখানে এ-দরগাটি অবস্থিত। এ উপত্যকার

নিম্নদেশে খ্রীস্টানদের একটি গীর্জা আছে। খ্রীস্টানরা বলে যে এ গীর্জাটির অভ্যন্তরে বিবি মরিয়মের কবর আছে। একই স্থানে আরও একটি গীর্জা আছে যাকে খ্রীস্টানরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং তীর্থ উদযাপন করতে আসে। খ্রীস্টানদের মিথ্যাভাবে বিশ্বাস করানো হয় যে এ গীর্জার ভেতরে হজরত ঈসার সমাধি আছে। এখানে যারা তীর্থ করতে আসে তাদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট কর আদায় করতে হয় এবং মুসলিমদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক প্রকার অবমাননা সহ্য করতে হয়। এ স্থানটির নিকটেই আছে হজরত ঈসার দোলনা।[৩৮] শুভেচ্ছা লাভের জন্য তীর্থযাত্রীরা তা দেখতে আসে।

অতঃপর জেরুজালেম থেকে আমরা গেলাম আসকালনের দূর্গ দেখতে। দুর্গটি তখন পুরোপুরি ধ্বংসের কবলে গিয়ে পড়েছে। ওমরের মসজিদ নামে বিখ্যাত যে মসজিদটি ছিল তারও তখন শুধু দেওয়ালগুলি আছে, আর আছে, মার্বেল প্রস্তরের কয়েকটি স্তম্ভ। কয়েকটি স্তম্ভ তখনও দাঁড়িয়ে আছে, বাকিগুলি ধরাশায়ী। একটি স্তম্ভ চমৎকার লাল রঙের। সেখানকার লোকরা বলে, খ্রীস্টানরা এক সময়ে এ স্তম্ভটি বয়ে নিয়ে যায় তাদের দেশে। কিছুদিন পরে সেটি হারিয়ে যায়। পরে দেখা যায় সেই স্তম্ভটি আসকালনে আবার যথাস্থানে এসে গেছে। সেখান থেকে আমি গেলাম আর-রামলা শহরে। আর-রামলা ফিলিস্তিন (Palestine) নামেও পরিচিত। কথিত আছে এখানকার মসজিদের পশ্চিমদিকে পয়গম্বরদের তিন শ' জন সমাহিত আছেন। আর-রামলা থেকে আমি এলাম নাবুলাস (Shechem)। এখানে প্রচুর গাছ-গাছড়া আছে আর আছে সততঃপ্রবহমান নহর। সিরিয়ার ভেতর জলপাইর জন্য বিখ্যাত স্থানগুলির একটি নাবুলাস। এখান থেকে জলপাইর তেল রপ্তানী হয়ে যায় কায়রো ও দামেশক শহরে। নাবুলাসে খরুবা মিষ্টি তৈরি হয় এবং সেসব মিষ্টি এখান থেকে দামেশক ও অন্যান্য শহরে রপ্তানী হয়। খরুবাগুলিকে প্রথমে জাল দেওয়া হয় তারপর সেগুলিকে পেষণ করে বের করা হয় রস। সেই রস থেকেই তৈরি হয় মিষ্টি। শুধু রসও দামেশক ও কায়রো শহরে চালান দেয়া হয়। এ-ছাড়া নাবুলাসে এক রকম তরমুজও পাওয়া যায়। সে তরমুজ খুবই সুস্বাদু।

সেখান থেকে লাধিকিয়ার পথে হায়র হয়ে আজালনে[৩৯] পৌঁছলাম। পথে আক্কার (Acre) ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। আক্কা ছিল সিরিয়ার ফ্রাঙ্কদের রাজধানী বন্দর। তখন কনস্টাটিনোপলের সঙ্গে এ বন্দরের তুলনা চলত।

এখান থেকে গেলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত সুরে (Tyre)। সুর তখন ধ্বংস হয়ে গেলেও সেখানে একটি লোকালয় আছে। লোকালয়ের অধিকাংশ বাসিন্দা রিফুসার সম্প্রদায়ের লোক। সুর বা টায়ার শহরটি তার দুর্ভেদ্যতার জন্য প্রসিদ্ধ। শহরের তিনটি দিক সমুদ্রের দ্বারা আবৃত। দু'টি প্রবেশপথের একটি সমুদ্রের দিকে, অপরটি স্থলের দিকে। স্থলের দিকে যে প্রবেশ পথটি রয়েছে সেটি পর-পর চারটি মাটির প্রাচীর দিয়ে আবৃত। সমুদ্রের দিকে প্রবেশপথটি দু'টি টাওয়ার বা সুউচ্চ মিনারের মধ্যস্থলে। এমন সুন্দর স্থাপত্যের নির্দশন দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এর তিনটি দিক সমুদ্রের দ্বারা আবৃত। অপরদিকে দেওয়াল। দেওয়ালের নিচে জাহাজ যাতায়াতের পথ। পূর্বে এক টাওয়ার

থেকে অপর টাওয়ার অবধি একটি লোহার শিকল ঝুলান ছিল। সে শিখলটি নিচু করে না দেওয়া পর্যন্ত যাতায়াতের কোন উপায় ছিল না। দ্বার রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকত বিশ্বাসী পাহারাদারদের উপর। তাদের অজ্ঞাতে কেউ বাইরে যেতে বা ভেতরে আসতে পারত না।

আক্কাতেও এ-ধরনের একটি পোতাশ্রয় আছে। কিন্তু তার ভেতর শুধু ছোট জাহাজই প্রবেশ করতে পারে। সুর বা টায়ার থেকে এলাম সায়দা (Sidon)। ফলের জন্য প্রসিদ্ধ সুন্দর এ শহরটি সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। এখান থেকে কায়রোয় ডুমুর, কিস্‌মিস ও জলপাইর তেল চালান হয়।

অতঃপর আমি তাবারিয়া (Tiberias)[৪০] শহরে হাজির হই। এক কালে এটি একটি প্রসিদ্ধ বড় শহর ছিল। এর কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন মাত্র দাঁড়িয়ে আছে অতীত সুদিনের সাক্ষ্য বহন করে। এখানে নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থাযুক্ত অতি চমৎকার হামাম আছে। হামামের পানি বেশ গরম। তাবারিয়ার গ্যালিলির দরিয়া (Sea of galilee) নামে আঠার মাইল লম্বা ও নয় মাইল চওড়া একটি হ্রদ আছে। শহরের একটি মসজিদ 'পয়গম্বরদের মসজিদ' নামে পরিচিত। মসজিদে রহিয়াছে শোয়া'ব (Jethss) যাঁর কন্যা হজরত মুসার বিবি এবং সুলেমান, জুদা ও রিউবেনের সমাধি। তাবারিয়া থেকে আমরা গেলাম যে কূপে ইউসুফকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা দেখতে। সেখানে গিয়ে কূপের পানি দ্বারা আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। একটি ছোট মসজিদের চত্বরে বেশ বড় ও গভীর একটি কূপ। পানি ছিল বৃষ্টির কিন্তু কূপের রক্ষণাবেক্ষণ কারী বলল, কূপের মধ্যে একটি ঝরণাও আছে। সেখান থেকে আমরা বৈরুত গিয়ে হাজির হলাম। বৈরুত শহরটি ছোট্ট কিন্তু চমৎকার বাজার ও সুন্দর মসজিদ আছে এখানে। এখান থেকে ফল এবং লোহা চালান হয়ে মিসরে যায়।

বৈরুত থেকে আমরা রওয়ানা হলাম আবু ইয়াকুব ইউসুফের কবর জেয়ারতের জন্য। তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একজন রাজা বলে পরিচিত। কারাফনূহ্[৪১] নামক একটি জায়গায় এ কবরটি অবস্থিত। সমাধির ধারেই একটি মুসাফেরখানা আছে। মুসাফেররা এখানে আদরযত্ন পেয়ে তাকে। অনেকে বলে, সুলতান সালাহুদ্দিন এটি স্থাপন করেন। কিন্তু অপর লোকদের মতে এটির প্রতিষ্ঠাতা সুলতান নুরুউদ্দিন। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সুলতান একবার স্বপ্নে দেখলেন আবু ইয়াকুবের দ্বারা তিনি উপকৃত হবেন। এ-জন্য আবু ইয়াকুবকে তিনি কিছুদিনের জন্য নিজের কাছে এনে রাখেন। আবু ইয়াকুব এক রাত্রে সেখান থেকে একাকী পলায়ন করেন। পথে অসহ্য শীতের মধ্যে তিনি একটি গ্রামে এসে হাজির হন। সেই গ্রামের একটি দরিদ্র লোক তাঁকে আশ্রয় দেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে একটি মুরগী জবাই করে রুটি আহার করতে দেন। আহারান্তে আবু ইয়াকুব গৃহস্বামীকে দোয়া করেন। গৃহস্বামীর কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছিল। অচিরেই একটি মেয়ে বিবাহ হবে বলে স্থির হয়েছিল। কন্যার বিবাহে পিতার দান-দেহাজ দেওয়ার রীতি তখনও সেখানে প্রচলিত ছিল। এ-সব দান-দেহারেজ অধিকাংশই হত তামার নির্মিত তৈজসপত্র। বিবাহের চুক্তির অঙ্গ স্বরূপ এসব

দান-দেহাজের বস্তু নিয়ে সবাই গর্ববোধ করত। আবু ইয়াকুব গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কোন তামার তৈজসপত্র আছে কি ?"

গৃহস্বামী বলল, "হ্যাঁ, আছে। আমার মেয়ের বিয়েতে দেহাজ দিবার জন্য কিছু তৈজসপত্র কেনা হয়েছে।"

সেগুলি কাছে আনা হলে আবু ইয়াকুব বললেন, "তোমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আরও যতটা পার ধার করে আন।" গৃহস্বামী তাই করল এবং অতিথির সামনে সব এনে হাজির করল। তিনি তখন তার চারদিকে আগুন জ্বেলে একটি থলের ভেতর থেকে কিছু আরক বের করে সেগুলির উপর ছড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সব পাত্র সোনার পাত্রে পরিণত হল। আবু ইয়াকুব সে সমস্ত একটি তালাবদ্ধ করে রেখে গেলেন এবং দামাস্কে সুলতান নুরুউদ্দিনকে সে সবের কথা উল্লেখ করে বিদেশী মুসাফেরদের জন্য হাসপাতাল ও একটি মুসাফেরখানা স্থাপন করতে লিখলেন। তিনি ঐ সব তৈজসপত্রের মালিকদের সন্তুষ্ট করতে এবং উপরোক্ত গৃহস্বামীকে ভরণপোষণ করতেও আদেশ দিলেন। গৃহস্বামী নিজেই পত্রখানা নিয়ে সুলতানের কাছে গেল। অতঃপর সুলতান এসে সবাইকে সন্তুষ্ট করলেন। সুলতান আবু ইয়াকুবকে অনেক সন্ধান করেও দেখা পেলেন না। অবশেষে দামেস্কে ফিরে গিয়ে ঐ নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলেন। এটি পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল।

অতঃপর আমি হাজির হলাম আত্রাবুলাস (Tripoli) শহরে। আত্রাবুলাস সিরিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর। নবনির্মিত এ শহরটি ছ'মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। পুরাতন শহরটি সমুদ্রের তীরেই ছিল। এক সময়ে খ্রীস্টানরা শহরটি অধিকার করেছিল। অতঃপর সুলতান বেইবাস[৪২] এটি পুনরুদ্ধার করে ধ্বংস করেন এবং নতুন শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ শহরে অনেকগুলি সুন্দর হামাম আছে। একটি হামাম একজন শাসনকর্তার নামানুসারে সিন্দামুর নামে পরিচিত। তিনি অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিতেন। সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার একজন স্ত্রীলোক এসে ফরিয়াদ জানাল, শাসনকর্তার একটি কর্মচারীর বিরুদ্ধে। স্ত্রীলোকটি দুধ বিক্রি করত। কিছু দুধ নিয়ে ঐ কর্মচারী খেয়ে ফেলেছে। স্ত্রীলোকটির কোন সাক্ষী ছিল না। কিন্তু তবু শাসনকর্তা তাকে তলব করে পাঠালেন এবং সে হাজির হলে তাকে দু'টুকুরা করে কেটে ফেললেন। তখন দেখা গেল লোকটির পাকস্থলীতে সত্যিই দুধ রয়েছে। তুর্কিস্তানের সুলতান বেবেক[৪৩] সম্বন্ধে এবং সুলতান কালাউনের অধীনে আইধারের শাসকর্তা আল-আত্রিশ সম্বন্ধেও অনুরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে।

ত্রিপলি থেকে হিস্ন্-আল্ আকরাদ (এখন কালাতে-আল্-হিস্ন্) ও হিস্ন্ হয়ে আমরা হামা পৌঁছলাম। হামা সিরিয়ার অপর একটি প্রসিদ্ধ শহর। শহরটি ফলের বাগ-বাগিচায় ঘেরা। এখানে গোলকাফার ও ঘূর্ণায়মান অনেকগুলি (Water wheel) আছে। সেখান থেকে আমরা মা'রা এসে হাজির হলাম। মারা যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকায় একশ্রেণীর শিয়া বাস করে। তারা 'দশ সাহাবা'কে ঘৃণার চোখে দেখে এবং 'ওমর'[৪৪] নামধারী লোকমাত্রই ঘৃণা করে। মারা থেকে আমরা যাই সারমিন। সারমিনে

সাবান প্রস্তুত হয় এবং দামাস্কাস ও কায়রোতে রপ্তানী হয়। হাত ধোবার উপযোগী সুগন্ধি সাবানও এখানে প্রস্তুত হয়। এ সাবান তারা লাল ও হলদে রঙে রঞ্জিত করে। এখানকার বাসিন্দারাও দশ সাহাবাকে ঘৃণা করে। একটি তাজ্জব ব্যাপার এই যে, এরা 'দশ' শব্দটিও উচ্চারণ করে না। দালালরা যখন নীলামে কোন জিনিস বিক্রি করতে যায় তখন বাজারে তারা নয়ের পর দশ না বলে 'নয় আর এক' বলে। একদিন সেখানে একজন তুর্কী উপস্থিত ছিল। এক দালালকে 'নয় আর এক' বলতে শুনেই সে তার হাতের লাঠিটা দালালের মাথার কাছে তুলে বলল, "বল দশ!" তাতে লোকটি বলল, "লাঠির সঙ্গে দশ।"

সেখান থেকে আমরা এলাম হালাব (Aleppo)[৪৫]। এখানে মালিক-উল-উমারার ঘাঁটি অবস্থিত। তিনি ছিলেন মিসরের সুলতানের প্রধান সেনানায়ক। তিনি সুবিচারক ছিলেন এবং তাঁর ন্যায় বিচারের অনেক সুখ্যাতি আছে কিন্তু তিনি একজন ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

এলেপ্পো থেকে রওয়ানা হয়ে তুর্কমনদের[৪৬] নবনির্মিত শহর তিজিন হয়ে আমরা পৌঁছলাম অ্যানটাকিয়া (Antioch)। সিরিয়ার শহরগুলির ভেতর একমাত্র এ্যান্টিকয়ক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু আল মালিক আজ-জহির (বেবার্স) যখন এ শহরটি অধিকার করেন তখন তিনি ঐ প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন।[৪৭] সুন্দর-সুন্দর অট্টালিকা বিশিষ্ট শহরটি জনবহুল এবং এখানে গাছগাছড়া ও পানির অভাব নেই। সেখানে থেকে আমি বাগ্রাস[৪৮] দূর্গ দেখতে যাই। দূর্গটি সিনদের অর্থাৎ আর্মেনিয়ান বিধর্মীদের দেশের প্রবেশপথে অবস্থিত। তাছাড়া কয়েকটি প্রাসাদ এবং আরও কয়েকটি দূর্গে প্রবেশের একই পথ। এখানকার কয়েকটি দূর্গ ইসমাইলিটায় (Ismailites) ফিদায়ী সম্প্রদায়ের[৪৯] লোকদের অধিকারে। উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছাড়া কাহারও এসব দূর্গে প্রবেশের অধিকার নেই। তারা সুলতানের তীর স্বরূপ। তাদের সাহায্যেই সুলতান তাঁর শত্রুদের আক্রমণ করেন। শত্রুরা তখন ইরাক ও অন্যান্য দেশে গিয়ে প্রাণরক্ষা করে। সুলতানের এসব লোক নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে থাকে। কিন্তু সুলতান যখন তাদের কাউকে কোন শত্রু নিপাত করতে পাঠান তবে তাকে জীবনের মূল্য স্বরূপ অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে থাকেন। কাজ সমাধা করে ফিরে এলে লোকটি সে অর্থ নিজেই গ্রহণ করে কিন্তু লোকটি মারা গেলে সে অর্থ দেওয়া হয় তার পুত্রদের। তাদের কাছে বিষাক্ত ছোরা থাকে এবং তাই দিয়েই তারা শত্রুদের আক্রমণ করে। অনেক সময় তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং নিজেরাই মৃত্যুর কবলে পড়ে।

ফিদায়ীদের দূর্গ থেকে আমি জাবালা শহরে গেলাম। জাবালা সমুদ্র পার থেকে এক মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত শহর। এ শহরে প্রসিদ্ধ তাপস ইব্রাহিম-ইব্‌ন-আদ্‌-হাম-এর কবর আছে। তিনি রাজ্য ত্যাগ করে নিজকে খোদার নামে উৎসর্গ করেছিলেন।[৫০] এখানে যারা আসে তাদের সবাই কবর রক্ষককে অন্ততঃ একটি করে মোমবাতি দিয়ে যায়। তার ফলে বহু মন মোমবাতি এখানে মৌজুদ থাকে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এ জেলার অধিকাংশ বাসিন্দা সুনারি (Nusayris) সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা হজরত আলীকে খোদা

বলে বিশ্বাস করে[৫১]। তারা নামাজ পড়ে না, অজু গোসল করে না এবং রোজাও রাখে না। আল-মালিক আজ-জাহির এখানকার বাসিন্দাদের নিজ গ্রামে মস্‌জিদ তৈরী করতে বাধ্য করেছিলেন। তখন তারা বাসগৃহের থেকে অনেক দূরে একটি করে মসজিদ তৈরি করে রাখে। কিন্তু তারা সে মসজিদে কখনও প্রবেশ করে না বা মেরামত করে না। অনেক সময় সে সব মসজিদ তাদের গরু ও গাধার আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহৃত হয়। সময়-সময় বিদেশী লোকরা সেসব মসজিদে আশ্রয় লয়। তখন তারা আজান দিতে লাগলে স্থানীয় লোকেরা বিদ্রূপ করে বলে "গাধার মত চীৎকার করো না, তোমার জন্য খড়বিচালী আসছে।" এ শ্রেণীর অনেক লোকের বাস এখানে।

এখানকার লোকদের ভেতর প্রচলিত একটি কাহিনী আছে। একবার একজন অপরিচিত লোক এসে নিজকে এদের কাছে মেহেদী বলে পরিচয় দিল। এ-কথা শুনে তারা এসে লোকটিকে ঘিরে ধরল। সে তখন দেশের মালিক হিসেবে সারা সিরিয়া তাদের ভেতর ভাগ করে দিল এবং প্রত্যেকটি শহরের জন্য তাদের এক-এক জনকে নিযুক্ত করল। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে জলপাই গাছের পাতা দিয়ে বলে দিল,"এটা তোমার নিযুক্তির প্রতীক।" এই বলে এক-এক শহরে তাদের এক-এক জনকে পাঠিয়ে দিল।

অতঃপর এদের কেউ কোন শহরে গিয়ে হাজির হলেই সেখানকার শাসনকর্তা তাকে ডেকে পাঠাতেন। লোকটি তখন হাজির হয়েই বলত, "ইমাম-আল-মেহেদী আমাকে এ শহর দিয়েছেন।" শাসনকর্তা জিজ্ঞেস করতেন, "তোমার সনদ্‌ কোথায় ?" সে তখন জলপাই গাছের পাতাটি বের করে দেখাত। শাসনকর্তা তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতে হুকুম দিতেন। তখন সেই তথাকথিত মেহেদী তাদের যুদ্ধ করতে বলল— মুসলমানদের সঙ্গে এবং জাবালাতেই প্রথম শুরু হবে সে যুদ্ধ। তরবারীর পরিবর্তে তিনি তাদের প্রত্যেককে মেদী গাছের ডালা নিয়ে যুদ্ধ করতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, এ ডালাই তাদের হাতে যুদ্ধের সময় তরবারী হবে। এক শুক্রবার যখন মুসলমানরা মসজিদে নামাজে রত ছিল তখন সহসা তারা জাবলায় মুসলমানদের গৃহে হামলা করল এবং মেয়েলোকদের অবমাননা করল। মুসলমানরা এ খবর পেয়ে দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত্রধারণ করল এবং যথেচ্ছভাবে তাদের হত্যা করতে লাগল। লাঠিকিয়ায় এ সংবাদ পৌঁছলে শাসনকর্তা তাঁর সৈন্য নিয়ে এসে হাজির হলেন। এদিকে সংবাদবাহী কবুতরের সাহায্যে ত্রিপলীতে সংবাদ পাঠালে প্রধান সেনানায়ক ও একদল সৈন্য নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। বিশ হাজার বিধর্মী নুসারীকে এভাবে হত্যা করা হল। বাকি সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রধান সেনানায়ককে বলে পাঠায় যে তাদের প্রাণে বাঁচালে তারা মাথা পিছু এক দিনার প্রধান সেনানায়ককে নজরানা দিবে। কবুতরের সাহায্যে তাদের এ-শর্ত পুনরায় সুলতানের কাছে পাঠান হল। সুলতান তাদের কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। তখন প্রধান সেনানায়ক সুলতানকে বুঝিয়ে দিলেন এসব লোক মুসলমানদের জমিজমা চাষাবাদ করত। এদের সবংশে হত্যা করা হলে পরে মুসলমানদের বহু অসুবিধা হবে। এর ফলে লোকগুলির জীবন রক্ষা পেল।

অতঃপর আমি লাঠিকিয়া (Latakia) শহরে গেলাম। শহরের বাইরে খ্রীস্টানদের একটি মঠ আছে। মঠটি দার-আল-ফাস্ নামে পরিচিত। সিরিয়া এবং মিসরের মধ্যে এটিই বড় মঠ। খ্রীস্টান সাধুরা এখানে বাস করে এবং বিভিন্ন দেশের খ্রীস্টানরা এখানে তীর্থ করতে আসে। খ্রীস্টান বা মুসলমান যারাই এখানে আসে তাদেরই খাবার দেওয়া হয়। খাবার হ'ল রুটী, পনির, জলপাই এবং সিরকা। লাঠিকিয়ার পোতাশ্রয়টি দু'টি টাওয়ার বা স্তম্ভের মধ্যে শিকল বেঁধে বন্ধ করে রাখা হয়। শিকলটি নিচু করে না দেওয়া পর্যন্ত কোন জাহাজ যেতে বা আসতে পারে না। এটি সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয়। এখান থেকে আমি যাই আল-মারফাব (Beluedere) দুর্গে। কারাকের দুর্গের মত এটিও একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। একটি উঁচু পাহাড়ের উপর দুর্গটি নির্মিত হয়েছে। বিদেশী মুসাফেররা এলে এর উপকণ্ঠে আশ্রয় পায়, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পায় না। আল-মালিক আল-মনসুর কালাউন এ দুর্গটি খ্রীস্টানদের নিকট থেকে অধিকার করেন। এ দুর্গের নিকটেই তাঁর পুত্র, মিসরের বর্তমান সুলতান আল-মালিক আন্-নাসিরের জন্ম হয়। এখান থেকে আমি আল-আকরা পর্বত দেখতে পাই। আল-আক্‌রা সিরিয়ার সর্বোচ্চ পর্বত। সমুদ্র থেকে দেশের যে অংশটি দৃষ্টিগোচর হয় সে অংশেও এত বড় পর্বত আর নেই। পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীরা তুর্কীমেন। এখানে ঝরণা এবং নহর আছে।

অতঃপর আমি লুবনান (Lebanon) পর্বতে যাই। পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর পর্বতশ্রেণী এই লুবনান। এখানে সবরকম ফলমূল জন্মে এবং অনেক ঝরণা ও লতাকুঞ্জ আছে। এখানে সব সময়েই বহুসংখ্যক ধর্মনিষ্ঠ লোক যাতায়াত করে এবং এজন্যই স্থানটি প্রসিদ্ধ।

এখান থেকে আমি বা-আল্‌বেক শহরে এলাম। বা-আলবেক দামাস্কের মতই সুখ-সুবিধাযুক্ত একটি পুরাতন শহর। এখানকার মত এত প্রচুর চেরী কোন জেলায়ই জন্মে না। এখানে বহুরকম মিষ্টি তৈরি হয়। তা'ছাড়া এখানকার বস্ত্র, কাঠের পাত্র ও চামচ সর্বোৎকৃষ্ট। এখানকার কারিগরেরা এক রকম থালা তৈরি করে একটির ভেতর আরেকটি করে দশটি অবধি এভাবে সাজিয়ে রাখে যে, দেখলে একখানা থালা বলেই মনে হয়। চামচও তারা এমনি করেই তৈরি করে এবং চামড়ার থলেতে রেখে দেয়। একজন লোক তার কোমরবন্দের মধ্যেই এগুলো রাখতে পারে। পরে প্রয়োজন মত বের করলে দেখা যাবে একটি চামচ কিন্তু সে তখন তার অপর নয় জন বন্ধুকেও নয় খানা চামচ দিতে পারবে। দ্রুত হেঁটে গেলে বা-আলবাক থেকে দামেস্ক একদিনের পথ। বা-আলবাক ছেড়ে কাফেলা আজ-জাবদানী নামক ছোট্ট একটি গ্রামে গিয়ে রাত্রি যাপন করে এবং পরের দিন ভোরে দামেস্কে পৌঁছে। দামেস্কে যাওয়ার জন্য আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম বলে বিকেল বেলা বা-আলবাক পৌঁছে পরের দিন ভোরেই পথে বেরিয়ে পড়ি।

মঙ্গলবার ৯ই রমজান, ৭২৬ হিজরী (৯ই আগস্ট, ১৩২৬ খ্রীঃ) আমি দামেস্কে প্রবেশ করলাম এবং আশ শারাবিসিয়া বিদ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। সৌন্দর্যে দামেস্ক শহর অন্যান্য সমস্ত শহরের শীর্ষস্থানে। এ শহরের শোভা-সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত।

ইবনে জুবাইর[৫২] এ শহরের যেভাবে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে ভাল বর্ণনা আর হতে পারে না। এখানকার উমাইয়া মসজিদ নামে পরিচিত গীর্জা মসজিদটি জগতে অতুলনীয়। গঠন-পারিপাট্যে ও বহি সৌন্দর্যে মসজিদটি সর্বোৎকৃষ্ট এবং অদ্বিতীয়। খলিফা প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫) এ মসজিদ স্থাপন করেন। মসজিদ প্রস্তুতের জন্য তিনি কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের কাছে কারিগর চেয়ে পাঠান। সম্রাট এ কাজের জন্য বার হাজার দক্ষ কারিগর দামেস্কে পাঠান। মসজিদ যেখানে স্থাপিত আছে পূর্বে সেখানে একটি গীর্জা ছিল। মুসলমানরা যখন দামেস্ক অধিকার করে তখন একজন সেনানায়ক তরবারী হস্তে গীর্জার একদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে মধ্যদেশ অবধি পৌঁছে। কাজেই গীর্জার যে অর্ধাংশ মুসলমানরা বলপ্রয়োগে দখল করে সে অর্ধাংশ মসজিদে পরিণত করে এবং বাকি যে অংশে তারা শান্তিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে সে অংশ গীর্জাই থেকে যায়। অতঃপর ওয়ালিদ সমগ্র গীর্জা ব্যাপিয়া মসজিদটি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যে কোন মূল্যে গীর্জাটি ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গ্রীকগণ তাহাতে সম্মত হয় না। তখন খলিফা গীর্জাটি অবরোধ করতে বাধ্য হন। খ্রীস্টানগণ তখন বলতে থাকে যে, এ গীর্জা যে নষ্ট করবে সে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হবে। এ কথা ওয়ালিদের কানে গেলে তিনি বললেন, 'আল্লাহর খেদমত করতে আমিই প্রথম উন্মাদ হতে চাই।' এই বলে তিনি কুঠার হস্তে নিজে গীর্জাটি ভাঙ্গতে আরম্ভ করেন। তখন অন্য মুসলমানরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং খ্রীস্টানদের ধারণা যে অলীক তা প্রমাণ করে।[৫৩]

এ মসজিদের চারটি প্রবেশদ্বার। দক্ষিণ দ্বারটি 'বৃদ্ধির দ্বার' নামে খ্যাত। দরজার সামনেই প্রশস্ত একটি পথ আছে। সেখানে পুরাতন জিনিস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকানপাট আছে। এ পথেই পূর্বেকার অশ্বারোহী সৈন্যদের বাসস্থানে যেতে হতো। এখান থেকে বেরিয়েই তাম্রনির্মিত জিনিসপত্রের কারিগর বা কাঁসারীদের বাজার। মসজিদের দক্ষিণ দিক অবধি প্রসারিত এ বাজারটি দামেস্কের অন্যতম সুন্দর বাজার। মা'বিয়া[৫৪] খলিফার আল-খাদ্‌রা (সবুজ প্রাসাদ) নামক প্রাসাদের স্থানে বাজারটি স্থাপিত হয়েছে। আব্বাসিকগণ প্রাসাদ ধ্বংস করে এখানে বাজার স্থাপন করে। মসজিদের পূর্বদিকের সুবৃহৎ দরজাটি 'জেরুন দরজা' নামে পরিচিত। এখান থেকে একটি প্রশস্ত রাস্তা স্তম্ভশ্রেণীর ভেতর দিয়ে ছয়টি সুউচ্চ স্তম্ভের মধ্যস্থ প্রবেশদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। রাস্তাটির উভয় পার্শ্বস্থ স্তম্ভের উপরে গোলাকৃতি বারান্দা বা গ্যালারী। এসব বারান্দায় বস্ত্র বিক্রেতা এবং অন্যান্যদের দোকান। তার উপরে লম্বা বারান্দায় রয়েছে স্বর্ণকার, পুস্তক বিক্রেতাদের দোকান এবং সুদৃশ্য কাচের জিনিসের দোকান। প্রথম দরজা সংলগ্ন চত্বরে দলিলপত্রাদি সম্পাদনকারী কর্মচারীদের কার্যালয়। প্রত্যেক কার্যালয়ে পাঁচ ছয় জন করে সাক্ষী মোতায়েন রয়েছে আর রয়েছে বিবাহাদি অনুষ্ঠানের জন্য কাজীর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্মচারী। দলিলপত্র সম্পাদনের কার্যালয় শহরের অন্যান্য জায়গায়ও আছে। এসব দোকানের কাছেই মনোহারী বাজার। সেখানে কাগজ, কলম, কালি বিক্রয় হয়। পথের মধ্যস্থলে মার্বেল পাথরের গোলাকার একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চা আবেষ্টন করে রয়েছে মার্বেল পাথরের উপর স্থাপিত

ছাদবিহীন চত্বর। চৌবাচ্চাটির মধ্যস্থলে একটি তামার নল। নলটির মুখ দিয়ে সজোরে পানি নির্গত হয়ে মানুষ সমান উচুঁতে উঠে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা একে Waterspoul বলে। দৃশ্যটি সত্যই মনোরম।

'জেরুন দরজা'টির অপর নাম 'ঘন্টার দরজা'। জেরুন দরজা অতিক্রম করলেই ডানদিকে উপরে প্রকাণ্ড খিলানের আকারে নির্মিত গ্যালারী বা বারান্দা। বৃহদাকার খিলানটার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাকার অনাবৃত খিলান। এক দিনে যত ঘন্টা ক্ষুদ্রাকার খিলানের সংখ্যা ঠিক ততটি। এসব খিলানের একটি করে দরজা। দরজার ভিতর দিক সবুজ এবং বাইরের দিক হলুদে রঙ্গে রঞ্জিত। দিনের একটি ঘন্টা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি খিলানের দরজার ভিতরের সবুজ দিক ঘুরিয়ে বাইরের দিক করে দেওয়া হয়, তখন হলদে দিকটি যায় ভিতর দিকে। লোকে বলে, বারান্দায় একজন লোক থাকে। ঘন্টা শেষ হ'লে সে হাত দিয়ে দরজা[৫৫] ঘুরিয়ে দেয়।

পশ্চিম দিকের দরজাটি Door of the Post (থামের দরজা) নামে পরিচিত। এ দরজার বাইরের পথে রয়েছে মোমবাতি প্রস্তুতকারক ও ফল বিক্রেতাদের দোকান। উত্তরের দরজাটি 'মিঠাইওয়ালাদের দরজা' নামে পরিচিত। এ দরজার বাইরেও রয়েছে একটি প্রশস্ত রাস্তা, তার ডাইনে পানির বৃহৎ চৌবাচ্চা ও চলমান পানিসহ শৌচাগারযুক্ত খানকাহ্, মসজিদের চারটি দরজার প্রত্যেকটিতেই একটি দালানে ওজুর ব্যবস্থা ও দালানে চলমান পানি সরবরাহের ব্যবস্থাযুক্ত প্রায় একশত কুটরী আছে।

সে সময়ে তকি উদ্দিন ইব্নে তায়মিয়া নামে দামেস্কে একজন হাম্বলী ধর্মশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু মাথায় ছিল সামান্য ছিট্। দামেস্কের লোকেরা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি ধর্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। একবার তাঁর কোন বক্তব্যের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রবিদরা একমত হতে পারলেন না। বিষয়টি সুলতানের গোচরীভূত করলে তিনি ইবনে তায়মিয়াকে কয়েক বছরের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখেন। কারারুদ্ধাবস্থায় তিনি কোরআনের তফসির লেখেন এবং চল্লিশ খণ্ডে সমাপ্ত সেই তফসিরের নাম রাখেন 'সমুদ্র'। অতঃপর ইবনে তায়মিয়ার মাতা সুলতানের সঙ্গে দেখা করে তায়মিয়ার মুক্তিকামনা করেন। ইবনে তায়মিয়া পুনরায় অনুরূপ অপরাধ না করা পর্যন্ত মুক্তই ছিলেন। এক শুক্রবার তায়মিয়া যখন মিম্বার থেকে খোত্বা পড়ে মুছাল্লিদের শোনাচ্ছিলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। খোত্বার মধ্যে তিনি বললেন, "আমি যে ভাবে অবতরণ করছি ঠিক সেই ভাবে খোদাও আমাদের মাথার উপরের আকাশে অবতরণ করেন।" বলেই তিনি মিম্বার থেকে এক ধাপ নিচে নেমে এলেন। একজন মালেকী সম্প্রদায়ের শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর প্রতিবাদ করলেন এবং তাঁর কথায় ঘোর আপত্তি উত্থাপন [৫৬] করলেন। উপস্থিত সাধারণ শ্রোতারা শেষোক্ত ব্যক্তির উপর ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে যথেচ্ছভাবে প্রহার করতে লাগল। প্রহারের সময় তাঁর মাথার পাগড়ীটি পড়ে যায়। পাগড়ীর তলায় লোকটির মাথায় ছিল একটি রেশমি টুপি। রেশম ব্যবহারের জন্য [৫৭] তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গেল হাম্বলীদের কাজীর কাছে। কাজী লোকটিকে কারাগারে বন্দী করে প্রহারের হুকুম

দিলেন। এ ব্যবহারের প্রতিবাদ করলেন অপরাপর শাস্ত্রবিদগণ। তাঁরা বিষয়টি প্রধান আমীরের গোচরীভূত করলেন। তিনি সমুদয় লিখে পাঠালেন সুলতানের কাছে। অধিকন্তু তায়মিয়া বিভিন্ন সময়ে যে সব আপত্তিকর উক্তি করেছেন তারও একটি ফিরিস্তি সুলতানের নিকট দাখিল করলেন। সুলতান তায়মিয়াকে দূর্গে বন্দী রাখবার হুকুম দিলেন। তায়মিয়া আমরণ সে দূর্গে বন্দী ছিলেন।[৫৮]

দামেস্কের আর একটি পবিত্র স্থান পদচিহ্ন মসজিদ (আল্-আকদাম)। শহর থেকে দু'মাইল দক্ষিণে হেজাজ, জেরুজালেম ও মিসর যাবার পথে এ মসজিদটি স্থাপিত। দামেস্কবাসীরা সুবৃহৎ এ মসজিদটিকে বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখে। একখণ্ড পাথরের উপর অঙ্কিত যে পদচিহ্নের জন্য মসজিদের নামকরণ হয়েছে সেগুলি হরজত মূসার পদচিহ্ন বলে কথিত। এ মসজিদের ক্ষুদ্র একটি কক্ষে এক খণ্ড পাথরের খোদিত আছে—"কোন একজন ধার্মিক লোক একরাত্রে হজরত রসূলুল্লাকে স্বপ্নে দেখেন। তখন রসূলুল্লাহ বলেন, 'এখানে আমার-ভাই মুসার কবর আছে।' এ মসজিদটিকে দামেস্কবাসীরা সত্যই কি রকম শ্রদ্ধার চোখে দেখে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম ১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষাশেষি দামেস্ক হয়ে ফিরবার পথে। দামেস্কের তৎকালীন শাসনকর্তা আরগুন শাহ্ ঢোল শহরৎ যোগে রাষ্ট্র করে দিলেন, দামেস্কের সবাইকে তিনদিন রোজা রাখতে হবে এবং উক্ত তিন দিন বাজারে কেউ কোন রকম খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে পারবে না।[৫৯] কারণ সেখানকার অধিকাংশ লোকই বাজারে তৈরি খাদ্য ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করে না।[৬০] শাসনকর্তার হুকুম মত সবাই একাদিক্রমে তিন দিন রোজা রাখল। শেষের দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন দামেস্কের আমীর, শরিফ, কাজী, মোল্লা থেকে শুরু করে সাধারণ লোক অবধি নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রধান মসজিদে গিয়ে হাজির হল। সেখানে সারারাত তারা খোদার এবাদত বন্দেগীতে কাটাল। পরের দিন সেখানে ফজরের নামাজ সেরে পুনরায় তারা মিছিল করে রওয়ানা হল পদচিহ্নের মসজিদের দিকে। এ মিছিলে খালি পায়ে আমীর ওমরাহ্ সবাই এসে যোগদান করল। মুসলমানগণ চলল কোরআন হাতে, খ্রীস্টানগণ বাইবেল হাতে এবং য়িহুদীগণ তাদের কেতাব হাতে। সবারই সঙ্গে পরিবারের নারী ও শিশুরা রয়েছে। সবাই কেঁদে কেঁদে স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থের ও পয়গম্বরের দোহাই দিয়ে খোদার করুণা ভিক্ষা করতে লাগল। এমনি করে প্রায় দ্বিপ্রহর অবধি তারা সেখানে কাটাল। অতঃপর তারা শহরে ফিরে এসে শুক্রবারের জুমা নামাজ আদায় করল। এর ফলে খোদা তাদের দুঃখের লাঘব করেছিলেন। দামেস্ক শহরে একদিনে মৃত্যুসংখ্যা কখনও দু'হাজারের উপরে উঠত না, অথচ কায়রো ও পুরাতন কায়রো শহরে দৈনিক মৃত্যুসংখ্যা চব্বিশ হাজারে উঠত।

দামেস্ক শহরে ধর্মের নামে দান-খয়রাতের পরিমাণ ও প্রকার মানুষের ধারণার অতীত। অক্ষম হজযাত্রীদের অর্থসাহায্য, বদলা হজের জন্য সাহায্য, কন্যার বিবাহের দান দেহাজ দেবার জন্য দরিদ্র পিতা-মাতাকে সাহায্য, গোলাম আজাদ করার উদ্দেশ্যে সাহায্য, মুসাফেরদের আহার, বাসস্থান ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সাহায্য। এসব

ছাড়াও আছে রাস্তাঘাটের উন্নতি বিধান ও রাস্তাঘাট পাকা করার সাহায্য। কারণ, দামেস্কের সকল রাস্তারই দুপার পাকা। পথচারীরা সেখান দিয়া যাতায়াত করে, মধ্যের অংশ ব্যবহার করে অশ্বারোহীরা। এসব ছাড়াও আছে অন্যান্য দাতব্য ব্যাপার। একদিন দামেস্কের এক গলিপথে যেতে যেতে আমি দেখতে পেলাম, একটি ছোট গোলাম একটি চীনা মাটির বাসন হাত থেকে ফেলে ভেঙ্গে ফেলেছে। তাই দেখে কয়েকজন লোক তাকে ঘিরে ধরেছে। তাদের একজন লোক ছেলেটিকে বলল, "বাসনের টুকরাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তৈজসপত্রের দানের যিনি জিম্মাদার তাঁর কাছে যাও।" ছেলেটি তাই করল। পরে ঐ লোকটি তাকে নিয়ে জিম্মাদারের কাছে গেলে ভাঙ্গা পাত্রের টুকরাগুলি পরীক্ষা করে তিনি ছেলেটিকে টাকা দিয়ে দিলেন। কারণ, এরকম ব্যবস্থা না থাকলে ছেলেটিকে মনিবের প্রহার অথবা গালাগাল নিশ্চয়ই সহ্য করতে হত। তাছাড়া এ ঘটনার জন্য ছেলেটিও মনমরা হয়ে যেত। এ রকম দান মানুষের অন্তরের ক্ষত আরোগ্য করে। ভাল কাজের জন্য যাঁরা দান করেন খোদা তাঁদের পুরস্কৃত করুন।

মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, সমাধিস্তম্ভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কার্যে দামেস্কবাসীরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। উত্তর আফ্রিকাবাসীদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুব উচ্চ। বিনাদ্বিধায় তারা তাদের অর্থ ও স্ত্রীপুত্রের ভার উত্তর আফ্রিকার লোকদের উপর ছেড়ে দেয়। বিদেশীদের প্রতিও তারা খুব ভাল ব্যবহার করে। সম্মানের হানিজনক কোন কাজ যাতে বিদেশীদের না করতে হয় সেদিকে এরা সর্বদাই নজর রাখে। আমি দামেস্কে আসার পর মালিকী সম্প্রদায়ভুক্ত অধ্যাপক নূর উদ্দিন শাখায়ীর সঙ্গে আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়। রমজানের মাসে তিনি আমাকে তাঁর গৃহে এফতার করার নিমন্ত্রণ করেন। চারদিন তাঁর গৃহে এফতার করার পর আমি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পঞ্চম দিনে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হই। তিনি আমার সংবাদ নিতে পাঠান। অসুখের কথা বলে পাঠালে তিনি তা মেনে নিতে নারাজ হন। কাজেই আমাকে পুনরায় সেখানে যেতে হয় এবং তাঁর গৃহে রাত্রি যাপন করতে হয়। পরের দিন ভোরে আমি বিদায় নিতে চাইলে তাতেও অসম্মতি জানিয়ে তিনি বললেন, "আমার বাড়িটাকে আপনার নিজের ভাইয়ের বা পিতার বাড়ী বলে মনে করে নিন।" এই বলে তৎক্ষণাৎ তিনি একজন ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। হুকুম দিলেন ডাক্তার যে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করবেন তার সবই আমার জন্য তৈরি হবে তাঁর বাড়িতে। এভাবে রোজা শেষ হওয়া অবধি আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হ'ল। সেখানে ঈদের উৎসব উদ্‌যাপনের পরে খোদা আমাকে নিরাময় করলেন। ইত্যবসরে আমার ব্যয়নির্বাহের জন্য যে অর্থ ছিল তা সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। নুরউদ্দিন তা জানতে পেরে আমাকে উটভাড়া করে দিলেন এবং প্রয়োজনীয় আরও সবকিছু দিয়ে কিছু অর্থও দিলেন। দিয়ে বললেন, "পথে কোন রকম বিপদ-আপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে।" খোদা যেন তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

জানাজার শোকযাত্রার সময় দামেস্কবাসীরা অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে নিয়ম পালন করে। সুললিত কণ্ঠে তারা কোরআন আবৃত্তি করতে করতে লাশের খাটের পুরোভাগে থেকে অগ্রসর হয় এবং গীর্জা ও মসজিদে গিয়ে জানাজা আদায় করে। জানাজা শেষ

হলে মোয়াজ্জিন উঠে বলেন, "অমুক জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।" এই বলে মৃতকে গুণবাচক বিশেষণে ভূষিত করে প্রার্থনা সমাপন করার পরে কবরে সমাহিত করে।

ভারতে এর চেয়েও প্রশংসনীয়ভাবে মৃতকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর তৃতীয় দিবস ভোরে তারা গোরস্থানে জমায়েত হয়। সেখানে সুদৃশ্য কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয় এবং কবরের উপরেও দেওয়া হয় কাপড়ের আচ্ছাদন। কবর আবৃত করা হয় গোলাপ ও নানা রকম সুগন্ধি ফুলে। কারণ, ফুল সেখানে বারমাসেই পাওয়া যায়। তারা লেবুগাছ বা ঐ জাতীয় গাছ নিয়ে আসে এবং তখন গাছে ফল না থাকলে ফল এনে গাছে বেঁধে দেয়। শোকযাত্রীদের ছায়া দেবার জন্য মাথার উপরে থাকে চাঁদোয়া। কাজী, আমীর ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিরা এসে আসন গ্রহণ করেন। কোরআন পাঠের পর কাজী উঠে মৃতের কথা বলে, তার মৃত্যুতে শোকপূর্ণ গাথায় তার জন্য শোক প্রকাশ করে সর্বশেষ মৃতের আত্মীয়দের সান্ত্বনা দিয়ে ও সুলতানের জন্য প্রার্থনা করে কর্তব্য সম্পাদন করে। যখন সুলতানের নামোচ্চারণ করা হয় তখন শ্রোতারা সবাই উঠে সুলতানের বাসস্থানের দিকে মাথা নোয়ায়। অতপর কাজী আসন গ্রহণ করলে কাজীর থেকে শুরু করে সবাইকে গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর শরবত এনে প্রথমে কাজীকে এবং পরে সবাইকে বিতরণ করা হয়। সর্বশেষে দেওয়া হয় পান। পানকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ মেহমানদের পান দেওয়া হয়। সুলতানের নিকট হতে অর্থ বা পোশাক-পরিচ্ছদের চেয়ে এনাম স্বরূপ পান পাওয়া অধিকতর সম্মানজনক। কোন ব্যক্তি এন্তেকাল করলে এ দিনের অনুষ্ঠান হবার পূর্বে তার পরিবারের কেউ পান খায় না। অনুষ্ঠানের পরে কাজী কয়েকটি পানপত্র গ্রহণ করে মৃতের ওয়ারীশদের হাতে দেন। অতঃপর শোকযাত্রীরা স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যায়।

সে-বছরই শাওয়াল মাসের চন্দ্রোদয় হলে (১লা সেপ্টেম্বর ১৩২৬) হেজাজযাত্রী একটি কাফেলা দামেস্ক ত্যাগ করে। আমিও তাদের সঙ্গে যাত্রা করি [৬১]। বসরায় পৌঁছে কাফেলা সাধারণতঃ চার দিন অপেক্ষা করে। কোন জরুরী প্রয়োজনে কাফেলার কেউ দামেস্কে থাকলে এ সময়ের ভেতর বসরায় এসে দলে ভিড়তে পারে। এখান থেকে তারা যায় জিজ্ঞার জলাশয়ে। সেখানে একদিন কাটিয়ে আল-লাজ্জুন হয়ে কারাক দূর্গে যায়। কারাক দূর্গকে The castle of the Raven বলা হয়। এটি অতি বিস্ময়কর ও দুর্ভেদ্য ছোট দূর্গগুলির একটি। চতুর্দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত এ দূর্গের প্রবেশ পথ একটি মাত্র। তাও ক্ষুদ্র পাহাড়ে সমাচ্ছন্ন। বিপদের সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে সুলতানরা এ দূর্গটি ব্যবহার করে থাকেন। সালার সর্বময় ক্ষমতা দখল করলে সুলতান আন-নাসির এ দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারাকের বাইরে আথ্-থানিয়া নামক স্থানে কাফেলা চারদিন অবস্থান করে এবং মরুপথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা সিরিয়ার শেষ শহর মা-আন্ পৌঁছি। পরে আকাবাত-আস সাওয়ান হয়ে মরুভূমিতে প্রবেশ করি। এ মরুভূমি সম্বন্ধে কথিত হয় ঃ "যে এখানে প্রবেশ করে সে হারিয়ে যায়, যে মরুভূমি থেকে বেরিয়ে আসে সে নবজন্ম লাভ করে।" দু'দিন পথ চলার পর আমরা

দাহ্ত হজ এসে পৌঁছলাম। এখানে অন্তঃসলিলা জলাশয় আছে কিন্তু মানুষের বসতি নেই।[৬২] সেখান থেকে এলাম ওয়াদিবল্দা। (এখানে পানি নেই)। তারপরে এলাম তাবুক। আমাদের পয়গম্বর (সাঃ) একবার তাবুক অভিযান করেন। সিরিয়ার হজযাত্রীদের ভেতর একটি রীতি প্রচলিত আছে। তাবুকের শিবিরে পৌঁছে তারা নিজ নিজ অস্ত্র বের করে এবং মুক্ত তরবারী দিয়ে হাতের তালুতে আঘাত করতে করতে বলতে থাকে, "আমাদের রসুলুল্লাহ্ এভাবে এখানে প্রবেশ করেছেন ঃ"

তাবুকে পৌঁছে কাফেলা চারদিন বিশ্রাম করে। এ সময়ে তারা তাবুক ও আল-উলার মধ্যবর্তী ভয়াবহ মরুপথের জন্য উটের ও নিজেদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে নেয়। পানি সরবরাহকারী ভিস্তিরা ঝরণার কাছে বাস করে। মহিষের চামড়ায় তৈরি আধারে তারা পানি সরবরাহ করে এবং চামড়ার পানিপাত্র বোঝাই করে দেয়। আমীর ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের নিজস্ব পানির আধার আছে। অপর ব্যক্তিরা নিজেদের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মূল্যে পানি ক্রয় করে নেয়।

এ মরুপথটির ভয়ে তাবুক ত্যাগের পর কাফেলা রাতদিন দ্রুত চলতে থাকে। অর্ধপথ অতিক্রমের পর আল-উখায়দির উপত্যকায় পৌঁছা যায়। একে দোজখের উপত্যকা বলা চলে (আল্লাহ্ এর থেকে আমাদের রক্ষা করুন [৬৩])। এক বছর সাইমুমের কবলে তীর্থযাত্রীরা এখানে ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন হয়। পানি শুকিয়ে যায় এবং একবারমাত্র পানের উপযোগী পানির মূল্য হাজার দিনারে পৌঁছে। কিন্তু অতঃপর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই ধ্বংসের কবলে পতিত হয়। এ উপত্যকায় একটি প্রস্তরখণ্ডে তাদের কাহিনী খোদিত আছে।

তাবুক থেকে যাত্রার পাঁচদিন পরে কাফেলা আল-হিজর কূপের কাছে পৌঁছে। আল-হিজর কূপে প্রচুর পানি আছে কিন্তু কেউ তা তুলে ব্যবহার করে না। তাবুক অভিযানের সময় পয়গম্বর (সাঃ) এখান দিয়া গমন করেন এবং এ কূপের পানি পান করতে সঙ্গীদের বারণ করে দেন।[৬৪]

আল্-হিজর থেকে [৬৫] অর্ধদিন বা তার চেয়ে কম সময় চলার পরে আল্-উলা পৌঁছা যায়। আল-উলা নামক মনোরম ও বৃহৎ এ গ্রামটিতে খেজুর বাগান ও পানির ঝরণা আছে। নিজেদের পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌতকরণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সংগ্রহের জন্য যাত্রীরা এখানে চার দিন অপেক্ষা করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য বা অপর কিছু সঙ্গে থাকলে যাত্রীরা তা এখানে রেখে যায়। এ গ্রামের বাসিন্দারা সবাই বিশ্বস্ত। সিরিয়ার খ্রীস্টান ব্যবসায়ীগণ এ স্থান অবধি আসতে পারে এবং এর বেশী অগ্রসর হতে পারে না। তারা যাত্রীদের কাছে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। আল্-উলা ত্যাগের তৃতীয় দিনে কাফেলা মদিনা শরিফের উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হয়।

সেই দিন বিকালেই আমরা পবিত্রস্থানে বিখ্যাত মসজিদে হাজির হলাম। শান্তির দরজায় আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে হজরতের (সাঃ) রওজা মোবারক ও পবিত্র মিম্বারের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ 'বাগানে' প্রার্থনা করলাম। অতঃপর হজরত (সাঃ) যে খেজুর গাছটির পাশে দাঁড়িয়ে খোতবা পাঠ করতেন তার ধ্বংসাবশেষ শ্রদ্ধাভরে স্পর্শ করলাম।

এ যাত্রায় আমরা মদিনায় চারদিন অবস্থান করলাম। চার দিনই আমরা পবিত্র মসজিদে রাত্রিযাপন করলাম। মসজিদের চত্বরে যাত্রীরা বহুসংখ্যক মোমবাতি জ্বেলে বৃত্তাকারে বসে পবিত্র কোরআন পাঠ করে, সুর করে দরুদ শরীফ পড়ে বা পবিত্র রওজা জেয়ারত করে।

অতঃপর মদিনা থেকে আমরা পবিত্র মক্কার পথে রওয়ানা হলাম। পাঁচ মাইল দূরে ধুনা-হুজায়ফা মসজিদে গিয়ে আমরা অবস্থান করলাম। এখানেই আমাদের পয়গম্বর (সাঃ) হজের বস্ত্র পরিধান করেন এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতা পালন করেন। আমিও এখানে সেলাই করা বস্ত্রাদি ত্যাগ করে গোসল করলাম। পরে হজের জন্য নির্দিষ্ট বস্ত্র পরিধান করে নামাজ আদায় করে নিজেকে হজের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। আমাদের যাত্রার চতুর্থ বিরতিস্থান হল বদর। এখানেই খোদা তাঁর প্রিয় পয়গম্বরকে সাহায্য করেন এবং নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।[৬৬] বদর একটি গ্রাম। কয়েকটি খেজুর বাগান ও ঝরণা থেকে উৎসারিত একটি নহর এখানে আছে। এখান থেকে আমাদের পথ শুরু হয় ভয়াবহ বাজওয়া উপত্যকার মধ্য দিয়ে। বাজওয়া ছেড়ে তিন দিন চলার পর রাবিখ উপত্যকা। এখানে বৃষ্টির পানি জমে একটি পুকুরের সৃষ্টি হয় এবং অনেক দিন অবধি পানি থাকে। এখানে এসে মিসরের এবং আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হজযাত্রীরা হজের বস্ত্র পরিধান করে। রাবিক ত্যাগের তিন দিন পরে আমরা খুলার জলাশয়ে পৌঁছি। সমতল ভূমিতে অবস্থিত খুলায় অনেক খেজুর বাগান আছে। আশেপাশের বেদুঈন অধিবাসীদের দ্বারা এখানে একটি বাজারের সৃষ্টি হয়েছে। বেদুঈনরা এখানে ভেড়া, ফলমূল ও মসল্লাদি বিক্রয়ের জন্য আনে। এখান থেকে উসফান হয়ে আমরা মার-ভী[৬৭] নামক উপত্যকায় পৌঁছলাম। মা'র উপত্যকাটি বেশ উর্বর। এখানে বহু খেজুর বাগান ও একটি ঝরণা থেকে উৎসারিত নহর আছে। এখান থেকে সারা এলাকায় পানি সেচনের কাজ চলে। এ উপত্যকা থেকেই মক্কার পবিত্র তীর্থে হাজির হলাম। গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার অদম্য আশায় ও আনন্দে তখন অন্তর আমাদের ভরপুর। ভোরে আমরা গিয়ে মক্কা শরীফ হাজির হলাম এবং তৎক্ষণাৎ পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করে হজের পালনীয় কর্তব্যাদি সম্পাদনে রত হলাম।[৬৮]

মক্কার বাসিন্দারা দুর্বল ও নিরীহদের প্রতি বিদেশীদের প্রতি আতিথ্য, দান, দয়া প্রভৃতি বহু সদগুণের জন্য প্রসিদ্ধ। তাদের কেউ কোন ভোজের আয়োজন করলে প্রথমেই অসহায় দরিদ্র ধর্মপ্রাণ লোকদের আহার করায়। এ সব হতভাগ্য লোকের অধিকাংশকে দেখতে পাওয়া যায় রুটীর দোকানের আশেপাশে। কেউ রুটী তৈরি করে নিয়ে যাবার সময় এরা তাকে অনুসরণ করে। সে কাউকে বঞ্চিত না করে নিজের রুটির কিছু অংশ এদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। যদি তার মাত্র একখানা রুটীও থাকে তবু সে তার অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ হাসিমুখে এদের হাতে তুলে দেয়। আরও একটি ভাল অভ্যাস এদের দেখেছি। এতিম ছেলেরা ছোট বড় দু'টি ঝাঁকা নিয়ে বাজারে বসে থাকে। শহরের লোক বাজারে এসে শস্য, গোশত বা তরিতরকারী কিনে এদের একজনকে ডেকে এক ঝাঁকায় গোশত অপর ঝাঁকায় অন্যান্য জিনিস সাজিয়ে দেয়। ছেলেটি ঠিক

ঠিক সেই জিনিসগুলি নিয়ে লোকটির গৃহে পৌছে দেয়। লোকটি নিজের কাজ সেরে গৃহে ফিরে এবং ইত্যবসরে তার আহার্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। এ-কাজে এসব এতিমের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই। এ জন্য তারা অতি সামান্য মজুরী পেয়ে থাকে।

আরবের পোশাক-পরিচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন। তারা সাধারণত শাদা বস্ত্র ব্যবহার করে যা সর্বদাই তুষারশুভ্র থাকতে দেখা যায়। আরবরা প্রচুর সুগন্ধদ্রব্য ও সুরমা এবং সর্বদা দাঁতন ব্যবহার করে। মক্কার নারীরাও অত্যন্ত সুন্দরী, ধর্মপরায়ণা ও নম্র স্বভাবা। তারাও এত সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে যে তারা একটু আতর কিনবার পয়সা বাঁচাবার জন্য সারারাত অনাহারে কাটিয়ে দেয়। ভাল জামাকাপড় পরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে তারা মসজিদে গমন করে। তখন তাদের আতরের গন্ধে সমস্ত পবিত্রস্থান মোহিত হয়ে যায়। এরা চলে যাবার পরেও সে স্থানে বহুক্ষণ সুগন্ধ থাকে।

যে সব ধর্মপ্রাণ তাপস তখন মক্কায় অবসর ধর্মজীবন যাপন করছিলেন তাঁদের ভেতর একজন ছিলেন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। কখনো তানজিরে এলে তিনি আমাদের সঙ্গে বাস করতেন। দিনের বেলা তিনি মুজাফফরিয়া কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং রাত্রিযাপন করতেন রাবি নামক স্থানে কর্মচারীদের একটি আশ্রয়স্থলে। মক্কার একটি প্রসিদ্ধ আশ্রয়স্থল রাবি। এ স্থানের নিকট এমন একটি কুয়া আছে যার পানির সঙ্গে মিষ্টতায় মক্কার অন্য কোন কুয়ার তুলনা চলে না। এখানকার অধিবাসীরা সবাই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। হেজাজের লোকেরা এ স্থানটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং নেয়াজ দেয়। তাইফের লোকেরা এখানে ফল সরবরাহ করে। সেখানে প্রচলিত রীতি অনুসারে খেজুর, আঙ্গুর, পিচ প্রভৃতি ফলের বাগানের মালিকগণ উৎপন্ন ফলের কিছু অংশ নেয়াজ স্বরূপ উটের পিঠে করে এখানে পৌছে দিয়ে যায়। তাইফ থেকে মক্কা দু'দিনের পথ। যদি কোন ব্যক্তি এখানে নেয়াজ দিতে কসুর করে তবে তার ফসলের ফলন পরের বছর কমে যায়।

একদিন মক্কার শাসনকর্তার সহিসরা তাঁর ঘোড়াগুলি নিয়া এ আশ্রয়স্থলে আসে এবং উপরোক্ত কুয়ার পানি দ্বারা ঘোড়ার শরীর ধোয়ায় ও পানি খেতে দেয়। পরে ঘোড়া গুলি আস্তাবলে নিয়া গেলে তারা পেটের ব্যথায় মাটীতে মাথা ও পা আছড়াতে থাকে। শাসনকর্তা এ সংবাদ পেয়ে নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সেই আশ্রয়স্থলে যান এবং ক্রটী স্বীকার করে সেখানকার বাসিন্দাদের এক ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন। তিনি এসে স্বহস্তে ঘোড়াগুলির পেট মলে দেবার পরে তারা যতটুকু পানি খেয়েছিল তার সবই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। অতঃপর ঘোড়াগুলি সুস্থ হয়। এর পর কোন দিনও সহিসরা ভাল উদ্দেশ্য ছাড়া উক্ত স্থানে যায়নি।

দুই

ইরাকের কাফেলার পরিচালকের সঙ্গে ১৭ই নভেম্বর আমি মক্কা ত্যাগ করি। তিনি নিজ ব্যয়ে বাগদাদ পর্যন্ত আমার জন্য একটি উটের পিঠের আসনের অর্ধাংশ ভাড়া করে দেন এবং পথে নিজে আমার দেখাশুনা করেন। বিদায়ের সময় কা'বা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার পরে আমরা মা'র এসে পৌছলাম। আমাদের সঙ্গে ইরাক, খোরাসান, ফারস ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশের এত বিপুল সংখ্যক হাজী ছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন জমিনের উপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে এমনি কালো মেঘের মত তাঁরা ছুটে চলেছিলেন। লোকের ভিড় এতই বেশী ছিল যে এক মুহূর্তের জন্য কেউ তার কাফেলা ছেড়ে কোন দিকে সরে গেলে পুনরায় তার জায়গা চিনে নিবে এমন কোন উপায় ছিল না। এ-কাফেলার সঙ্গে দরিদ্র হাজীদের মধ্যে বিতরণের জন্য উটের পিঠে পানি বোঝাই ছিল। তা'ছাড়া খয়রাতী খাদ্য ও রোগাক্রান্ত হাজীদের জন্য ঔষধপথ্যবাহী উটও সঙ্গে ছিল। কাফেলা যেখানে গিয়ে থেমেছে সেখানেই বড় বড় পিতলের কড়াইতে রান্না করা হয়েছে। দরিদ্র হাজীদের এবং যাদের সঙ্গে খাদ্যবস্তু ছিল না তাদের খাদ্য এখান থেকেই সরবরাহ করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত উটও আমাদের সঙ্গে ছিল। যারা চলতে অক্ষম তারা এসব উটে চড়ে অগ্রসর হচ্ছিল। ইরাকের সুলতান আবু সাঈদের বদানের জন্যই এসব ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছিল। এ ছাড়া কাফেলার সঙ্গে কর্মব্যস্ত বাজারও ছিল। অনেক রকম দ্রব্যসম্ভার, খাদ্য, ফলমূল প্রভৃতি সবকিছুই সেখানে পাওয়া যেত। মশাল জ্বেলে দোকানদাররা কাফেলার সঙ্গে রাত্রে চলতে থাকে। তাদের মশালের আলোকে রাতের অন্ধকারও দিনের মত আলোময় হয়ে উঠে।

আমরা খুলায় ও বদর হয়ে মদিনায় ফিরে এলাম এবং পুনরায় হজরতের (সাঃ) রওজা মোবারক জেয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করলাম। মদিনায় ছয়দিন কাটিয়ে তিন রাত্রি চলার উপযোগী পানি নিয়ে আমরা যাত্রী করলাম এবং ওয়াদিল-আরুসে পৌছে পুনরায় পানি সংগ্রহ করে নিলাম। এখানে মাটী খুঁড়ে পানের উপযোগী পানি পাওয়া যায়। ওয়াদিল-আরুস ছেড়ে আমরা নাজদ-এর দেশে প্রবেশ করলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, এটি একটানা একটি সমতলভূমি। এখানকার নির্মল সুগন্ধি বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ

করে আমরা তৃপ্ত হলাম। চার মঞ্জিল পথ চলবার পরে আমরা উসায়লা নামক একটি জায়গায় এসে থামলাম। এখানে পানি পাওয়া যায়। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে এলাম আন-নাকিরা। এখানেও পানি পাওয়া যায়। বিরাটাকার চৌবাচ্চার মত এখানে কয়েকটি পুকুরের চিহ্ন রয়েছে। তরপরে আমরা পৌছলাম আল্-ফারুরা। এখানে বৃষ্টির পানিতে ভরতি পুকুর আছে। জাফরের কন্যা জুবায়দা যে সব পুকুর খনন করান এগুলি তারই কয়েকটি। মক্কা থেকে বাগদাদ অবধি দীর্ঘ পথের প্রতিটি পুকুর, চৌবাচ্চা ও কূপ সেই মহিলার পূণ্যস্মৃতির স্তম্ভস্বরূপ। খোদা তাঁকে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। এ স্থানটি নজ্‌দের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। স্থানটি বেশ প্রশস্ত, আবহাওয়া ও মাটি উত্তম। সারা বছরই এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। আল-ফারুরা থেকে আমরা আল-হাজির পৌছলাম। এখানে পুকুর আছে কিন্তু শুকিয়ে গেছে। কাজেই পানির জন্য অস্থায়ী পুকুর খনন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সেখান থেকে আমরা সামিরা এসে হাজির হলাম। সামিরা সমতল ভূমিতে অবস্থিত একটি নীচু স্থান। স্থানটি সুরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত বলে লোকালয়পূর্ণ। এখানকার কূপে প্রচুর পানি আছে কিন্তু সে পানি লবণাক্ত। সে জলার বেদুঈনরা মেষ, মাখন ও দুধ নিয়ে সেখানে আসে হাজীদের কাছে বিক্রি করার জন্য। এসব জিনিসের পরিবর্তে একমাত্র মোটা সূতীবস্ত্র ছাড়া টাকা পয়সা বা অন্য কোন জিনিস গ্রহণ করতে কিছুতেই তারা রাজী হয় না। আমরা পুনরায় যাত্রা করে 'গর্তওয়ালা পাহাড়ে' (Hill with the Hole) পৌছলাম। মরুভূমি অঞ্চলের এ পাহাড়টির শিরোদেশে একটি ছিদ্র আছে। সেখানে বাতাস প্রবেশ করলে একপ্রকার শব্দ শুনা যায়।

অতঃপর আমরা ওয়াদিল-কুরুশে পৌছলাম। এখানে পানি পাবার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখান থেকে সারারাত্রি চলার পরে আমরা ভোরে ফায়েদ [১] দুর্গে হাজির হলাম।

সমতলভূমিতে অবস্থিত ফায়েদ একটি পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থান। এ স্থানটির উপকণ্ঠে ব্যবসায়ী শ্রেণীর আরবদের বাস। তারা হাজীদের সঙ্গে ব্যবসা করে জীবিকার্জন করে। মক্কা যাবার পথে হজযাত্রীরা তাদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর কিছু অংশ এখানে রেখে যায় এবং ফেরবার সময় তা সংগ্রহ করে নেয় [২]। মক্কা ও বাগদাদের অর্ধপথে ফায়েদ অবস্থিত। সর্বত্র পানি পাওয়া যায় এমনি একটি সহজ পথে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে কুফা যেতে বার দিন লাগে। আরব দস্যুদের ভয়ে হাজীরা এখানে সশস্ত্র অবস্থায় এসে ঢোকে। কারণ, লোভী আরব দস্যুরা এখানে একত্র হয়ে অনেক সময় কাফেলা আক্রমণের চক্রান্ত করে। এখানে এসে আমরা দেখা পেলাম আমীর মোহাম্মদ বিন ইসার দুই পুত্র আমীর ফাইয়াদ ও আমীর হাইয়ার। তাঁদের সঙ্গে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। হজযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে লক্ষ্য করলাম। আরবরা বিক্রির জন্য অনেক উট ও মেষ এনেছিল। হাজীদের ভেতর যার যা দরকার কিনে নিতে লাগল।

আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল আল-আজ্‌ফার, জারুদ এবং আরও কয়েকটি বিশ্রাম-স্থানের মধ্য দিয়ে। আমরা 'শয়তানের পথ' নামক গিরিপথে এসে পৌছলাম। রাত্রির জন্য সেখানে আস্তানা ফেলে পরের দিন আবার যাত্রা শুরু হল। সমস্ত পথের মধ্যে এ অংশটাই সবচেয়ে বন্ধুর এবং চলা কষ্টসাধ্য।

আমাদের পরবর্তী বিশ্রাম-স্থানের নাম ওয়াকিসা। এখানে একটি দুর্গ আছে, পানির পুকুরও আছে। তাছাড়া এখানে আরবদের বসতি রয়েছে। এ পথের এটিই শেষ জায়গা যেখানে পানি পাওয়া যায়। ইউক্রেটিস্ থেকে বেরিয়ে আসা নহর ছাড়া এখান থেকে কুফা পর্যন্ত পানি পাবার উল্লেখযোগ্য কোন জায়গা নেই। কুফার অনেক লোক ওয়াকিসা অবধি এগিয়ে আসে হাজীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। সঙ্গে করে আনে ময়দা, রুটী, খেজুর এবং অন্যান্য ফলমূল। এখানে এসে তারা হাজীদের সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করে পরস্পর কোলাকোলি করে।

এখান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা পৌছলাম লাওজা। এখানে প্রকাণ্ড একটি পুকুর রয়েছে। সেখান থেকে এলাম আল-মাসাজিদ (মসজিদ শব্দের বহুবচন)। এখানে পুকুর আছে তিনটি। তারপর গেলাম মানারাত আল-কারুন (Minarat of the Horns) নামক একটি মিনারের কাছে। মরু অঞ্চলে অবস্থিত এ মিনারটি যথেষ্ট উঁচু বলে বহুদূর থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়। মিনারের শীর্ষদেশ হরিণের শিং দ্বারা সজ্জিত। কিন্তু মিনারটির আশেপাশে কোন লোকালয় নেই।

অতঃপর আমরা আল-উধায়ের নামে একটি উর্বর উপত্যকায় এসে পৌছলাম। সেখান থেকে আল-কাদিসিয়ার প্রসিদ্ধ যুদ্ধের ময়দানে। এখানেই পার্শীদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধে আল্লাহ্ ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এখানে কয়েকটি খেজুর বাগান আছে এবং ইউফ্রেটিস্ [৩] থেকে একটি নহরও এ অবধি এসেছে।

সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা নজফের মাশ-হাদ আলী শহর গিয়ে পৌছলাম। ইরাকের একটি চমৎকার শহর এটি। প্রস্তরময় একটি প্রশস্ত সমতল ভূমিতে অবস্থিত এ শহরটি যেমন সুগঠিত তেমনি জনবহুল। শহরের বাজারগুলি সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আমরা (বাইরের) বাব-আল্ হাদ্‌রা দিয়ে বাজারে প্রবেশ করে প্রথমেই পেলাম তরিতরকারীর দোকান, বাবুর্চিদের এবং কশাইদের দোকান। তারপরে ফলের বাজার দরজির দোকান, আতরের দোকান। তারপরে হাজির হলাম (ভিতরের) বাব-আল্-হাদ্‌রায়। এখানে একটি কবর আছে যাকে সবাই আলীর কবর বলে।[৪] বাব-আল্-হাদ্‌রা দিয়া কেউ ভিতরে ঢুকলেই প্রথমেই পাবে একটি বৃহৎ মুসাফেরখানা, তার ভিতর দিয়া দরগায় প্রবেশের পথ। প্রবেশ পথে কর্মচারী, হাজিরা বই-রক্ষক ও খোজা প্রহরীরা আছে। কোন দর্শনার্থী কবরের দিকে অগ্রসর হলেই প্রহরীদের একজন বা দর্শনার্থীর পদমর্যাদানুযায়ী সবাই উঠে দাঁড়ায় এবং তার সঙ্গে দরজায় গিয়ে আপেক্ষা করে। সেখান থেকে তারা দর্শনার্থীর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বলে উঠে, "হে আমীর-উল-মোমেনিন, আমি খাকসার আপনার পবিত্র বিশ্রাম স্থলে প্রবেশের অনুমতি চাইছি।" অতঃপর তাকে দরজায় চুম্বন করতে বলে। দরজা-চৌকাঠ রৌপ্য নির্মিত। পরে সে দরগায় প্রবেশ করে। দরগার মেঝে রেশমী কার্পেটে মোড়া। দরগার ভিতরে ছোটবড় অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যের দীপাধার আছে। মধ্যস্থলে মানুষ সমান উঁচু একটি চতুষ্কোণ বেদী রয়েছে। কাঠের বেদীটি সম্পূর্ণভাবে সোনার পাত দিয়ে রূপার পেরেকে আঁটা।

এখানে তিনটি কবর রয়েছে। এখানকার লোকদের মতে করবগুলি হজরত আদম, হজরত নূহ ও হজরত আলীর। কবরগুলির মধ্যস্থলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের থালা রাখা আছে। থালায় রয়েছে গোলাব, কস্তুরী এবং অন্যান্য আতর। আগন্তুক হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আতর নাকে মুখে লাগায় এবং দোয়া প্রার্থনা করে। দরগায় আরও একটি দরজা আছে। তার চৌকাটি রৌপ্য নির্মিত এবং রঙীন রেশমের ঝালরওয়ালা। দরজার পরেই একটি মসজিদ। এ শহরের সমস্ত অধিবাসীই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এ সমাধিসৌধে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে বলে তারা এ সমাধিকে হজরত আলীর সমাধি বলে দাবী করে। এ সব অলৌকিক ঘটনার একটি ঘটে ২৭শে রজব [৫] তারিখের শেষে। সেদিন ইরাকের উভয়াংশ, খোরাসান, পার্শিয়া ও আনাটোলিয়া থেকে প্রায় ত্রিশ, চল্লিশ জন খোঁড়াকে এখানে এনে পবিত্র সমাধিসৌধে রাখা হয়। উপস্থিত লোকেরা তখন মোনাজাত, দোয়া দরুদ অথবা কোরআন পাঠ করে রাত্রিযাপন করে এবং ঐ সকল খোঁড়ারা কখন ভাল হয়ে উঠবে তার অপেক্ষা করতে থাকে। যখন রাত্রির আধাআধি হয় অথবা তিনভাগ গিয়ে একভাগ থাকে তখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বলে উঠে, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদর রসুলল্লাহ ওয়া আলিউন হাবিবুল্লাহ।" এ ঘটনা এখানকার লোকদের কাছে বিশেষ বিদিত। আমি বিশ্বাসী লোকের কাছে একথা শুনেছি কিন্তু নিজে কখনও তেমন কোন রাত্রে উপস্থিত থাকিনি। আমি মেহ্মান কলেজে (Guest' College) চারজন বিকলাঙ্গ লোকের দেখা পেয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তারা বল্ল যে, সে রাত্রে তারা হাজির হতে পারেনি বলে পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষা করছে।

এ শহরের লোকেরা কোন খাজনা বা কর দেয় না, শাসনকর্তাও নেই কিন্তু এ শহর এককভাবে নকিব-আল-আশরাফ (Keeper of the Register of the descendants of the Prophet)-এর অধীনে। এখানকার লোকদের সবাই উদ্যমশীল ব্যবসায়ী। তারা সাহসী, দয়ালু ও সফরের সঙ্গী হিসাবেও উত্তম কিন্তু হজরত আলী সম্বন্ধে অত্যন্ত গোঁড়া। যদি এখনকার লোকেদের ভেতর কেউ মাথায়, হাতে, পায়ে অথবা শরীরের অপর কোন অঙ্গে রোগাক্রান্ত হয় তবে সোনা বা রূপা দিয়ে সে অঙ্গের একটি প্রতিকৃতি তৈরী করে এ স্মৃতিস্তম্ভে নিয়ে আসে। এ সমাধিসৌধের খাজাঞ্চিখানা অনেক ধনরত্নে সমৃদ্ধ। দরবারে নকিব-আল-আশরাফ উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। যখন তিনি ভ্রমণে বের হন তখন ঠিক প্রধান সেনানায়কের সমমর্যাদায় তাঁর অনুগমন করে পতাকাবাহী ও দামামা বাদকগণ। প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে রণবাদ্য বাজান হয়। বর্তমানে যিনি এ পদে আছেন তাঁর আগে একত্রে একাধিক ব্যক্তি এ পদ দখল করছিলেন। পালাক্রমে তাঁরা শাসনকর্তার কর্তব্য পালন করতেন।

এ সব খ্যাতনামা ব্যক্তিদের একজন ছিলেন শরিফ আবু ঘুরা। তরুণ বয়সে তিনি ধর্মকর্ম ও বিদ্যাশিক্ষায় কাটান কিন্তু নকিব-আল-আশরাফ পদে অধিষ্ঠিত হবার পর ইনি দুনিয়াদারিতে লিপ্ত হয়ে পড়েন, ধর্ম স্বভাব ত্যাগ করেন এবং অসদুপায়ে তাঁর অর্থের ব্যবহার করতে থাকেন। বিষয়টি সুলতানের গোচরীভূত করা হলে আবু ঘুরা তা

জানতে পেরে খোরাসান যান এবং সেখান থেকে রওয়ানা হন সোজা ভারতের পথে। সিন্ধুনদ পার হয়েই তিনি সঙ্গীদের হুকুম করলেন জয়ঢাক আর রণভেরী বাজাতে। ভেরী বেজে উঠতেই গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে গেল, মনে করল হয়ত বা তাতার দস্যুরাই দেশে হামলা করেছে। গ্রাম ছেড়ে তারা পালিয়ে গেল উজা (উচ্) শহরে। সেখানকার শাসনকর্তাকে খবর দিল যা-কিছু তারা শুনেছে। খবর পেয়েই তিনি যুদ্ধের আয়োজন করে একদল সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু যে সন্ধানী সৈন্যদলকে তিনি আগে পাঠিয়েছিলেন তারা দেখল, মোটেই জন-দশেক অশ্বারোহী, তাদের সঙ্গে কিছু সংখ্যক পদাতিক, পেছনে রয়েছে সওদাগরেরা, দামামা ও পতাকাবাহীর দল। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে, তারা বলল, ইরাকের নকিব শরিফ এসেছেন ভারতের সুলতানের কাছে। এ সংবাদ নিয়ে সন্ধানী সৈন্যরা ফিরে এল শাসনকর্তার কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন, শরিফের বুদ্ধি বিবেচনা কম, নয়তো নিজের দেশের বাইরে এসে তিনি নিশান উড়িয়ে দামামা বাজাতে শুরু করতেন না। শরিফ কিছুদিন উজ্ শহরেই অবস্থান করলেন। তখনও প্রতিদিন সকালে-বিকালে তাঁর বাড়ির বাইরে তিনি নিশান উড়িয়ে ও জয়ঢাক বাজিয়ে তৃপ্তিবোধ করতেন। শুনা যায়, ইরাকে থাকতে তাঁর উপস্থিতিতে যখন ঢাক বাজানো হতো তখন বাজনা থামলেই তিনি বলে উঠতেন, "আরেকবার হোক, ঢাকী।" তারপর এ শব্দ কটাই হয় ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁর ডাকনাম।

উজার শাসনকর্তা শরিফের সংবাদ লিখে পাঠালেন সুলতানের কাছে। তাঁর আগমনের সময়ে এবং আসার পর অবধি বাসগৃহের দরজায় সকালে-বিকালে জয়ঢাক বাজানো এবং নিশান উড়ানোর সংবাদ দিতেও তিনি ভুললেন না। ভারতে তখন প্রচলিত নিয়ম ছিল; সুলতানের বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঢাক বাজাতে বা নিশান উড়াতে পারবেন না। কেউ অনুমতি পেলেও শুধু সফরের পথে বাজনা বাজাতে পারতেন। তা'ছাড়া বাজনা বাজার রীতি ছিল শুধু সুলতানের প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে। পক্ষান্তরে মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে বাজনা বাজানো হয় সেনানায়কের গৃহের দ্বারে। কাজেই শরিফের ব্যবহারের কথা শুনে সুলতান বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হলেন। শরিফ তখন যথারীতি জয়ঢাক বাজাতে-বাজাতে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এ-দিকে সুলতানও যাচ্ছিলেন সিন্ধুর আমীরের সঙ্গে দেখা করতে। পথে দেখা হতেই শরিফ এগিয়ে এসে সুলতানকে অভ্যর্থনা জানালেন। সুলতান কুশল প্রশ্নাদির পর তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর জবাব শুনে আমীরের কাছে চলে গেলেন। ফিরবার পথেও শরিফের আসার বা অন্য কোন রকম ব্যবস্থা না করেই রাজধানীতে ফিরে এলেন। তিনি তখন দৌলতাবাদে যাত্রার জন্য তৈরী হয়েছিলেন। যাত্রার পূর্বে শরিফকে পাঁচশ দিনার (মরক্কোর ১২৫ দিনার) দূত মারফত পাঠিয়ে বলে দিলেন, "তাঁকে বলবে, তিনি যদি ফিরে যেতে চান তাহলে এ টাকা তাঁর পথ খরচের জন্য, যদি তিনি আমাদের সঙ্গে আসতে চান তবে এ টাকা সফরে ব্যয় করবেন, আর যদি থাকতে চান তবে আমাদের ফিরে না-আসা পর্যন্ত তাঁর খাওয়ার খরচ এ টাকা দিয়ে হবে।" শরিফ খুশী হতে পারলেন না। তিনি ভেবে রেখেছিলেন, সুলতান অপরকে যেমন

বখ্‌শিশ দেন তেমনি দরাজ হস্তে তাঁকেও বড় রকম কিছু দেবেন। অবশেষে তিনি সুলতানের সঙ্গে যাওয়াই স্থির করলেন এবং উজিরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করতে লাগলেন। উজিরও তাঁকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন এবং সুলতানের উপর নিজের প্রভাবের বলে দৌলতাবাদ জেলার দুটি গ্রাম তাঁর জন্য জায়গীর স্বরূপ আদায় করে দিলেন। প্রায় আট বছর কাল শরিফ সেখানে বাস করে দু'টি গ্রামের প্রজাদের কাছে কর আদায় করে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। অতঃপর তিনি ভারত ত্যাগ করতে চান কিন্তু তাতে সক্ষম হন না। কারণ, যাঁরা সুলতানের অধীনে চাকুরী করেন তাঁরা সুলতানের বিনানুমতিতে কোথাও যেতে পারেন না। বিদেশীদের সঙ্গে তাঁর সংস্রব বেশী বলে তাঁদের তিনি কদাচিৎ অনুমতি দিয়ে থাকেন। শরিফ প্রথমে চেষ্টা করেন সমুদ্রোপকুলের পথে পালাতে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাঁকে রাজধানীতে ফিরে আসতে হয়। তখন পুনরায় উজিরের চেষ্টায় তিনি ভারত ত্যাগের অনুমতি লাভ করেন। শুধু অনুমতিই নয়, সুলতান তাঁকে দশ হাজার দিনারও দান করেন।

এ বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল একটা বস্তায় ভর্তি করে। অর্থ শরিফের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু বলে এবং পাছে কেউ তাতে ভাগ বসায় এ ভয়ে তিনি টাকার বস্তার উপর শুয়েই ঘুমাতেন। তার ফলে স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর পাশে ব্যথা হয়ে গেল। সে ব্যথাই তাঁর কাল হল, টাকার বস্তা পাবার বিশ দিন পর তিনি এন্তেকাল করলেন। টাকা তিনি রেখে গেলেন শরিফ হাসান-আল্‌-জারানীর কাছে। তিনিও সমস্ত টাকা খয়রাত করে দিলেন দিল্লীর শিয়াদের ভেতর। ভারতীয়রা উত্তরাধিকারের দায়িত্ব অমান্য করে না এবং বিদেশীদের টাকা পয়সায় হস্তক্ষেপ করে না, এমন কি তার পরিমাণ যত বেশীই হোক সে সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করে না। অনুরূপ ভাবে, কাফ্রীরাও শ্বেতচর্ম লোকদের অর্থের প্রতি লোভ করে না, সত্যিকার ওয়ারিস না পাওয়া পর্যন্ত সে টাকা লোকটির দলপতির কাছেই থাকে।

খলিফা হজরত আলীর কবর জেয়ারতের পর আমাদের কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল বাগদাদের পথে। আমি সে দেশবাসী এক দল আরবের সঙ্গে বসরার পথ ধরলাম। তারা ছিল অত্যন্ত সাহসী। তাদের সঙ্গ ছাড়া এ রকম দেশে সফর করাই সম্ভব হত না। ইউফ্রেটিস নদীর পারে আল-ইদ্‌হার নামক একটা স্থানের মধ্যে দিয়ে ছিল আমাদের পথ। একদল লুণ্ঠনকারী আরব অধ্যুসিত আল-ইদ্‌হার নল-খাগড়ার জঙ্গলময় জলাভূমি। এখানকার আরবরা রাহাজানি করে এবং নিজেদের শিয়া বলে পরিচয় দেয়। আমাদের পশ্চাদ্বর্তী একদল দরবেশকে আক্রমণ করে এরা তাদের পায়ের জুতা থেকে কাঠের তৈরী খাদ্যপাত্র অবধি লুঠ করে নেয়। তারা এ জঙ্গলে নিজেদের সুরক্ষিত করে নিয়েছে এবং সর্বপ্রকার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতেও তারা সক্ষম। ইহার মধ্যে দিয়ে তিনদিন পথ চলবার পর আমরা ওয়াসিত শহরে পৌছলাম ইরাকের বাসিন্দাদের ভেতর যাদের সজ্জন বলা যায়, ওয়াসিতের বাসিন্দারা তাদের অন্তর্গত। তারা শুধুই সজ্জন নয়, সর্বপ্রকারে সজ্জন। ইরাকীদের ভেতর যারা ভালভাবে কোরআন আবৃত্তি করতে চায় তারা সবাই আসে এখানে। এ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে এমন একদল ছাত্র

আমাদের কাফেলায়ও ছিল। আমাদের কাফেলা তিন দিন অবস্থান করায় আমি এখান থেকে এক দিনের পথ উম্মে উবায়দা নামক গ্রামে আর-রিফাইর কবর জেয়ারতের সুযোগ পেলাম। যাত্রার পরদিন দুপুর বেলা আমি এখানে গিয়ে পৌঁছলাম। বিরাট এ দরগায় হাজার হাজার দরবেশের বাস।[৬] আসরের নামাজের পর জয়ঢাক ও দামামার বাজনা শুরু হল এবং সঙ্গে-সঙ্গে হাজার-হাজার দরবেশ নৃত্য শুরু করলেন। অতঃপর মাগরেবের নামাজ আদায় করে তাঁরা আহারে বসলেন। আহার্য ছিল চাউলের রুটি, মাছ, দুধ ও খেজুর। এশার নামাজের পরে তাঁরা নিজেদের দরুদ পড়তে লাগলেন। অনেক জ্বালানী কাঠ সেখানে জড়ো করে অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হয়েছিল। দরবেশরা নৃত্য করতে করতে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। কেউ-কেউ আগুনের ভেতর গড়াগড়ি করতে লাগলেন। কেউ-কেউ বা আঙ্গার নিভে না যাওয়া পর্যন্ত মুখের ভেতর রাখলেন। আহ্‌মদী দরবেশদের এ সব আজব রীতি। তাঁদের ভেতর কেউ-কেউ বড়-বড় সাপ এনে দাঁত দিয়ে সাপের মাথায় কামড়ে এপিঠ-ওপিঠ বিদ্ধ করে দেয়।

আর-রিফাইর কবর জেয়ারতের পর আমি ওয়াসিতে ফিরে এসে দেখলাম আমাদের কাফেলা আগেই রওয়ানা হয়ে গেছে। আমি পথে গিয়ে তাদের নাগাল পেলাম এবং তাদের সঙ্গে বসরা অবধি গেলাম। শহরের দিকে অগ্রসর হতে-হতে দু'মাইল দূরে নজরে পড়ল দূর্গের মত দেখতে সুউচ্চ একটি অট্টালিকা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এটি হজরত আলীর মস্‌জিদ । এক সময়ে বসরা এত বিরাট একটি শহর ছিল যে এ মসজিদটি ছিল তার কেন্দ্রস্থলে। আর এখন কিনা মসজিদটি পড়েছে গিয়ে দু'মাইল দূরে । এখান থেকেও দু'মাইল দূরে শহরের পুরাতন প্রাচীর। কাজেই বর্তমান শহরও পুরাতন প্রাচীরের মধ্যস্থলে এ-মস্‌জিদটি।[৭] ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরগুলির ভেতর বসরা একটি। এখানকার মত খেজুর বাগান পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চৌদ্দ পাউণ্ড খেজুরের চলতি দাম ইরাকী এক দিরহাম অর্থাৎ এক নুকরার [৮] তিন ভাগের এক ভাগ। এখানকার কাজী আমাকে এমন প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি খেজুর দিলেন যা একজনে অতি কষ্টে বয়ে আনতে পারে। সেগুলি বিক্রি করে আমি মোটে নয় দিরহাম পেলাম, তার তিন দিরহাম দিতে হল কুলীকে সেই ঝুড়ি বাড়ি থেকে বাজার অবধি বয়ে নেবার মজুরী বাবদ। বসরার বাসিন্দারা একাধিক সদ্‌গুণের অধিকারী। বিদেশীদের প্রতি তাদের ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। তারা এভাবে বিদেশীদের হক আদায় করে যে তাদের ভেতর কেউ নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে না। শুক্রবার তারা জুমার নামাজ পড়ে পূর্ববর্ণিত হজরত আলীর মস্‌জিদে কিন্তু অন্যান্য দিন মসজিদটির দ্বার বন্ধ থাকে। একদিন শুক্রবারের জামা'তে আমি উপস্থিত ছিলাম। এমাম খোৎবা পাঠ করতে উঠে কতকগুলি মারাত্মক ব্যাকরণ [৯] ভুল করলেন। আমি বিস্মিত হয়ে কাজীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, "ব্যাকরণ শাস্ত্র জানেন এমন একজন লোকও আর এ শহরে নেই।" সমস্ত কিছুর পরিবর্তন সাধন যিনি করেন তাঁর মহত্ব বৃদ্ধি হউক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয়, ব্যাকরণ শাস্ত্রে বসরার বাসিন্দাদের জ্ঞান এক সময়ে উচ্চ শিখরে উঠেছিল। যেখানকার মাটিতে এর কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ

করেছে, যে দেশের অধিবাসীদের এ বিদ্যায় প্রাধান্য ছিল অবিসম্বাদিত, সেই দেশের এমাম আজ ব্যাকরণের নিয়মাবলী ভঙ্গ না করে খোৎবা পাঠ করতে পারেন না।

বসরা থেকে উবুল্লা[১০] যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি সামবাক নামক এক প্রকারের ছোট একটি নৌকায় আরোহণ করলাম। বসরা থেকে উবুল্লা দশ দিনের পথ। এ পথের দু'পারে পথিক দেখতে পায় একটানা ভাবে ফল ও তালের বাগিচা। গাছের ছায়ায় সওদাগরেরা বসে বিক্রি করছে রুটি,মাছ, খেজুর,দুধ ও ফলমূল। উবুল্লা এক সময়ে খুব বড় শহর ছিল। ভারত ও ফারসের সওদাগরেরা নিয়মিত এখানে যাতায়াত করত। কিন্তু সে শহর ধ্বংস হয়ে আজ একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। সূর্যাস্তের পরে এখান থেকে আমরা একটি ছোট জাহাজে আরোহণ করে পরদিন ভোরে গিয়ে আবাদান পৌঁছলাম। উবুল্লার একটি লোক জাহাজটির মালিক। কৃষিবিহীন সমতল অঞ্চলে অবস্থিত আবাদান একটি গ্রাম। শুনেছিলাম আবাদানে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন তাপস বাস করেন। তিনি বাস করেন সম্পূর্ন নির্জনে। মাসে একবার তিনি নদীর পারে এসে এক মাসের খাদ্যোপযোগী মাছ শিকার করে আবার প্রস্থান করেন। আমি তাঁকে খুঁজে বের করতে মনস্থ করলাম এবং তাঁকে নামাজরত অবস্থায় খুঁজে পেলাম একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে। নামাজের শেষে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ্ তোমার ইহকালের ও পরকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" আলহামদোলিল্লাহ—খোদার সমস্ত প্রশংসা যে তিনি সত্যই আমার ইহকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। সে মনোবাঞ্ছা দেশ ভ্রমণের ছাড়া আর কিছুই নয়। সে বাসনা তিনি এভাবে পূর্ণ করেছেন যে আমার জ্ঞাত মতে আর কাউকে তা করেননি। পরকাল এখনও আমার সামনে রয়েছে কিন্তু সে বিষয়ে খোদার অশেষ দয়া ও ক্ষমতার উপর আমার অসীম আস্থা আছে। আমার সঙ্গীরা পরে পূর্বোক্ত তাপসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিন্তু তারা তাঁর কোন সন্ধান পায়নি। আমরা যে মুসাফেরখানায় বাস করছিলাম সেখানকার একজন দরবেশ সেদিন সন্ধ্যায় তাপসের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি দরবেশের হাতে একটি তাজা মাছ দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, "আজ যে মেহ্‌মান আমার কাছে এসেছিল তাকে নিয়ে দাও।" দরবেশ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তোমাদের ভেতর কে শেখের সঙ্গে দেখা করেছো?" আমি বল্লাম, "আমি দেখা করেছি।" তখন তিনি আমাকে বললেন, "তিনি বলেছেন, এইটি তোমার মেহ্‌মানের উপহার।" আমি এজন্য খোদাকে ধন্যবাদ জানালাম। পরে দরবেশ মাছটি রান্না করলে আমরা সবাই তা খেলাম। এর চেয়ে ভাল মাছ আমি কখনও খাইনি। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হ'ল বাকী জীবন আমি এ শেখের খেদমতেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু আমার মনের একাগ্রতা সে সঙ্কল্প থেকে আমাকে নিবৃত্ত করল।

সেখান থেকে আমরা জাহাজে মাজুল রওয়ানা হলাম। আমার অভ্যাস ছিল, যে পথে একবার গিয়েছি সে পথে যতটা সম্ভব আর কখনও ফিরে না আসা। বাগদাদ যাওয়ার সঙ্কল্প ছিল আমার কিন্তু বসরার এক ব্যক্তি আমাকে পরামর্শ দিল লুরস্ যেতে, সেখান থেকে ইরাক-আল-আজম, পরে ইরাক-আল-আরব। আমি তার পরামর্শই গ্রহণ করলাম। চারদিন পর আমরা মাজুল[১১] পৌঁছলাম। পারস্য উপসাগরের কূলে মাজুল

একটি ছোট জায়গা। সেখানকার এক শস্যব্যবসায়ীর একটি ঘোড়া ভাড়া করে রামিজ (রাম-হারমুজ) রওয়ানা হলাম। মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ। সেখানে যাযাবর কুর্দীসের বাস।ফলের গাছ ও নদী সম্বলিত রামিজ সুন্দর একটি শহর। সেখানে এক রাত্রি বাস করে পুনরায় কুর্দী অধ্যুষিত একটি সমতল ভূমির উপর দিয়ে তিন রাত্রি পথ চললাম। প্রতি মঞ্জিলের শেষেই একটি করে মুসফেরখানা। মুসাফেরখানায় প্রত্যেক মুসাফেরকে রুটি, মাংস ও মিষ্টি বিতরণ করা হয় । অতঃপর আমরা তুস্তর (সুস্তার) শহরে এসে পৌছলাম। শহরটি একটি সমতল ভূমির প্রান্তদেশে অবস্থিত। সেখান থেকে পর্বতের শুরু। সেখানে শেখ শরাফউদ্দিন মুসার মাদ্রাসায় আমি ষোল দিন কাটালাম। মুসা একজন অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির লোক। প্রতি শুক্রবার জুমার জামাতের পর তিনি 'ওয়াজ' করেন। একদিন তাঁর ওয়াজ শুনে মনে হ'ল তাঁর তুলনায় মিসরে, হেজাজে, সিরিয়ার যত ওয়াজ এতদিন শুনেছি সবই ম্রিয়মান। একদিন নদীর পাড়ের এক ফলের বাগানে দরবেশ, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও খ্যাতনামা লোকদের এক সমাবেশে তাঁর সঙ্গে আসবার সুযোগ আমার হয়েছিল। উপস্থিত সবাইকে আহার্য দিয়ে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওয়াজ (খোত্‌বা পাঠ) করলেন। তিনি খোতবা পাঠ শেষ করতেই চারদিক থেকে-ছোট ছোট কাগজের টুকরা তাঁর উপর নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। পারস্যের লোকদের মধ্যে রীতি আছে, কাগজের টুকরায় প্রশ্ন লিখে তা' ওয়াজখানের দিকে নিক্ষেপ করে। ওয়াজখান পর-পর সেগুলির জবাব দিয়ে যান। এক্ষেত্রেও শেখ সমস্ত কাগজের টুকরা সংগ্রহ করে পর-পর অতি সুন্দরভাবে জবাব দিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করলেন।

তুস্তার থেকে রওয়ানা হয়ে উচ্চ পার্বত্য পথে আমরা তিন রাত্রি পথ চলবার পর ইদ্‌হাজ শহরে হাজির হলাম। ইদ্‌হাজ মাল-আল-আমীর নামেও পরিচিত। মাল-আল-আমীর সুলতান আতা বেগের রাজধানী। সেখানকার সকল শাসনকর্তার উপাধিই আতাবেগ [১২]। আমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু তা সম্ভব হল না; কারণ তিনি মদ্যাসক্ত এবং কেবলমাত্র শুক্রবার বাইরে আসেন। কয়েকদিন পরে সুলতান নিজেই আমাকে আমন্ত্রণ পাঠান তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। পত্র বাহকের সঙ্গে আমি সাইপ্রাস দ্বার নামে পরিচিত একটি প্রবেশদ্বারে গিয়ে হাজির হলাম। সেখান থেকে একটি উচ্চ সিঁড়ি গিয়ে উঠেছে একটি কোঠায়। সুলতানের পুত্রের জন্য তারা শোকাতুর বলে সে কোঠাটি সজ্জিত করা হয়নি। সুলতান একটি গদি আঁটা আসনে বসেছিলেন। তাঁর সামনে দু'টি আবৃত পানপাত্র । তার একটি সোনার অপরটি রূপার। তাঁর আসনের কাছেই আমার জন্য একটি সবুজ কম্বল বিছানো হয়েছিলো। আমি তার উপর আসন গ্রহণ করলাম। সে কামরায় তখন তাঁর একজন সভাসদ ও একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সুলতান আমার নিজের সম্বন্ধে, দেশ সম্বন্ধে এবং মিসরের ও হেজাজের সুলতান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি তাঁর সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম। ঠিক তখন বিশিষ্ট একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি সেই কামরায় ঢুকলেন। সুলতান লোকটির প্রশংসা করতে লাগলেন। আমি তখন লক্ষ্য করলাম,

সুলতান মদ্য পান করেছেন। কিছুক্ষণ পরে বিশুদ্ধ আরবীতে তিনি আমাকে বল্লেন, "কথা বলুন।" আমি তাঁকে বললাম, "যদি আপনি শুনতে রাজী হন তবে বলতে পারি। আপনার পিতা ছিলেন দানধ্যান ও সততার জন্য বিখ্যাত একজন সুলতান। শাসক হিসাবে আপনার বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই ঐ একটি বস্তু ছাড়া।" বলেই আমি পানপাত্র দু'টি দেখিয়ে দিলাম। আমার কথায় তিনি বিস্ময়াবিষ্টের মত চুপ করে রইলেন। আমি তখন চলে আসতে চাইলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, "আপনার মত লোকের সঙ্গে দয়ার শার্মিল"। দেখলাম তিনি যেন ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন এবং প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাজেই আমি চলে এলাম। আমি আমার পাদুকা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু যে আইনজ্ঞ লোকটির কথা উল্লেখ করেছি তিনি ঘরের ভেতর খুঁজে পাদুকা জোড়া এনে দিলেন। তাঁর এ দয়ার জন্য লজ্জিত হয়ে আমি ত্রুটি স্বীকার করলাম। কিন্তু তাতে তিনি আমার পাদুকা চুম্বন করে মাথার উপর তুলে বললেন "আল্লাহ যেন আপনার মঙ্গল করেন। আজ সুলতানকে আপনি যা বলেছেন আপনি ছাড়া কেউ তা পারতেন না। আশাকরি আপনার কথা তাঁর মনের উপর গাদ কাটবে।"

কয়েকদিন পরেই আমি ইদ্‌হাজ ছেড়ে আসি। সুলতান আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের কিছু দিনার পাঠান বিদায়ের উপহার স্বরূপ। এ সুলতানের এলাকায় আমরা সু-উচ্চ পর্বত-সঙ্কুল পথে ১০ দিন অবধি সফর করি। প্রতি রাত্রেই আমরা কোন মাদ্রাসায় পৌঁছে বিশ্রাম করেছি। সেখানে প্রত্যেক সফরকারী ও তাঁর বাহনের খাদ্য সরবরাহ করা হয়। কোন-কোন মাদ্রাসা জনবিরল স্থানে অবস্থিত। কিন্তু মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাতে আছে। ঐ রাজ্যের আয়ের এক তৃতীয়াংশ এসব মুসাফেরখানা ও মাদ্রাসার ব্যয়নির্বাহের জন্য রাখা হয়। ইসফাহান প্রদেশের একটি সমতল অঞ্চলে উস্ তারকান্ ও ফিরুজান শহর হয়ে আমরা পথ চলতে লাগলাম। ফিরুজানে পৌঁছে শহরের অধিবাসীদের সঙ্গে শহরের বাইরেই দেখা হ'ল। তখন তারা একটি শবযাত্রায় চলেছে। শবের খাটের সামনে ও পেছনে মশাল চলছে। তারা বাঁশী বাজাতে-বাজাতে শবের অনুগমন করছে গায়করা চলেছে আনন্দসূচক গান গাইতে-গাইতে। তাদের এ কাণ্ড দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। পরের দিন যে পথ দিয়ে আমরা অগ্রসর হলাম তার আশে পাশে ফলের বাগান আছে, খালও আছে, আর আছে কবুতরের বাসার উপযোগী বহু সংখ্যক মিনার। বিকেল বেলা আমরা ইরাক-আল-আজমের অন্তর্গত ইসফাহান বা ইসপাহান এসে পৌঁছলাম। ইসপাহান শহরটি যেমন বড় তেমনি সুদৃশ্য। কিন্তু শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের বিবাদের ফলে আজ এ শহরের বহুলাংশ ধ্বংসের কবলে পড়েছে। সে বিবাদ সেখানে এখনও চলছে। ফলের জন্য স্থানটি বিখ্যাত। এখানকার খুবানী অতুলনীয়, তার ভেতরে আছে সুস্বাদু বাদাম। ইসপাহানের ন্যাসপাতি স্বাদে ও আকারে সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে আর পাওয়া যায় চমৎকার আঙুর ও তরমুজ। ইসপাহানের বাসিন্দারা সুদর্শন। তাদের গাত্রবর্ণ রক্তাভ সাদা। তারা সাহসী ও সদাশয় এবং সর্বদাই ভাল ব্যয়বহুল খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এ ব্যাপারে তাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। এখানে প্রত্যেক শ্রেণীর

ব্যবসায়ীদেরই একটি সমিতি আছে। ব্যবসায়ে লিপ্ত না হলেও নেতৃস্থানীয় লোকদের অনেক সমিতি আছে। তা'ছাড়া আছে অবিবাহিত যুবকদের সমিতি। এসব সমিতি অপর সমিতির সভ্যদের দাওয়াত করে এবং সাধ্যমত জাঁকজমক সহকারে ভোজ দেবার প্রতিযোগিতা করে। শুনেছি, একবার এক সমিতি অপর সমিতির সভ্যদের দাওয়াত করে রান্না করেছিল মোমবাতি জ্বালিয়ে। পরে এ মেহ্মানরা পাল্টা দাওয়াত করে রান্না করেছিল রেশম জ্বালিয়ে।

অতঃপর আমরা ইসপাহান থেকে রওয়ানা হই সিরাজে শেখ মাজদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে। সিরাজ সেখান থেকে দশ দিনের পথ। ছয় দিন পথ চলার পর আমরা পৌঁছলাম ইয়াজদিখস্তে। শহরের বাইরে একটি ধর্মশালায় মুসাফেরদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। শহরটি সুরক্ষিত এবং প্রবেশদ্বারটি লৌহ নির্মিত। ভিতরে রয়েছে কতকগুলি দোকান। মুসাফেররা প্রয়োজনীয় সব জিনিস এখানে কিনতে পারে। এখানে যে পনির তৈরী হয় তা ইয়াজদিখাস্তি নামে পরিচিত। উৎকর্ষতায় সে পনির অতুলনীয় । প্রতিটি পনিরের টুকরার ওজন দু' থেকে চার আউন্স। সেখান থেকে তুর্কী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল পার হয়ে সিরাজ গিয়ে পৌঁছলাম। জনবহুল সিরাজ শহরটি সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত। প্রত্যেক রকম কারবারের জন্যই এখানে রয়েছে স্বতন্ত্র বাজার। এখানকার অধিবাসীরাও সুদর্শন এবং সুবেশধারী। সমগ্র প্রাচ্যে একমাত্র দামেস্ক ছাড়া বাজারের সৌন্দর্যে, ফলেফুলের বাগানে, নদীনালায় ও অধিবাসীদের সুশ্রীতায় সিরাজের তুলনা হয় না। চারদিক ফলের বাগানে বেষ্টিত একটি সমতল ভূমিতে সিরাজ অবস্থিত। মধ্যে মধ্যে রয়েছে নদী। তারই একটি নাম রুকনাবাদ[১৩]। এ নদীর সুমিষ্ট পানি গ্রীষ্মে অতি শীতল এবং শীতের সময় গরম। সিরাজের বাসিন্দারা ধর্ম প্রাণ ও সৎ, বিশেষ করে সেখানকার নারী সমাজ। তাদের মধ্যে চমৎকার একটি রীতি প্রচলিত আছে। প্রতি সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার শহরের প্রধান মসজিদে এক বা দু' হাজার নারী পাখা হাতে গিয়ে জমায়েত হয় এবং ধর্ম সম্বন্ধে বক্তার বক্তৃতা শোনে। অত্যাধিক গরম বলে তারা তখন নিজের-নিজের পাখা ব্যবহার করে। আমি আর কোনো দেশেই মহিলাদের এত বড় জমাত দেখি নি।

সিরাজ নগরে প্রবেশ করে আমার অন্তরে জাগরূক ছিল একটি মাত্র বাসনা। সে বাসনা হ'ল যুগের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় খ্যাতনামা শেখ মাজদ্দিন ইসমাইলকে খুঁজে বের করা। আমি যখন তাঁর গৃহে গিয়ে পৌঁছলাম তিনি তখন আসরের নামাজের জন্য বাইরে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে ছালাম করলাম। তিনি আমার সঙ্গে কোলাকোলি করে আমার হাত ধরে জায়নামাজ অবধি এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে ইঙ্গিত দিলেন। অতঃপর শহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা এলেন তাঁকে ছালাম করতে। ভোরে ও সন্ধ্যায় এই তাদের রীতি। এরপর তিনি আমার সফর এবং যে সব দেশ সফর করেছি সে সব-সম্বন্ধে আলাপ করলেন। আলাপের পর তাঁর মাদ্রাসায় আমার থাকার ব্যবস্থা করতে হুকুম দিলেন। ইরাকের সুলতান শেখ মাজদ্দিনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাঁর এ শ্রদ্ধার কারণ নিম্নোক্ত কাহিনীটিতে বুঝা যায়।

ইরাকের ভূতপূর্ব সুলতান মুহাম্মদ খোদাবান্দার ১৪ ইসলাম গ্রহণের আগেই তাঁর সহচর ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী একজন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। পরে তাদের সহ তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন এ ব্যক্তিকে তিনি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। এ সুযোগে তিনিও সুলতানকে পীড়াপীড়ি করে রাজী করালেন তাঁর রাজ্যের সর্বত্র শিয়া মত প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু বাগদাদ, সিরাজ ও ইস্পাহানের লোকেরা এ মত প্রচারে বাধা দিল। সুলতান তাতে ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি ঐ তিন জায়গায় কাজীদের সমন দিয়ে হাজির করতে হুকুম দিলেন। সুলতানের হুকুম মোতাবেক প্রথম যাঁকে দরবারে আনা হল তিনিই সিরাজের কাজী শেখ মাজদ্দিন। সুলতান তখন ছিলেন তাঁর গ্রীষ্মাবাস কারাবাগ ১৫ নামক একটি স্থানে। কাজীকে তাঁর কাছে হাজির করা হলে তিনি হুকুম দিলেন তাঁকে কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করতে। গলায় শিকল বাঁধা প্রকাণ্ড এ কুকুরগুলিকে নরমাংস খেতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। যখন কাউকে কুকুরের সামনে দেবার জন্য আনা হয় তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় প্রকাণ্ড একটি ময়দানে। তারপর কুকুরগুলিকে লেলিয়ে দেওয়া হয় তার উপর। লোকটি তখন স্বভাবতই পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পালাবার পথ পায় না। কুকুরগুলি অনায়াসে তাকে ধরে ছিন্ন-ভিন্ন করে তার মাংস খেতে থাকে। কিন্তু কাজী মাজদ্দিনকে যখন কুকুরের সম্মুখে ছেড়ে দেওয়া হল তখন একটি কুকুরও তাঁকে আক্রমণ করল না। বরং কুকুরগুলি অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাঁর কাছে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। এ খবর শোনার পর হতেই সুলতান কাজীকে অশেষ শ্রদ্ধা দেখাতে লাগলেন এবং শিয়া মত পরিত্যাগ করলেন। শুধু তাই নয়, সিরাজের প্রসিদ্ধ এলাকা জামকানের একশ'টি গ্রাম সহ অনেক কিছু কাজীকে দান করলেন। ভারত থেকে ফিরবার পথে ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় আমি কাজীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি তখন এত দুর্বল যে চলাফেরা করতে পারেন না। তবু তিনি আমাকে দেখেই চিনলেন এবং উঠে কোলাকোলি করলেন। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম সিরাজের সুলতান নিজের কান ধরে তাঁর সামনে বসে আছেন। কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সম্মান দেখাবার এই রীতি সেখানে। সুলতানের সামনে হাজির হয়ে সেখানে সবাই তাই করে।

আমার সিরাজ সফরকালে সিরাজের সুলতান ছিলেন আবু ইস্‌হাক ১৬। তিনি ছিলেন উত্তম সুলতানদেরই একজন। তিনি সুদর্শন, সদাচারী, বিনয়ী, দয়ালু প্রকৃতির একজন শক্তিশালী সুলতান ছিলেন। বিশাল একটি রাজ্য তিনি শাসন করতেন। তাঁর তুর্কী ও পার্শী সৈন্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের উর্ধ্বে। কিন্তু তিনি সিরাজের অধিবাসীদের বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাদের কখনো চাকুরীতে বহাল করতেন না এবং কাউকে কোন রকম অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিতেন না। কারণ তারা ছিল যেমন সাহসী, তেমনি ছিল পটু শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। ১৩৩৫ খ্রীস্টাব্দে সুলতান আবু সাঈদের মৃত্যুর পর প্রত্যেক আমীর নিজের কাছে যা ছিল তাই হস্তগত করেন। কিন্তু সুলতান আবু ইসহাক নিজের বলে সিরাজ, ফারস ও ইসপাহানে আয়ান কিস্‌রার ১৭ মত একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং সিরাজের অধিবাসীদের

আদেশ করেন প্রস্তাবিত প্রাসাদের ভিত্তি খননের । তখন এক সমিতির লোকেরা অপর সমিতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এ কাজ আরম্ভ করল। কর্মীদের প্রতিযোগিতা এতদুর গিয়ে পৌছল যে অনেকে মাটি বইবার ঝুড়ি চামড়া দিয়ে তৈরী করে তা আবার কারুকার্য করা রেশমী কাপড়ে মুড়ে দিল। গাধার পিঠে যে ঝুড়ি ঝুলানো থাকত তাও এভাবে মুড়তে বাকি রইল না। কেউ-কেউ কাজের যন্ত্রপাতি তৈরী করল রূপা দিয়ে । কেউ কেউ অসংখ্য মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। যখন তারা মাটি খনন করতে যেত তখন সবচেয়ে ভাল পোশাকটি পরে নিত। সুলতান একটি অলিন্দে বসে তাদের এসব লক্ষ্য করতেন। ভিত্তি খননের কাজ শেষ হলে তাদের বিদায় দিয়ে বেতন ভুক কারিগর নিয়োগ করা হল। নিয়োজিত কারিগরের সংখ্যা ছিল কয়েক সহস্র। আমি শহরের শাসনকর্তার কাছে শুনেছি, যে কর সেখানে আদায় হত তার বেশীর ভাগই ব্যয় হয়েছিল এ কাজের জন্য। দান ধ্যানের জন্য আবু ইসহাক নিজের তুলনা করতে যাইতেন ভারতের সুলতানের সঙ্গে। কিন্তু মাটির ঢিল থেকে সপ্তর্ষীমণ্ডল' কত দূরে"। আবু ইসহাকের সবচেয়ে বড় দানের কথা আমি যা শুনেছি, তাতে জিরাতের রাজার এক দূতকে তিনি দিয়েছিলেন সত্তর হাজার দিনার। কিন্তু ভারতের সুলতান তার চেয়ে অনেক বেশী করে দিয়ে থাকেন অসংখ্য লোককে। দানের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমীর বখ্ত একবার ভারতের সুলতানের রাজধানীতে দেখা করতে এসে নিজেকে অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। সুলতান তাঁর কাছে যেতেই তিনি উঠবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সুলতান তাঁকে বিছানা ছেড়ে নামতে বারণ করলেন। একটি আসন আনা হলে সুলতান সেখানে বসলেন। তারপর হুকুম করলেন দাঁড়িপাল্লা ও সোনা আনতে। সে সব এলে তিনি রুগ্ন ব্যক্তিকে একটি পাল্লায় উঠে বসতে বললেন। আমীর তখন বলে উঠলেন, 'জাহাঁপনা আগে যদি বুঝতাম আপনি এই করবেন তা'হলে সমস্ত জামা-কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিতাম। সুলতান বললেন, 'এখন পরে নিন আপনার যত জামা-কাপড় আছে।' কাজেই তুলা দিয়ে তৈরী শীতের সমস্ত জামা-কাপড় প'রে তিনি একটি পাল্লায় উঠে বসলেন। আরেক পাল্লায় চাপানো হলো সম-ওজনের সোনার তাল। সুলতান তখন বললেন, "এগুলি নিয়ে আপনার রোগমুক্তির জন্য দানখয়রাত করে দিন।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সিরাজে এমন অনেকগুলি পবিত্র স্থান আছে যার প্রতি বাসিন্দাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তারা এসব স্থান জেয়ারত করতে আসে। এ-সবের ভেতর ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফের কবরস্থান একটি। সেখানে শেখ বললেই এ ইমামকে ছাড়া আর কাউকে বুঝায় না। মুসলিম তাপসদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চ। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একবার ত্রিশজন দরবেশকে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে তিনি সিংহলের সরণ দ্বীপে (Adam's peak) যান। পথে এক জনমানবহীন স্থানে পৌছে ক্ষুধায় তাঁরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। সিংহলে অনেক হাতী পাওয়া যায়। সিংহল থেকে ভারতে অনেক হাতী চালান হয়ে আসে। ক্ষুধার যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠে

তখন দরবেশরা একটি ছোট হাতী মেরে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু শেখ তাঁদের বারণ করেন। অবশেষে ক্ষুধায় অস্থির হয়ে তাঁরা শেখকে অমান্য করেই একটি হাতীর বাচ্চা মেরে ক্ষুধা নিবারণ করেন। অবশ্য শেখ হাতীর গোশত ভক্ষণে রাজী হন না। অতঃপর রাত্রে তাঁদের নিদ্রিত অবস্থায় চারদিক থেকে অনেক হাতী এসে সেখানে হাজির হয় এবং তাঁদের প্রত্যেকের ঘ্রাণ নিয়ে একে-একে সবাইকে হত্যা করে। নিদ্রিত শেখেরও ঘ্রাণ নেয় কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না করে সহসা একটি হাতী শুড় দিয়ে তাঁকে নিজের পিঠে তুলে নেয় এবং একটি লোকালয়ে গিয়ে হাজির হয়। গ্রামবাসীরা শেখকে হাতীর পিঠে এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হয়। হাতিটি তখন তাঁকে মাটিতে নামিয়ে রেখে প্রস্থান করে।

এ সিংহল দ্বীপেও আমি সফর করেছি। এখানকার লোকেরা এখনও পৌত্তলিক (বৌদ্ধ) রয়েছে। কিন্তু তা হলেও মুসলমান দরবেশদের এরা সম্মান করে, নিজেদের গৃহে আশ্রয় দেয় এবং আহার করতে দেয়। নিজেদের গৃহে এর স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস করে। ভারতের যে সব পৌত্তলিক (ব্রাহ্মণ ও হিন্দু) বাস করে তাদের রীতিনীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কখনও মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না এবং কখনও নিজেদের পাত্রে পানাহার করতে দেয় না। অথচ কথায় বা কাজে তারা মুসলমানদের প্রতি আপত্তিকর কিছু করে না। এখানে আমরা একবার তাদের হাতে রান্না করা গোশত খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাদের নিজেদের পাত্রেই আমাদের খাদ্য পরিবেশেন করা হল, তারা বসে রইল কিছু দূরে। তারা কলাপাতায় করে আমাদের ভাতও খেতে দিত। ভাত তাদের প্রধান খাদ্য। ভাত দিয়ে তারা চলে যেত। আমাদের খাওয়ার যা কিছু পড়ে থাকত তা কুকুর ও পাখী এসে খেয়ে ফেলত। যদি কোন অবোধ শিশু কখনো এসব খেত তবে তাকে প্রহার করে কিছু গোবর খাইয়ে দেওয়া হত। তারা বলে, এই করে তাকে পবিত্র করা হয়।

সিরাজ নগরের বাইরে যে সব পবিত্র কবর আছে তার মধ্যে ধর্ম প্রাণ শেখ সাদীর[১৮] কবর একটি। ফারসী ভাষায় তিনি তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় অনেক সময় আরবী কবিতা ব্যবহার করেছেন। কবির দ্বারা নির্মিত চমৎকার একটি মুসাফেরখানা এখানে আছে। মুসাফেরখানার ভেতরে সুদৃশ্য একটি ফুলবাগান। নিকটেই রয়েছে রুকনাবাদ নামক প্রসিদ্ধ নদীর উৎপত্তিস্থল। শেখ সাদী কাপড় ধোয়ার জন্য মার্বেল পাথরের কতগুলি চৌবাচ্চা তৈরী করে গেছেন। সিরাজের বাসিন্দারা কবর জেয়ারত করতে এসে এখানেই খেতে পায় এবং নদীতে নিজেদের কাপড় ধুয়ে নেয়। আমিও তাই করলাম—আল্লাহ্ তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।

সিরাজ থেকে দু'মাইল পশ্চিমে কাজারুন। সিরাজ থেকে কাজারুন রওয়ানা হলাম শেখ আবু ইসহাক আল-কাজারুনীর কবর জেয়ারত করতে। ভারত ও চীনের বাসিন্দারা শেখ আবু ইস্‌হাককে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। চীন সমুদ্রে ভ্রমণকালে বাতাস যদি বিপরীত দিকে বইতে থাকে এবং জলদস্যুর আক্রমণের ভয় থাকে তবে ভ্রমণকারীরা শেখ আবু-ইস্‌হাকের নামে মানত করে এবং যে যা মানত করল তা কাগজে লিখে

রাখে। অতঃপর তারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছলে ঐ ধর্ম স্থানের লোকেরা জাহাজে গিয়ে তালিকা দেখে মানতের টাকা পয়সা আদায় করে আনে। ভারত ও চীন থেকে এমন কোন জাহাজ এখানে আসে না যাতে মানতের হাজার হাজার দিনার আদায় না হয়। শেখের নাম করে কোন ফকির এখানে এসে ভিক্ষা চাইলে তাকে শেখের নামের মোহরাঙ্কিত একটি হুকুমনামা দেওয়া হয়। তাতে লেখা থাকেঃ 'যদি কেউ শেখ আবু ইসহাকের নামে মানত করে থাকো তবে অমুককে এত টাকা মানতের টাকা থেকে দিয়ে দাও।" অতঃপর হাজার, শ' বা কমবেশী টাকার কথা উল্লেখ করে দেয়। ফকির কোন মানত কারীর দেখা পেলে তাকে হুকুমনামা দেখিয়ে টাকা আদায় করে অপর পিঠে রশিদ লিখে দেয়।

কাজারুণ থেকে জায়দানের পথে আমরা এলাম হুবায়জা। সেখান থেকে পানিবিহীন মরুভূমির ভেতর দিয়ে পাঁচদিন পথ চলে কুফায়[১৯] হাজির হলাম। এক সময়ে কুফা ছিল আস্‌হাবদের, পণ্ডিতব্যক্তিদের ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের বাসস্থান এবং আমির উল-মোমেনিন হজরত আলীর রাজধানী। কিন্তু এখন সে কুফা পার্শ্ববর্তী যাযাবর আরবদের আক্রমনের ফলে ধ্বংসের কবলে এসে পড়েছে। শহরটির চারদিকে কোন প্রাচীর নেই। এখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মসজিদটির সাতটি গুম্বজ সুউচ্চ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। কারুকার্যখচিত স্তম্ভগুলির একটি অংশ অপরটির উপর পর-পর বসিয়ে জোড়া দেওয়া হয়েছে গলানো সীসার সাহায্যে। এখান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা বীর মাল্লাহা (Salt well) নামক সুন্দর একটি শহরে এসে রাত কাটালাম। সুন্দর এ শহরটির চারদিক তাল বাগানে বেষ্টিত। আমি শহরে প্রবেশ না করে বাইরেই তাঁবু খাটালাম। কারণ, এ শহরের বাসিন্দারা গোঁড়া শিয়া মতাবলম্বী।

পরের দিন ভোরে যাত্রা শুরু করে আমরা 'হিল্লা' শহরে এলাম। ইউফ্রেটিস্ নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত 'হিল্লা' বেশ বড় একটি শহর। শহরের বাজারগুলিতে ফসলাদি ছাড়াও স্থানীয় অনেক শিল্পদ্রব্য কিনতে পাওয়া যায়। এখানে নদীর এপার থেকে ওপার অবধি নৌকার পর নৌকা সার বেঁধে সাজিয়ে সুন্দর একটি সেতু তৈরী করা হয়েছে। নৌকাগুলির 'আগা' ও পাছায় লোহার শিকল লাগিয়ে উভয় তীরে বাঁধা হয়েছে কাঠের শক্ত খুঁটীর সঙ্গে। হিল্লার বাসিন্দারা সবাই 'Twelver' দলভূক্ত শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু তাদের ভেতর আবার রয়েছে দুটি উপদল। এক দলের লোকেরা 'কুর্দ' বলে পরিচিত অপর দলকে বলা হয় 'দুই মসজিদের দল'। দু' দলের ভেতর সর্বক্ষণ ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। শহরের প্রধান বাজারের সন্নিকটে একটি মসজিদ আছে। এ মসজিদটির দরজা রেশমী পর্দায় ঢাকা থাকে। তারা এ মসজিদকে বলে 'জামানার ইমাম' (বা Master of the Age) -এর দরগা। এখানকার প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পূর্বে প্রায় শতেক লোক মুক্ত তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রাদি হাতে নিয়ে নগরের শাসনকর্তার কাছে হাজির হয়। তিনি তাদের জাজিম ও লাগাম লাগানো একটি ঘোড়া বা গাধা দেন। সেই ঘোড়া বা গাধাটি নিয়ে তখন তারা ঢাক ঢোল বাঁশীসহ মিছিল করে পঞ্চাশ জন ঘোড়ার আগে এবং পঞ্চাশ জন পিছনে, ডাইনে বামে অনেক লোক সহ

জামানার ইমামের দরগায় গিয়ে হাজির হয়। দরজার সামনে গিয়ে বলতে থাকে, "বিছমিল্লাহ্, হে জামানার ইমাম, বিছমিল্লাহ্ চলে আসুন, দুর্নীতি শুরু হয়েছে, অবিচার চলছে। এখনই আপনার আগমনের সময়, যাতে আপনার দ্বারা আল্লাহ্ সত্য ও মিথ্যার যাচাই করতে পারেন।" মাগরেবের নামাজের সময় অবধি তারা ঢাক, ঢোল ও বাঁশী বাজিয়ে এমনি করে ডাকতে থাকে। তাদের বিশ্বাস, আল্ হাসান আল্-আসকারির পুত্র মোহাম্মদ এই মসজিদে ঢুকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়েছেন এবং একদিন আবার এখান থেকেই হবে তার আবির্ভাব। কারণ তাদের মতে, ইনিই হবেন সেই 'প্রত্যাশিত ইমাম'।

সেখান থেকে চলে এলাম আমরা কারবালা—হযরত আলীর[২১] পুত্র হোসেনের দরগাহ্। এ কবরটির পারিপার্শ্বিকতা ও জেয়ারতের রীতিনীতি নাজাফে হযরত আলীর কবরের অনুরূপ। এ শহরেরও বাসিন্দারা সবাই শিয়া মতাবলম্বী এবং তারাও দু'টি দলে বিভক্ত। যদিও তারা একই বংশ থেকে উদ্ভূত তবু সর্বক্ষণ পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে। তার ফলে শহরটি ধ্বংসপ্রায় হয়ে গেছে।

তারপর সেখান থেকে এলাম বাগদাদ—শান্তির আগার, ইসলামের রাজধানী[২২]। হিল্লার সেতুর মত এখানে দু'টি সেতু আছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সে সেতুর উপর দিয়ে রাত-দিন নদীর এ-পার ও-পার লোক চলাচল করে। বাগদাদে মোট এগারটি প্রধান (Cathedral) মস্জিদ আছে, তার আটটি নদীর দক্ষিণ তীরে, বাকী তিনটি বাম তীরে। এ ছাড়াও বাগদাদে আরো মসজিদ ও মাদ্রাসা আছে কিন্তু মাদ্রাসাগুলির সবই ভগ্নদশা প্রাপ্ত। বাগদাদে হাম্মাম বা গোসলখানার সংখ্যা প্রচুর এবং সেগুলি সুন্দর ভাবে গঠিত। অধিকাংশ হাম্মামের দেওয়াল পিচ দিয়ে রং করা হয়েছে বলে কাল মার্বেল পাথরের মত দেখায়। কুফা ও বসরার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি ঝরণা থেকে এ পিচ্ সংগ্রহ করা হয়। সেখানে ক্রমাগত পিচের ধারা বয়ে এসে ঝরণার দু'পাশে কাদার মত জমা হয়। শাবলের সাহায্যে তাই তুলে আনা হয় বাগদাদে। প্রতি বেসরকারী গৃহ বা প্রতিষ্ঠানের গোসলখানা রয়েছে। গোলসখানার এক কোণে আছে পানির গামলা (Basin) তার সঙ্গে যুক্ত ঠাণ্ডা ও গরম পানির দু'টি কল। প্রত্যেক স্নানার্থীর জন্য তিনখানা করে তোয়ালের ব্যবস্থা আছে। একখানা থাকে গোলসখানায় ঢুকবার আগে পরবার জন্য, অপরখানা পরে বাইরে আসবার জন্য এবং তৃতীয়খানা শরীর মুছে শুকাবার জন্য। একমাত্র বাগদাদ ছাড়া অপর কোন শহরে আমি এ ধরনের বিস্তৃত ব্যবস্থা দেখি নাই, যদিও কোন-কোন শহরে এর কাছাকাছি সুব্যবস্থা আছে[২৩]। বাগদাদ শহরের পশ্চিমাংশ নির্মিত হয়েছে আগে যদিও তার বহুলাংশ এখন ধ্বংসের কবলে। তা সত্ত্বেও এখানে এখনও তেরটি মহল্লা আছে এবং তার প্রতিটিই একটি শহরের মত এবং প্রতিটি মহল্লায় দু' তিনটি করে গোসলখানা আছে। হাসপাতালটি মনে হয় একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ, যার চিহ্ন মাত্র এখন বর্তমান। শহরের পূর্বাংশে রয়েছে অনেকগুলি বাজার। সবচেয়ে বড় বাজারটিকে বলা হয় মঙ্গলবারের বাজার। শহরের এ অংশে কোন

ফলের গাছ নেই বলে এখানে ফল আনা হয় পশ্চিমের অংশ থেকে। সেখানে ফলের বাগানাদি আছে।

আমার বাগদাদ আগমনের সম সময়ে সেখানে আসেন উভয় ইরাক ও খোরাসানের সুলতান আবু সাঈদ বাহাদুর খান ২৪। ইনি সুলতান মোহাম্মদ খোদাবান্দার পুত্র। সুলতান খোদাবান্দার ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। বর্তমান সুলতান একজন দয়ালু ব্যক্তি। তিনি যখন পিতার মসনদ দখল করেন তখনও বয়সে তিনি বালক মাত্র। তাঁকে নামে মাত্র সুলতান রেখে সমস্ত ক্ষমতা দখল করেছিল প্রধান আমীর জুবান। এভাবেই কিছুকাল চলবার পর একদিন ভূতপূর্ব সুলতানের বেগমগণ জুবানের পুত্র দামাস্ক খাজার ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে নালিশ করেন বর্তমান সুলতানের কাছে। সুলতান জুবানের পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। তাতার সৈন্যদলের সঙ্গে জুবান তখন ছিলেন খোরাসানে। তাতার সৈন্যদল জুবানের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু উভয় পক্ষের সৈন্যরা যখন সামনাসামনি হয় তখন তাতার সৈন্যরাও জুবানকে ত্যাগ করে সুলতানের সঙ্গে যোগদান করে। জুবান অগত্যা সিজিস্তানে (সিস্তান) পলায়ন করতে বাধ্য হয় এবং পরে হিরাতের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন পরেই হিরাতের সুলতান তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ও তার কনিষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করে তাদের মাথা সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর আবু সাইদ যখন সর্বেসর্বা তখন তিনি জুবানের কন্যাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জুবানের কন্যাকে বলা হত বাগদাদ খাতুন। তিনি পরমাসুন্দরী ছিলেন এবং শেখ হাসানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। আবু সাইদের মৃত্যুর পরে শেখ হাসানই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। শেখ হাসান ছিলেন আবু সাঈদের ফুপাত ভাই। আবু সাঈদের হুকুমে হাসান তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং বাগদাদ খাতুন শীঘ্রই আবু সাঈদের প্রিয়তমা পত্নী হয়ে উঠেন। তুর্কী ও তাতারদের মধ্যে মহিলাদের স্থান অতি উচ্চে। তাঁরা যখন কোন হুকুম দেন তখন বলেন, "সুলতান ও মহিলাদের আদেশানুসারে।" প্রত্যেক মহিলাই বিরাট আয়ের কয়েকটি শহর ও জেলার মালিক। সুলতানের সঙ্গে যখন তাঁরা সফরে বের হন তখন তাঁদের জন্য পৃথক তাঁবুর বন্দোবস্ত থাকে।

উপরে বর্ণিত অবস্থায় কিছুদিন চলবার পরে সুলতান দিলশাদ নাম্নী এক নারীকে বিবাহ করেন এবং অচিরেই তার অনুরক্ত হয়ে উঠেন।২৫ তখন বাগদাদ খাতুনকে অবহেলা করার ফলে সে হিংসার বশে একখানা রুমালের সাহায্যে সুলতানকে বিষ প্রয়োগ করে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশ লোপ হয়ে গেল। তখন আমীররা নিজ নিজ প্রদেশের মালিক হয়ে বসলেন। পরে যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, বাগদাদ খাতুনই সুলতানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে তখন তাঁরাও বাগদাদ খাতুনকে হত্যা করবেন বলে স্থির করেন। খাজা লুলু নামে একজন গ্রীক্ ক্রীতদাস ছিলেন প্রধান আমীরদের একজন। বাগদাদ খাতুন যখন স্নানাগারে ছিলেন তখন সেখানে প্রবেশ করে লুলু লাঠির প্রহারে বাগদাদ খাতুনকে হত্যা করেন। এক টুক্‌রা চট দিয়ে ঢাকা অবস্থায় তার মৃতদেহ কয়েকদিনের জন্য সেখানেই পড়েছিল।

অতঃপর আমি সুলতান আবু সাঈদের 'মহল্লার'[২৬] সহগামী হয়ে বাগদাদ ত্যাগ করি। সুলতান কোন্ পথে যান তাই দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তাঁর সঙ্গে দশদিন চলার পরে আমি একজন আমীরের সঙ্গে তাব্রিজ [২৭] শহরে রওয়ানা হই। দশদিন সফরের পরে আমরা তাব্রিজ শহরের বাইরে আস্-শাম নামক একটি জায়গায় হাজির হয়ে তাঁবু খাটালাম। এখানে সুন্দর একটি মুসাফেরখানা আছে। এখানে মুসাফেরদের রুটি, গোশ্ত, ঘৃতপক্ক ভাত ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। পর দিন ভোরে শহরে প্রবেশ করে গাজান বাজার নামে প্রকাণ্ড একটি বাজারে হাজির হলাম। দুনিয়ার যত সুন্দর-সুন্দর বাজার আমি দেখেছি তার একটি গাজান বাজার। প্রত্যেক পণ্য-দ্রব্যের জন্যই এখানে নির্দিষ্ট পৃথক স্থান আছে। স্বর্ণকারদের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে নানা রঙের মণিমুক্তা দেখে আমার চোখ ঝল্‌সে যাবার উপক্রম হল। রেশমী কোমরবন্দ্ সহ মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত সুশ্রী ক্রীতদাসদের সাহায্যে এসব রকমারী মণিমুক্তা দেখানো হয়। তারা মহাজনের সামনে দাঁড়িয়ে তুর্কী বেগমদের এসব দেখায়, বেগমরা তখন এসে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে প্রচুর পরিমাণে কিনতে থাকে। এসব দেখে একটি দাঙ্গা দেখছি বলে মনে হ'ল।—আল্লাহ্ এসব থেকে আমাদের রক্ষা করুন! তারপর গেলাম কস্তুরী ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যের বাজারে। সেখানেও অনুরূপ বা তার চেয়েও খারাপ দাঙ্গা দেখে এলাম।

তাব্রিজে আমরা মাত্র এক রাত্রি কাটালাম । পরের দিন সুলতান আমীরকে ফিরে যাবার নির্দেশ পাঠালেন। কাজেই এখানকার কোন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হবার আগেই ফিরে আসতে হল। ফিরে আসবার পরে আমীর আমার বিষয়ে সুলতানকে বললেন এবং আমাকে চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুলতান আমায় দেশ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে একটি পোশাক ও ঘোড়া আমাকে উপহার দিলেন। আমীর তখন সুলতানকে বললেন যে আমি হেজাজ যেতে চাইছি। তার ফলে তিনি আমাকে রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দিতে হুকুম করলেন। আমীর-উল-হজ্জের সঙ্গে আমার সফরের ব্যবস্থা হল এবং তিনি বাগদাদের শাসনকর্তাকে সে কথা পত্র লিখে জানিয়ে দিলেন। বাগদাদে ফিরে এসে সুলতানের ব্যবস্থা মত সবকিছুই আমি পেলাম। হজযাত্রীর কাফেলা রওয়ানা হতে তখনও দু'মাসের বেশী সময় বাকি ছিল। কাজেই এ সুযোগে মাসুল ও দিয়ার বাকর জেলা দু'টি সফর করে আসা আমার উত্তম বলে মনে হল।

বাগদাদ ত্যাগ করে আমরা দুজাল খালের পাড়ে একটি সরাইখানায় এলাম। তাইগ্রীস নদী থেকে বেরিয়ে এসে অনেকগুলি নদীতে পানি সরবরাহ করছে এ খালটি । দু'দিন পর আমরা এলাম হারবা নামক বড় একটি গ্রামে সেখান থেকে তাইগ্রীস নদীর তীরস্থ আল-মাশুক নামক একটি দূর্গের নিকটে। এর উল্টা দিকে পূর্ব তীরে সুররা-মানরা বা সামারা শহর। এ শহরটির শুধুমাত্র ধ্বংসাবশেষ এখন বর্তমান। এখানকার আবহাওয়া সুষম প্রকৃতির এবং স্থানটি ধ্বংসাব শেষে পূর্ণ হলেও অত্যন্ত মনোরম [২৮] । আরও একদিনের পথ এগিয়ে গিয়ে আমরা তাকরিট পৌঁছলাম । তাকরিট শহরটি বেশ

বড় এবং এখানে সুন্দর-সুন্দর বাজার এবং অনেকগুলি মসজিদ আছে। এ শহরের বাসিন্দারা তাদের বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আরও দু'মঞ্জিল পথ চলে আমরা এলাম আল্-আকর নামে আরেকটি গ্রামে। এখান থেকে একটানা কতগুলি গ্রাম ও আবাদী জমি পার হয়ে মসুল। সেখান থেকে আমরা যেখানে এলাম সেখানকার জমি কাল। বসরা ও কুফার মধ্যকার স্থানের ঝরণার মত এখানকার কুপে পিচ্ পাওয়া যায়। এখান থেকে আরও দু'মঞ্জিল গিয়ে আমরা আল-মাউসিল (মসুল) পৌছলাম।

মসুল একটি পুরাতন বর্ধিষ্ণু শহর। এখানকার সুদৃঢ় দূর্গটি আল-হাদরা (The Humpback) নামে পরিচিত। দূর্গের পরেই সুলতানের প্রাসাদরাজি। শহর থেকে প্রাসাদগুলিকে পৃথক করে রেখেছে বেশ চওড়া একটি দীর্ঘ রাস্তা। রাস্তাটি শহরের শুরু থেকে শেষ অবধি প্রসারিত। শহর বেষ্টন্ করে আছে ঘন-ঘন সন্নিবিষ্ট মিনারওয়ালা দু'টি সুদৃঢ় প্রাচীর। প্রাচীরগুলি এতটা পুরু যে পর-পর অনেকগুলি কোঠা তৈরী করা হয়েছে। প্রাচীরের ভিতরে দিল্লী ছাড়া আর কোথাও আমি এমন নগর প্রাচীর দেখি নাই। শহরের বাইরেই বিস্তৃত শহরগুলি। সেখানে মস্‌জিদ, গোসলখানা, বাজার, মুসাফেরখানা প্রভৃতি সবই আছে। এখানে তাই গ্রীসের তীরে রয়েছে প্রসিদ্ধ একটি মস্‌জিদ। মস্‌জিদের চারদিকে লোহার জাফরি-কাটা জানালা। আর আগে এর সংলগ্ন নদীর দিকে প্রসারিত সুদৃশ্য ও সুগঠিত বেদী। মস্‌জিদের সামনেই একটি হাসপাতাল। এ ছাড়া আরও দু'টি প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ আছে শহরের ভিতরে। মসুলের কায়সারিয়া লোহার দরজাওয়ালা সুন্দর একটি অট্টালিকা।[২৯]

মসুল থেকে আমরা গেলাম জাজিরাত ইবনে ওমর নামক বৃহৎ একটি শহরে। শহরটি নদী দ্বারা বেষ্টিত বলেই নাম হয়েছে জাজিরা (দ্বীপ) । শহরের বহুলাংশ আজ ধ্বংসের কবলে। জাজিরার বাসিন্দারা সচ্চরিত্র ও বিদেশীদের প্রতি সদাশয়। এখানে যেদিন ছিলাম সেদিন আমাদের জুদি পর্বত দেখবার সুযোগ হয়। এই জুদি পর্বতে এসে হজরত নূহ্-এর কিশ্‌তি নোঙর করেছিল বলে কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে। জাজিরাত-ইবনে ওমর থেকে দু'মঞ্জিল এগিয়ে আমরা পৌছলাম নাসিবিন শহরে। মাঝারী আকারের একটি প্রাচীন শহর নাসিবিন। বিস্তীর্ণ একটি উর্বর সমতটে অবস্থিত এ শহরেরও অনেকাংশ ভগ্নদশায় উপনীত। এ শহরে যে গোলাব পানি তৈরী হয় সুগন্ধের জন্য তা অতুলনীয়। নিকটবর্তী একটি পাহাড় থেকে উৎপন্ন নদী শহরটিকে ঘিরে আছে। নদীর একটি শাখা শহরে প্রবেশ করে রাস্তা, বাড়ীঘর, প্রধান মস্‌জিদের চত্বর পার হয়ে দু'টি চৌবাচ্চায় গিয়ে নিঃশেষ হয়েছে। এ শহরে একটি হাসপাতাল ও দু'টি মাদ্রাসা আছে।

অতঃপর আমরা হাজির পর্বতের পাদদেশে স্থাপিত সিন্‌জার[৩০] নামক শহরে । শহরের অধিবাসীরা সাহসী ও দয়ালু প্রকৃতির কুরদ্। সিন্‌জার থেকে এলাম দারা। দারা নামক এ বৃহৎ পুরাতন শহরে মনোরম একটি দূর্গ[৩১] আছে। এ শহরটিও ধ্বংসপ্রায় এবং একেবারেই জনবিরল। শহরের বাইরের জনপদে গিয়ে আমরা থাকবার ব্যবস্থা

করলাম। সেখান থেকে যাত্রা করে পাহাড়ের পাদদেশে মিরিদিন শহরে গেলাম। মুসলমান দেশগুলিতে যে সব সুন্দর সুগঠিত শহর আছে তার মধ্যে মিরিদিন একটি। এখানে যে উলের সূতা তৈরী হয় তা এ নামেই সর্বত্র পরিচিত। পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত এখানে সুউচ্চ একটি দুর্গ আছে। আমি যখন সেখানে যাই তখন মিরিদিনের সুলতান ছিলেন আল্ মালীক আস্-সালি[৩২]। ইরাক, সিরিয়া বা মিসরে দানে তাঁর মত মুক্তহস্ত ব্যক্তি আর নাই। কবি ও দরবেশরা আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর দান গ্রহণের জন্য।

এখান থেকে বাগদাদ ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করতে হল। মসুলে পৌঁছে দেখলাম সেখানকার হজযাত্রী দল বাগদাদের দিকে যাত্রা করে শহর ছেড়ে বাইরে এসেছে। আমিও তাদের শামিল হয়ে গেলাম। বাগদাদে পৌঁছে দেখতে পেলাম, সেখানকার হজযাত্রীরাও যাত্রার আয়োজন করছে। কাজেই আমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করে আমার প্রাপ্যের কথা উল্লেখ করলাম। একটি উটের পিঠের অর্ধাংশ তিনি আমার জন্য বরাদ্দ করে দিলেন আর দিলেন খাদ্য ও চারজনের উপযোগী পানি। এবং তদনুযায়ী একটি হুকুমনামা লিখে দিয়ে আমীর-উল-হজের কাছে আমাকে হাওলা করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু পরে আমাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে আমাকে রেখে তিনি যথেষ্ট যত্ন ও দয়া প্রদর্শন করেন এবং আমার ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে তিনি অনেক বেশী দেন। কুফা ত্যাগ করার পর আমি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হই। সেজন্য আমাকে প্রত্যহ বহুবারের জন্য উটের পিঠ থেকে ওঠানামা করতে হয়। আমীর-উল-হজ সর্বদা আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন এবং আমাকে দেখাশুনা করতে অপর সবাইকে আদেশ দিতেন। আল্লার দরগাহ্ মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত আমি অসুস্থই ছিলাম। সেখানে পৌঁছে যথারীতি পবিত্র কাবা তওয়াফ করলাম এবং আর সব করণীয় বসা অবস্থায় সমাধা করতে হল। সাফা ও মারোয়া গেলাম আমীরের ঘোড়ায় চড়ে।[৩৩] মিনায় এসে আমি অনেকটা ভাল বোধ করতে লাগলাম ও সুস্থ হয়ে উঠলাম। হজের শেষে একটি বছর আমি পুরোপুরিভাবে ধর্মকর্ম উদ্‌যাপনে কাটালাম।

পরের বছর হজ (১৩২৮) সমাপন করে পর-পর আরও দু'বছর আমার সেখানে কাটল।

তিন

১৩৩০ খ্রীস্টাব্দের শেষের হজের পরে আমি মক্কা থেকে ইয়েমেন রওয়ানা হলাম। প্রথমে জুদ্দা (জেদ্দা) এসে পৌছলাম। জেদ্দা সমুদ্রোপকূলে পারশ্যবাসীদের দ্বারা তৈরী একটি প্রাচীন শহর। এখানে এসে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আমার অপরিচিত একজন অন্ধলোক যে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার নাম ধরে ডেকে হাত ধরে বলল, "আংটীটি কোথায়?"

আমার মক্কা শরীফ ত্যাগের পর একজন ফকির এসে ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে দেবার মত কিছুই না-থাকায় আংটীটি খুলে দিয়েছিলাম। আমি অন্ধ লোকটিকে তাই খুলে বল্‌লাম। সে তখন বলল, "ফিরে গিয়ে সেটির খোঁজ করো, কারণ, তার মধ্যে যে নাম লেখা আছে তাতে বিশেষ গোপন ব্যাপার আছে।"

আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম তার এ কথা শুনে এবং তার এ রকম অলৌকিক জ্ঞান দেখে। আল্লাহ্ জানেন এ লোকটি কে ছিল । শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মুয়াজ্জিন এসে শহরের বাসিন্দা মস্‌জিদে কতজন হাজির হয়েছে গণনা করে দেখে। তারা সংখ্যায় যদি চল্লিশ জন হয় তবে ইমাম জুমার নামাজ পড়ান। আর শহরের বাসিন্দাদের সংখ্যা যদি চল্লিশের কম হয় তবে সেদিন তিনি পড়ান চার রাকাত জহুরের নামাজ। বিদেশী মুসাফেরের সংখ্যা সেদিন যত বেশীই হউক, এ গণনার সময় তাদের ধরা হয় না।

আমরা এখানে এসে একটি নৌকায় উঠলাম। নৌকাকে এখানে বলা হয় জল্‌বা। শরিফ মনসুর আরেকটি নৌকায় উঠে আমাকেও তাতে উঠতে বললেন কিন্তু আমি তাতে অস্বীকার করলাম। তাঁর জল্‌বায় উঠান হয়েছিল অনেকগুলি উট। আমি কখনও সমুদ্রে সফর করিনি বলে তাঁর জল্‌বায় উঠতে ভয় হয়েছিল। আমরা অনুকুল বাতাসে দু'দিন চলবার পরে বাতাস পাল্‌টে গেল। তখন আমাদের নৌকা পথ ছেড়ে দূরে যেতে আরম্ভ করল। ঢেউ নৌকায় উঠে আমাদের গায়ে পড়তে লাগল, আরোহীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আয়ধাব ও সাওয়াকিনের মাঝামাঝি রা'স দাওয়াইর' নাম নৌকা ভিড়াবার উপযোগী একটি জায়গায় না-আসা অবধি আমাদের এ আতঙ্ক বজায় ছিল। আমরা

এখানে তীরে উঠে নল খাগড়া দিয়ে মসজিদের আকারে তৈরী একটি ঘর দেখতে পেলাম। তার ভিতর উটপাখীর ডিমের খোলা ভরতি পানি। আমরা সে পানি এবং তা দিয়ে রান্নাও করলাম।

একদল বেজা এল আমাদের কাছে। আমরা উট ভাড়া করলাম তাদের কাছ থেকে। যে জায়গা দিয়ে আমাদের পথ সেখানে ছোট ছোট এক রকম হরিণ আছে প্রচুর। বেজারা সে সব হরিণ খায় না বলে মানুষ দেখেও তারা ভয় পেয়ে পালায় না। দু'দিন পথ চলার পর আমরা সাওয়াকিন (সুয়াকিন) নামক দ্বীপে এসে পৌছলাম । সমুদ্রকুল থেকে ছ'মাইল দূরে অবস্থিত এটি একটি বড় দ্বীপ কিন্তু এখানে না আছে পানি না আছে কোন ফসল বা গাছ-গাছড়া । নৌকা বোঝাই করে এখানে পানি আনা হয়। আর বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য রয়েছে বড়-বড় চৌবাচ্চা। উটপাখীর, হরিণের ও বন্য গাধার গোশ্‌ত এখানে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় অনেক ছাগল, দুধ ও মাখন। সে সব মক্কায় চালান হয়ে যায়। খাদ্যশস্য বলতে এখানে আছে জুরজুর নামে মোটা দানাওয়ালা এক রকম ভূট্টা বা জোয়ার। তাও মক্কায় রপ্তানী হয়ে যায়। আমি সাওয়াকিনে থাকাকালে সেখানকার সুলতান ছিলেন মক্কার আমীরের পুত্র শরীফ জায়েদ।

সাওয়াকিন থেকে আমরা জাহাজে উঠলাম ইয়েমেন যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এ পথে সমুদ্রে অনেক পাহাড় আছে বলে রাত্রে জাহাজ চালান হয় না। সন্ধ্যা হলেই কোন জায়গায় থেমে আবার যাত্রা শুরু হয় ভোরে। জাহাজের কাপ্তেন সর্বক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে থেকে হাল ধরে যে থাকে তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় পাহাড় সম্বন্ধে। সাওয়াকিন থেকে যাত্রার ছ'দিন পর আমরা হালি [২] শহরে পৌছি। আরবের দু'টি গোত্রের লোকেরা প্রধানতঃ বাস করে এ জনবহুল বড় শহরে। সুলতান একজন সৎপ্রকৃতির লোক। তিনি শিক্ষিত এবং একজন কবি। মক্কা থেকে জেদ্দা পর্যন্ত পথে আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। তাঁর শহরে এসে পৌছলে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন এবং কয়েকদিন অবধি আমার মেহমানদারী করেন। আমি তাঁরই একটি জাহাজে চড়ে সারজা এসে পৌছলাম। সারজায় ইয়েমেনের সওদাগরেরা বাস করে।[৩] তারা দয়ালু ও মুক্তহস্ত। মুসাফেরদের খেতে দেয় এবং হজযাত্রীদের সাহায্য করে নিজেদের জাহাজ দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছে দিয়ে এবং অর্থ সাহায্যে করে। আমরা মাত্র একটি রাত্রি কাটালাম সারজা শহরে তাদের মেহমান হিসাবে। তারপরে গেলাম আল-আহওয়াব এবং সেখান থেকে জাবিদ [৪]।

জাবিদ সানা থেকে এক শ বিশ মাইল। সানার পরে জাবিদই ইয়েমেনের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধিশালী শহর। বহু খাল পরিবেষ্টিত অনেক ফলের বাগান আছে এ শহরের আশেপাশে। এখানে কলা ও ঐ জাতীয় আরও ফলাদি জন্মে। শহরটি দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সমুদ্রের উপকুলে নয় এবং এটি দেশের একটি প্রধান শহর। শহরটি যেমন বড় তেমনি জনবহুল। এর চারদিকে তাল বৃক্ষের কুঞ্জ, মধ্যে মধ্যে চলমান খাল। এক কথায় জাবিদ ইয়েমেনের সবচেয়ে সুদৃশ্য ও মনোরম শহর। এখানকার বাসিন্দারাও ব্যবহারে ভদ্র নম্র এবং সৎ ও সুদর্শন। বিষেশতঃ এখানকার নারীরা পরমা সুন্দরী। এ শহরের

লোকদের মধ্যে সুবুত-আন্ নখল নামে প্রসিদ্ধ আনন্দ ভোজের রীতি প্রচলিত আছে। যখন খেজুর রঙ ধরে ও পেকে উঠে তখন প্রতি শনিবার এরা খেজুর বাগানে [৫] গিয়ে জমায়েত হয়। শহরের স্থায়ী বাসিন্দাই হউক বা বিদেশী হউক শহরে তখন একজন লোকও থাকে না। গীতবাদ্যের দল সঙ্গে যায় তাদের আনন্দদানের জন্য, ব্যবসায়ীরা যায় তাদের ফল-ফলাদি ও মিষ্টির পশরা নিয়া। নারীরা সেখানে যায় উটের পিঠে আরোহণ করে। পরমা সুন্দরী হয়েও এখানকার নারীরা নীতিপরায়ণ ও বহু সদ্গুণ সম্পন্না। বিদেশীদের প্রতিও তারা অনুরাগিণী এবং আমাদের দেশের নারীদের মত বিদেশীদের সঙ্গে বিবাহে তারা অসম্মতি প্রকাশ করে না। যখন কোন স্বামী বিদেশে সফরে যায় স্ত্রী তখন তাকে বিদায় সম্ভাষণ দিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসে। শিশু থাকলে স্বামীর অনুপস্থিতিকালে মা-ই তার পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয়। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী তার নিজের খোরপোশ বাবদ কিছুই দাবী করে না। যখন সে স্বামীর সঙ্গে বাস করে তখনও অতি অল্পেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু এখানকার নারীরা কখনও নিজের শহর ছেড়ে কোনক্রমেই অন্যত্র যেতে রাজী হয় না।

সেখান থেকে আমরা ইয়েমেনের সুলতানের রাজধানী তাইজ পৌঁছি। তাইজ দেশের একটি চমৎকার বড় শহর [৬]। কিন্তু এ শহরের বাসিন্দারা স্বেচ্ছাচারী উদ্ধত ও রূঢ় প্রকৃতির লোক। সুলতান যেখানে বাস করে সে শহরের অবস্থা সাধারণতঃ এ রকমই হয়ে থাকে। তাইজ শহরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে সুলতানের প্রাসাদ এবং তাঁর সভাসদগণের বাসস্থান; দ্বিতীয় ভাগের নাম উদায়না, সেখানে সৈনিকদের ঘাঁটি ; তৃতীয় ভাগে সাধারণ লোকদের বাসস্থানসহ হাটবাজার। ইয়েমেনের সুলতান নাসির উদ্দিন আলী ছিলেন রসুলের বংশধর। দরবারের সময় এবং অভিযানের সময় তিনি বিশেষ জাঁকজমক পছন্দ করেন। আমাদের এখানে আগমনের পরে চতুর্থ দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন সুলতানের দরবার বসবার দিন। কাজী আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে আমি তাঁকে সালাম করলাম । সালামের রীতি অনুসারে প্রথমে তর্জনী দ্বারা মাটি স্পর্শ করে সে তর্জনী মাথায় ঠেকিয়ে বলতে হয় "খোদা শাহানশার হায়াত দারাজ করুক।" কাজীকে সে রকম করতে দেখে আমি তাঁরই অনুসরণ করলে সুলতান আমাকে তাঁর সামনে বসতে বললেন। বসতে বলে আমার দেশ, আমার দেখা অন্যান্য দেশ ও দেশের সুলতানের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করলেন। উজির সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুলতান তাঁকে আমার সঙ্গে সম্মানসূচক ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। [৭] তাঁর মেহমানদারীতে কিছুদিন কাটিয়ে, আমি যাত্রা করলাম প্রাক্তন রাজধানী সানার পথে। ইট ও পলেস্তরা দিয়ে তৈরী সানা জনবহুল শহর। শহরের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং পানি উত্তম। বৃষ্টি সম্বন্ধে ভারত, ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ার আশ্চর্য ব্যাপার এই, এসব জায়গায় বৃষ্টিপাত হয় গ্রীষ্মের সময়, বিশেষ করে সে সময়ের বিকেলবেলা, কাজেই বিদেশী ভ্রমণকারীরা বৃষ্টির ভয়ে দুপুরের দিকেই তাড়াহুড়া করে কাজকর্ম সারতে চেষ্টা করেন। বৃষ্টিপাত সে সব জায়গায় প্রচুর হয় বলে শহরের লোকেরাও তার

আগে গৃহে ফিরে আসে। সমস্ত সানা শহরটি পোস্তা বাঁধানো বলে বৃষ্টি হলেও রাস্তাঘাট ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

সেখান থেকে আমি ইয়েমেনের সমুদ্রোপকুলের এডেনে এসে হাজির হলাম। এ বন্দরটি পবর্তবেষ্টিত এবং মাত্র একটি দিকে রয়েছে প্রবেশ পথ। এখানে না আছে কোন ফসল বা গাছ-গাছড়া, না আছে পানি। বৃষ্টির পানি ধরবার জন্য অনেক বড়-বড় চৌবাচ্চা রয়েছে এখানে। অনেক সময় আরবরা এখানকার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়। তখন টাকা-পয়সা ও কাপড়ের টুকরার বিনিময়ে পানি সরবরাহের পুনঃ প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে হয়। এখানে অত্যাধিক গরম অনুভূত হয়। এডেন ভারতীয়দের বন্দর এবং কিন্‌বায়াত (ক্যাম্বে), ফাওলাম (কুইলন) কালিকট এবং মালাবারের বহু বন্দর থেকে বড়-বড় জাহাজ যাতায়াত করে এ বন্দরে। এখানে ভারতীয় সওদাগরেরা বাস করে, মিসরের অনেক সওদাগরও এখানে রয়েছে। এখানকার সমস্ত বাসিন্দাই হয় সওদাগর, মোটবাহী, নয় তো মৎস্যজীবী। কোন কোন ব্যবসায়ী বিশেষ বিত্তশালী । তাঁদের কেউ-কেউ এত ধনশালী যে একাই সমুদয় সাজসরঞ্জামসহ একটি জাহাজের মালিক। এ নিয়ে সওদাগরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পর্যন্ত চলে। তা সত্ত্বেও তাঁরা ধর্মপরায়ণ, বিনয়ী, সৎ ও সদয় প্রকৃতির লোক। বিদেশীদের প্রতি তাঁদের ব্যবহার ভাল, ধার্মিকদের মুক্তহস্তে দান-খয়রাত করেন এবং যাকাতাদি খোদার প্রাপ্য যথারীতি আদায় দেন।

এডেন বন্দরে জাহাজ ধরে চার দিন সমুদ্রপথে চলার পর আমি জায়লা (Zayla) পৌছি। বারবেরা নামক কাফ্রী সম্প্রদায়ের লোকদের শহর এটি। জায়লা থেকে দু'মাসের পথ মাগডাশা অবধি বিস্তৃত তাদের এ দেশটি মরুভূমিসঙ্কুল । বড় বাজার সহ জায়লা বেশ বড় শহর কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে এ শহরটি সবচেয়ে নোংরা ও জঘন্য দুর্গন্ধময় শহর। তার কারণ এখানে যথেষ্ট মাছ আমদানী হয় এবং এখানকার বাসিন্দারা রাস্তায় উট জবাই করে রক্ত সেখানেই ফেলে রাখে। সমুদ্র তরঙ্গ সঙ্কুল থাকা সত্ত্বেও আমরা শহরের অপরিচ্ছন্নতা এড়াবার জন্য জাহাজে রাত কাটালাম।

জায়লা থেকে সমুদ্রপথে পনরদিন জাহাজ চালিয়ে আমরা এলাম মাগডাশা (মাগদিসু)। মাগডাশা বিস্তৃত একটি শহর। এখানকার বাসিন্দারা ব্যবসায়ী এবং প্রত্যেকে বহু উটের মালিক। শত শত উট এখানে জবাই হয় খাদ্যের জন্য। কোন জাহাজ এসে এখানে ভিড়লে সামবাক নামক ছোট-ছোট নৌকা গিয়ে তার গায়ে লাগে। প্রত্যেক নৌকায় থাকে একদল যুবক, তাদের হাতে ঢাকা দেওয়া খাবারের থালা। জাহাজে যে সব সওদাগরেরা আসে তাদের একজনের হাতে খাবারের থালা দিয়ে বলে "ইনি আমার মেহমান।" এমনি করে সবাই এক এক জনকে মেহ্মান মেনে নেয়। সওদাগররাও তখন শুধু সেই মেজ্‌বানের বাড়ি যায়। যারা পূর্বে এ শহরে এসেছে এবং পূর্ব থেকেই লোকজনের সঙ্গে পরিচিত তারা যেখানে খুশী যেতে পারে। অতঃপর মেজ্‌বান সওদাগরের হয়ে তার জিনিসপত্র বেচাকেনা করে দেয়। যদি কেউ কোন জিনিস সওদাগরের কাছ থেকে অত্যন্ত কম দামে কিনে অথবা মেজ্‌বানের অনুপস্থিতিতে

সওদাগরের কাছে কেউ কিছু বিক্রয় করে তবে সে কেনাবেচা সিদ্ধ হয় না। এ রীতি সওদাগরদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এ সব যুবকের দল আমাদের জাহাজে উঠলে তাদের একজন এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার সঙ্গীরা বললেন, "ইনি সওদাগর নন; একজন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ লোক ইনি।" তা শুনে যুবক তার বন্ধুদের ডেকে বলল, "ইনি কাজীর মেহ্মান।" তাদের দলে কাজীর লোকও ছিল। সে ছুটে গেল কাজীকে খবর দিতে। কাজী তখন সমুদ্রতীরে এলেন তাঁর একদল ছাত্র সঙ্গে নিয়ে। ছাত্রদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে। আমার দলবল নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে তাঁকে সালাম করলে তিনি বললেন, "বিসমিল্লাহ্ বলে চলুন আমরা শেখকে ছালাম করতে যাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "শেখ এখন কে?"

তিনি বললেন, "সুলতান।" সুলতানকে তাঁরা এখানে শেখ বলেন।

আমি তখন বললাম, "থাকবার জায়গায় ঠিকঠাক হয়ে গিয়ে দেখা করব তাঁর সঙ্গে।"

তিনি জবাব দিলেন, "কোন শাস্ত্রবিদ, শরিফ বা ধার্মিক কেউ এখানে এলে এখানকার রীতি অনুসারে বাসস্থানে যাবার আগেই দেখা করতে হয় শেখের সঙ্গে।"

কাজেই, তাঁর কথা মত শেখের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বারবেরা সম্প্রদায়ের এ সুলতানের নাম আবু বকর। আরবী জানা সত্ত্বেও তিনি কথা বলেন মাগডিসি ভাষায়। আমরা প্রাসাদে পৌঁছে অন্দরে খবর পাঠালে একজন খোজা এল থালায় পান সুপারী নিয়ে। সে আমাকে ও কাজীকে দশটি করে পান ও কিছু সুপারী দিয়ে বাকী সব দিল আমার সঙ্গীদের এবং কাজীর ছাত্রদের। পরে বলল, "আমাদের হুজুর বলেছেন, ইনি থাকবেন ছাত্রদের সঙ্গে।"

পরে সে খোজা ভৃত্যই প্রাসাদ থেকে আমাদের খাবার নিয়ে এল। তার সঙ্গে এল উজির । মেহ্মানদের দেখাশুনা করবার ভার তাঁর উপর। তিনি বললেন, "আমাদের হুজুর আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা ও অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।"

আমরা সেখানে তিন দিন ছিলাম। প্রত্যহ তিন বার করে খাবার দেওয়া হত আমাদের। চতুর্থ দিন ছিল শুক্রবার। সেদিন কাজী ও একজন উজির আমাকে এক প্রস্থ পোশাক এনে দিলেন। অতঃপর আমরা মসজিদে গেলাম এবং সুলতানের পর্দার [৮] আড়ালে থেকে নামাজ আদায় করলাম। শেখ বাইরে এলে আমি তাঁকে অভিবাদন জানালাম। তিনিও আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। অতঃপর নিজে পাদুকা পরে আমাদেরও আদেশ করলেন আমাদের নিজ নিজ পাদুকা পরে নিতে। পাদুকা পরা হলে আমাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে প্রাসাদের দিকে চললেন। বাকি সবাই চলে গেল খালি পায়ে। শেখের মাথার উপরে ধরা হয়েছে রঙ্গীন রেশমের চারটি চাঁদোয়া। প্রতিটি চাঁদোয়ার উপরে একটি করে সোনার পাখী। 'প্রাসাদের রীতিনীতি পালন করার পর সবাই সালাম করে নিজ নিজ পথে চলে গেল।

সাওয়াহিল দেশে কুল্ওয়া (কিলওয়া, কুইলোয়া) শহরে যাবার উদ্দেশ্যে আমি মাগডাশা থেকে আবার জাহাজে চড়লাম। এ শহরটি জান্জ[৯] নামক কাফ্রীদের । আমরা

মোম্বাসা নামক বড় একটি দ্বীপে এলাম। সাওয়াহিল দেশ ১০ থেকে সমুদ্রপথে এখানে পৌঁছতে দু'দিন লাগে। দ্বীপের বাইরে মূল ভূমিতে এ দ্বীপের কোন অংশ নেই। দ্বীপে ফলের গাছ আছে কিন্তু কোন খাদ্যশস্য নেই। খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় সাওয়াহিল থেকে। এ দ্বীপের বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্য কলা ও মাছ। বাসিন্দারা ধর্মপরায়ণ, সম্মানী এবং সৎপ্রকৃতির। শহরে কাঠের সুগঠিত মসজিদ আছে। এ দ্বীপে আমরা এক রাত্রি কাটালাম। তারপরে যাত্রা করলাম উপকূল শহর কুল্‌ওয়ার উদ্দেশ্য। এ শহরের লোকেদের অধিকাংশ জ্ঞানজ। তাদের গাত্র বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ, মুখে উল্‌কির চিহ্ন। একজন সওদাগর আমাকে বলেছিলেন, কুল্‌ওয়া থেকে পনর দিনের পথ দক্ষিণে সুফালা। লিমিদের দেশ জুফি থেকে সুফালায় স্বর্ণরেণু আনা হয়। সুফালা থেকে জুফি এক মাসের পথ ১১ । কুল্‌ওয়া একটি সুন্দর শহর। শহরের সমস্ত ঘরবাড়ী কাঠের তৈরী। কুল্‌ওয়ার সঙ্গেই নাস্তিক জান্‌দের দেশ বলে কুল্‌ওয়ার বাসিন্দাদের সর্বক্ষণ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়। আমার সময়ে এখানে বাসিন্দাদের সর্বক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়। আমার সময়ে এখানে সুলতান ছিলেন আবুল মুজাফ্‌ফর হাসান। দান-ধ্যানের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর যা কিছু পাওয়া যেত, কোরাণের নির্ধারিত নীতি ১২ অনুযায়ী তার একপঞ্চমাংশ তিনি দাতব্য কাজের জন্য পৃথক করে রাখতেন। আমি দেখেছি একজন ফকির এসে চাইলে তিনি তাঁর গায়ের কাপড় দান করে দিলেন সেই ফকিরকে '। এ দানশীল ও নীতিপরায়ন সুলতানের এন্তেকালের পর সুলতান হলেন তাঁর ভাই দাউদ। এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভাইয়ের বিপরিত প্রকৃতির লোক। যখনই কেউ এসে তাঁর কাছে কিছুর আবেদন করত, তিনি বলতেন, "যিনি দিতেন তিনি মরে গেছেন এবং দেবার মত কিছুই রেখে যাননি।"মুসাফেররা তাঁর ওখানে মাসেক থাকবার পর তিনি তাদের যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে বিদায় করতেন। তার ফলে তাঁর দরজায় আর কেউ কখনও আসত না।

কুল্‌ওয়া থেকে আমরা যাত্রা করি দাফারি (দোফার)। দাফারি ইয়েমেনের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এখান থেকে ভাল জাতের ঘোড়া ভারতে রপ্তানী হয়। অনুকূল বাতাসে এখান থেকে ভারতে জাহাজ যেতে একমাস সময় লাগে। এডেন থেকে মরুভূমির মধ্য দিয়া দাফারি আসতে একমাস লাগে। শহরটি লোকালয়হীন স্থানে অবস্থিত। এখানকার বাজারটি অত্যন্ত নোংরা, কারণ প্রচুর মাছ ও ফল আমদানী হয় এ বাজারে। এখানকার মাছ সামুদ্রিক পোনা জাতীয় এবং অত্যন্ত তৈলাক্ত। একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই, পোনা জাতীয় এ মাছ এখানে পশুর প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর আর কোথাও এমন ব্যাপার আমার চোখে পড়ে নাই। বাজারের বেশীর ভাগ বিক্রেতা কাল রঙের বস্ত্র পরিহিতা ক্রীতদাস নারী। এখানকার বাসিন্দারা ভুট্টার চাষ করে এবং গভীর কূপ থেকে তুলে জমিতে পানি সেচন করে। ক্রীতদাসদের কোমরে দড়ি বেঁধে মস্ত বড় বালতির সাহায্য কূপ থেকে সেই পানি তোলা হয়। এদের প্রধান খাদ্য ভাত। সেজন্য চাউল আমদানী করা হয় ভারত থেকে। এখানকার বাসিন্দাদের একমাত্র জীবিকা ব্যবসায়।

এখানে কোন জাহাজ এসে ভিড়লে তারা কাপ্তেন, খালাসী থেকে শুরু করে সবাইকে সুলতানের গৃহে নিয়ে যায় এবং তাদের ভোজন করায় তিন দিন অবধি। এমনি করে তারা জাহাজীদের কাছে সুনাম অর্জন করে। আরও একটি আশ্চার্য ব্যাপার এই, এখানকার লোকদের রীতিনীতির সঙ্গে পুরোপুরি মিল আছে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার লোকদের সঙ্গে। শহরের আশেপাশে অনেক ফলের বাগানেই কলা গাছ রয়েছে। এখানকার কলার আকারও বেশ বড়। আমার সাক্ষাতেই একটা কলা ওজন করে দেখা গেল সেটি বার আউন্স। এখানকার কলা মিষ্টি ও সুস্বাদু। এখানকার লোকেরা পান ও নারিকেলের চাষ করে, যা শুধু ভারতে ও এখানেই দেখা যায়।[১৩] আমি এ দু'টি জিনিষের উল্লেখ করেছি বলে বিস্তারিত ভাবেই এ সম্বন্ধে বলছি।

পান গাছ আঙ্গুরের লতার মত জন্মে। পান গাছের কোন ফল হয় না। শুধু পাতার জন্য এ গাছ জন্মানো হয়। পান সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা খুব উচ্চ। কোন লোক বন্ধুর বাড়ী দেখা করতে গেলে বন্ধু যদি তাকে পাঁচটি পান এনে দেয় তবে মনে করতে হবে তাকে সারা দুনিয়া দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে দাতা যদি নবাব বাদশা বা ঐরকম কেউ হন। সোনা রূপার দানের চেয়ে পানের দান বেশী সম্মানজনক। পান ব্যবহার করা হয় নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে। প্রথমে নিতে হয় সুপারী। সুপারী জায়ফলের মত জিনিষ। সুপারীগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে কেটে চিবানো হয়। তারপরে লওয়া হয় পান। পানে একটু Chalk লাগিয়ে সুপারীসহ একত্রে চিবাতে হয়। পান শ্বাসপ্রশ্বাস মিষ্ট করে, হজমের সহায়তা করে, খালি পেটে পানি খাওয়ার দোষ নিবারন করে এবং কর্মশক্তি উদ্দীপিত করে।

আরেকটি আশ্চর্যজনক জিনিষ নারিকেল গাছ। নারিকেল গাছ দেখতে ঠিক খেজুর গাছের মত। নারিকেল মানুষের মাথার সদৃশ। কারণ, নারিকেলের দু'টি চোখের এবং একটি মুখের চিহ্ন আছে। তা'ছাড়া কচি নারিকেলের শাঁস 'মগজের' মত। মাথার চুলের মত নারিকেলের ছিবড়া আছে। ছিবড়া দিয়ে দড়ি তৈরি হয়। তার-কাঁটার পরিবর্তে সেখানে দড়ি ব্যবহৃত হয় জাহাজ তৈরির কাজে। তাছাড়া ছিবড়া দিয়ে কাছিও তৈরি হয়। নারিকেলের গুণের মধ্যে প্রধান হল,—নারিকেল শরীরে শক্তি বাড়ায়, শরীর মোটা করে, এবং মুখমণ্ডলে লালিমা এনে দেয়। কচি নারিকেল কাটলে চমৎকার টাট্‌কা মিষ্টি পানীয় পাওয়া যায়। পানি পান করার পরে চামচের মত এক টুকরা খোসা নিয়ে শাঁস চেছে তুলতে হয়। এর স্বাদ ডিমের মত, যে ডিম সিদ্ধ অথচ পুরোপুরি রান্না করা নয়। নারিকেলের শাঁস পুষ্টিকর। আমি মালদ্বীপে দেড় বছর কাল নারিকেল খেয়ে বাস করেছি। এ ফলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য,—তৈল, দুধ ও মধু এর ফল থেকে পাওয়া যায়। মধু বের করা হয় নিম্ন বর্ণিত উপায়ে। নারিকেল গাছের যে বৃন্তে ফল ধরে তা কেটে ফেলা হয় দু'আঙ্গুল পরিমাণ বাকি রেখে। তার সঙ্গে একটি ছোট হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। কাটা বৃন্ত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রস ঝরে হাঁড়িতে জমা হয়। ভোরে এ রকম করা হলে বিকেলে একজন লোক দু'টি হাঁড়ি নিয়ে গাছে ওঠে। একটি হাঁড়িতে থাকে পানি, অপরটিতে ঢেলে আনা হয় সারাদিনের জমা রস। তারপরে বৃন্তটি ধুয়ে সামান্য একটু কেটে দেওয়া হয়। কেটে দেবার পর আরেকটি হাঁড়ি বেঁধে রাখা হয়। যথেষ্ট পরিমাণে রস জমা না হওয়া অবধি প্রতিদিন ভোরে একই রকম করা হয়। যথেষ্ট রস জমা হলে

তা জ্বল দিয়ে গাঢ় করা হয়। এমনি করে অতি চমৎকার মধু তৈরী হয় এবং ভারত, ইয়েমেন ও চীনের সওদাগরেরা তা কিনে দেশে নিয়ে মিষ্টি তৈরী করে। নারিকেলের (কোরানো) শাঁস পানিতে ডুবিয়ে রাখলে সেই পানির রঙ ও স্বাদ দুধের মত হয় এবং অন্য খাদ্যের সঙ্গে তা খাওয়া হয়। তৈল তৈরী করতে হলে পাকা নারকেলের শাঁস রৌদ্রে শুকাতে হয়, তারপর কড়াইতে জ্বাল দিয়ে তৈল নিষ্কাষণ করা হয়। এ তৈল দ্বারা বাতি জ্বালানো হয়, রুটীর সঙ্গে খাওয়া হয় এবং মেয়েরা মাথায় ব্যবহার করে।

মাসিরার একজন লোকের ছোট একখানা জাহাজে আমরা দাফারি থেকে ওমান যাত্রা করলাম। যাত্রার দ্বিতীয় দিনে আমরা হাসিক[১৪] নামক জাহাজ ভিড়বার একটি জায়গায় গিয়ে জাহাজ থেকে নামলাম। হাসিকে প্রধানতঃ আরবীয় মৎস্যজীবিরা বাস করে। এখানে বহু ধূপ গাছ আছে। ধূপ গাছের পাতা সরু সরু। পাতা কেটে দিলে দুধের মত রস পড়তে থাকে। রস থেকে প্রথমে হয় গঁদ পরে ধূপ। এ বন্দরের বাসিন্দাদের জীবিকা প্রধানতঃ নির্ভর করে মাছের উপর। লুখাম নামক যে মাছ এখানে ধরা হয় তা অনেকটা ক্ষুদ্রকায় হাঙরের মত। এ সব মাছ ধরার পরে তারা লম্বা করে কেটে রৌদ্রে শুকায় এবং খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এখানে এসব মাছের কাঁটা দিয়ে ঘর তৈরী করা হয়। ঘরের চাল তৈরী হয় উটের চামড়া দিয়া।

ছয় দিন পর আমরা এক জনমানবহীন পাখীর দ্বীপে এসে পৌছলাম। নোঙ্গর ফেলে আমরা গিয়ে ডাঙ্গায় উঠলাম এবং দেখতে পেলাম অসংখ্য পাখীতে দ্বীপ ছেয়ে আছে। 'ব্ল্যাকবার্ড' জাতীয় পাখী কিন্তু আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। নাবিকরা কতকগুলি পাখীর ডিম সংগ্রহ করে রান্না করে খেল। তারপর ধরে আনল কতকগুলি পাখী। সেগুলি জবাই না করেই কেটে রান্না করে ফেলল[১৫]। আমার খাদ্য ছিল তখন শুকনো খেজুর আর মাছ। প্রতিদিন সকালে বিকেলে এরা মাছ ধরত। ধরা মাছ রান্না করে এরা সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দিত। মাছ ভাগের বেলা জাহাজের কাপ্তেনকেও বেশী দিত না। আমরা সে বছর হজ পর্ব সমুদ্রের বুকেই পালন করলাম। সে দিনের সারাদিন এবং পরের দিনেরও সূর্যোদয় অবধি সমুদ্র ছিল তরঙ্গসঙ্কুল। আমাদের সামনেই একটি জাহাজডুবি হয় এবং তার একটি লোকমাত্র অনেক কষ্টে সাঁতরে নিজের জীবনরক্ষা করে।

অতঃপর আমরা গেলাম মাসিরা নামক একটি বড় দ্বীপে। এ দ্বীপের অধিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে মাছের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।[১৬] জাহাজ ভিড়াবার জায়গা দূরে বলে আমরা এ দ্বীপে উঠিনি। তা ছাড়া এ দ্বীপের লোকেরা জবাই না করেই পাখী খায় বলে তাদের প্রতি আমার একটা বীতরাগের ভাবও এসেছিল।

মাসিরা থেকে একরাত ও একদিন জাহাজ চালিয়ে আমরা সার নামক একটি বড় গ্রামে এসে জাহাজ ভিড়ালাম। সেখান থেকে একটি ঢালু পাহাড়ের গায়ে নির্মিত কালহাট শহর দেখা যায় এবং খুব নিকটে বলে মনে হয়।[১৭] দুপুরের পরেই আমরা এখানে এসে নোঙর করেছিলাম বলে আমার ইচ্ছে হল পায়ে হেঁটে কালহাট গিয়ে সেখানেই রাত কাটাব। কারণ, জাহাজের লোকদের ব্যবহার আমি পছন্দ করছিলাম না। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, বিকেলে মাঝামাঝি সময়ে সেখানে যেয়ে পৌছতে পারি। কাজেই একজন খালাসীকে চালক হিসেবে ভাড়া করে নিলাম। খিদর নামক

একজন আমাদের সঙ্গে জাহাজের যাত্রী। সে আমার সঙ্গী ছিল। আমার সঙ্গের অন্যান্য লোকদের জাহাজে রেখে গেলাম জিনিষপত্র পাহারা দিয়ে রাখবার জন্য। কথা হল, পরের দিন তারা গিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আমার কিছু কাপড় জামা সঙ্গে নিলাম। ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সেগুলি বইবার ভার দিয়েছিলাম চালকের উপর। আমি নিজে নিয়েছিলাম একটা বর্শা। এদিকে চালক মতলব করেছে, সেগুলি চুরি করবে। কাজেই সে আমাদের নিয়ে গেল সমুদ্রের একটা খাঁড়ির দিকে। সেখানে নিয়ে কাপড়সহ খাঁড়ি পার হতে শুরু করল। আমি তখন বললাম, "কাপড়গুলি রেখে তুমি একলা পার হয়ে যাও। আমরা পারি তো যাব, না হলে খুঁজে দেখব পানি কোথায় অগভীর!" তখন সে ফিরে এল। একটু পরে দেখতে পেলাম, কয়েকজন লোক সেখান দিয়ে সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছে। তখন ঠিকই ধারণা হল, চালক আমাদের ডুবিয়ে মেরে কাপড় চোপড় নিয়ে সরে পড়বার মতলব করেছিল। বাইরে আমি নিশ্চিন্তভাব বজায় রেখে ভেতরে ভেতরে হুঁশিয়ার ছিলাম আর চালককে ভয় দেখাবার জন্য সারাক্ষণ হাতের বর্শাটা উঁচিয়ে রেখে চলছিলাম। তারপর পানিহীন একটা সমতল ভূমিতে পৌঁছে পিপাসায় ভয়ানক কষ্ট পেলাম। অতঃপর খোদার অনুগ্রহে একজন অশ্বারোহী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আরও লোকজন সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা আমাদের পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করালেন। তখন শহরের খুব কাছাকাছি এসে গেছি মনে করে আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু আসলে তখনও আমাদের সামনে কতকগুলি নালা ছিল। আরও মাইল কয়েক হাঁটার পর সন্ধ্যাবেলা চালক আমাদের নিয়ে যেতে চাইল সমুদ্রের উপকূলের দিকে। সে দিকটা পাহাড় সমাচ্ছন্ন বলে সেখানে কোন রাস্তাঘাট ছিল না। আমাদের পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে পারলে সে কাপড় জামাগুলি নিয়ে পালাবে এই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু আমি তখন এ রাস্তা ছেড়ে আর কোন রাস্তায় যেতেই রাজী হলাম না। আমার ভয় ছিল, পথে আমাদের মারধর করবে বলে। কতটা পথ শহরে পৌঁছতে তখনও বাকি আছে তাও আমাদের জানা ছিল না। কাজেই, ঠিক করলাম, রাস্তা ছেড়ে একদিক সরে নিয়ে আমরা ঘুমাব। যদিও আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তবু ক্লান্তির ভাব গোপন করে জামা-কাপড়গুলি নিজের কাছে রেখে বর্শা হাতে বসে রইলাম। আমার সঙ্গীটিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে ও আমাদের চালক ঘুমিয়ে পড়ল, আমি জেগে রইলাম। আমাদের চালক যখনই একটু নড়ে চড়ে উঠছিল তখনই তার সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে দিচ্ছিলাম যে আমি জেগেই আছি। ভোরে আমি চালককে পাঠালাম পানি খুঁজে আনতে। তখন আমার সঙ্গী নিল কাপড়গুলি। তখন আমাদের কয়েকটি ছোট নদী ও নালা পার হতে বাকি ছিল। চালক পানি নিয়ে এল। অবশেষে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আমরা এসে কালহাট শহরে পৌঁছলাম। জুতোর ভিতরে আমার পা দু'টি এমনভাবে ফুলে উঠেছিল যে, প্রায় রক্ত বেরিয়ে আসছিল। তখন আবার আমাদের চরম দুরবস্থা স্বরূপ দ্বার-রক্ষক পীড়াপীড়ি করতে লাগল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাদের শাসনকর্তার কাছে হাজির করবে বলে। ভাগ্যক্রমে শাসনকর্তা ছিলেন খুব দয়ালু লোক। তিনি আমাকে সেখানে রেখে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি ছয় দিন কাটালাম। পায়ের ক্ষতের জন্য এ কয়দিন আমি চলাফেরা করতে পারিনি।

কালহাট শহরটি সমুদ্রের তীরে। এখানে ভাল বাজার এবং অতি সুদৃশ্য একটি মসজিদ আছে। মসজিদের দেওয়ালগুলি কাশানী টালি দিয়ে সাজানো। মসজিদটি বেশ

উচ্চস্থানে অবস্থিত বলে এখান থেকে সারা শহর ও পোতাশ্রয় নজরে পড়ে। এখানে এসে এমন এক রকম মাছ খেলাম যা আর কোথাও খাইনি। যে কোন রকম মাংসের চাইতে সে মাছ আমার কাছে ভাল লেগেছিল বলে আমি এ মাছ ছাড়া আর কিছুই খেলাম না। মাছগুলি গাছের পাতার সাহায্যে ভেজে ভাতের সঙ্গে খেতে দেয়। ভাতের জন্য সমুদ্র পথে তারা ভারত থেকে চাউল আমদানী করে। এখানকার বাসিন্দারা ব্যবসায়ী। ভারত মহাসাগর দিয়ে যা কিছু আসে তারই উপর এদের জীবিকা। কোন জাহাজ এসে এ বন্দরে পৌঁছলে তাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না।

অতঃপর সেখান থেকে যাত্রা করে ছয়দিন পর আমরা ওমান দেশে পৌঁছি।[১৮] নদী নালা, গাছপালা, বাগান, তালবন এবং অনেক রকম ফল দেখে বুঝা যায় দেশটি উর্বর। এখানকার রাজধানী নাজওয়া পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে সুন্দর বাজার ও পরিচ্ছন্ন মসজিদ আছে। এ শহরের বাসিন্দাদের মসজিদের চত্বরে বসে আহার করা অভ্যাস। যার যা খাবার আছে সবাই এখানে এনে একত্র বসে খায় এবং মুসাফেররাও তাদের সঙ্গে যোগদান করে। এরা খুব সাহসী ও যুদ্ধে পারদর্শী বলে সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই আছে। এখানকার সুলতান আজ্‌দ্‌ গোত্রের একজন আরবী। তাঁকে বলা হয় আবু মোহাম্মদ। ওমানের শাসনকর্তা মাত্রেরই পদবী আবু মোহাম্মদ।[১৯] সুমদ্রোপকূলের বেশীর ভাগ শহর হরমুজ সরকারের শাসনাধীন।

আমি অতঃপর হরমুজ দেশে এলাম। হরমুজ নামে সমুদ্রের তীরে একটি শহর আছে। এ শহর মুর্গিস্তান নামেও পরিচিত। শহরের উল্টা দিকে সমুদ্রের নয় মাইল ভিতরে একটি দ্বীপ আছে। দ্বীপটির নাম নতুন হরমুজ।[২০] এ দ্বীপে যে শহরটি আছে তার নাম জারাওন। শহরটি যেমন বড়, তেমনি সুন্দর। বাজারগুলিও কর্মব্যস্ত। কারণ এ বন্দর থেকেই ভারত ও সিন্ধু থেকে আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য উভয় ইরাক, ফারস ও খোরাসানে চালান দেওয়া হয়। দ্বীপটি লোনা এবং দ্বীপের বাসিন্দারা বসরা থেকে আমদানী করা মাছ ও খেজুর খেয়ে জীবনধারণ করে। এখানকার লোকেরা নিজেদের ভাষায় বলে, "খোরমা ওয়ামাহি লুতি পাদশাহী" অর্থাৎ খেজুর ও মাছ শাহী খাদ্য। এ দ্বীপে পানি একটি বিশেষ মূল্যবান বস্তু। শহর থেকে দূরে কূপ ও বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখবার জন্য চৌবাচ্চা আছে। লোকেরা সেখানে গিয়ে মশক ভর্তি করে সমুদ্রের তীরে আনে এবং তারপর নৌকার সাহায্যে দ্বীপে আনে। আমি একটি আশ্চর্যজনক জিনিষ এখানে দেখলাম। বড় মসজিদের দরজায় বিশাল একটি মাছের মাথা ফেলে রেখে যার আকার ছোটোখাটো একটি পাহাড়ের টিলার সমান। তার এক একটি চোখের কোটর ঘরের দরজার মত। লোকেদের দেখা যায় তার এক চক্ষু দিয়ে ভেতরে ঢুকে আরেক চক্ষু দিয়ে বেরিয়ে আসে।

হরমুজের সুলতান কুতুবউদ্দিন তাহামতান একজন অতিশয় দয়ালু ও নম্র প্রকৃতির শাসনকর্তা। যে সব ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ বা ধর্মপরায়ণ লোক কিংবা শরিফ এখানে আসেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে হক আদায় করা তাঁর অভ্যাস। আমরা তাঁকে গিয়ে পেলাম বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায়। সেখানে ষোলদিন কাটিয়ে ফিরে আসবার সময় আমার এক সঙ্গীকে বললাম, "সুলতানের সঙ্গে একটি বার দেখা না করে কি করে চলে যাই?" কাজেই আমরা উজিরের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার হাত ধরে প্রাসাদে নিয়ে হাজির করলেন। সেখানে ময়লা জামা কাপড় গায়ে, মাথায় পাগড়ী

ও কটিবন্ধে রুমাল সহ এক বৃদ্ধ বসে আছেন দেখলাম। উজির তাঁকে সালাম করলেন। উজিরের দেখাদেখি আমিও তাঁকে সুলতান বলে না চিনেই সালাম করলাম। তারপর পরিচিত একজন লোক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। পরে উজির আমার ভুল ভেঙ্গে দিলে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম ও ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাইলাম। সুলতান তখন উঠে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন। উজির ও অপরাপর সভাসদেরাও তাঁর সঙ্গে গেলেন। তৎপর আমিও ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি সেই জীর্ণমলিন পোষাক নিয়েই মসনদে বসে আছেন। তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। যে-সব দেশ সফর করেছি, রাজারাজড়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি তাদের সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর খাওয়ার পরে তিনি উঠে গেলে আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আমরা হরমুজ থেকে যাত্রা করলাম খুনজুবাল শহরে একজন তাপসের সঙ্গে দেখা করতে। প্রণালীটি পার হয়ে গিয়ে আমাদের বাহন ভাড়া করতে হল তুর্কমেনদের কাছ থেকে। এসব তুর্কমেন এখানকারই বাসিন্দা। এ অঞ্চলে এদের সঙ্গে ছাড়া সফর করা সম্ভব নয়। কারণ এরা খুব সাহসী এবং সমস্ত পথঘাট এদের জানা আছে। এখানে চারদিনের পথ অবধি বিস্তৃত একটি মরুভূমি আছে। সে মরুভূমিতে আরবদস্যুরা বিচরণ করে এবং জুন ও জুলাই মাসে মারাত্মক 'সাইমুম' এ অঞ্চল দিয়ে বয়ে যায়। সাইমুমের কবলে একবার পড়লে ধ্বংস ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শুনেছি এ বিষাক্ত বাতাসের কবলে পড়ে যে প্রাণ হারায় তার আত্মীয় বন্ধুরা তার দাফন করার জন্য গোসল করাতে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলগা হয়ে যায়।[২১] সারা রাস্তায়ই এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত লোকদের কবর দেখতে পাওয়া যায়। আমরা রাত্রে সফর করতাম এবং সূর্যোদয় থেকে বিকেল অবধি বিশ্রাম করতাম গাছের ছায়ায়। এ মরুভূমিটির বুকেই কুখ্যাত দস্যু জামাল আল-লুক লুটপাট করে বেড়াত। তার অধীনে একদল আরবী ও পারশী অশ্বারোহী দস্যু ছিল। লুণ্ঠিত টাকার সাহায্যে সে মুসাফেরখানা স্থাপন করত ও মুসাফেরদের অর্থ সাহায্য করত। শুনা যায়, যারা যাকাত আদায় করে না তাদের ছাড়া অপর কারও ধনরত্ন সে অপহরণ করত না। কোন সুলতানই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নাই। অবশেষে সে নিজেই অনুতপ্ত হয়ে ধর্মের পথে এসে ধর্মজীবনযাপন করতে থাকে। তার কবর এখন একটি তীর্থস্থান বিশেষ।

এ মরুভূমি পার হয়ে আমরা কাওরাস্তানে পৌঁছলাম। ছোট এ শহরে চলমান নহর ও ফলের বাগান আছে কিন্তু ভয়ানক গরম এখানে।[২২] এখান থেকে অনুরূপ আরও একটি মরুভূমির উপর দিয়ে আমরা তিন দিন পথ চলে লার [২৩] নামক বড় একটি শহরে এলাম। এখানে সারা বছর পানি পাওয়া যায় এমন নদী ও অনেক ফলের বাগান আছে। আমরা দরবেশদের এক আস্তানায় বাস করতে লাগলাম। তাঁদের ভেতর একটি চমৎকার রীতি প্রচলিত আছে। তাঁরা প্রতিদিন বিকেলে এসে হাজির হন তাঁদের এ আস্তানায়; তারপরে বেরিয়ে শহরের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। প্রত্যেক বাড়ী থেকে তাঁদের একখানা বা দু'খানা করে রুটী দেওয়া হয়। সে রুটী থেকেই এরা মুসাফেরদের খেতে দেয়। গৃহস্থরাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত রুটী তৈরি করে এবং দরবেশদের এ রীতি প্রচলিত রাখতে সাহায্যে করে। লার শহরে একজন তুর্কমেন সুলতান বাস করেন। তিনি আমাদের উপহার [২৪] পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করি নাই।

অতঃপর আমরা শেখ আবু দুলাফের বাসস্থান খুন্‌জুবাল[২৫] শহরে এসে পৌঁছলাম। এ শেখের সঙ্গে দেখা করতেই আমরা এসেছি। আমরা তার মুসাফেরখানায় রইলাম। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর একটি পুত্রের দ্বারা আমার খাবার পাঠিয়ে দিতেন। সেখান থেকে আমরা এলাম কায়েস শহরে যার অপর নাম সিরাফ [২৬]। সিরাফের বাসিন্দারা সৎবংশজাত পারশী। এদের ভেতর একদল আরবীও আছে। তারা পানির নীচে থেকে মুক্তা সংগ্রহ করে। সিরাফ থেকে বাহ্‌রায়েন পর্যন্ত নদীর মত বিস্তীর্ণ এ শান্ত উপসাগরে মুক্তা সংগ্রহের কাজ চলে। এপ্রিল ও মে মাসে এ অঞ্চলে ডুবুরী ফারস, বাহ্‌রায়েন ও কাদিফ থেকে সওদাগরদের নিয়ে অনেক নৌকা আসে। ডুব দেবার আগে ডুবুরীরা কচ্ছপের খোলসে তৈরী মুখোশ পরে এবং নাকেও কচ্ছপের খোলসের তৈরী 'ক্লিপ' লাগায়। তারপরে একগাছি দড়ি কোমরে বেঁধে ডুব দেয়। পানির নীচে ডুবে থাকার শক্তি তাদের সবার সমান নয়। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এক ঘন্টা বা দু'ঘন্টা অবধি পানির নীচে থাকতে পারে।[২৭] সমুদ্রের তলায় পৌঁছে ডবুরী দেখতে পায় ছোট-ছোট টুকরা পাথরের ফাঁকে বালির উপর ঝিনুক পড়ে আছে। তারপর সে ঝিনুকগুলি কুড়িয়ে অথবা সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে গলায় ঝুলানো চামড়ার থলেতে রাখে। যখন তার নিঃশ্বাস শেষ হয়ে আসে তখন সে দড়িতে টান দেয়। দড়িতে টান পড়লেই উপরে যারা আছে তারা দড়ি টেনে ডুবুরীকে নৌকায় তুলে আনে। তার থেকে তখন থলেটি নিয়ে ঝিনুকগুলি একে-একে খোলা হয়। ঝিনুকের খোলের ভেতর মাংস আছে। ছুরি দিয়ে মাংস কাট্‌লে তা বাতাসের সংস্পর্শে এসে মুক্তায় পরিণত হয়। তখন ছোট বড় নানা আকারের মুক্তা একত্র সংগ্রহ করে সুলতানকে দেওয়া হয় তাঁর প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ এবং বাকিটা কিনে নেয় নৌকায় সওদাগরেরা। সওদাগরদের অধিকাংশই ডুবুরীদের পাওনাদার। তারা প্রাপ্যের পরিবর্তে মুক্তা নিয়ে যায়।

সিরাফ থেকে আমরা বাহ্‌রায়েন শহরে এলাম। সুন্দর ও বড় শহর বাহ্‌রায়েনে বাগান, গাছগাছড়া ও খাল আছে। এখানে পানি সহজলভ্য। হাত দিয়ে মাটি খুঁড়লেই এখানে পানি পাওয়া যায়।[২৮] স্থানটি বালুকাময় এবং অত্যন্ত গরম। অনেক সময় বালি বাসস্থান অবধি বিস্তার লাভ করে। বাহরায়েন ছেড়ে আমরা পৌঁছি আল-কুদায়েফ শহরে(কাদিফ) এ সুন্দর বড় শহরে গোঁড়া শিয়া সম্প্রদায়ের আরবরা বাস করে। নিজেদের শিয়া বলে জাহির করতে তারা কাউকে ভয় করে না।

অতঃপর আমরা হাজার শহরে এলাম। এখন হাজারকে বলা হয় আলহাসা[২৯]। একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, "হাজারে খেজুর বয়ে আনা।" কারণ, অন্য কোন জেলার চেয়ে এখানে অনেক বেশী খেজুর আছে। এমন কি এখানকার লোকেরা পশুকেও খেজুর খেতে দেয়। হাজার থেকে আমরা জামামা শহরে পৌঁছি। তারপর জামামার শাসন কর্তার সহযাত্রী হয়ে মক্কাশরিফ গিয়ে হজব্রত পালন করি। সেটা ছিল ১৩৩২ খ্রষ্টাব্দে । সে বছরই মিসরের সুলতান আল-মালীক আন্‌-নাসির তাঁর শেষ হজ পালন করেন। মক্কা ও মদিনার উভয় দরগায় তিনি সে বছর যথেষ্ট দান খয়রাত করেন এবং দরগার অধিবাসীদেরও উপহার দেন। এ যাত্রাতেই তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন নিজের পুত্র আমীর আহমদকে এবং নিজের প্রধান আমীর বেকতিমারকে। সুলতান শুনেছিলেন, এরা তাঁকে হত্যা করে মসনদ দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

চার

ইয়েমেন ও ভারত যাবার উদ্দেশ্যে হজের পরেই আমি জেদ্দায় এলাম জাহাজ ধরবার জন্য কিন্তু কোন সঙ্গী পেলাম না বলে আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। আমাকে চল্লিশ দিন কাটাতে হল জেদ্দায়। সেখানে তখন কসাইরগামী একখানা জাহাজ ছিল। জাহাজটির অবস্থা কি রকম দেখবার জন্য জাহাজে উঠে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। খোদার ইচ্ছায় তা হয়েছিল, কারণ সে জাহাজটি যাত্রা করে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে যায় এবং অতি অল্প লোকই প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়। পরে আমি আয়বীব যাওয়ার জন্য জাহাজে উঠি কিন্তু জাহাজ গিয়ে পৌছে রা'স দাওয়াইর নামক জাহাজ ভিড়াবার একটি জায়গায়। সেখান থেকে কয়েকজন বেজার সঙ্গে আমরা মরুভূমির পথে আয়বীব রওয়ানা হয়ে গেলাম। সেখান থেকে এডফু গিয়ে নীলনদের পথে কায়রো এলাম। কায়রোতে দিন কয়েক কাটিয়ে যাত্রা করলাম সিরিয়া। পথে যেতে দ্বিতীয় বারের জন্য গাজা, হেবরণ, জেরুজালেম, রামলা আকরে, ত্রিপলী এবং জাবালা হয়ে লাধিকিয়া দেখে এলাম।

লাধিকিয়ায় ছোট একটি জাহাজ পেলাম। জাহাজটি Genoeseদের, তার মালিকের নাম মারতালমিন। সে জাহাজে তুর্কীদের দেশ বলে পরিচিত বেলাদ-আর রোম (আনাতোলিয়া) রওয়ানা হলাম। আগে এ দেশটি তুর্কীদেরই[১] ছিল। পরে এদেশ অধিকার করে মুসলমানেরা কিন্তু তবু এখনও তুর্কমেন মুসলমানদের শাসনাধীনে এখানে অনেক খ্রীষ্টান বসবাস করে। আমাদের দশ রাত্রি সমুদ্রে কাটাতে হয়েছে। সে সময়ে খ্রীস্টানরা আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে এবং ভাড়া বাবদ কিছুই গ্রহণ করেনি। দশম দিনে আমরা আলায়া পৌছি। আলায়া থেকেই এ প্রদেশের শুরু। এ দেশটি পৃথিবীর অন্যতম উত্তম দেশ। অন্যান্য দেশের ভাল যা-কিছু খোদা এখানে এনে একত্র করে দিয়েছেন। এখানকার লোকেরা সবচেয়ে শান্ত প্রকৃতির। পোষাকে পরিচ্ছদেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খাদ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এরা সব চেয়ে দয়ালু। এদেশের যেখানেই আমরা গেছি, মুসাফেরখানায় বা গৃহস্থ বাড়ীতে, সেখানেই

নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই এসে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেছে। এখানকার নারীরা নেকাব ব্যবহার করে না। যখন আমরা চলে এলাম তখন ঠিক আত্মীয়-পরিজনের মতই আমাদের বিদায় দিল, নারীদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সপ্তাহে মাত্র একবার তারা রুটী তৈরি করে। যে দিন রুটী তৈরি হত লোকেরা সেদিন গরম রুটী আমাদের দিয়ে বলত, "বাড়ীর বিবিরা আপনাদের উপহার পাঠিয়েছেন এবং দোয়া করতে বলেছেন।" এখানকার সমস্ত বাসিন্দাই গোঁড়া সুন্নী মতাবলম্বী কিন্তু এরা ভাঙ খায় এবং তা অনিষ্টকর মনে করে না।

সমুদ্রোপকূলে[২] আলেয়া একটি বড় শহর। এ শহরের অধিবাসীরা তুর্কমেন। কায়রো, আলেকজেন্দ্রিয়া, সিরয়া থেকে সওদাগরেরা এ শহরে যাতায়াত করে। এ জেলায় যথেষ্ট কাঠ পাওয়া যায়। এখান থেকে আলেকজান্দ্রিয়া ও ডামিয়েট্টায় কাঠ চালান হয়ে যায়। সেখান থেকে বহন করে নেওয়া হয় মিসরের অন্যান্য শহরে। এখানে সুলতান আলাউদ্দিনের দ্বারা নির্মিত ইট প্রসিদ্ধ দূর্গ আছে। শহরের কাজী ঘোড়ায় চড়ে আমাকে আলেয়ার সুলতান ইউসুফ বেকের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেলেন। সুলতানের পিতার নাম ছিল কারামান। এখানকার লোকদের ভাষায় বেক অর্থ রাজা। তিনি শহর থেকে দশ মাইল দূরে বাস করেন। আমরা গিয়ে দেখলাম, তিনি সমুদ্র পারে একটি টিলার উপর বসে আছেন, নীচে বসে আছেন আমীর ও উজিরগণ। সুলতানের ডাইনে ও বামে রয়েছে সৈনিকরা। তিনি তাঁর চুলে কাল রং দিয়েছেন। আমি তাঁকে অভিবাদন করলাম এবং আমার আগমনের কারণ সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রশ্ন করলেন তার জবাব দিলাম। আমি চলে আসার পর তিনি আমাকে কিছু অর্থ উপহার পাঠিয়েছিলেন।

আলেয়া থেকে আমরা এলাম অতি সুদৃশ্য শহর আন্তালিয়া (আদালিয়া)[৩]। শহরটি আয়তনে বিশাল। কিন্তু তা হলেও এমন আকর্ষণীয় শহর অন্যত্র দেখা যায় না। শহরের লোকসংখ্যা যথেষ্ট হলেও উত্তমরূপে সজ্জিত। এখানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা মহল্লা রয়েছে। শহরের খৃষ্টান অধিবাসীরা প্রাচীরবেষ্টিত মিনা (বন্দর) নামক একটি মহল্লায় বাস করে। রাত্রে এবং শুক্রবার নামাজের [৪] সময় প্রাচীরের প্রবেশদ্বার ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখা হয়। এ শহরের আদি বাসিন্দা গ্রীকরাও পৃথক একটি মহল্লায় বাস করে, ইহুদীরা অপর একটিতে। সুলতান ও তাঁর বিভিন্ন কর্মচারীরাও পৃথক একটি মহল্লায় বাস করেন। প্রত্যেক মহল্লাই প্রাচীরবেষ্টিত। বাকি মুসলমান অধিবাসীরা শহরের কেন্দ্রস্থলে বাস করে। সমস্ত শহর ও উল্লিখিত মহল্লাগুলির চতুর্দিক বেষ্টন করে আরও একটি বৃহৎ প্রাচীর আছে। এখানকার ফলের বাগানগুলিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এক প্রকার খুবানী বা অ্যাপ্রিকট পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকদের কাছে তা কামালউদ্দীন নামে পরিচিত। এ ফলের শাঁষের ভেতরে মিষ্ট বাদাম পাওয়া যায়। শুষ্ক খুবানী এখান থেকে মিশরে চালান হয়ে যায়। মিশরে এ ফলের যথেষ্ট কদর।

আমরা এখানকার কলেজের মসজিদে ছিলাম। কলেজের তখনকার অধ্যক্ষের নাম ছিল শেখ শিহাবউদ্দীন আল হামাবী। আনাতোলিয়ার প্রতি জেলায়, শহরে ও গ্রামে যে সব তুর্কমেন আছে, তাদের ভেতর সর্বত্রই আখিয়া (Akhiya) বা 'যুব ভ্রাতৃত্ব'

(Young Brotherhood) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সভ্য দেখা যায়। মেহ্মানদের আদর আপ্যায়ন করতে সদাই ব্যগ্র, এদের মত এমন সম্প্রদায় আর কোথাও দেখা যায় না। মেহ্মানদের কাছে এরা যথাসম্ভব খাবার হাজির করে, অন্যের অভাব দূর করে, অন্যায় অত্যাচার দমন করে এবং পুলিসের অত্যাচারী চরদের বা তাদের সঙ্গে যে সব দুষ্কৃতকারী যোগদান করে, তাদের হত্যা করে। যুবভাই বা স্থানীয় লোকদের ভাষায় আখি নির্বাচিত হয় সমব্যবসায়ী সকলের ভোটে, অবিবাহিত লোকদের দ্বারা অথবা কঠোর সংযমী ধর্মপরায়ণ কোন ব্যক্তির দ্বারা। নির্বাচিত যুবভাই স্ব-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করে। এই প্রতিষ্ঠান 'ফতুয়া' (বা Order of youth) নামেও পরিচিত। নেতা একটি মুসাফেরখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাতে কম্বল, বাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এনে দেন। প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা সারাদিন নিজ-নিজ জীবিকার জন্য উপার্জন করে, দিনের শেষে বিকালে বা উপার্জন করে সবই এনে দেয় নেতার কাছে। এভাবে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তা দিয়ে ফল, খাদ্য এবং মুসাফেরখানার অন্যান্য দরকারী জিনিষ ক্রয় করা হয়। সেদিন যদি কোন মুসাফের শহরে আসে তবে তাকে মুসাফেরখানায় রেখে ঐ দিনের সংগৃহিত খাদ্য দেওয়া হয়। এভাবে যতদিন খুশী সে সেখানে থাকতে পারে। যদি কোনদিন কোন মুসাফের না আসে তবে নিজেরা একত্র হয়ে সে সব খাবার খায় এবং খাওয়ার পরে নৃত্য-গীত-বাদ্যের দ্বারা আমোদ প্রমোদ করে। পরের দিন আবার যে যার কাজে চলে যায় এবং শেষ বেলায় উপার্জ্জিত অর্থ এনে নেতার কাছে যথারীতি জমা দেয়। প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের বলা হয় ফিতায়ানা (Fityan) (Youth)। নেতাকে বলা হয় 'আখি'[৫] আগেই তা বলেছি।

আমাদের আন্তালিয়ায় পৌঁছবার পরের দিন এমনি একটি যুবক শেখ শিহাবউদ্দিনের কাছে এসে তুর্কী ভাষায় কথাবার্তা বল্লেন। আমি তখন তার কথা বুঝতে পারিনি। লোকটির পরিধানে ছিল পুরাতন কাপড়, মাথায়ও একটি টুপি ছিল। শেখ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ লোকটি কি বলছে বুঝতে পারলে?"

আমি বল্লাম, "না, কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

শেখ তখন বললেন, "তোমাকে এবং তোমার দলের আর সবাইকে তার ওখানে খাওয়ার দাওয়াত করতে এসেছে।"

আমি মনে মনে বিস্মিত হলাম কিন্তু মুখে বল্লাম, "বেশ তো।"

লোকটি চলে গেলে শেখকে বললাম, "লোকটি গরীব। আমাদের খাওয়াতে গেলে তার কষ্ট হবে। লোকটির উপর আমাদের বোঝা চাপাতে চাই না।"

শেখ হেসে বললেন, "সে যুব ভ্রাতৃত্বের একজন শেখ। মুচির কাজ করে কিন্তু খুব দয়ালু। তার দলে রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রায় দু'শ লোক। তারা একে নেতা নির্বাচিত করে একটি মুসাফেরখানা তৈরী করেছে। সেখানে মুসাফেরদের খাওয়ানো হয়। সারা দিনে এরা যা উপায় করে রাত্রে তাই খরচ করে।"

আমার মাগরেবের নামাজ পড়া হয়েছে এমন সময় আবার সেই লোকটি এসে হাজির। সে এসে আমাদের মুসাফেরখানায় নিয়ে গেল। আমরা অতি চমৎকার একটি

অট্টালিকায় এসে হাজির হলাম। ঘরের মেঝে তুর্কী কার্পেটে মোড়া, অসংখ্য বাতি জ্বলছে ইরাকী কাচের ঝাড় লণ্ঠনের । কিছু সংখ্যক যুবক সার বেঁধে হল–কামরায় দাঁড়িয়ে আছে। পরণে তাদের লম্বা কোর্তা, পায়ে জুতা, কোমরবন্ধের সঙ্গে ঝুলছে প্রায় দু'হাত করে লম্বা একটি করে ছুরি। তাদের মাথায় সাদা উলের টুপি, টুপির চূড়ায় বাঁধা এক হাত লম্বা দু' আঙ্গুল চওড়া এক টুকরা কাপড়। যখন তারা বসল তখন সবাই টুপি খুলে নিজের সামনে রেখে দিল। তারপর আরেকটি করে কারুকার্যময় রেশমের বা ঐ জাতীয় টুপি মাথায় দিল। তাদের হলটির মধ্যস্থলে মুসাফেরদের জন্য রক্ষিত একটি দেবী। আমরা গিয়ে আসন গ্রহণ করার পর ফল মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়া হ'ল এবং তার পরে শুরু হ'ল নৃত্য গীত। আমরা তাদের মুক্ত হস্তের দয়া দাক্ষিণ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমরা রাত্রির শেষ দিকে বিদায় নিয়ে এলাম। আমরা যখন এ শহরে গিয়েছি তখন ইউনুস বেকের পুত্র খিদর বেক ছিলেন সুলতান। তিনি তখন অসুস্থ। তবু আমরা তার সঙ্গে দেখা করেছি তাঁর রুগ্ন শয্যায়। তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং বিদায় নেওয়ার সময় কিছু অর্থ আমাদের উপহার দিলেন।

সেখান থেকে আমলা এলাম বরদুল (Buldur) জায়গাটি ছোট কিন্তু অনেক ফলের বাগান এবং নদী নালা আছে আর আছে পাহাড়ের উপর একটি দূর্গ। আমরা সেখানে বাস করলাম ইমামের (peacher) মেহ্‌মান হয়ে। সেখানকার যুব ভ্রাতৃত্ব একটি সভা ডাকল এবং তাদের সঙ্গে থাকতে আমাদের অনুরোধ জানাল। কিন্তু আমাদের মেজবান ইমাম তাতে রাজী হলেন না। কাজেই যুব ভ্রাতৃত্ব তাদের এক সভ্যের একটি বাগানে ভোজের আয়োজন করে আমাদের সেখানে নিয়ে গেল। তারা যে রকম আনন্দের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করল তা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল যদিও আমরা কেউ পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারিনি এবং বুঝিয়ে দেবারও কেউ সেখানে ছিল না। আমরা সেখানে একদিন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম।

বারদুর থেকে আমরা এলাম সাবারতা (Isarta), সেখানে থেকে আকরিদুর (Egirdir)। আকরিদুর জনবহুল একটি বড় শহর। এখানে মিঠা পানির একটি হ্রদ আছে। এ হ্রদ থেকে নৌকায় দু'দিনে আকশর ও বাকশর এবং অন্যান্য শহর ও গ্রামে ৬ যাওয়া যায়। আকারদুরের সুলতান এ দেশের একজন খ্যাতনামা শাসনকর্তা। তিনি একজন সৎ প্রকৃতির লোক। প্রতিদিন তিনি শহরের প্রধান মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করেন। আমাদের সেখানে থাকাকালে তাঁর একটি পুত্র মারা যায়। তার দাফনে পরে সুলতান এবং ছাত্রেরা তিনদিন অবধি খালি পায়ে কবরস্থানে যান। দ্বিতীয় দিন আমি তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমাকে হেঁটে যেতে দেখে তিনি একটি ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। মাদ্রাসায় পৌঁছে আমি সেই ঘোড়াটি ফেরত পাঠিয়ে দেই। কিন্তু তিনি সে ঘোড়া পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে বলেন, "আমি উপহার হিসাবে ঘোড়াটি আপনাকে দিয়েছি, ধার হিসাবে নয়।" তিনি আমাকে জামা কাপড় ও কিছু অর্থও উপহার দেন।

অতঃপর আমরা কুল্ হিসার (Laka Fortress) শহরে পৌছলাম। নল খাগড়াপূর্ণ জলায় সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত কুল্ হিসার একটি ছোট শহর।[৭] নল খাগড়া ও পানির উপরে তৈরী একটি সেতু এ শহরের একমাত্র প্রবেশ পথ। পথটি এত সরু যে একেবারে একটি মাত্র ঘোড়সওয়ার সে পথে যেতে পারে। একটি হ্রদের মধ্যে একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপরে রয়েছে দুর্ভেদ্য এ শহরটি। এখানকার সুলতান আকরিদুরের সুলতানের ভাই। আমরা যখন এখানে পৌছি তিনি তখন অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা সেখানে কয়েকদিন কাটাবার পর তিনি এলেন। তিনি আমাদের খাদ্য ও ঘোড়া সরবরাহ করে অত্যন্ত সহৃদয়তার পরিচয় দেন। জারমিয়ান (Kermian) নামে পরিচিত একদল দস্যু সেখানে আছে। কুতাহিয়া নামে একটি শহরও তাদের দখলে আছে। এজন্য সুলতান আমাদের সঙ্গে একদল অশ্বারোহী দেন লাধিক (Denizli) পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দেবার জন্য। সাতটি বড় মসজিদবিশিষ্ট লাধিক একটি প্রসিদ্ধ শহর। চারপাশে সোনালী জরির কাজ করা এ ধরণের অতুলনীয় সূতী কাপড় তৈরী হয় লাধিক শহরে। উত্তম বুনট ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সূতার তৈরী বলে সে কাপড় খুব টেক্সই হয়। কারিগরদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রীক্ নারী, কারণ, এখানে বহু সংখ্যক গ্রীকের বাস। তারা সুলতানের প্রজা এবং তাঁকে জিজিয়া কর দেয়। গ্রীকদের একটি বিশেষ চিহ্ন হল তাদের মাথার লম্বা চুড়াবিশিষ্ট সাদা বা লাল টুপি । এখানকার গ্রীক নারীরা মাথায় ব্যবহার করে বড় পাগড়ী। শহরে প্রবেশ করেই আমরা একটি বাজারের মধ্য দিয়া যেতে ছিলাম, কয়েকজন দোকানদার তাড়াতাড়ি তাদের দোকান ছেড়ে এসে আমাদের ঘোড়ার লাগাম ধরল। এ ব্যাপারে অন্যান্য দোকানদাররা আপত্তি উত্থাপন করল। তারপরে এমন বাদানুবাদ চলতে আরম্ভ করল যে কয়েকজন ছুরি বের করে ফেলল। আমরা অবশ্য তাদের বক্তব্য কিছুই বুঝতে পারিনি কিন্তু মনে ভয় হল যে, এরাই বোধ হয় সেই ডাকাত এবং এটাই তাদের শহর। অবশেষে খোদা আমাদের এমন একজন লোক সেখানে এনে হাজির করলেন যিনি আরবী জানতেন। তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন, বিবদমান লোকগুলি দু'টি যুব ভ্রাতৃত্বের সভ্য। দু'দলই আমাদের মেহ্মান হিসাবে পেতে চাইছে। তাদের এ ব্যাপার দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। পরে স্থির হল, তারা লটারী করবে এবং যারা তাতে জিত্বে তাদের সঙ্গেই প্রথমে আমরা গিয়ে বাস করব। তদনুসারে কাজ হলে প্রথমে আমরা ভ্রাতা সিনানের সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাদের গোসলখানায় নিয়ে গেলেন এবং নিজে আমার দেখাশুনা করলেন। অবশেষে আমাদের জন্য তারা মিষ্টি ও বহু রকম ফল এনে একটি ভোজের আয়োজন করেন। ভোজনের পর কোরান পাঠ হয় এবং তারপর তারা সুর করে দরুদ পড়ে ও নৃত্য করে। পরের দিন আমরা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাই। তিনি আনাতোলিয়ার একজন প্রসিদ্ধ সুলতান। সেখান থেকে ফিরে এলে আমাদের সঙ্গে দেখা হয় অপর মুসাফেরখানার ভ্রাতা তুমানের সঙ্গে। তিনি আমাদের আরও বেশী সমাদর করেন এবং গোসলখানা থেকে বের হয়ে আসবার পর আমাদের উপর গোলাপ পানি সিঞ্চন করেন।

রাস্তার বিপদের ভয়ে আমরা লাধিকে কিছুদিন কাটাই। পরে একটি কাফেলার সংবাদ পেয়ে আমরা একদিন এবং পরবর্তী রাত্রের কিছু অংশ তাদের সঙ্গে গিয়ে তাবাস্

(Davas) দূর্গে পৌঁছি। দূর্গের বাইরেই আমাদের সে রাত্রি কাটাতে হয়। পরের দিন ভোরে দেওয়ালের উপর দিয়ে আমাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ খবর দেওয়া হয়। অতঃপর তাদের সেনাপতি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং কোথাও দস্যুরা আছে কিনা চারদিকে ঘুরে তা দেখেন। দেখার পরে পশুগুলি ছেড়ে দেওয়া হয় বিচরণের জন্য। এই সেখানকার নিত্য প্রচলিত রীতি। সেখান থেকে আমরা এলাম মুঘলা এবং মুঘলা থেকে মিলাস। মিলাস দেশের অন্যতম সুন্দর ও প্রসিদ্ধ শহর। আমরা এখানেও একটি যুব ভ্রাতৃত্বের মুসাফেরখানায় বাস করি। এখানে তারা আমাদের নানাভাবে যে রকম সমাদর করেন সে সমাদর আগের চেয়েও বেশী। শাসনকর্তা হিসাবে এখানকার সুলতান একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি । তিনি সর্বদা ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌দের সঙ্গে দিন কাটান। তিনি আমাদের খাদ্য ও অর্থ উপহার দিয়েছিলেন। সুলতানের উপহার গ্রহণ করে আমরা কুনিয়া (Konia) শহরের উদ্দেশ্য যাত্রা করি। কুনিয়া সুন্দর অট্টালিকাবিশিষ্ট একটি বড় শহর। এ শহরে অনেক নদীনালা ও ফলের বাগান আছে। শহরের রাস্তাগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং প্রত্যেক পণ্যের জন্য এখানে পৃথক বাজার আছে। কথিত আছে এ শহর স্থাপিত হয় বাদশাহ সেকান্দারের দ্বারা। বর্তমানে এ শহরটি সুলতান বদরউদ্দিন ইবনে কারামানের রাজত্বের অন্তর্গত। একটু পরেই আমরা তাঁর বিষয়ে উল্লেখ করব। শহরটি কিছুদিনের জন্য ইরাকের রাজা দখল করেছিলেন কারণ এ শহর তাঁর রাজ্যের অতি নিকটে। আমরা মেহমান হয়েছিলাম কাজীর মুসাফেরখানায়। কাজীর নাম ইবনে কালাম শাহ্। তিনি ফতুয়ার একজন সভ্য। তাঁর মুসাফেরখানাটি বড় এবং শিষ্য সংখ্যাও যথেষ্ট। খলিফা হজরত আলীর সময় থেকে তাদের এ ফতুয়া চলে এসেছে বলে তারা দাবী করে। সূফী মতাবলম্বীরা যেমন তালি দেওয়া বস্ত্র পরিধান করে তাদেরও তেমনি বিশেষ পরিধেয় ছিল পায়জামা।[৮] এই কাজী অন্যান্য ফতুয়ার চেয়ে অনেক বেশী সমাদর আমাদের করেছেন এবং নিজের পরিবর্তে ছেলেকে আমাদের সঙ্গে গোসল খানায় পাঠিয়েছেন।

এ শহরেই বিখ্যাত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জালালউদ্দিন রুমীর মাজার শরীফ অবস্থিত। রুমী এখানে মাওলানা (আমাদের প্রভু) নামে পরিচিত। তিনি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আনাতোলিয়ায় এক 'ভ্রাতৃত্ব' আছে তারা মাওলানা রুমীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ দাবী করে। তাঁর নামানুসারে এ ভ্রাতৃত্বকে বলা হয় জালালিয়া।[৯] কাহিনী প্রচলিত আছে যে, জালালউদ্দিন প্রথম জীবনে একজন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও অধ্যাপক ছিলেন। একদিন এক মিঠাই বিক্রেতা কলেজের মসজিদে এল এক খাঞ্চা মিঠাই মাথায় নিয়ে। তাঁকে এক টুকরা মিঠাই দিয়ে সে বেরিয়ে গেল। শেখ তখন তাঁর অধ্যাপনার কাজ ফেলে মিঠাইওয়ালার পেছনে চলে গেলেন এবং কয়েক বছর অবধি নিরুদ্দিষ্ট রইলেন। তারপরে তিনি ফিরে এলেন সত্য কিন্তু ফিরে এলেন মানসিক সুস্থতা হারিয়ে। তখন তিনি ফারসী কবিতা আবৃত্তি করা ছাড়া আর কোন কথাই বলতেন না। তাঁর ফারসী কবিতার অর্থও তখন কেউ বুঝতে পারত না। তিনি তখন যা রচনা করেছেন তার শিষ্যরা সে সব লিখে রেখেছেন। পুস্তকাকারে সে সব রচনার সমষ্টিই বিখ্যাত গ্রন্থ মসনবি। এ গ্রন্থকে এ দেশের লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এ গ্রন্থের বিষয়

নিয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে, শিক্ষা দেয় এবং প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে তাদের ধর্মশালায় এ গ্রন্থ পাঠ করে।

কুনিয়া থেকে আমরা এলাম লারান্দা (কারামান)। লারান্দা কারামানের সুলতানের রাজধানী। সুলতানের সঙ্গে আমার দেখা হল শহরের বাইরে। তিনি তখন শিকার করে ফিরছিলেন। আমি ঘোড়া থেকে নেমে তাঁকে অভ্যর্থনা করায় তিনিও ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। এ দেশের সুলতানদের যদি কোন বিদেশী সফরকারী ঘোড়া থেকে নেমে সম্মান প্রদর্শন করে তবে তাঁরাও তাঁর চেয়ে বেশী সম্মান তাদের করেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ ঘোড়া থেকে না নামেন তবে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। ফলে তিনি তাঁদের সদেচ্ছা থেকে বঞ্চিত হন। একবার এ ধরণের কোন এক রাজার আমরা অনুরূপ একটি ব্যাপার ঘটেছিল। সুলতানকে এভাবে সম্মান করার পরে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে শহরে এলেন এবং বিশেষ আতিথেয়তা দেখালেন।

আমরা অবশেষে ইরাক রাজ্যের অন্তর্গত আকসারা (আকসেরাই) এসে পৌঁছলাম। এখানে ভেড়ার লোমের কার্পেট তৈরী হয় এবং সে সব কার্পেট সুদূর ভারত, চীন ও তুর্কী দেশগুলিতে চালান হয়ে যায়। আকসারা থেকে নাকদা এবং সেখান থেকে এলাম কায়সারিয়া। কায়সারিয়া দেশের অন্যতম বড় শহর। এ শহরে একজন শাসনকর্তার বেগম (Khatun) বাস করেন। তিনি সুলতানের আত্মীয়, এবং সুলতানের সকল আত্মীয়ের মতই তিনি আগা পদবী ব্যবহার করেন। আগার অর্থ বিখ্যাত। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি অত্যন্ত বিনীত ব্যবহার করলেন এবং আমাদের আহারের ব্যবস্থা করলেন। বিদায়ের সময় তিনি জাজিম ও লাগাম সহ একটি ঘোড়া এবং কিছু অর্থ উপহার দিলেন। এ শহরগুলির সর্বত্রই আমরা যুব ভ্রাতৃত্বের মুসাফেরখানায় বাস করেছি। সুলতান যে শহরে বসবাস না করেন, এখানকার প্রচলিত রীতি অনুসারে সে শহরের শাসন ভার থাকে একজন যুব ভাইয়ের উপর। তিনি সুলতানের সমমর্যাদায় সবকিছু কার্য পরিচালনা করেন।

অবশেষে আমরা দেশের আরেকটি বড় শহর সিওয়াসে এসে পৌঁছলাম। ইরাকের সুলতানের নিয়োজিত একজন শাসনকর্তা সিওয়াসে বাস করেন। তাঁর নাম আলাউদ্দিন আরতানা। শহরের কাছে যেতে প্রথমে আমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল যুব ভ্রাতা আহমদ–এর অন্তর্ভুক্ত একটি দলের সঙ্গে, তারপরে দেখা হ'ল যুবভ্রাতা সেলেবী দলের সঙ্গে। তারা আমাদের অনুরোধ জানাল তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে কিন্তু আমরা আগের দলকে কথা দিয়েছিলাম বলে সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। তাদের মুসাফেরখানায় হাজীর হলে আমাদের মেজবানরা অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বিশেষ সমাদরের সঙ্গে আমাদের মেহ্মানদারী করলেন। আমরা আলাউদ্দিন আরতানার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বিশুদ্ধ আরবীতে আমার সঙ্গে কথার্বাতা বললেন, যে সব দেশ সফর করেছি, যে সব রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে সে সব জানতে চাইলেন এবং আমাদের উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন। বিদায়ের আগে চিঠি লিখে দিলেন অন্যান্য শহরস্থ তাঁর সহকারীদের কাছে আমাদের সমাদর করবার জন্য এবং খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের জন্য।

সেখান থেকে আমরা পৌছলাম আমাসিয়া। প্রশস্ত রাস্তাওয়ালা এ শহরটি যেমন সুন্দর তেমনি বড় । সেখান থেকে এলাম কুমিশ(গুমুশখানা)। কুমিশ একটি জনবহুল শহর। এখানে একটি রৌপ্য খনি আছে। ইরাক ও সিরিয়ার সওদাগরেরা এ শহরে অহরহ যাতায়াত করে। কুমিশ ছেড়ে পৌছলাম এসে আরজানজান। আরজানজানের অধিকাংশ বাসিন্দা আর্মেনিয়ান। আরজানজানের পর আমরা এলাম আরজাররাম। শহরটি বড় কিন্তু দু'দল তুর্কমেনদের ভেতর গৃহযুদ্ধের ফলে শহরটি আজ ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছে। আমরা এখানে 'যুবভ্রাতা' তুমানের মুসাফের খানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। শুনলাম তুমানের বয়স একশ ত্রিশ বছর। তিনি একখানা লাঠি ভর করে হেঁটে বেড়ান। তিনি এখনও কার্যক্ষম আছেন এবং নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করেন।

অতঃপর আমরা পৌছলাম বিরগী[১০]। সেখানে এসে শুনলাম মহিউদ্দিন নামক একজন নামকরা অধ্যাপক সেখানে বাস করেন। মাদ্রাসায় পৌছে আমরা দেখলাম, তিনি একটি তেজী গাধায় আরোহণ করে সবেমাত্র আসছেন। তাঁর পরিধানে রয়েছে সোনালী জরির কাজ করা প্রচুর কাপড় জামা। দু'পাশে আসছে গোলাম ও ভৃত্যের দল, পিছনে ছাত্রেরা। তিনি আমাদের সদয় অভ্যর্থনা জানালেন এবং মাগরেবের নামাজের পর আমাকে দেখা করতে আমন্ত্রণ জানালেন।

যথা সময়ে গিয়ে আমি তাঁর দেখা পেলাম তাঁর বাগানে একটি অভ্যর্থনা কক্ষে। বাগানে একটি নহর আছে। মারবেল পাথরের চৌবাচ্চার সঙ্গে সেটি যুক্ত। কারুকার্যময় বস্ত্রে আবৃত একটি উচ্চ আসনে তিনি বসেছেন, ডাইনে ও বামে দাঁড়িয়ে আছে গোলাম, ভৃত্য ও ছাত্রের দল। আমি তাঁকে প্রথম দেখে কোন রাজা বলেই ভুল করেছিলাম। তিনি উঠে আমাকে অর্ভ্যথনা করে বেদীর উপর পাশে আমাকে বসালেন। খাওয়ার পরে আমরা মাদ্রাসায় ফিরে এলাম। বিরগীর সুলতান তখন নিকটেই পাহাড়ের উপর তাঁর গ্রীষ্মাবাসে বাস করছিলেন। অধ্যাপকের কাছে খবর পেয়ে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। অধ্যাপকের সঙ্গে আমি গিয়ে যখন হাজির হলাম, তিনি তখন তাঁর দু' পুত্রকে পাঠালেন আমাদের কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার জন্য। আমাকে তিনি একটি তাঁবুও পাঠালেন। এ শ্রেণীর তাঁবুকে এখানে খরগ বলে। কাঠের কতকগুলি বাতা গুম্বজাকারে একত্র করে এটি তৈরী করা হয়েছে। বাতার ফাঁকে পশমী কাপড়–উপরের দিক আলো-হাওয়া প্রবেশের জন্য খোলা। দরকার মত তা বন্ধও করা যায়। পরের দিন সুলতান আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমি যে সব দেশে সফর করেছি সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আহারের পরে আমি বিদায় নিয়ে এলাম। কয়েক দিন এভাবেই চলল। সুলতান প্রত্যেক দিনই তাঁর সঙ্গে আহারের জন্য আমাদের ডেকে পাঠান। তুর্কীরা ধর্মশাস্ত্রবিদদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে তার নির্দশন স্বরূপ তিনি নিজেই একদিন বিকেলে এসে আমাদের তাঁবুতে হাজির হলেন। অবশেষে অধ্যাপক ও আমি উভয়েই এ পাহাড়ে বাস করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। কাজেই অধ্যাপক একদিন সুলতানকে বলে পাঠালেন যে আমি পুনরায় আমার সফর শুরু করতে চাইছি। জবাবে সুলতান জানালেন, তিনি পরের দিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে শহরে তাঁর প্রাসাদে ফিরে যাবেন। পরের দিন আমাদের জন্য

একটি চমৎকার ঘোড়া পাঠিয়ে তিনিও আমাদের সঙ্গে শহরে ফিরে এলেন। প্রাসাদে ফিরে এসে প্রকাণ্ড একটি সিঁড়ি বেয়ে দরবার কক্ষে এসে পৌঁছলাম। কক্ষের মধ্যস্থলে পানির একটি চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার প্রত্যেক কোণে একটি করে ব্রঞ্জনির্মিত সিংহ। সিংহের মুখ থেকে চৌবাচ্চায় অনবরত পানি পড়ছে। কক্ষের চারদিকে বেষ্টন করে কার্পেট মোড়া বেদী—এক জায়গায় বেদীর উপরে সুলতানের জন্য গদি আঁটা আসন। আমরা এখানে পৌঁছলে সুলতান গদি সরিয়ে আমাদের সঙ্গে কার্পেটের উপর আসন গ্রহণ করলেন। কোর-আন পাঠকগণ সর্বদাই দরবারে হাজির থাকেন। তাঁরা বসেন বেদীর নীচে। কিছু শরবৎ ও বিস্কুট খাওয়ার পরে আমি সুলতানকে ধন্যবাদ জানালাম ও অধ্যাপকের প্রশংসা করলাম। তাতে সুলতান অত্যন্ত খুশী হলেন।

আমরা সে অবস্থায় বসা থাকতেই সুলতান হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আসমান থেকে পড়েছে এমন কোন পাথর আপনি কখনও দেখেছেন কি?"

আমি বললাম, "না, তেমন কোন পাথরের কথা আজ অবধি শুনি নি।"

"হ্যাঁ, এ শহরের বাইরে একবার একটি পাথর পড়েছিল।" এই বলে তিনি সেই পাথরটি আনতে হুকুম করলেন। প্রকাণ্ড একটা কাল পাথর আনা হল আমাদের সামনে। পাথরটি শক্ত এবং চক্‌চকে। মনে হ'ল তার ওজন এক হন্দরের কম হবে না। অতঃপর সুলতান ডেকে পাঠালেন পাথর-ভাঙ্গা মজুরদের। চারজন মজুর এক সঙ্গে লোহার হাতুড়ী দিয়ে পাথরের উপর ঘা মারল কিন্তু পাথরের গায়ে কোন দাগও পড়ল না। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। সুলতান তখন পাথরের টুকরাটি যথাস্থানে নিয়ে রাখতে হুকুম দিলেন। আমরা চৌদ্দদিন অবধি এ সুলতানের সঙ্গে একত্রে বাস করেছি। প্রতি রাত্রেই তিনি আমাদের জন্য ফল, মিষ্টি ও অন্যান্য খাদ্য পাঠাতেন, আর পাঠাতেন মোমবাতি। তা' ছাড়াও তিনি আমাকে এক শ' স্বর্ণমুদ্রা, এক হাজার দেরহাম, এক প্রস্থ পরিচ্ছদ এবং মাইকেল নামে একজন গোলাম উপহার দেন। আমার সঙ্গীদের প্রত্যেককে দেন একটি করে পোষাক ও কিছু অর্থ। এসব কিছুর জন্যই আমরা অধ্যাপক মহিউদ্দিনের কাছে ঋণী। খোদা তাঁর মঙ্গল করুন।

আমরা সেখান থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করে সুলতানের এলাকার মধ্যেই তিরা শহরে এলাম। সেখান থেকে এলাম গ্রীকদের শহর আয়ামূলক (Ephesus)। গ্রীকরা এ প্রাচীন বড় শহরটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। পাথরের দ্বারা সুন্দরভাবে নির্মিত প্রকাণ্ড একটি গীর্জা এখানে আছে। প্রত্যেকটি পাথর খণ্ড দশ হাত বা তার চেয়েও বেশী লম্বা। এখানকার বড় মসজিদটি অত্যন্ত সুদৃশ্য। এক সময়ে এটি গ্রীকদের একটি গীর্জা ছিল। আমি চল্লিশ দিনারে এখানে একটি গ্রীক বাঁদী ক্রয় করেছিলাম।

সেখান থেকে আমরা এলাম ইয়াজমীর (স্মার্ণা)। সমুদ্রোপকূলে ধ্বংসপ্রায় একটি বড় শহর। আয়দীনের সুলতানের পুত্র ওমর এখানে শাসনকর্তা। আমার কথা শুনে তিনি সরাইখানায় দেখা করতে এসেছিলেন এবং আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। পরে তিনি আমাকে নিকোলাস নামক একজন গ্রীক ক্রীতদাসও দেন। তিনি একজন দয়ালু ও ধর্মপ্রাণ শাহজাদা এবং সর্বদা খৃষ্টানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। তাঁর কতকগুলি নৌকা

ছিল। সেগুলির সাহায্যে তিনি বিখ্যাত কনস্টান্টিনোপলের আশে-পাশে আক্রমণ করে' লোকদের বন্দী করে আনতেন ও লুটের মাল আনতেন। সে সব দান খয়রাত ও উপহারে ব্যয় করে আবার গিয়ে আক্রমণ চালাতেন। অবশেষে এ আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রীকরা আবেদন জানান পোপের কাছে। পোপ জেনোয়া ও ফ্রান্সের খৃস্টানদের আদেশ করলেন প্রতি-আক্রমণ চালাতে। তারা তাই করল। পোপও রোম থেকে একদল সৈন্য পাঠালেন। পোপের সৈন্যরা রাত্রে আক্রমণ চালিয়ে বন্দর ও শহর দখল করে ফেলল। আমীর ওমর দূর্গ থেকে বেরিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ শহীদ হলেন। খৃস্টানরা শহরে আধিপত্য বিস্তার করলেও দূর্গটি সুরক্ষিত ও শক্তিশালী থাকায় তা দখল করতে পারল না।[১১]

সেখান থেকে আমরা মাগনিসিয়া (এখন Manisa) এসে হজের নামাজ পড়লাম। আমাদের জামাতে ছিলেন সুলতান সারুখান। এখানে আমার গোলামটি ঘোড়াকে পানি খাওয়াবার জন্য গিয়ে আমার সঙ্গীর আরেকটি গোলামের সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করে। সুলতান পলাতকদের খুঁজে বের করতে পাঠালেন কিন্তু সবাই তখন ঈদের উৎসবে ব্যস্ত বলে তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব হল না। তারা ফুজা নামে উপকূলবর্তী একটি শহরের দিকে পলায়ন করে। এ শহরটি বিধর্মীদের অধিকারে।[১২] বিধর্মীরা প্রতি বছর সুলতানকে কিছু উপহার পাঠায়। ফলে সুলতান তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। পরের দিন দুপুর বেলা কয়েকজন তুর্কী ঘোড়াসহ গোলামদের এনে আমাদের কাছে হাজির করে। আগের দিন বিকালে পলাতকরা তুর্কীদের কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাদের দেখে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরে পলাতকরা পলায়নের ব্যাপার স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

অতঃপর আমরা বারখামা পৌঁছলাম। বারখামা একটি ধ্বংস প্রায় শহর কিন্তু এখানে পাহাড়ের চূড়ায় একটি সুরক্ষিত দূর্গ রয়েছে। এখানে আমরা একজন গাইড নিযুক্ত করে পাহাড়ের পথে সফর করে বালিকাসরি এসে পৌঁছলাম। এখানকার দুমুর খাঁ নামক সুলতান একজন অপদার্থ ব্যক্তি। তাঁর পিতা এ শহর নির্মাণ করেন এবং পুত্রের আমলে সে শহর একদল প্রতারকের বাসস্থানে পরিণত হয়। "যেমন রাজা, তেমনি তার প্রজা।" আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একটি জামা উপহার দেন। এ শহর থেকে আমি মার্গেরাইট নাম্নী একটি গ্রীক্ বালিকা বাঁদী রূপে খরিদ করি।

বারখামা থেকে আমরা এলাম বার্‌সা (Brusa)। চমৎকার বাজার, প্রশস্ত রাস্তা চারিদিক ফলের বাগবাগিচা ও নদীনালা সহ বারসা একটি বড় শহর। এখানে শহরের বাইরে দু'টি চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার একটি পুরুষদের জন্য, অপরটি নারীদের জন্য। দূর দূরাঞ্চল থেকে রোগীরা এখানে চিকিৎসার জন্য আসে। তারা এসে একজন তুর্কী সুলতানের দ্বারা নির্মিত একটি মুসাফেরখানায় তিনদিন বসবাস করতে পারে। এ শহরে এসে আমি শেখ আবদুল্লাহ্ নামক একজন মিশরী ভ্রমণকারীর দেখা পাই। তিনি চীন, সিংহল, পাশ্চাত্য, স্পেন, নিগ্রোল্যাণ্ড ছাড়া দুনিয়ার সব দেশ সফর করেছেন। কাজেই এ'সব দেশ সফর করে এ ব্যাপারে আমি তাঁকে ছাড়িয়ে গেছি।

বারসার বর্তমান সুলতান ওরখান বেক্। তিনি ওসমান চাকের পুত্র। তিনি তুর্কমেন সুলতানদের সর্বপ্রধান। অর্থ, জমি, সৈন্যবল প্রভৃতিতে তিনি সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী। তাঁর প্রায় এক শ'টি দূর্গ তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে দেখাশুনা করেন। তিনি বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাদের দেশ অবরোধ করেন। তাঁর পিতাই বারসা শহর গ্রীকদের থেকে দখল করেন। কথিত আছে তিনি প্রায় বিশ বৎসরকাল ইয়াজনিক (Nicea) অবরোধ করে রাখেন কিন্তু শহরটি দখলের পূর্বেই এন্তেকাল করেন। এ জায়গাটি দখল করবার আগে তাঁর পুত্র ওরখান বেকও প্রায় বার বৎসর কাল এটি অবরোধ করে রাখেন। আমি বারসায় এসে এখানেই তাঁর দেখা পাই।[১৩] একটি হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত ইয়াজনিক শহরে ঢুকতে হয় সরু পুলের মত একটি রাস্তা পার হয়ে। এ রাস্তাটি এত সরু যে এক সঙ্গে একজন মাত্র ঘোড়সওয়ার অগ্রসর হতে পারে। শহরের চারদিক দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত। দু'টি দেওয়ালের মধ্যে একটি করে পরিখা। পরিখা পার হতে হয় কাঠের টানা সাঁকোর সাহায্যে। দেওয়ালের মধ্যে ফলের বাগান, ঘরবাড়ী, ও মাঠ আছে। পানি তুলতে হয় কূপ থেকে। আমার একটি ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে আমাদের এখানে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। কিন্তু অনেক বিলম্ব হতে থাকায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি তিনজন সঙ্গী একটি বালিকা বাঁদী ও দু'জন বালক গোলাম নিয়ে ঘোড়াটি ফেলেই রওয়ানা হয়ে এলাম। ভাল তুর্কী ভাষা জানে এবং দোভাষীর কাজ করতে পারে তখন এমন কেউ আমাদের সঙ্গে ছিল না। আমাদের দোভাষীকে আমরা ছেড়ে এসেছি ইয়াজনিকে। এ শহর ছেড়ে আমরা সাকারী (Sangarius) নামে প্রকাণ্ড একটি নদী খেয়ার সাহায্যে পার হয়ে এলাম। খেয়া বলতে চারটি কাঠের বিম দড়ি দিয়ে একত্রে বাঁধা। তার উপরে মালপত্র চাপিয়ে যাত্রীরা উঠলে তা অপর পারে নেওয়া হয় দড়ির সাহায্যে টেনে। ঘোড়াগুলি সাঁতরে যায় তার পেছনে।

সেই রাত্রেই আমরা কাবিয়া (Gheiva) পৌছে একটি 'ভ্রাতৃত্বের' আশ্রয়ে থাকি। কিন্তু তিনি আরবী ভাষা বুঝতেন না, আমরা বুঝতাম না তুর্কী। কাজেই তিনি একজন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞকে ডেকে নিয়ে এলেন। ইনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন ফারসীতে। আমাদের আরবী বুঝতে না পেরে তিনি ভ্রাতাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, Ishan 'arabi kuhna miguyand waman 'arabi naw midanam, অর্থাৎ "এরা প্রাচীন আরবী বলছেন এবং আমি জানি শুধু আধুনিক আরবী।" তিনি নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যই একথা বলেছেন, কারণ সবাই জানত তিনি আরবী জানেন কিন্তু আসলে তিনি আরবী জানতেন না। কিন্তু তাতে বরং আমাদের যথেষ্ট উপকারই হয়েছিল। আমাদের সেই ভ্রাতা ঐ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে আমাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়ে বললেন, "এঁদের যথেষ্ট সম্মান করতে হবে কারণ এঁরা আরবীতে কথা বলেন। আমাদের প্রিয় পয়গম্বর ও তাঁর সাহাবাগণের ভাষাও ছিল প্রাচীন আরবী।"

ধর্মশাস্ত্রবিদ্ সে লোকটি কি বলেছিলেন প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু কথাগুলি আমি মনে করে রেখেছিলাম। পরে আমি যখন ফারসী ভাষা শিখলাম তখনই শুধু অর্থ বুঝতে পারলাম।

আমরা মুসাফেরখানায় সে রাত কাটালাম। ভ্রাতা আমাদের একজন চালক সঙ্গে দিয়ে ইয়ানিজা(Tarakli) নামক বড় একটি শহরে পাঠালেন। আমরা আখির মুসাফেরখানা খুজতে গিয়ে দেখা পেলাম একজন পাগলা দরবেশের। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটাই কি আখির মুসাফেরখানা?"

তিনি বললেন "না-আম" (হাঁ)।

তাঁর জবাব শুনে আমি এই ভেবে খুশী হলাম যে এতদিনে অন্ততঃ আরবী-জানা একজন লোকের দেখা পেলাম। কিন্তু তাঁকে বেশী করে পরখ্ করতে গিয়ে সব গুমর ফাঁক হয়ে গেল। তিনি আরবী বলতে শুধু ঐ "না–আম" শব্দটিই জানতেন। আমরা তাই মুসাফেরখানায় আশ্রয় গ্রহণ করলে একজন ছাত্র এসে আমাদের খাবার দিয়ে গেল। আমি নিজে তখন অনুপস্থিত ছিলাম কিন্তু এ ছাত্রটির সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ভাব হয়ে উঠ্‌ল। যদিও সে আরবী জান্‌ত না তবু আমাদের সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করত। সে আমাদের বিষয় শাসনকর্তার কাছে বলায় তিনি তাঁর একজন ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দেন। আমাদের কেনুক্ (Kevnik) পৌছে দেবার জন্য। ওরখান বেকের এলাকার ভেতর কেনুক একটি ছোট শহর। মুসলমান শাসনাধীনে শহরে বাস করে বিধর্মী গ্রীক্‌রা। এখানে মুসলমান বাড়ি শুধুই একটি এবং সেটির মালিক গ্রীকদের শাসনকর্তা। কাজেই আমাদের থাকতে হল একজন বৃদ্ধা বিধর্মীয় গৃহে। তখন ছিল তুষার ও বৃষ্টিপাতের সময়। বৃদ্ধা আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে[১৪] এবং আমরা তার গৃহেই রাত কাটাই। এ শহরের কোন গাছগাছড়া বা আঙ্গুর বাগান নাই। এখানে একমাত্র জাফরানের চাষ হয়। আমাদের সওদাগর মনে করে বৃদ্ধা আমাদের কাছে বিক্রির জন্য অনেকটা জাফরান এনে হাজির করেছিল।

ভোরে আমরা ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলে আমাদের ঘোড়সওয়ার চালক আরেকজন চালক এনে হাজির করল আমাদের মুতুরনি অবধি পৌছে দিতে। আগের দিন রাত্রে এত অধিক তুষার পাত হয়েছে যে রাস্তার চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের চালক আগে-আগে যেতে লাগল, আমরা তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে চললাম। প্রায় দুপুরের সময় আমরা তুর্কমেনদের একটি গ্রামে এসে পৌছলাম। তারা আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করলো। আমাদের ঘোড়সওয়ারের অনুরোধে তাদের একজন এসে আমাদের সঙ্গী হল। বন্ধুর পাবর্ত্য পথের ভেতর দিয়ে সে আমাদের নিয়ে চলল। একটি খালে আমাদের ত্রিশবারের বেশী পার হতে হল। সে সব ছাড়িয়ে গেলে চালক আমাদের কাছে কিছু অর্থ চাইল। আমরা বললাম, "আমরা শহরে পৌছে তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দেব।"

আমাদের কথায় সে সন্তুষ্ট হল না অথবা বুঝতেই পারল না। সে আমাদের এক সঙ্গীর একটি ধনুক চেয়ে নিয়ে একদিকে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এল। আমি সে সময় তাকে কিছু অর্থ দিলাম। সে তখন আমাদের ফেলেই চলে গেল। কোন্ দিকে যেতে হবে কিছুই আমরা জানি না, আমাদের সামনে কোন রাস্তাও নেই। সূর্য ডুবে যাচ্ছে প্রায় এমন সময় আমরা একটা পাহাড়ে এসে পৌছলাম। সেখানে আমরা পথ চিনতে পারলাম কতকগুলি পাথর পথে ছড়ানো দেখে। আরও বেশী তুষারপাত হতে পারে এবং

জায়গাটা জনমানবহীন আশঙ্কা করে আমার ভয় হ'ল হয়ত সঙ্গীদেরসহ এখানেই আমাদের শেষ। ঘোড়া থেকে নামলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং পথ চলব তাও জানা নেই। আমার ঘোড়াটা ছিল ভাল। তখন মনে মনে ভাবলাম, আমি যদি নিরাপদে কোথাও পৌঁছতে পারি তবে সঙ্গীদের রক্ষার চেষ্টা করতে পারি। এই ভেবে আমি তাদের খোদার উপর সোপর্দ করে রওয়ানা হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার অনেক পরে এক জায়গায় কতকগুলি বাড়ীঘর দেখে বলে উঠলাম, আল্লাহ্ বাড়িগুলিতে যেনো লোকজনের দেখা পাই। লোকজনের দেখা সত্যিই পেলাম। খোদা মেহেরবানী করে আমাকে কয়েকজন দরবেশের এক বাসস্থানে এনে হাজির করেছেন। দরজায় আমাকে কথা বলতে শুনে তাঁদের একজন বেরিয়ে এলেন। আমি লোকটিকে আগে থেকেই চিনতাম। দরবেশদের সঙ্গে নিয়ে আমি তাঁকে আমার সঙ্গীদের রক্ষার জন্য যেতে অনুরোধ করলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়েই তাঁরা সেখানে গেলেন এবং পরম দয়ালু খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ যে আমরা সবাই নিরাপদে ফিরে এলাম। দরবেশদের সবাই সাধ্যমত খাদ্যবস্ত্র দিয়ে আমাদের বিপদ দূর করলেন।

পরেরদিন ভোরে যাত্রা করে আমরা মুতুরলি (Mudurlu) পৌঁছলাম। সেখানে আরবী জানে এমন একজন হজযাত্রীর দেখা পেলাম। তাকে আমরা অনুরোধ করলাম আমাদের সঙ্গী হয়ে কাস্তামুনিয়া অবধি যেতে। সেখান থেকে কাস্তামুনিয়া দশ দিনের পথ। আমার একটি মিশরীয় জামা, সাময়িক খরচের জন্য কিছু অর্থ, একটি ঘোড়া তাকে দিলাম এবং বিশেষ পারিতোষিকের প্রতিশ্রুতি দিলাম। জামা ও অর্থ সে পরিবারের লোকদের দিয়ে গেলো। দেখা গেল, সে একজন ধনবান ব্যক্তি কিন্তু চরিত্রে তার নীচ প্রকৃতির। আমরা আমাদের খরচ পত্রের জন্য তার হাতে টাকা পয়সা দিতাম। আমাদের উচ্ছিষ্ট রুটি সে নিয়ে যেত এবং তাই দিয়ে আমাদের জন্য মসলা শাকও লবণ কিনে আনতো অথচ সে দরুণ আমাদের পয়সা কেটে নিত। আমি এ কথা ও শুনেছি যে আমরা আমাদের খরচের জন্য তাকে যা দিতাম তারও কিছুটা অংশ সে চুরি করত। আমরা তুর্কী ভাষা জানতাম না বলেই তাকে আমাদের সঙ্গে রাখতে হয়েছিল। তারপর ব্যাপার এতদূর গড়াল যে, সন্ধ্যায় আমরা তাকে বলতাম "কেমন হাজী, আজকে কত চুরি করলে?"

সে তার জবাবে কত নিয়েছে তা প্রকাশ করত, আমরা হাসতাম ও তাই নিয়ে আমোদ করতাম।

সেখান থেকে আমরা বুলি শহরে এসে এক যুব ভ্রাতৃত্বের মুসাফেরখানায় আশ্রয় নিলাম। কী যে চমৎকার লোক এখানে মুসাফেরখানায় তা তারা যেমন উচ্চমনা আর নিঃস্বার্থ, তেমনি মুসাফেরদের প্রতি সদয়, স্নেহশীল। কী আন্তরিকতাপূর্ণ তাঁদের অভ্যর্থনা! কোন মুসাফের এলে তাঁদের ব্যবহারে তাকে ভাবতে হবে যে সে তাঁদেরই একজন অতি প্রিয় আপনজন।

পরেরদিন ভোরে রওয়ানা হয়ে আমরা গারাদি বুলি শহরে পৌঁছলাম। সমতল ভূমিতে অবস্থিত এ শহরটি সুন্দর ও বড় কিন্তু মনে হয় এটি পৃথিবীর অন্যতম

শীতপ্রধান শহর। গারাদি বুলি শহর কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত এবং এক-এক মহল্লায় এক-এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এক মহল্লার লোক অপর মহল্লার লোকদের সঙ্গে কখনও মেলামেশা করে না। এখানকার সুলতান দেশের একজন খ্যাতি সম্পন্ন শাসক। তিনি সুদর্শন ও সৎ, কিন্তু অনুদার। তিনি মুসাফেরখানায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং এক ঘন্টাকাল আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন। পরে আমাকে জিন্ লাগানো একটি ঘোড়া ও একটি পোষাক উপহার দেন।

আমরা বারলু[১৫] নামক একটি ছোট শহর ছাড়িয়ে কাস্তামুনিয়া এসে পৌছলাম। কাস্তামুনিয়া একটি সুন্দর বড় শহর । এখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায় প্রচুর এবং দামও এত সস্তা যে আমি কোথাও তেমন দেখিনি। আমরা এখানে অন্ধ কালা একজন শেখের সরাইখানায় ছিলাম। তাঁর একটি আশ্চর্য গুণ দেখলাম। তাঁর ছাত্রদের ভেতর একজন নিজের আঙুল দিয়া মাটিতে বা শূন্যে যা লিখে দিত তিনি অনায়াসে তা বুঝতেন ও জবাব দিতেন। কখনো কখনো এভাবে বড় বড় গল্প পর্যন্ত তাকে বলা হয়। আমরা প্রায় চল্লিশদিন এখানে কাটাই। বিখ্যাত সুলায়মান বাদশাহ কাস্তামুনিয়ার সুলতান। দীর্ঘ শ্মশ্রুশোভিত রাজোচিত সৌম্যকান্তি বিশিষ্ট সত্তর বছরের বৃদ্ধ তিনি। আমি তাঁর অভ্যর্থনা কক্ষে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে পাশে বসিয়ে আমার সফর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। পরে তিনি আমাকে তাঁর কাছেই থাকতে হুকুম করে। সেই দিনই আমার ব্যয় নির্বাহের ও ঘোড়ার খাদ্যের জন্য টাকা পয়সা ছাড়াও একটি সাদা ঘোড়া ও একটি পোষাক দিলেন। এরপর অর্ধদিনের পথ দূরের এক গ্রাম থেকে তিনি আমাকে কিছু গম ও বার্লি দেন। কিন্তু খাদ্যশস্য সেখানে খুবই সস্তা বলে তা বিক্রি করা সম্ভব হল না। কাজেই সেগুলি আমার সঙ্গী হজযাত্রীদের দিয়ে দিলাম। প্রতিদিন অপরাহ্নে দরবারে বসা এখানকার সুলতানদের একটি রীতি। তখন সেখানে খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং দরজা খুলে রাখা হয়। শহরের বাসিন্দা, যাযাবর বিদেশী মুসাফের বা সফরকারী—কারও জন্যই সে খাদ্য গ্রহণে বাধা নেই।

কাস্তামুনিয়া থেকে আমরা সানুব (Sinope) এসে পৌছলাম । শক্তি ও সৌন্দর্যের সমাবেশ হয়েছে এ জনবহুল শহরটিতে। একমাত্র পূর্ব দিক ব্যতীত শহরটি সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব দিকের একটি মাত্র প্রবেশপথ দিয়ে শাসনকর্তা ইব্রাহিম বেকের অনুমতি ছাড়া কেউ শহরে প্রবেশ করতে পারে না। ইব্রাহিম বেক্ সুলতান সুলায়মান বাদশাহ্র ছেলে। শহরের বাইরে এগারটি গ্রাম গ্রীক্ বিধর্মীদের বাস। সানুবের প্রধান মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর। সুলতান পারওয়ানাহ্ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তার পরে সুলতান হন তার ছেলে গাজী চেলেবি। গাজী চেলেবির মৃত্যুর পর শহরটি দখল করেন সুলতান সুলায়মান। গাজী চেলেবি সাহসী কিন্তু দাম্ভিক ছিলেন। তাঁর অদ্ভূত দক্ষতা ছিল পানির নীচে সাঁতরাবার। তিনি তার যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতেন। যখন দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হতো এবং সবাই ব্যস্ত থাকত যুদ্ধে তখন তিনি লোহার একটি যন্ত্র দিয়ে পানিতে ডুব দিতেন এবং যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুর জাহাজ ফুটো করে দিয়ে আসতেন। জাহাজ ডুবে যাবার আগে শত্রুরা কিছুই বুঝতে পারত না।

আমরা জাহাজে কিরাম[১৬] যাব বলে অনুকুল আবহাওয়ার অপেক্ষায় চল্লিশ দিন কাটালাম কাস্তামুনিয়া। তারপর গ্রীকদের একটি জাহাজ ভাড়া করেও আমাদের এগার দিন অপেক্ষা করতে হল অনুকূল বাতাসের অপেক্ষায় । অবশেষে আমাদের জাহাজ পাল তুলে দিল কিন্তু তিন রাত্রি চলবার পরই আমরা মধ্য সমুদ্রে আটকা পড়ে গেলাম ভয়াবহ ঝড়ে। দেখতে দেখতে তুমুল ঝড় আরম্ভ হল এবং বায়ুর পরিবর্তিত গতি আমাদের পুনরায় সানুবের কাছে নিয়ে হাজির করল। তারপরে আকাশ পরিষ্কার হলে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম এবং অনুরূপ আরও একটি ঝড়ের পরে সমুদ্রের পারে পাহাড় দেখতে পেলাম। তখন কার্শ (Kerch) নামক একটি পোতাশ্রয়ের দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। যেই পোতাশ্রয়ে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দেখতে পেলাম পাহাড়ের উপর থেকে কয়েকজন লোক সঙ্কেতে আমাদের সেখানে ঢুকতে বারণ করছে। বন্দরে কোন শত্রুর জাহাজ আছে মনে করে আমরা ফিরে এসে উপকূল ঘেঁষে চলতে লাগলাম। জাহাজ যখন পারের দিকে যাচ্ছিল তখন আমি কাপ্তেনকে বললাম, আমি এখানে নামতে ইচ্ছা করি। তিনি আমাকে নামিয়ে দিলেন। কিপচক্ মরুভূমির ভেতর এ স্থানটি সবুজ তৃণাচ্ছন্ন কিন্তু বৃক্ষহীন। এখানে জ্বালানী কাঠ দুস্প্রাপ্য বলে সবাই ঘুঁটে ব্যবহার করে। কাজেই, সেখানে উচ্চ স্তরের লোকদেরও জামার আঁচলে করে ঘুঁটে কুড়াতে দেখা যায়। এ মরুভূমিতে যাতায়াতের একমাত্র বাহন চার চাকার গাড়ী। মরুভূমির একদিক থেকে অপরদিক অবধি যেতে ছ'মাস লাগে। ছ'মাসের তিন মাস যেতে হয় সুলতান মোহাম্মদ উজবেগের[১৭] রাজ্যের মধ্যে দিয়ে। আমরা এখানে পৌঁছবার পরের দিন আমাদের সঙ্গী একজন সওদাগর কিপ্চকের এক খৃস্টান বাসিন্দার কাছ থেকে কয়েকটি গাড়ী ভাড়া করলেন এবং আমরা কাফা এসে পৌঁছলাম। খৃষ্টান অধ্যুষিত কাফা সমুদ্রের তীরে একটি বড় শহর। শহরের খৃষ্টান শাসনকর্তার নাম ডামডির (Demetrio)[১৮]।

কাফায় এসে আমরা মসজিদে বাস করি। এখানে এসে পৌঁছার এক ঘন্টা পরেই শুনতে পেলাম চারদিকে ঘন্টা বাজ্ছে। এর আগে কোথাও এ রকম ঘন্টা বাজতে শুনি নাই[১৯] বলে ভয় পেয়ে আমি সঙ্গীদের মিনারে উঠে কোরআন পাঠ করতে ও আজান দিতে বললাম। তারা তাই করতেই হঠাৎ অস্ত্র ও বর্মধারী লোক এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সেখানকার মুসলমানদের কাজী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাদের কোর-আন পড়া আর আজান শুনে ভয় হলো আপনাদের কোনো বিপদ ঘটেছে কি না, তাই ছুটে এলাম। তারপর তিনি বলে গেলেন এবং আমাদেরও কোনো বিপদ ঘট্ল না। পরেরদিন শাসনকর্তা এসে আমাদের এক ভোজে আপ্যায়িত করলেন। পরে আমরা ঘুরে দেখলাম শহরে অনেক বাজার রয়েছে। সমস্ত বাসিন্দাই বিধর্মী। বন্দরে গিয়ে দেখলাম, যুদ্ধ জাহাজ, সওদাগরী জাহাজ মিলিয়ে ছোট-বড় প্রায় দু'শ জাহাজ রয়েছে পোতাশ্রয়ে। এ পোতাশ্রয়টি পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত পোতাশ্রয়।

একটি চার চাকার গাড়ী ভাড়া করে আমরা কিরাম শহরে এলাম। কিরাম সুলতান উজবেগ খানের রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার শাসনকর্তার নাম তালাকতুমুর। আমাদের কথা শুনে তিনি একটি ঘোড়াসহ ইমামকে আমাদের কাছে পাঠান, কারণ তিনি নিজে তখন অসুস্থ ছিলেন। পরে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাদের যথেষ্ট সম্মান

করেন ও উপহার দেন। শাসনকর্তা খানের রাজধানী সারা যাত্রার আয়োজন করছিলেন। কাজেই আমরাও তার সঙ্গে যাবার জন্য গাড়ি ভাড়া করে নিলাম। এসব গাড়ির চারটি বড় চাকা থাকে এবং ভারের তারতম্য হিসেবে দু'টি বা তার বেশী সংখ্যক ঘোড়া, বলদ বা উটে টানে। ঘোড়াগুলির একটিতে চড়ে চালক হাতে চাবুক বা কাঠের লাঠি নিয়ে বসে। কাঠের বাতার সঙ্গে বনাত বা কম্বলের কাপড় চামড়ার ফালি দিয়ে বেঁধে তৈরী এক ধরনের হাল্‌কা তাঁবু গাড়ীর উপর দেওয়া হয়। তাঁবু ঝাঁঝরা দেওয়া জানালার সাহায্যে বাইরের সবকিছুই দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখা যায় না। চলন্ত গাড়ীর এসব তাঁবুর ভিতরে বসে খাওয়া, ঘুমানো, লেখাপড়া প্রভৃতি সবই করা চলে। যে গাড়ীতে মালপত্র এবং রসদ রাখা হয় সে গাড়ীতে এক রকম একটি তাবু থাকে এবং তা তালা দিয়ে রাখা হয়।

আমীর তালাকতুমুর তাঁর ভাই ও দু'টি ছেলে সহ আমরা একত্র যাত্রা করলাম। যেসব জায়গায় আমরা বিশ্রামের জন্য থেমেছি তার সব জায়গায়ই তুর্কীরা তাদের ঘোড়াগুলিকে রাত্রে বা দিনে যথেচ্ছভাবে চড়ে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেয়, সঙ্গে কোন সহিস বা রক্ষক থাকে না। চুরির ব্যাপারে তাদের আইনের কড়াকড়ির জন্যই এ রকম করা সম্ভব হয়েছে। কোনো চুরি যাওয়া ঘোড়াসহ কাউকে পেলে তাকে সেটি ফেরৎ দিতে বাধ্য করা হয় আরও নয়টি ঘোড়া সঙ্গে দিয়ে। যদি সে তা দিতে অক্ষম হয় তবে ঘোড়ার পরিবর্তে তার ছেলেদের নেওয়া হয়। যদি তার ছেলেও না থাকে তবে তাকেই জবাই করা হয় ভেড়ার মত। তারা রুটী বা অপর কোনো শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে না। মিলেট বা জোয়ারের সঙ্গে কুচি কুচি করে' কাটা মাংসের সুরুয়া রান্না করে তারা তাই খায়। থালায় করে দইয়ের সঙ্গে সুরুয়া পরিবেশন করলে তারা তাই পান করে এবং পরে গাধার দুধে তৈরী কুমিজ নামক দই খায়। জোয়ার দিয়ে তারা একপ্রকার চোলাই করা পানীয় তৈরী করে। এ পানীয় তাদের কাছে বুজা (Beer) নামে পরিচিত। তাদের মতে বুজা অবৈধ পানীয় নয়। বুজা দেখতে শাদা। আমি একবার খেয়ে দেখেছিলাম জিনিসটা তেতো। কাজেই, আর কোনোদিন খাইনি। মিষ্টি খাওয়াকে এরা অপমানজনক মনে করে। একবার রমজানের সময় আমার এক সঙ্গীর হাতে তৈরী কিছু মিষ্টি সুলতান উজবেগকে দিয়েছিলাম। তিনি কোন রকমে আঙুল দিয়ে সেগুলি ধরেই মুখে পুরে দিলেন।

কিরাম থেকে যাত্রা করে আঠারটি ষ্টেশন পার হয়ে আমরা একটি জলাশয়ের কাছে পৌঁছলাম। সেটি হেঁটে[২০] পার হতে একদিন লেগে গেলো। অনেক গরু, ঘোড়া ও গাড়ী পার হয়ে যাবার পরে জায়গাটি অত্যন্ত কর্দমাক্ত হয় এবং পার হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। সুতরাং আমীর আমার একটু আরাম হবে ভেবে তাঁর একজন পরিষদ সঙ্গে দিয়ে আমাকে আগেই পাঠিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার আদেশ দিয়ে আজাকের শাসনকর্তাকে একটা চিঠিও লিখে দিলেন তিনি। তারপরে আমরা দ্বিতীয় এক জলাশয়ে এলাম। সেটি পার হতেও আধা দিন লেগে গেলো সেখান থেকে যাত্রা করার তৃতীয় দিন আমরা সমুদ্রের পারে আজাক (Azov) শহরে এসে পৌঁছলাম। এ সুগঠিত শহরটিতে Genoese এবং অন্যান্য সওদাগরেরা বরাবর যাতায়াত করে। আমীর

তালাকতুমুরের পত্র পেয়েই শাসনকর্তার শহরের কাজী ও কয়েকজন ছাত্র সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং খাদ্যও পাঠালেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমরা আহারের পর শহরে গেলাম। কারণ, শহরের বাইরে আমরা তাবু ফেলেছিলাম। দুদিন পরে আমীর তালাকতুমুর এলে বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করা হলো। রঙীন রেশমী কাপড়ে তৈরী বিশেষ একটি তাঁবুতে তার জন্য ভোজের আয়োজন হ'ল। তিনি ঘোড়া থেকে নামলে রেশমী কাপড়ের টুকরা বিছিয়ে দেওয়া হ'ল তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওযার জন্য। তিনি দয়া পরবশ হয়ে আমাকে আগে আগে যেতে দিলেন, যাতে শাসনকর্তা বুঝতে পারেন যে তিনি আমাকে কতটা সম্মানের চোখে দেখেন। আমাকে নিয়ে প্রকাণ্ড একটি চেয়ারে বসিয়ে নিজে বসলেন পাশে একটি আসনে। তাঁর ছেলেরা, ভাই ও ভাইপোরা দাড়িয়ে রইলেন বিনীতভাবে। প্রকাণ্ড এ চেয়ারখানা তার নিজের জন্যই রক্ষিত ছিল। ভোজ শেষ হলে আমীরকে, তার পরিবারের প্রত্যেককে এবং আমাকে একটি করে জামা উপহার দেওয়া হল। তারপরে আমীরও তার ভাইকে দশটি করে ঘোড়া, দু' ছেলেকে ছয়টি ঘোড়া এবং আমাকে একটি ঘোড়া উপহার দিলেন।

এদেশে ঘোড়ার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং মূল্য খুবই কম। একটি ভাল ঘোড়ার মূল্য আমাদের চলতি এক দিনারের বেশী নয়। এখানাকার লোকের জীবিকা ঘোড়ার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে যেমন ঘোড়ার সংখ্যা বেশী, তাদের দেশে তেমনি ঘোড়ার সংখ্যা অথবা ভেড়ার সংখ্যার চেয়েও তাদের ঘোড়ার সংখ্যা বেশী। একজন মাত্র তুর্কী হাজার হাজার ঘোড়ার মালিক। এক সঙ্গে ছয় হাজার বা সে রকম সংখ্যক ঘোড়া ভারতে চালান হয়ে যায়। তার মধ্যে প্রত্যেক সওদাগরই হয়তো ১শত বা ২শত করে ঘোড়া একবারে পাঠায়। প্রত্যেক পঞ্চাশটি ঘোড়ার জন্য তারা একজন করে রক্ষক বা সহিস ভাড়া করে। তারাই ঘোড়াগুলিকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে। লম্বা একটি লাঠির মাথায় দড়ি বাঁধা থাকে। সহিস সেই লাঠি হাতে একটি ঘোড়ায় চড়ে এবং যখনই আরেকটি ঘোড়াকে ধরতে চায় তখন নিজের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যায় দ্বিতীয় ঘোড়াটির কাছে। এগিয়ে গিয়ে লাঠির সাহায্যে দড়িটি ঘোড়ার ঘাড়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে তাকে টেনে আনে। তারপর তার পিঠে চড়ে প্রথমটি চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়। সিন্ধুদেশে পৌছবার পরে ঘোড়াগুলিকে ঘাস খাওয়ানো হয়। সিন্ধুদেশের ঘাসপাতা বালির সমকক্ষ নয় বলে অধিকাংশ ঘোড়া মরে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়। সিন্ধু পৌছে ঘোড়ার মালিককে সাত রৌপ্য দিনার শুল্ক দিতে হয় এবং মুলতান গিয়ে আরও একবার শুল্ক আদায় দিতে হয়। পূর্বে মালিককে তার আমদানীকৃত ঘোড়ার দামের এক চতুর্থাংশ শুল্ক বাবদ দিতে হয়েছে কিন্তু সুলতান মোহাম্মদ তা রদ করে দেন এবং আয়ের দশমাংশ শুল্ক ধার্য করেন। তা সত্বেও ঘোড়ার মালীক যথেষ্ট লাভ করে। প্রতি ঘোড়া কমপক্ষে একশত দিনার (মরক্কো মুদ্রায় পঁচিশ দিনার) বিক্রি হয়। অনেক সময় তার দ্বিগুণ বা তিনগুণ মুল্যেও ঘোড়া বিক্রি হয়। একটি ভাল ঘোড়া পাঁচশ দিনার বা তার চেয়েও বেশী মুল্যে বিক্রি হয়। ভারতীয়েরা ঘোড়দৌড়ের জন্য এসব ঘোড়া কিনে না। তারা

যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহার করে এবং যুদ্ধের সময় নিজেরা বর্ম পরে এবং ঘোড়াকেও বর্ম পরিয়ে দেয়। ইয়মেন, ওমান ও ফারস থেকে তারা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া খরিদ করে। সেখানকার ঘোড়ার দাম এক হাজার থেকে চার হাজার দিনার অবধি।

আমীর তালাকতুমুরের সঙ্গে আমি আজাক থেকে মাজার অবধি যাই। তুরুস্কে যে সব সুন্দর শহর আছে তার মধ্যে এটি একটি। এ শহরটি একটি সুন্দর নদীর পারে অবস্থিত।[২২] শহরের বাজারে একজন য়িহুদী আমাকে আরবীয় ভাষায় শুভেচ্ছা জানালো। সে থেকে এখানে এসেছে। য়িহুদীটি বলল, সে স্থলপথে কনস্টান্টিনোপল, আনাতোলিয়া এবং সিরকাসিয়ানদের দেশ(Transcaucasia) হয়ে এখানে এসেছে। তাতে চার মাস সময় লেগেছে। সফররত সওদাগরেরাও এপথ চিনে। তারাও তার কথা সবাই সমর্থন করল।

এদেশে এসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করলাম, নারীর প্রতি তুর্কী জাতির সম্মান। এখানে পুরুষদের চেয়ে সমাজে নারীর মর্যাদা বেশী। কিরাম থেকে রওয়ানা হয়ে আসবার পরে আমীরের বেগমকে আমার দেখবার সুযোগ হয়। তিনিই প্রথম শাহ্জাদী, যাঁকে আমি এখানে দেখলাম। তাঁর সম্পূর্ণ গাড়ীটি ছিল নীল রঙের দামী পশমী কাপড়ে ঢাকা। তাঁবুর দরজা জানালা খোলা। শাহ্জাদীর সঙ্গে রয়েছে পরমা সুন্দরী ও মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা চারজন পরিচারিকা। তাঁর পিছনে আরও কতকগুলি গাড়ী। তাতেও রয়েছে তার মহলের পরিচারিকারা। আমীরের তাবুর কাছে এসে তিনি যখন গাড়ী থেকে নামলেন তখন ত্রিশ জন পরিচারিকা এলো তার বস্ত্রাঞ্চল বহন করতে। আমি সওদাগর এবং সাধারণ পরিবারের মহিলাদেরও দেখেছি। তাঁরা প্রত্যেকে একটি গাড়ীতে যাতায়াত করে। সে গাড়ী ঘোড়ায় টানে। তাঁর বস্ত্রাঞ্চল বহন করবার জন্য তিন চারজন পরিচারিকা থাকে। মহিলারা মুক্তার কাজ করা সরু মাথাওয়ালা টুপি ব্যবহার করে। টুপির চূড়ায় ময়ূরের পালক লাগানো থাকে। তাবুর জানালা খোলা রাখা হয় বলে জানালা দিয়ে তাদের মুখ দেখা যায়। কারণ তুর্কী রমণীরা মুখে নেকাব ব্যবহার করে না।

অনেক সময় স্বামীর সঙ্গেও তারা বাইরে বের হন। তখন অনেকে তাদের পরিচারক মনে করে, কারণ মেষের লোমে তৈরী পোশাক আর উঁচু টুপি ছাড়া আর কিছুই তারা পরিধান করে না।

অতঃপর আমরা সুলতানের শিবিরে যাত্রার আয়োজন করলাম। সুলতানের শিবির ছিল তখন বিশদাগ নামক স্থানে। বিশদাগ অর্থ 'পাঁচ পাহাড়'[২৩]। মাজার থেকে বিশদাগ চারদিনের পথ। এ পাহাড়গুলির মধ্যে একটি উষ্ণপ্রস্রবন আছে। তুর্কীরা এখানে এসে গোসল করে এবং তাতে রোগ প্রতিরোধ হয় বলে এরা দাবী করে। রমজান মাসে পয়লা তারিখে আমরা শিবিরে এসে পৌছলাম। এসে শুনলাম, আমরা যেখান থেকে এইমাত্র এসেছি তারই ধারে কাছে কোথাও শিবির উঠে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের আবার ফিরে আসতে হল। সেখানে একটি পাহাড়ের উপরে আমার তাবু খাটালাম। তাবুর সামনে একটি নিশান পুতে ঘোড়া ও গাড়ীগুলিকে তাবুর পেছনে রাখলাম। তখন

'মহল্লা' অগ্রসর হয়ে এল। মহল্লার নাম রেখেছে তারা 'অরদু'। আমরা দেখলাম একটা প্রকাণ্ড শহর যেনো এগিয়ে আসছে তার বাসিন্দা, মসজিদ, বাজার প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে। চলমান রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে কারণ সফরের সময়েও তারা পথে রান্না করে আহার করে। ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে এসব আসছে। তাবুর জায়গায় পৌঁছে তারা গাড়ী থেকে নামিয়ে তাবুগুলি সেখানে খাটাল। সে সব তাবু ওজনে খুব হাল্‌কা। মসজিদ এবং দোকানপাটও এনে সেখানে স্থাপন করা হল। সুলতানের খাতুনরাও নিজ নিজ দলবল সহ আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। চতুর্থ খাতুন যেতে-যেতে নিশানওয়ালা আমাদের তাঁবুটি পাহাড়ের উপর দেখতে পেলেন। আমরা যে সদ্য এখানে এসেছি নিশানটি তারই চিহ্ন। তাবুটি দেখতে পেয়ে তিনি আমাদের অর্ভ্যথনা করতে পাঠালেন তাঁর সখীদের এবং বালক ভৃত্যদের। আমার একজন সঙ্গীও তালাকতুমুরের একজন পরিষদের সাহায্যে আমি তাকে কিছু উপহার পাঠালাম। তিনি তা সাদরে গ্রহণ করলেন এবং আমাদের তার হেফাজতে রাখবার হুকুম দিয়ে চলে গেলেন। পরে সুলতান এলেন এবং নিজের 'মহল্লা' নিয়ে পৃথকভাবে শবির স্থাপন করলেন।

বিখ্যাত সুলতান মুহাম্মদ উজবেক খাঁ একটি বিশাল রাজ্যের শাসনকর্তা। তিনি আল্লাহ্‌র শত্রু কনস্টান্টিনোপলের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। আমাদের আমির-উল্‌-মোমেনিন্‌ (খোদা তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করুক এবং তাঁকে জয়যুক্ত করুক) মিশর ও সিরিয়ার সুলতান (মরক্কার সুলতান) ইরাকের সুলতান, তুর্কীস্তানের সুলতান, অক্সাসের পরে যে দেশ আছে সেখানকার সুলতান, ভারতের সুলতান ও চীনের সুলতান প্রভৃতি পৃথিবীর সাতটি রাজ্যের একটির মতই বৃহৎ সুলতান উজবেকের রাজ্য। আমার আগমনের পরের দিন বিকেলে এক আনুষ্ঠানিক দরবারে তার সঙ্গে আমি দেখা করলাম। সেখানে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছিল। আমরা সুলতানের উপস্থিতিতে এফ্‌তার করলাম। এখানকার তুর্কীরা মুসাফেরদের আহার ও বাসস্থান দেবার অথবা অর্থ সাহায্যে করবার রীতি পালন করে না কিন্তু তারা জবাই করার জন্য তাদের ভেড়া ও ঘোড়া দেয় এবং কুমিজ খেতে দেয়। এসব তাদের দান বলে গণ্য। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পরে সুলতান সোনালী মণ্ডপ নামে অতি সুসজ্জিত একটি মণ্ডপে দরবারে বসেন। মণ্ডপের মধ্যস্থলে কাষ্ঠনির্মিত একটি সিংহাসন। সিংহাসনটি রূপালী পাতে মোড়া এবং পায়াগুলি রূপায় নির্মিত ও উপরিভাগ মণিমুক্তা খচিত। সুলতান মস্‌নদে বসলে ডান পাশে বসেন খাতুন তায়তুঘলিন, তার ডানদিকে বসেন খাতুন কেবেক, সুলতানের বামে বসেন খাতুন বায়ালুন আর তার বামে খাতুন উদুর্জা। মস্‌নদের নিম্নে দাঁড়ান সুলতানের দুই পুত্র –বড়টি ডানে ছোটটি বামে। কন্যা বসেন সুলতানের সামনে। প্রত্যেক খাতুন এলেই সুলতান উঠে হাত ধরে তাকে মস্‌নদে উঠতে সাহায্যে করেন। দরবারের সামনেই এসব ঘটে, কোন পর্দার দরকার হয় না।

সুলতানদের সঙ্গে দেখা করার পরের দিনই আমি প্রধান খাতুন তায়তুঘ্‌লির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনিই বেগম এবং দুই সুলতান জাদার মাতা। তিনি দশজন

বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে বসেছিলেন। তারা সম্ভবতঃ বেগমের পরিচারিকা হবে। বেগমের সামনে বসেছিল প্রায় পঞ্চাশজন সখী। তাদের সামনের থালায় চেরীফল নিয়ে তারা পরিস্কার করছিল। বেগম নিজেও একটি সোনালী ট্রেতে চেরীফল নিয়ে পরিস্কার করছিলেন। তিনি কুমিজ আনতে হুকুম করলেন এবং নিজহাতে একটি পেয়লা ভর্তি করে আমার হাতে দিলেন। তাদের বিবেচনায় এভাবে নিজহাতে কুমিজ পরিবেশন খুব সম্মানজনক। আমি আগে কখনও কুমিজ পান করি নাই। তবু পেয়ালাটি হাতে না নেবার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। কুমিজ খেয়ে দেখলাম এবং আদৌ সুস্বাদু মনে হল না বলে আমার এক সঙ্গীকে খেতে দিলাম। পরের দিন গেলাম দ্বিতীয় খাতুন কেবেকের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন কোর-আন শরীফ পাঠ করছিলেন। তিনিও আমাকে কুমিজ পান করতে দিলেন। তৃতীয় খাতুন বায়ালুন কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের কন্যা।[২৪] তাঁকে দেখলাম মণিমুক্তাখচিত একটি মসনদে তিনি বসে আছেন। তাঁর সামনে গ্রীক, তুর্কী ও লুবিয়ান জাতীয় প্রায় শতেক সখী বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পিছনে রয়েছে খোজারা এবং পার্শ্বে গ্রীক পরিচারক। তিনি আমাদের সফরের কথা, গৃহের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং রুমালের সাহায্যে নিজের সজল চক্ষু মুছলেন। পরে তাঁর হুকুমে খাবার এলে আমরা তাঁর সামনে বসেই খেলাম। আমরা বিদায় হতে চাইলে তিনি বললেন, আমাদের সম্পর্ক যেন এখানেই শেষ না হয়। সর্বদা আসবেন এবং কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। আমরা চলে আসবার পরে তিনি আমাদের খাদ্য, প্রচুর রুটী, মাখন, ভেড়া, অর্থ ও দামী পোষাক এবং তেরোটি ঘোড়া দান করেছিলেন। তার তিনটি ঘোড়া বেশ ভাল ছিল এবং দশটি ছিল সাধারণ ঘোড়া। এই খাতুনের সঙ্গে আমি কনস্টান্টিনোপল অবধি যাই। সে বর্ণনা পরে দেওয়া হবে। চতুর্থ খাতুন রাণীদের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি যেমন অমায়িক তেমনি সহানুভূতিশীলা। আমরা দেখা করলে তিনি আমাদের প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেন তার তুলনা হয় না। সুলতানের কন্যাও আমাদের প্রতি যে দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন তেমন আর কোনো খাতুনই করতে পারেন নাই। তিনি বহুভাবে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। খোদা যেনো তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

আমি বুলগার[২৫] শহরের কথা শুনেছিলাম। সেখানে সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী রাত এবং পাল্টা মৌসুমে সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী দিন হয়। আমার ইচ্ছে হয়েছিল স্বচক্ষে তা দেখতে হবে। সুলতানের শিবির থেকে দশ রাতের পথ বুলগার শহর। আমি সুলতানকে অনুরোধ করেছিলাম আমার সঙ্গে একজন চালক দিতে এবং তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। রমজান মাসে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। সন্ধ্যায় এফতারের পরে মগরেবের নামাজ পড়ে ভোর হবার আগে শুধু রাত্রের নামাজ পড়বার মতো সময় হাতে পেলাম। সেখানে তিন দিন কাটালাম।

বুলগার থেকে চল্লিশ দিন লাগে অন্ধকারের দেশে যেতে। সেখানেও যাবার ইচ্ছা আমার ছিল কিন্তু পথকষ্টের কথা ভেবে এবং বিশেষ লাভবান হতে পারব না মনে করে সে ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। সেখানে যাবার একমাত্র বাহন কুকুরে-টানা শ্লেজ। সেখানকার মরুভূমি বরফে আচ্ছন্ন বলে মানুষ বা পশু পা পিছলে পড়ে যাওয়া ছাড়া হেঁটে যেতে পারে না। কিন্তু কুকুর তার পায়ের নখ দিয়ে বরফ আটকে ধরতে পারে। ধনী সওদাগরেরা নিজেদের শত শত শ্লেজে খাদ্য, পানী, জ্বালানী বোঝাই করে এসব রাস্তায় চলতে পারেন কারণ মরুভূমির এ রাস্তায় গাছপালা বা মানুষের বস্তি নাই। এ-সব পথের একমাত্র চালক এমন সব কুকুর যারা একাধিক বার এ পথে যাতায়াত করেছে। এমন একটি কুকুরের মূল্যও প্রায় হাজার দিনার অবধি ওঠে। এমনি একটি কুকুরের ঘাড়ে শ্লেজ বেঁধে দিয়ে সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় আরও তিনটি কুকুর। এই কুকুরটি চালক এবং অন্যান্য কুকুর শ্লেজ নিয়ে তাকেই অনুসরণ করে। যখন চালক কোথাও থামে তখন এরাও থামে। চালক কুকুরের মালিক কখনো তার কুকুরকে মারে না বা গালাগালি দেয় না। খাবার তৈরি হলে মানুষের আগে খেতে দেওয়া হয় কুকুরকে। নতুবা কুকুর রাগান্বিত হয়ে সবাইকে ধ্বংসের মুখে ফেলে পালিয়ে যায়। সফরকারীরা চল্লিশ মঞ্জিল পার হয়ে এসে অন্ধকার দেশে পৌঁছে। তখন যে যা পণ্যদ্রব্য এনেছে সবই সেখানে রেখে ফিরে আসে নিজের নিজের তাঁবুতে। পরের দিন গিয়ে দেখতে পায় সে সব জিনিষের পাশে-পাশে রাখা আছে মেরুদেশের বেজী জাতীয় জীবের চামড়া। সওদাগর যদি তার পণ্যের বিনিময়ে সে সব পেয়ে সন্তুষ্ট হয় তবে তা'গ্রহণ করে নতুবা সেখানেই রেখে পুনরায় চলে আসে। তখন স্থানীয় লোকেরা আরও কিছু বেশী চামড়া রেখে যায় অথবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সওদাগরের পণ্য ফেলে নিজেদের দেওয়া চামড়া ফেরত নিয়ে যায়। এ নিয়মেই সেখানে তেজারতী চলে। সেখানে যারা সওদাগরী করতে যায় তারা জিনের সঙ্গে না মানুষের সঙ্গে কারবার করছে তার কিছুই জানতে পারে না, কারণ তারা কেউ কাউকে দেখে না।

যে আমীরকে সুলতান আমার সাথী হিসাবে সঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গেই বুলগার থেকে ফিরে এলাম এবং ২৮শে রমজান বিশদাগে এসে মহল্লা দেখতে পেলাম। ঈদ পর্ব উদ্‌যাপনের পর সুলতানের সঙ্গে মহল্লা সহ আমরা হজ্‌তরখান (আস্ত্রাখান) এসে পৌঁছলাম। চমৎকার শহর হজ্‌তরখান। পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত নদী ইতিল (ভল্‌গা)-এর পারে শহরটি অবস্থিত। শীতকালে নদীটি বরফে পরিণত হয়। তখন লোকেরা শ্লেজের সাহায্যে নদীর উপর দিয়া যাতায়াত করে। কোনো-কোনো সময় কাফেলা শীতের শেষে এ নদী পার হতে এসে ডুবে মরে। এ শহরে এসে খাতুন বায়ালুন তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুলতানের অনুমতি চাইলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পিতৃগৃহে সন্তান প্রসব করে তিনি পুনরায় সুলতানের কাছে ফিরে যাবেন। তিনি খাতুনকে অনুমতি দিলেন। তখন আমিও বিখ্যাত কনস্টান্টিনোপলস শহর দেখবার আশায় খাতুনের সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অনুমতি দিতে সম্মত হলেন না। আমি তখন বললাম, আমি আপনার পৃষ্ঠপোষকতা ও রক্ষণাধীনে গেলে

আমার ভয়ের কিছুই নেই। তারপরে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং আমরা পরস্পর বিদায় নিলাম। তিনি আমাকে দেড় হাজার দিনার, একটি পোষাক, বেশ কিছু ঘোড়া উপহার দিলেন। প্রত্যেক খাতুন দিলেন রৌপ্যের তাল। সুলতানের কন্যা দিলেন তাঁদের চেয়েও বেশী। সেই সঙ্গে দিলেন এক প্রস্থ পোষাক পরিচ্ছদ ও বহু বেজী জাতীয় জীবের চামড়ার মালিক হলাম।

খাতুন বায়ালুনের সঙ্গে ১০ই শওয়াল আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। সুলতান, বেগম ও মস্‌নদের উত্তরাধিকারী শাহ্‌জাদা এক মঞ্জিল অবধি খাতুন বায়ালুনের সঙ্গে গিয়ে ফিরে এলেন। অন্যান্য খাতুনরা গেলেন দ্বিতীয় মঞ্জিল অবধি। তারপর তাঁরাও ফিরে এলেন। আমীর বায়দারা পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর সহগামী হলেন। খাতুনের নিজেরও ছিল প্রায় পাঁচশ' ঘোড়সওয়ার, তার মধ্যে দু'শ তাঁর নিজস্ব ক্রীতদাস ও গ্রীক, বাকি সব তুর্কী এছাড়া তাঁর সঙ্গে পরিচারিকা ছিল দু'শ। তাদের অধিকাংশই ছিল গ্রীক। দু'হাজার ভারবাহী ও আরোহণোপযোগী ঘোড়া ছিল তাঁর সঙ্গে। চারশ' ছিল গাড়ী। এছাড়াও ছিল তিন শ' বলদ ও দু'শ উট। এ সব ছাড়া ছিল দশজন গ্রীক যুবক ও সমসংখ্যক ভারতীয় যুবক। ভারতীয় যুবকদের যে প্রধান তাকে বলা হতো ভারতীয় 'সানবুল্'। গ্রীক যুবকদের নেতার নাম ছিল মাইকেল। কিন্তু তুর্কীরা তার নাম রেখে ছিল লুলু (মুক্তা)। খাতুন তাঁর অধিকাংশ পরিচারিকা ও মালপত্র সুলতানের শিবিরেই রেখে এসেছেন, কারণ তিনি মাত্র পিতার সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। আমরা উকাক[২৭] রওয়ানা হলাম। উকাক মাঝারী আকারের একটি শহর হলেও এখানে সুন্দর-সুন্দর অট্টালিকা এবং প্রচুর প্রাকৃতিক উৎপন্নদ্রব্য আছে। শহরটি শীতপ্রধান। এ শহর থেকে একদিন হেঁটে গেলে রুশদেশের পর্বত। রুশরা খৃষ্টান, তাদের মাথায় লাল চুল, চোখ নীলবর্ণ, মুখচ্ছবি কদাকার। লোকগুলি বিশ্বাসঘাতক। এদের দেশে রৌপ্য খনি আছে। সেখান থেকে রৌপ্যের তাল এনে তার সাহায্যে এখানে কেনা বেচা চলে। প্রতিটি রৌপ্য তালের ওজন পাঁচ আউন্স।

এখান থেকে দশ রাত্রি সফরের পরে আমরা কিপচাপ মরুভূমির সমুদ্রোপকূলস্থ সারদাক্ শহরে এসে পৌছলাম। এখানে এমন একটি পোতাশ্রয় আছে যা সবচেয়ে বড় ও সুন্দর পোতাশ্রয়গুলির[২৮] অন্যতম। শহরের বাইরে অনেক ফলের বাগান, ঝরণা আছে। এ অঞ্চলে তুর্কী এবং তাদের অধীনে কিছুসংখ্যক গ্রীকের বাস। এসব গ্রীকের অধিকাংশই শিল্পজীবি। তাদের বাসগৃহগুলি কাঠের তৈরি। এক সময়ে এ শহরটি বেশ বড়ই ছিল। কিন্তু গ্রীক ও তুর্কীদের ভেতর ঝগড়ার ফলে শহরের অধিকাংশই আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। প্রথমে গ্রীকরাই জয়ী হয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু তুর্কীরা প্রতিবেশীদেশের সাহায্যে পেয়ে গ্রীকদের হত্যা করে ও দেশ থেকে বিতাড়িত করে। গ্রীকদের অনেকে তুর্কীদের প্রজা হিসেবে এখনও সেখানে বসবাস করছে। এ দেশের প্রত্যেক মঞ্জিলে এসেই খাতুন ঘোড়া, ভেড়া, গরুমহিষ, যব, কুমিজ, গরু ও মেষের দুধ উপহার পেয়েছেন। এখানে দ্বিপ্রহরের পূর্বে ও বিকেলে পথ চলা হয়। প্রত্যেক শাসনকর্তাই তার এলাকার সীমান্ত অবধি খাতুনকে এগিয়ে দিতে আসেন। তার

প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এরূপ করা হয়, খাতুনের নিরাপত্তার জন্য নয়, কারণ এদেশগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ। অতঃপর আমরা যে শহরে পৌঁছলাম সে শহরটি 'বাবা সালতাফ'[২৯]-এর নামে পরিচিত। বাবা সালতাফ ছিলেন একজন ecstatic mystic, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যে সব গল্প প্রচলিত ছিল তাতে মনে হয় তিনি শরিয়ত বিরোধী কাজ করতেন। তুর্কীদের রাজ্যের শেষ সীমায় অবস্থিত এ শহরটি। এখান থেকে গ্রীকদের রাজ্য পর্যন্ত জনহীন মরুভূমির ভেতর দিয়ে আঠার দিনের পথ। এ পথের আট দিন পর্যন্ত পানি দুষ্প্রাপ্য। কাজেই ছোট মশ্‌কে গাড়ী বোঝাই করে পানি নিয়ে এ পথে যাত্রা করতে হয়। আমরা যাত্রা করেছিলাম শীতকালে। কাজেই আমরা পানির অভাব বোধ করিনি। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ যে আমাদের যাত্রাপথ নিরাপদই ছিল।

এ যাত্রাপথের শেষে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম গ্রীক রাজ্যের[৩০] সীমান্তে মাহ্‌টুলী দুর্গে। খাতুনের আগমনের সংবাদ গ্রীকরা পূর্বেই অবগত ছিল। কাজেই গ্রীকদের প্রধান ব্যক্তি নিকোলাস একদল সৈন্য ও অনেক উপহার দ্রব্যসহ রাজকুমারীদের এবং শুশ্রূষাকারিণীদের সঙ্গে নিয়ে এখানে দেখা করতে আসেন কনস্টান্টিনোপল থেকে। মহাটুলী থেকে কন্‌স্টান্টিনোপল্ বাইশ দিনের পথ। মাহ্‌টুলী থেকে খাল অবধি যেতে লাগে ষোল দিন, পরে সেখান থেকে কনস্টান্টিনোপল ছয় দিন। এ দুর্গ থেকে যাত্রা করতে ঘোড়া বা খচ্চরের সাহায্য নিতে হয়। পথ বন্ধুর ও পর্বতসঙ্কুল বলে গাড়ী এখানেই রেখে যেতে হয়। গ্রীক-প্রধান অনেক খচ্চর সঙ্গে এনেছিলেন। তার ভেতর থেকে ছয়টি খচ্চর খাতুন আমার জন্য পাঠান। আমার গাড়ী ও মালপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সব সঙ্গী ও ক্রীতদাসদের রেখে এসেছিলাম খাতুন তাদের দেখাশুনার ভার দেন দুর্গরক্ষকের উপর। তিনি তাদের বাসোপযোগী একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। কমাণ্ডার বায়দারা তাঁর সৈন্যদল নিয়ে এখান থেকেই ফিরে যান এবং আজান দেওয়ার রীতিও রহিত হয়। তাঁর উপহার সামগ্রীর সঙ্গে কিছু মদ্যও ছিল। তিনি তা পান করেন। শূকরের মাংস ছিল। তাঁর জনৈক কর্মচারীর কাছে শুনেছি খাতুন তা আহার করেন। একজন তুর্কী ছাড়া নামাজী কেউ তাঁর সঙ্গে রইল না। এ তুর্কীটি আমাদের সঙ্গে এসে নামাজ আদায় করত। আমাদের সম্বন্ধে যে মনোভাব এতদিন লুক্কায়িত ছিল, আমরা বিধর্মীদের দেশে প্রবেশ করবার সঙ্গে-সঙ্গে তা আবার সজাগ হয়ে উঠল। কিন্তু খাতুন গ্রীক-প্রধানকে আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতে বলে দিলেন। তার ফলে একজন পাহারাদারকে তিনি প্রহার করেন। কারণ, এ পাহারাদার আমাদের নামাজের প্রতি উপহাস করেছিল।

এরপর আমরা মাসলামা ইবনে আবদুল মালেকের দুর্গে পৌঁছলাম। একটি পর্বতের পাদদেশে ইসতাফিলি নামক বেগবতী নদীর পাড়ে এ দুর্গটি অবস্থিত। এ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই। দুর্গের বাইরে একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। আমরা যখন গেলাম তখন খালে জোয়ার এসেছে প্রায় দু'মাইল চওড়া ও খালটি হেঁটে পার হতে হবে বলে আমরা ভাটার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। অতঃপর বালুকাময় পথে চার মাইল হেঁটে আমরা পেলাম দ্বিতীয় খাল। চার মাইল চওড়া এ খালটিও আমরা হেঁটে পার

হলাম। তারপর প্রস্তর ও বালুকাময় পথে দু'মাইল হেঁটে তৃতীয় খালের কাছে এলাম। তখন খালে সবেমাত্র জোয়ার আসতে শুরু হয়েছে। কাজেই এক মাইল চওড়া এ খালটি হেঁটে পার হতে আমাদের বেশ খানিকটা বেগ পেতে হল। সুতরাং সমস্ত খালের প্রস্থ অর্থাৎ খাল ও শুকনা জায়গা সহ প্রায় বার মাইল। বর্ষার সময়ে এ স্থানের সবটাই ডুবে যায় বলে নৌকা ছাড়া পার হবার উপায় থাকে না। তৃতীয় খালটির পারে ফানিকা নামে ছোট একটি সুন্দর শহর আছে। এখানকার গীর্জাও ঘরবাড়ীগুলি বেশ সুন্দর। শহরের চারদিকে খাল ও ফলের বাগান আছে। এসব বাগানে সারা বছরই আঙুর, আপেল নাশপাতি, খুবানী প্রভৃতি ফল থাকে। এ শহরে আমাদের তিন রাত্রি কাটাতে হল। খাতুন ছিলেন তাঁর পিতার একটি ছোট দূর্গে।

অতঃপর কিফালী কারাস নামে খাতুনের এক ভাই সেখানে এলেন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে। খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সাদা পোষাক পরিহিত তাঁর ভাই ছাই রংয়ের একটি ঘোড়ায় আরোহন করলেন। তার মাথার উপরে মণিমুক্তা খচিত ছত্র। তাঁর ডাইনে ছয় জন যুবরাজ বামেও সমসংখ্যক, সবারই পোষাক সাদা, মাথায় সোনালী জরির কাজ করা ছত্র। তার সামনে একশত জন পদাতিক সৈন্য ও একশত জন ঘোড়সওয়ার। তাদের গায়ে লম্বা কোট ও ঘোড়ার পীঠও বস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাদের প্রত্যেকের সামনেই জীন লাগানো এক সুসজ্জিত ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে একজন ঘোড়সওয়ারের উপযোগী মণিমুক্তা খচিত শিরস্ত্রাণ, বর্ম, ধনুক এবং একটি তরবারী, প্রত্যেকের হাতেই একটি-একটি বর্শা, বর্শার মাথায় ক্ষুদ্র নিশান। অধিকাংশ বর্শাই হর্ণ বা রৌপ্যের পাতে মোড়া। এগুলি সুলতানের পুত্রের আরোহণের ঘোড়া। তাঁর ঘোড়াসওয়ার সৈন্যরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। এক একটি দলে দু'শ ঘোড়সওয়ার। তাদের উপরে আছে একজন করে অধিনায়ক। তার সামনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দশজন ঘোড়সওয়ার। তারাও একটি করে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অধিনায়কের পিছনেও দশজন ঘোড়সওয়ার রঙীন পতাকা বহন করে চলেছে। আরও দশজনে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে দশটি জয়ঢাক। তাদের সঙ্গে রয়েছে রণভেরী, শিঙ্গা ও বাঁশী বাজাবার জন্য ছয় জন। খাতুন একটি ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন রক্ষী, পরিচারিকা, ক্রীতদাস বালক এবং ভৃত্য সহ প্রায় পাঁচ শত লোকলস্কর নিয়ে। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে সোনালী জরি ও জড়োয়ার কাজ করা মূল্যবান রেশমী পোষাক। তিনি নিজে পরেছেন সোনালী বুটিদার মণিমুক্তাভূষিত রেশমী পোষাক, মাথায় মূল্যবান জড়োয়ার কাজ করা মুকুট। তার ঘোড়াটির আচ্ছাদনও তৈরী হয়েছে সোনালী কাজ করা রেশমী কাপড়ে। ঘোড়ার পায়ে সোনার তৈরী ব্রেসলেট, গলায় পাথর বসানো হার। ঘোড়ার পায়ে সোনার তৈরী ব্রেসলেট, গলায় পাথর বসানো হয়। ঘোড়ার জীনের ফ্রেমটি স্বর্ণমণ্ডিত ও মণিমাণিক্যখচিত। শহরের থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একখন্ড সমতলভূমিতে ভাই বোনে দেখা হল। তার ভাই বয়সে ছোট বলে প্রথমে ঘোড়া থেকে নেমে বোনের ঘোড়ার রেকাবে চুম্বন দিলেন, বোন চুম্বন দিলেন ভাইয়ের মাথায়। সেনানায়ক এবং যুবরাজরাও সবাই ঘোড়া থেকে নেমে খাতুনের ঘোড়ার রেকাবে চুম্বন দিলেন। তারপর ভাইকে নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন।

পরদিন আমরা সমুদ্রোপকূলে একটি বড় শহরে হাজির হলাম । নদীনালা ও বৃক্ষ শোভিত এ শহরটির নাম আমার স্মরণ নেই। শহরের উপকণ্ঠে আমাদের তাবু ফেলা হল। খাতুনের যে ভাইটি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনি দেখা করতে এলেন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দশ হাজার ঘোড়সওয়ার সিপাহীর এক মিছিল নিয়ে। তার মাথায় একটি মুকুট, ডান দিকে বিশ জন এবং বাঁ দিকে বিশ জন যুবরাজ (Prince)। তাঁর ঘোড়াগুলোকেও সাজানো হয়েছে তার ভাইয়ের ঘোড়ার মতই, কিন্তু জাঁকজমক এবার অনেক বেশী এবং ঘোড়ার সংখ্যাও বেশী। ভগ্নি আগের বারে যে পোষাক পরেছিলেন এবারেও সে পোষাকেই এসেছেন। সামনাসামনি হলে দু'জনই এক সঙ্গে ঘোড়া থেকে নামলেন। কাছেই একটি রেশমী তাবু খাটানো ছিল। দু'জনেই তারা সে তাবুতে প্রবেশ করলেন। কাজেই কি ভাবে তাঁরা পরস্পরকে অভ্যর্থনা করলেন তা জানা সম্ভব হল না। আমাদের তাঁবু ছিল কনস্টান্টিনোপলস থেকে দশ মাইল দূরে। পরের দিন মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত নারী পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে শহরের অধিবাসীরা কেউ ঘোড়ায় চড়ে কেউ বা পায়ে হেটে সেখানে এসে হাজির হল। ভোরে ঢাক ঢোল ও ভেরী বাজানো হ'ল। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রাজপরিষদের কর্মচারীসহ খাতুনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সম্রাটের মাথার ওপর একটি চন্দ্রাতপ ধরে আছে বেশ কিছু সংখ্যক ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক মিলে। তাদের প্রত্যেকের হাতে কাঠের লম্বা লাঠি। লাঠির মাথায় একটি করে চামড়ার বলের মত বস্তু। তারই সাহায্যে তারা চন্দ্রাতপটি উঁচু করে রয়েছে। চন্দ্রাতপের মধ্যস্থলে বেদীর মত একটি বস্তু রয়েছে। সেটির অবলম্বনও ঘোড়সওয়ারদের লাঠি। সম্রাট যখন সামনের দিকে অগ্রসর হলেন তখন সৈনিকদের ভেতর কেমন একটা জড়াজড়ি শুরু হয়ে গেল। ফলে সেখানে ধূলি উড়তে লাগল। আমি তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে না পেরে জীবনের ভয়ে খাতুনের মালপত্র ও লোকলস্করের সঙ্গে রয়ে গেলাম। শুনেছি, খাতুন তাঁর পিতামাতার কাছে গিয়ে প্রথমে তাঁদের সম্মুখস্থ মাটী চুম্বন করেন ও পরে তাদের ঘোড়ার খুরে চুম্বন করেন। খাতুনের প্রধান প্রধান কর্মচারীরাও তাই করে।

আমরা দুপুর বেলা অথবা দুপুরের একটু পরে কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করলাম। শহরের লোকেরা আকাশ বাতাস কাপিয়ে ঘন্টা বাজাতে আরম্ভ করে। রাজপ্রাসাদের প্রথম প্রবেশদ্বারে পৌছে দেখতে পেলাম প্রায় শতেক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে মঞ্চে দাড়িয়ে একজন সর্দার। তাদের বলতে শুনলাম সারাকিনু সারাকিনু অর্থাৎ মুস্‌লিম মুস্‌লিম। তারা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না। খাতুনের সঙ্গীরা তখন বুঝিয়ে দিল যে আমারও তাদের সঙ্গী। কিন্তু উত্তরে তারা বলল "বিনানুমতিতে এদের ঢুকতে দেওয়া নিষেধ।" কাজেই আমরা সেখানে দাড়িয়ে রইলাম। খাতুনের একজন সঙ্গী গিয়ে খাতুনকে এ সংবাদ জানাল। খাতুন তখনও পিতার কাছেই ছিলেন। তিনি পিতাকে আমাদের বিষয় জানাতেই আমরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেলাম এবং বাসস্থানের কাছে একটি বাসগৃহও পেলাম। এ ছাড়া তিনি হুকুম দিলেন, শহরের কোথাও যেতে আমাদের যেনো বাধা দেওয়া না হয়। তাঁর এ হুকুম বাজারে ঘোষণা করে দেওয়া হল। আমরা তিন দিন প্রাসাদের ভেতরেই রইলাম। খাতুন আমাদের জন্য

ময়দা, রুটী, গোশত, মুরগী, মাখন, মাছ, ফল, টাকা-পয়সা, ও শয্যাদ্রব্য পাঠিয়ে দিলেন। চতুর্থ দিনে আমরা সুলতানের দরবারে যাবার সুযোগ পেলাম।

কনস্টন্টিনোপলের সম্রাটের নাম তাকফুর। পিতার নাম সম্রাট জিরজিস্ (জর্জ)[৩২]। তাঁর পিতা সম্রাট জর্জ তখনও জীবিত কিন্তু তিনি ছেলের হাতে রাজত্ব দিয়ে নিজে গীর্জায় থেকে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছেন ও ধর্মচর্চা করেছেন। তাঁর কথা আমরা পরে বলব। আমাদের কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছবার চতুর্থ দিনে খাতুন তাঁর ভারতীয় ক্রীতদাস সানবুলকে আমাদের কাছে পাঠালেন। সে আমার হাত ধরে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেল। আমরা পর-পর চারটি দেউড়ী পার হয়ে গেলাম। প্রত্যেক দেউড়ীতে খিলানের নীচে সশস্ত্র পদাতিক সৈন্যরা রয়েছে। তাদের অধিনায়ক রয়েছে কার্পেট মোড়া মঞ্চের উপর। পঞ্চম দেউড়ীতে পৌঁছতেই সানবুল আমাকে সেখানে রেখে অন্যত্র চলে গেল এবং ফিরে এল চারজন গ্রীক যুবক সঙ্গে নিয়ে। আমার সঙ্গে কোন ছুরি আছে কিনা দেহ তল্লাসী করে তারা দেখে নিল। একজন কর্মচারী আমাকে বললেন, "এটা এদের রীতি। যিনি রাজার নিকট যাবেন তিনি আমীর ফকির বা দেশী বিদেশী যাই হন না কেন তার দেহ তল্লাসী করা হবেই হবে।" এ রকম রীতি ভারতেও প্রচলিত আছে। দেহ তল্লাসীর পরে দেউড়ীর ভারপ্রাপ্ত লোকটি উঠে আমাকে হাত ধরে নিয়ে দরজা খুললেন। তখন চারজন লোক আমাকে ঘিরে ধরল। তাদের দু'জন ধরল আমার জামার আস্তিন আর দু'জন দাঁড়াল পিছনে। তারপরে আমাকে নিয়ে এল প্রকাণ্ড একটি হলে। হলের দেওয়ালগুলি কারুকার্যখচিত । তাতে রয়েছে বিভিন্ন প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তুর চিত্র। মধ্যস্থলে একটি নহর, নহরের দু'পাশে গাছ। ডানে ও বামে লোক দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। হলে আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে তাদের হাতে দিয়ে আগের চারজন চলে গেল। আগের লোকদের মত এরাও আমার জামা ধরল এবং অপর একজনের ইঙ্গিতে আমাকে সামনের দিকে নিয়ে চলল[৩৩]। তাদের ভেতর একজন ছিল ইহুদী। তিনি আমাকে আরবীতে বললেন,"ভয় পাবেন না। ভিতরে যাঁরা যান তাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহারই এরা করে। আমি এখানকার দোভাষী। আমি সিরিয়ার অধিবাসী।" এ কথা শুনে সুলতানকে কিভাবে অভিবাদন করতে হবে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলতে পরামর্শ দিলেন। আমরা প্রকাণ্ড একটি চন্দ্রাতপের নীচে এসে হাজির হলাম। সেখানে সম্রাট তাঁর সিংহাসনে বসে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মহিষী, খাতুনে মাতা। সিংহাসনের পাদদেশে বসেছেন খাতুন ও তাঁর ভাইয়েরা। সিংহাসনের ডান দিকে ছ'জন, বাঁ দিকে চারজন এবং পছনে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তাঁরা সশস্ত্র। আমি সম্রাটের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করবার আগেই তিনি আমাকে অভয় দেওয়ার জন্য একটু বসতে ইঙ্গিত করলেন। একটু বসে আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতে তিনি আমাকে বসতে বললেন, কিন্তু আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। তিনি আমাকে জেরুজালেম, পবিত্র পাহাড়, পবিত্র সমাধির গীর্জা, ঈসার দোলনা এবং বেথ্‌লেহেম সম্বন্ধে নানান কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, হজরত ইব্রাহিমের

(Hebron) শহর, দামাস্কাস, কায়রো, ইরাক ও আনা-তোলিয়ার কথা। আমি তাঁর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলে সঙ্গে-সঙ্গে ইহুদী দোভাষী তা বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের ছেলেদের বললেন, "এঁর সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করবে এবং কোনো রকম বিপদ-আপদে না পড়েন সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।"

অতঃপর তিনি আমাকে সম্মানসূচক একটি পোষাক জীন ও লাগামসহ একটি ঘোড়া, সম্রাটের নিজের ব্যবহারের ছাতার মত একটি ছাতা উপহার দিলেন। ছাতাটি হল নিরাপত্তার চিহ্ন। আমার সঙ্গে থেকে প্রত্যহ শহরের নানা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখাবার জন্য একটি লোক আমার জন্য নিযুক্ত করে দিতে সম্রাটকে অনুরোধ জনালাম। তা'হলে যা-কিছু সুন্দর ও অভিনব আমার চোখে পড়বে তার কথা দেশে গিয়ে বলতে পারব। আমার অনুরোধ রক্ষা করে একজন লোক নিযুক্ত করে দিলেন। তাদের দেশের রীতি হলো, কেউ যদি সম্রাটের সম্মানসূচক পোষাক ও ঘোড়া উপহার পায় তবে জয়ঢাক, ঢোল, বাঁশী বাজিয়ে এমনভাবে তাঁকে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয় যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ রীতি তারা পালন করে চলে তুর্কীদের বেলা, যাতে কেউ তাঁদের কোন রকম অত্যাচার না করে। এভাবে আমাকে নিয়েও শহর প্রদক্ষিণ করা হল।

শহরটি বেশ বড় এবং একটি প্রকাণ্ড নদীর দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত। এ নদীটিতে জোয়ার ভাটা হয়। আগে এ নদীর উপর পাথরের একটি সেতু ছিল। এখন তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নৌকার সাহায্যে পারাপার করা হয়। নদীর পূর্ব পারে শহরটির যে অংশ পড়েছে সে অংশের নাম ইস্তাম্বুল। বাদশাহ্, আমীর ওমরাহ এবং অন্যান্য সবারই বাসস্থান এ অংশের অন্তর্ভুক্ত। এ শহরের বাজার ও রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত এবং শান্ বাঁধানো। প্রতিটি বাজারেরই প্রবেশদ্বার আছে, রাত্রে তা বন্ধ করে রাখা হয়। বাজারের বিক্রেতা ও শ্রমশিল্পীদের বেশীর ভাগই নারী। একটি পাহাড়ের পাদদেশে এ শহর অবস্থিত। পাহাড়টি সমুদ্রের দিকে প্রায় নয় মাইল বেড়ে গেছে। পাহাড়টির প্রস্থও তদনুরূপ তা ততোধিক হবে। পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ছোট্ট একটি দূর্গ এবং শাহী প্রাসাদ। শহর-প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে পাহাড়টি আঁবেষ্টন করে। এ প্রাচীরটি এতো সুদৃঢ় যে সমুদ্রের দিক থেকে আক্রমণ করবার আশঙ্কা নেই। এ আবেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে তেঁরোটি গ্রাম। এখানকার প্রধান গীর্জাটি শহরের এ অংশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। নদীর পশ্চিম তীরস্থ শহরের অপরাংশ গালাটা নামে পরিচিত এবং ফরাসী (Frankish) খৃষ্টানদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট। এ অংশে তারাই বসবাস করে। ফরাসী ছাড়াও এদের ভেতর রয়েছে জেনেভা, ভেনিস ও রোমের লোকজন। কনস্টান্টিনোপলের রাজার কর্তৃত্ব তারা মেনে চলে এবং তাদের অনুমোদনক্রমে রাজা তাদের ভেতর থেকে একজনকে কর্তৃত্বের ভার দেন। এদের কাছে সে ব্যক্তি (Comes) কোসেম্ নামে পরিচিত। তারা প্রতি বছরই রাজাকে একটা কর দিতে বাধ্য। অনেক সময় তারা বিদ্রোহও করে এবং রাজা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন পোপ এসে উভয় দলের ভেতর শান্তি স্থাপন করেন। তারা সবাই ব্যবসায়ী। পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয়ের তারা

অধিকারী। আমি সেখানে একসঙ্গে শতেক গ্যালিও বড় জাহাজ দেখেছি। ছোট জাহাজ সেখানে এতো বেশী যে গুণে শেষ করা যায় না। শহরের এ অংশের বাজারগুলিও ভাল কিন্তু অত্যন্ত নোংরা। বাজারগুলির ভেতর দিয়ে ক্ষুদ্র একটি নদী বয়ে গেছে। সে নদীটিও অত্যন্ত নোংরা। এমন কি তাদের গীর্জাগুলিও নিম্নস্তরের এবং ময়লাযুক্ত।

প্রসিদ্ধ গীর্জাটির বাইরের বর্ণনাই আমি দিতে সক্ষম। কারণ, এ গীর্জার অভ্যন্তর দেখবার সুযোগ আমার হয়নি। তারা এ গীর্জার নাম দিয়েছে আয়া সোফিয়া (St. Sophia)। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, গীর্জাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বেরেচিয়ার পুত্র আসাফ্। বেরেচিয়া সলোমনের Cousin (জ্ঞাতি ভাই)। গ্রীসদের প্রসিদ্ধ গীর্জাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। গীর্জাটি দেওয়াল দ্বারা এভাবে বেষ্টিত যে দেখে একটি শহর বলেই মনে হয়। এর তেরটি প্রবেশপথ আছে এবং ঘেরাও করা একটি পবিত্র স্থান আছে। স্থানটি এক মাইল লম্বা এবং একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। কারও এ আবেষ্টনীর ভেতর প্রবেশ করতে বাধা নিষেধ নেই। বস্তুতঃ আমি প্রবেশ করেছিলাম রাজার পিতার সঙ্গে। মার্বেল পাথরে মোড়া এ স্থানটি একটি দরবার গৃহের মত। গীর্জা থেকে বেরিয়ে একটি নহর এখান দিয়ে বয়ে চলেছে। এ চত্বরের প্রবেশদ্বারের বাইরে রয়েছে বেদী ও দোকানপাট। অধিকাংশই কাঠের তৈরী। এখানে তাদের বিচারকগণ এবং দপ্তর-রক্ষকগণ বসেন। গীর্জার দরজার বাইরে বারান্দার নীচে থাকে গীর্জার তত্ত্বাবধানকারীরা। তারা রাস্তায় ঝাঁট দেয়, গীর্জার আলো জ্বালে ও দরজা বন্ধ করে। সেখানে যে প্রকাণ্ড একটি ক্রুশ রক্ষিত আছে, তার সামনে প্রণত না হলে তারা কাউকে গীর্জায় ঢুকতে দেয় না। তারা দাবী করে, কাঠের এ স্মরণ চিহ্নটির উপরে কৃত্রিম যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল[৩৪]। দশ হাত উপরে গীর্জার প্রবেশদ্বারের মাথায় একটি সোনলী বাক্সের মধ্যে এটি রাখা হয়েছে। একটি ক্রুশ তৈরি করার উদ্দেশ্যে আরেকটি সোনালী বাক্স রাখা হয়েছে আড়াআড়ি ভাবে। প্রবেশদ্বারটি সোনা ও রূপার পাতে মোড়া; রিং দু'টি খাঁটি সোনার তৈরী। শুনেছি এ গীর্জার পাদ্রী ও সন্যাসীদের সংখ্যা হাজার হাজার। তাদের অনেকে নাকি যীশুখৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের বংশধর। এ গীর্জার ভেতরে আরও একটি গীর্জা রয়েছে শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য। তাদের ভেতর প্রায় এক হাজার হবে কুমারী । বঁয়স্থা নারীর সংখ্যা আরও বেশী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে। রীতি অনুসারে প্রতিদিন ভোরে রাজা, তাঁর অমাত্যগণ ও অন্যান্য লোকজন এ গীর্জায় আগমন করেন। পোপ ও গীর্জায় আসেন বছরে একবার। তিনি চার দিনের রাস্তা দূরে থাকতেই রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যান। তাঁর সামনে হাজির হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ান। পোপ যখন এসে নগরে প্রবেশ করেন তখন রাজা তাঁর আগে নগ্নপদে যেতে থাকেন। যতদিন পোপ কনস্টান্টিনোপলে অবস্থান করেন, প্রতিদিন সকালে- বিকালে রাজা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মুসলমানদের যেমন Religious house বা Conventখৃষ্টানদের তেমনি Monastery. কনস্টান্টিনোপলে এ ধরনের অনেক monastery রয়েছে। তার ভেতর রাজা জর্জ যেটি তৈরী করিয়েছেন সেটি ইস্তাম্বুলের বাইরে গাটালার উল্‌টা দিকে।

আরও দু'টি monastery আছে প্রধান গীর্জার বাইরে, গীর্জার প্রবেশ পথের দক্ষিণে। এ monastery দু'টি তৈরী হয়েছে একটি বাগানের মধ্যে। বাগনটিকে দু'ভাগ করেছে একটি নহর। monastery -র একটি পুরুষদের জন্য অপরটি নারীদের। প্রত্যেক monastery -র ভেতরেই একটি করে গীর্জা। গীর্জার চার পাশ ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট কুঠরী বা কামরা। ধর্মের নামে উৎসর্গ কৃত নারী পুরুষরা। সেখানে বাস করে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে। প্রত্যেক monastery-র বাসিন্দাদের খোরপোষের ব্যয় নির্বাহ হয় ধর্ম প্রাণ লোকদের দানে। যে রাজা monastery তৈরী করেছেন তাঁর সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য প্রত্যেক monastery-র ভেতরেই একটি করে ছোট Convent রয়েছে। কারণ, রাজাদের মধ্যে অনেকেই ষাট সত্তর বৎসর বয়স হলে একটি monastery তৈরী করে ছেলেদের উপর রাজ্য চালনার ভার ন্যস্ত করে বাকী জীবন Convent -এ এসে ধর্মচর্চায় কাটান। কারুকার্যখচিত মর্মর প্রস্তর দ্বারা এসব জাঁকজমকশালী monastery তৈরী করা হয়। রাজার দেওয়া একজন গ্রীক্ পরিচালকের সঙ্গে আমি একটি monastery-তে প্রবেশের সুযোগ পেলাম। তার ভেতরে একটি গীর্জায় দেখলাম পশমী কাপড় পরিহিত প্রায় পাঁচশ কুমারী। তাদের সবারই মুণ্ডিত মস্তক পশমী টুপীতে ঢাকা। কুমারীদের সবাই অন্ততঃ সুন্দরী কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনের সুস্পষ্ট ছাপ তাদের মধ্যে রয়েছে । তাদের সামনে বেদীর উপর বসে এক যুবক অতি সুললিত সুরে তাদের বাইবেল (Gospel) পড়ে শুনাচ্ছিলো। তেমন সুললিত স্বর আমি কমই শুনছি। তাকে ঘিরে আরও আটজন যুবক তাদের পুরোহিতের সংগে নিজ-নিজ বেদীর উপর বসে আছে। প্রথম যুবকের পড়া শেষ হতেই আরেকজন পড়তে আরম্ভ করে। পরিচালক গ্রীক আমাকে বললো, "এসব কুমারীরা রাজার কন্যা। গীর্জার কাজের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছে। তেমনি যুবকরাও রাজার ছেলে।" যে সব গীর্জায় মন্ত্রী, শাসনকর্তা এবং প্রসিদ্ধ অপরাপর ব্যক্তিদের কন্যারা রয়েছে আমি সে সব গীর্জায়ও তার সংগে প্রবেশ করেছি। এছাড়া সেখানে বয়স্থা নারীরা এবং সন্ন্যাসীরাও রয়েছে। প্রত্যেক গীর্জায় প্রায় শতেক লোক বাস করে। শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই সন্ন্যাসী, কাঠোর সংযমী তাপস অথবা পুরোহিত।[৩৫] সৈনিক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক অবধি এ শহরের ছোট বড় সবাই শীত ও গ্রীষ্মে মাথায় প্রকাণ্ড ছাতা ব্যবহার করে। মেয়েরা ব্যবহার করে প্রকাণ্ড পাগড়ী। একদিন আমার গ্রীক পরিচালকের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে বের হয়ে ভূতপূর্ব রাজা জর্জের দেখা পেলাম পথে। তিনিও এখন সন্ন্যাসব্রত পালন করেছেন। পশমী বস্ত্র পরিহিত মাথায় পশমী টুপি দিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি যাচ্ছিলেন। লম্বা সাদা দাড়ি তাঁর মুখে। দেখলেই কঠোর সংযমী বলে চেনা যায়। তাঁর সামনে ও পেছনে রয়েছে একদল সন্ন্যাসী। তাঁর হাতে একটি যষ্ঠী, গলায় তসবী। তাঁকে দেখেই ঘোড়া থেকে নেমে গ্রীক আমাকে বলল, "নেমে পড়ুন, ইনি আমাদের রাজার পিতা।" পরিচালক তাঁকে অভিবাদন করার পরে তিনি তাঁকে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তারপর একটু থেমে আমাকে কাছে ডাকলেন। তিনি আমার হাত ধরে আরবী জানা সেই গ্রীক পরিচালককে বললেন, "এই মুসলিমকে বুঝিয়ে বলো, যে

হাত জেরুজালেমে প্রবেশ করেছে এবং যে পদদ্বয় Dome of the Rock এবং Holy sepulchreও বেথেলহামের পবিত্র গীর্জায় প্রবেশ করেছে আমি তাই ধারণা করছি।" এই বলে তিনি আমার পা ছুঁয়ে হাত বুলালেন নিজের মুখে। বিধর্মী হয়েও এসব পুণ্যস্থান যারা দর্শন করেন তাঁদের প্রতি এদের অগাধ ভক্তি দেখে আমি বিস্মিত হলাম। তিনি আবার আমার হাত ধরে এক সঙ্গে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে বহুক্ষণ অবধি অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন– জেরুজালেম এবং সেখানকার খৃষ্টানদের সম্বন্ধে। গীর্জায় ঘেরাও করা যে পবিত্রস্থানের বর্ণনা আমি উপরে দিয়েছি সেখানেও আমি তার সঙ্গে প্রবেশ করেছি। তিনি যখন প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে যাচ্ছিলেন তখন একদল পুরোহিত ও সন্ন্যাসী এগিয়ে এলো তাঁকে অভিবাদন করতে, কারণ অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাদের অগ্রসর হতে দেখে তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। আমি তখন তাঁকে বললাম, "আমারও ইচ্ছে হয় আপনার সঙ্গে গীর্জার ভেতরে ঢুকতে।" তখন তিনি দোভাষীর দিকে ফিরে বললেন,"যে এ গীর্জায় ঢুকতে চাইবে তাকে প্রথম ঐ বিখ্যাত ক্রুশের সামনে সেজ্দা করতে হবে। এ রীতি আমাদের পুর্বপুরুষের সময় থেকে প্রচলিত রয়েছে এবং তা রদ করবার উপায় নেই।" কাজেই আমাকে ফিরে আসতে হলো। তিনি একাই গিয়ে গীর্জায় ঢুকলেন। এরপর তাঁর আর দেখা পাইনি। রাজাকে ছেড়ে আমরা এসে বাজারে দালাল লোকদের কাছে এলাম। সেখানে Judge আমাকে দেখতে পেয়ে তাঁর একজন সহকারীকে পাঠালেন পরিচালকের কাছে আমার পরিচয় জানতে। আমি একজন মুসলিম পণ্ডিত শুনে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি সুদর্শন একজন বৃদ্ধি ব্যক্তি, তাঁর পরিধানে সন্ন্যাসীর কাল পোষাক। জন দশেক লোক তাঁর সামনে বসে লিখছে। আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সঙ্গীরাও উঠ্‌ল। তিনি বললেন "আপনি আমাদের রাজার মেহ্‌মান, সিরিয়া ও মিশরের অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। বহুক্ষণ অবধি আমরা কথাবার্তা বললাম। অনেক লোক এসে জড়ো হলো তার চারপাশে। তিনি বললেন, "একদিন আমার বাড়িতে নিশ্চয়ই আসবেন যাতে আপনার মেহ্‌মানদারী করবার সুযোগ পাই।" বিদায় নিয়ে আমি চলে এলাম। তারপরে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

খাতুনের সঙ্গী তুর্কীরা বুঝতে পারলো, খাতুন তাঁর পিতার ধর্মে বিশ্বাসী এবং পিতার সঙ্গেই তিনি থাকতে চান। তখন তারা স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলো। তিনি তাদের মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায় দিলেন। তাছাড়া পাঁচশ ঘোড়াসওয়ারসহ সারুজা নামক একজন আমীরকে সঙ্গে দিলেন তাদের দেশে পৌছে দিতে। তিনি আমাকেও ডেকে পাঠালেন। আমাকে দিলেন বারবারা নামক তাদের দেশে প্রচলিত তিন'শ স্বর্ণমুদ্রা। মুদ্রা হিসাবে বারবার ৩৬ ভাল নয়। আর দিলেন এক হাজার ভেনিসের রৌপ্যমুদ্রা, সে সঙ্গে বস্ত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ এবং তার পিতার দেওয়া দু'টি ঘোড়া। তার পর আমাকে সারুজার হাওলা করে দিলেন। তাদের শহরে একমাস ছ' দিন কাটিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম। সীমান্ত পৌছে আমাদের সঙ্গীদের এবং মালপত্রসহ গাড়ী নিয়ে মরুভূমির পথে ফিরে এলাম। বাবা সালটাক অবধি সারুজা আমাদের সঙ্গে এলেন। তারপর তিনদিন সেখানে মেহ্‌মান থেকে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

তখন ছিল শীতকাল। আমি পশম-দেওয়া তিনটি কোট গায়ে ব্যবহার করি। সে-সঙ্গে দু'টি পাজামা, তার একটিতে আস্তর লাগানো। পায়ে প্রথমে উলের মোজা তার উপর আস্তর লাগানো সূতী মোজা, তার উপর ভল্লুকের পশম-লাগানো ঘোড়ার চামড়ার জুতা। আগুনের কাছে বসে গরম পানি দিয়ে আমি ওজু করি। কিন্তু প্রত্যেক ফোঁটা পানি সঙ্গে-সঙ্গে জমে বরফ হয়ে যায়। যখন মুখ ধুই তখন দাড়ী বেয়ে পানি পড়েই জমে যায় বরফ হয়ে। সে গুলো ঝেড়ে ফেললে তুষারের মতো ছড়িয়ে পড়ে। নাক বেয়ে পানি পড়ে গোঁফের উপর এসেই জমে যায়। গায়ে যে-সব কাপড়-চোপড়ের বহর চাপিয়ে ছিলাম তা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠতে আমার অসুবিধা হচ্ছিলো। সঙ্গীরা তখন ধরে আমাকে জিনের উপর চাপিয়ে দিলো।

আমরা সুলতান উজবেগকে হজ্‌তারখানে (আস্ত্রাখান) রেখে এসেছিলাম। ফিরে গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর রাজধানীতে চলে গেছেন। আমরা ইটিল (ভল্‌গা) নদী ও আশেপাশের জলাশয়ে ভ্রমণ করলাম। সে-সবই জমে তখন বরফ হয়ে গেছে। রান্না খাওয়ার জন্যে পানির দরকার হলেই আমরা বরফ ভেঙ্গে একটি পাতে টুকরা রেখে দিতাম। তাই গলে পানি হতো। এমনি করে চ'লে চতুর্থ দিনে আমরা সুলতানের রাজধানী[৩৭] সারা গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের সফরের কথা, গ্রীকদের রাজার কথা এবং তাদের শহরের কথা সুলতানকে বললাম। সব শুনে সুলতান আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হুকুম দিলেন। চমৎকার বাজার ও প্রশস্ত রাস্তাঘাটযুক্ত সারা একটি সুন্দর ও বড় শহর। একদিন আমরা স্থানীয় একজন প্রসিদ্ধ লোকের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে শহরটি কতো বড় তাই জরিপ করতে বের হলাম। শহরের একপাশে আমরা বাস করতাম। একদিন ভোরে বেরিয়ে শহরের অপর পাশ অবধি পৌঁছতে অপরাহ্ন হয়ে গেলো। আরেক দিন হেঁটে বের হলাম শহর কতটা চওড়া তাই দেখতে। যাওয়া এবং আসায় আধা দিন লেগে গেলো তাও গেলাম দু'পাশে শুধু বাড়ি দেখে, সেখানে কোনো ভগ্নাবশেষ বা বাগান চোখে পড়লো না। এখানে তেরোটি গীর্জা এবং অনেকগুলো মসজিদ আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে নানা জাতীয় লোক। তাদের মধ্যে মঙ্গলরাই দেশের শাসনকর্তা। তারা অংশতঃ মুস্‌লিম। আর রয়েছে মুস্‌লিম আস্ (Ossetes) এবং কিপ্‌চাক্ সারকাসিয়ানস (Circassians) রুশ ও গ্রীক। এদের সবাই খ্রীষ্টান। প্রত্যেক দলেরই পৃথক মহল্লা, পৃথক বাজার। ইরাক, মিশর ও সিরিয়ার সওদাগর ও বিদেশী লোকেরা নিজ নিজ ধনসম্পত্তি রক্ষার সুবিধার জন্যে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি মহল্লায় বাস করে।

পাঁচ

সারা থেকে আমরা খারিজম রওয়ানা হলাম। রাজধানী সারা থেকে খারিজম যাবার পথ মরুভূমির ভেতর দিয়ে। চল্লিশ দিন লাগে সেখানে যেতে। পথে ঘোড়ার খাদ্যের উপযোগী ঘাস পাতা পাওয়া যায় না বলে ঘোড়া নিয়ে এ-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। গাড়ী টানার জন্য এ-পথে উট ব্যবহার করা হয়। সারা ত্যাগের দশদিন পরে আমরা সারাচাকে পৌঁছি। সারাচাকের অর্থ ছোট সারা । শহরটি উসুল(উরাল)[১] নামক একটি বেগবতী নদীর তীরে অবস্থিত। বাগদাদ শহরের সেতুর মতো এ-নদীটির পারাপার ব্যবস্থাও নৌকোর তৈরী সেতুর সাহায্যে। এখানে লটবহর সহ আমরা পৌঁছেছিলাম ঘোড়ার সাহায্যে। এবার ঘোড়ার স্থান দখল করবার জন্য উট ভাড়া করতে হলো। ঘোড়াগুলো অত্যন্ত পথক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ঘোড়ার দামও এখানে অত্যন্ত সস্তা। এজন্য মাত্র চার রৌপ্য দিনার বা তারও কমে প্রতিটি ঘোড়া বিক্রী করতে হলো। এখান থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন অবধি আমাদের চলতে হলো খুবই দ্রুতগতিতে। এ সময়ে শুধু দ্বিপ্রহরের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে দু'ঘন্টার জন্য রান্না ও জোয়ারের (millet) তৈরী সুরুয়া খাওয়ার জন্য আমরা থেমেছি। প্রত্যেকের সঙ্গেই শুষ্ক মাংস থাকে। সুরুয়ার উপরে মাংস দিয়ে সবটার উপরে দৈ ঢেলে দেওয়া হয়। গাড়ী চলতে থাকা অবস্থায় প্রত্যেকেই নিজের-নিজের গাড়ীতে বসে খায় ও ঘুমায়। পথে গবাদি পশুর খাদ্যোপযোগী ঘাস-পাতার অভাব বলে এ-পথে পথিককে চলতে হয় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এ কঠিন পথ অতিক্রম করবার পরে অধিকাংশ উটই মরে যায়। মরে যেগুলো অবশিষ্ট থাকে সেগুলোকেও এক বছরের আগে অর্থাৎ মোটা-তাজা না হলে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। দু'তিন দিনের পথ অতিক্রম করবার পর-পর বৃষ্টির দরুণ সঞ্চিত বা অগভীর কূপে পানির ব্যবস্থা আছে।

মরুভূমি পার হয়ে আমরা খারিজম শহরে এসে পৌঁছলাম।[২] খারিজম তুর্কীদের সবচেয়ে সুন্দর বড় ও প্রসিদ্ধ শহর। এ-শহরের অধিবাসীদের সংখ্যা এতো বেশি যে

তাদের চলাচল দেখে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের কথা মনে পড়ে। একদিন ঘোড়ায় চড়ে বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে আমি ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেলাম। তখন আর সামনেও যেতে পারি না, পিছিয়েও আসতে পারি না। এ অবস্থায় কি করা উচিৎ বুঝতে না পেরে আমি অতি কষ্টে পিছিয়ে এলাম। শহরটি সুলতান উজবেগের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। এখানে সুলতানের প্রতিনিধিত্ব করেন কুতলুডামুর (Qutludumur) নামক একজন ক্ষমতাশালী আমীর। খারিজমিয়ানদের মতো তেমন বন্ধুভাবাপন্ন ও অতিথি পরায়ন উত্তম লোক আমি দুনিয়ার আর কোথাও দেখিনি । উপাসনা সম্বন্ধেও তাদের মধ্যে যে প্রশংসনীয় রীতির প্রচলন দেখেছি তা আর কোথাও দেখিনি। প্রত্যেক মোয়াজ্জিন তার মসজিদের আশেপাশের প্রতি গৃহে গিয়ে নামাজ সম্বন্ধে তাদের সজাগ করে দিয়ে আসেন। যদি কেউ সামাজিক অর্থাৎ জামাতের নামাজে অনুপস্থিত থাকে তবে কাজী তাকে প্রকাশ্যে প্রহার করেন। এ-জন্য প্রত্যেক মসজিদেই একটি চাবুক ঝোলানো আছে দেখতে পাওয়া যায়। এ-ছাড়াও দোষী ব্যক্তিকে পাঁচ দিনার জরিমানা করা যায়। জরিমানার টাকা ব্যয় করা হয় মসজিদের কাজে অথবা দান খয়রাতে। তাদের কাছে শোনা যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ রীতি নাকি তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। শহরের বাইরে দিয়ে জয়হুন (Oxus) নদী প্রবাহিত। স্বর্গের চারটি নদীর মধ্যে জয়হুন একটি। ইটিল (ভল্‌গা) নদীর মতো এ নদীটির পানিও শীতকালে পাঁচ মাস জমাট বেঁধে থাকে। গ্রীষ্মকালে নদী তিরমিদ্‌ (Termez) অবধি জাহাজ চলাচলের উপযোগী হয়। নদীর অনুকূল স্রোতে জাহাজে তিরমিদ্‌ যেতে দশ দিন লেগে যায়। খারিজম পৌঁছে আমি শহরের উপকণ্ঠে তাবু ফেললাম। খবর পেয়ে কাজী তার একদল অনুসারীসহ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এসে বললেন, "আমাদের এ-জনবহুল শহরে দিনের বেলা ঢুকতে হলে আপনাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে। কাজেই শেষ রাত্রের দিকে আমার সহকারী এসে আপনাকে শহরে নিয়ে যাবে।" তার পরামর্শই আমরা মেনে নিলাম। আমাদের নিয়ে থাকতে দেওয়া হলো নতুন একটি স্কুলে (Academy) । তখনও সেটি কাজে লাগানো হয়নি। শুক্রবার নামাজের পরে আমি কাজীর সঙ্গে তার গৃহে গেলাম। মসজিদের নিকটেই তার গৃহ। অতি জাঁকজমকশালী একটি কোঠায় নিয়ে আমাকে বসানো হলো। মূল্যবান কার্পেট এবং দেওয়ালে কাপড় লাগিয়ে সাজানো এ কোঠাটি। কোঠার একাধিক তাকের উপর সজ্জিত রূপার গিল্‌টি করাও ইরাকী কাচের তৈজসপত্র। এ-দেশের লোকেরা এ-রীতিটি সবাই মেনে চলে।

কাজীকে সঙ্গে নিয়েই আমি আমীর কুতলুডামুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম পা বাঁধা অবস্থায় একখানা রেশমী কার্পেটের উপর তিনি শুয়ে আছেন। কারণ, তিনি তখন বাতরোগে ভুগছেন। তুর্কীদের মধ্যে বাত রোগটি খুব বেশি দেখা যায়। তিনি নিজের রাজ্য, খাতুন বায়ালুন, তাঁর পিতা এবং কনষ্টান্টিনোপল সম্বন্ধে নানা কিছু জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমাদের আহারের ব্যবস্থা করা হলো। মুরগীর রোষ্ট, সারস পাখী ও বাচ্চা কবুতরের মাংস, ঘৃতে ভাজা রুটি, বিস্কুট ও মিষ্টি এসে হাজির হলো। তারপরে এলো ফলমুল, ডালিম প্রভৃতি। কোনো-কোনো খাদ্য পরিবেশন করা হলো স্বর্ণ

বা রৌপ্য পাত্রে সোনালী চামচের সাহায্যে। বাকি খাদ্য কাচপাত্রে কাঠনির্মিত[৩] চামচ দিয়ে। পরে খাওয়ালো চমৎকার তরমুজ। স্কুলে ফিরে এসে আমীর আমাদের জন্য চাউল, ময়দা, ভেড়া, মাখন, মসলাপাতি ও জ্বালানী কাঠ পাঠিয়ে দিলেন। এ-সব দেশে কাঠ-কয়লার ব্যবহার প্রচলিত নেই। ভারতে এবং পারস্যেও তাই। চীন দেশে জ্বালায় এক রকম পাথর। কাঠ-কয়লার মতোই তা জ্বলে। একবার সেগুলো জ্বালানোর পরে ছাইগুলো পানি দিয়ে মাখানো হয়। তারপর রৌদ্রে শুকিয়ে পুনরায় জ্বালানো হয়। আমীরের একটি অভ্যাসের কথা এখানে বলছি। প্রতিদিন কাজী তাঁর আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দাতা ও লেখকদের নিয়ে আমীরের দরবারে হাজির হন এবং প্রধান আমীরদের কোনো একজনের সম্মুখে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। প্রধান আমীরের সঙ্গে থাকে আরও আটজন তুর্কী আমীর ও শেখ। তখন জনসাধারণ আসে তাদের মামলার বিচারের জন্য। যে সব মামলা পবিত্র আইনের আওতায় আসে সেগুলির বিচার করেন স্বয়ং কাজী বাকিগুলি বিচারের ভার উপস্থিত আমীরদের উপর। তারা পক্ষপাতিত্ব করেন না বা উৎকোচ গ্রহণ করে না বলে সূক্ষ্ম ও ন্যায় বিচার করে থাকেন। একদিন জুমার নামাজের পরে কাজী আমাকে বললেন, "আমীর আদেশ করেছিলেন আমাকে পাঁচশ দিরহাম উপহার দিতে এবং আরও পাঁচ শ দিরহাম ব্যয় করে একটি ভোজের আয়োজন করে শেখ, চিকিৎসক এবং প্রধান-প্রধান ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করতে। তখন আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি যে ভোজের আয়োজন করতে চাইছেন তাতে অতিথিরা দু'এক গ্রাস খেতে পারেন কিন্তু সম্পূর্ণ টাকা মেহ্মানকে দিলে তিনি বেশি উপকৃত হবেন। তিনি তাতেই রাজী হয়ে আপনাকে এক হাজার দিরহামই দিতে বলেছেন।" একটি বালক ভৃত্য এক হাজার দিরহামের (মরক্কোর তিন'শ দিনারের সমতুল্য) একটি তোড়া এনে আমার হাতে দিল সেই দিনই পঁয়ত্রিশ রৌপ্য দিনার মূল্যে কালো রংয়ের একটি ঘোড়া কিনে সেই ঘোড়ায় চড়ে আমি মসজিদে গেলাম। ঘোড়াটির দাম পরিশোধ করলাম সেই হাজার দিরহাম থেকে। তারপরে আমার নিজস্ব ঘোড়ার সংখ্যা এতো বেড়ে গেলো যে তার সংখ্যা উল্লেখ করলে কোনো-কোনো সংশয়াকুল লোকের পক্ষে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা অসম্ভব নয়। অতঃপর ভারতে পৌঁছা অবধি আমার দিনগুলো বেশ ভালোভাবেই কাটতে লাগলো। আমার অনেকগুলো ঘোড়া ছিল কিন্তু এ কালো ঘোড়াটিকেই আমি বেশি পছন্দ করতাম। আর সব ঘোড়ার সামনে একটি ঘেরাও করা জায়গায় এ ঘোড়াটি রাখা হতো। তিন বছরকাল এটি আমার সঙ্গে ছিলো। ঘোড়াটির মৃত্যুর পর আমার ভাগ্য পরিবর্তন হল খারাপের দিকে।

খারিজম আসতে আমি সঙ্গী পেয়েছিলাম আলী নামে কারবালার একজন সওদাগরকে। তিনি ছিলেন একজন শরীফ ব্যক্তি। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে কিছু কাপড় জামা ও অন্যান্য জিনিষ কিনে দিতে। তিনি আমার একটি জামা দশ দিনারে খরিদ করে আমার থেকে নিলেন আট দিনার এবং বাকি দু' দিনার দিলেন নিজের পকেট থেকে। প্রথমে আমি এর কিছুই জানতাম না। পরে ঘটনা পরম্পরায় কথাটা আমার কানে এলো। শুধু তাই নয়, তিনি আমাকে কিছু টাকাও ধার

দিয়েছিলেন। আমীরের উপহারের টাকা পেয়ে আমি তার পাওনা পরিশোধ করবার পর তার দয়ার জন্য কিছু একটা উপহার দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই তা গ্রহণ করলেন না। এমনকি তার একটি বালক ভৃত্যকে সে উপহার দিতে চাইলেও তিনি রাজি হলেন না। তার মতো একজন মুক্তহস্ত ইরাকী আমি আর কোথাও দেখিনি। আমার সঙ্গে তিনিও ভারত সফরে আসবেন বলে স্থির করেছিলেন। এমন সময় তাদের শহরের একজন সওদাগর চীন যাবার পথে খারিজমে এসে পৌঁছলো। তখন তিনি ভয় করলেন, হয়তো সওদাগরেরা দেশে ফিরে বদনাম করবে যে আলী ভিক্ষে করতে ভারতে গেছে। সে-জন্য তিনি স্বদেশের সওদাগরদের সঙ্গে চীন যাত্রা করলেন।

পরে ভারতে থাকাকালে শুনেছি, চীন, ও তুর্কীস্তানের সীমান্তে[৪] আল মালীক নামক জায়গায় পৌঁছে আলী সেখানেই থেকে যান এবং বালক-ভৃত্যকে আগে-আগে পাঠিয়ে দেন মালপত্রসহ। কিন্তু বালকটির ফিরে আসতে অনেকদিন লেগে গেলো। ইত্যবসরে তাদের শহরের অপর একজন সওদাগর এসে একই সরাইখানায় আলীর সঙ্গেই বাস করতে লাগলেন। আলী বালক-ভৃত্যর ফিরে আসার সময় অবধি কিছু টাকা ধার চাইলেন সেই সওদাগরের কাছে। কিন্তু সওদাগর টাকা ধার দিতে অস্বীকার করলেন। পরে অবশ্যি আলীকে সাহায্য না করাটা অন্যায় হয়েছে বলে সওদাগর বুঝতে পারলেন। তাই তিনি আলীর সরাইখানায় থাকা-খাওয়া খরচ নিজেই জমা দিতে চেষ্টা করলেন। আলী এ-কথা শুনতে পেয়ে এতটা দুঃখিত হয়ে পড়েন যে, নিজের কামরায় ঢুকে তিনি নিজের গলা কেটে ফেলেন। পরে তার যখন খোঁজ হলো তখন আলীর মুমূর্ষু অবস্থা। একজন ক্রীতদাসকে তার হত্যার জন্যে সন্দেহ করা হয়। আলী তা জানতে পেরে বললেন, "এর প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করো না। আমি নিজেই নিজের গলায় ছুরি দিয়েছি।" অতঃপর সেদিনই তিনি ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।

খারিজম থেকে যাত্রা করার সময় আমি উট ভাড়া করলাম এবং উটের একটি শিবিকাও কিনে নিলাম। কিছু সংখ্যক ঘোড়ায় চড়ে ভৃত্যেরা এলো, শীতের জন্য বাকি ঘোড়াগুলোকে কম্বল গায়ে জড়িয়ে আনতে হলো। আমরা খারিজম ও বুখারার মধ্যবর্তী মরুভূমিতে প্রবেশ করলাম। খারিজম থেকে বুখারা অবধি আঠারো দিনের বালুকাময় পথে একমাত্র ছোট শহর কাট্[৫] ছাড়া আর কিছুই নেই। চারদিন পর আমরা এসে কাট্ পৌঁছলাম এবং শহরের বাইরে তাবু ফেললাম। পাশেই একটি হ্রদের পানি ঠাণ্ডায় জমে গেছে এবং বালকেরা তার উপর খেলা করছে। কাজী আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। তার ঘন্টাখানেক পরে এলেন সেখানকার শাসনকর্তা এবং তার পরিষদবর্গ। তারা আমাদের থাকতে অনুরোধ জানালেন এবং আমাদের সম্মানার্থে এক ভোজের আয়োজন করলেন। এ মরুভূমিতে পানি ছাড়া ছয় রাত্রি চলার পরে আমরা ওয়াবৃকান (Wafkend) শহর পৌঁছলাম। সেখানে থেকে পুরো একদিন ফলের বাগান, নদী, গাছপালা ও বাড়ি ঘরের ভেতর দিয়ে পথ চলে এসে পৌঁছলাম বুখারা শহরে । পূর্বে এ-শহর অক্সাস নদীর অপর পারের দেশসমূহের রাজধানী ছিল। অভিশপ্ত তাতার টিঙ্কিজ (চেঙ্গিজ) এ শহর ধ্বংস করেন। তিনি ইরাকের রাজাদের পূর্বপুরুষ। মসজিদ স্কুল ও

বাজারের সামান্য কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ এখন এখানে দেখা যায়। এখানকার অধিবাসীদের অত্যন্ত হীন চক্ষে দেখা হয় এবং খারিজমে তাদের কোনো সাক্ষ্য আইনে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। কারণ ধর্মান্ধতা, মিথ্যা ভাষণ প্রভৃতির জন্য এদের যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। অধিবাসীদের ভেতর এমন একটি লোকও আজ নেই যার ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান আছে বা জ্ঞান লাভ ৬ করতে ইচ্ছুক। বুখারার উপকণ্ঠে ফাতেহাবাদ নামক একটি সরাই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলাম। সেখানকার শেখ আমাকে নিজের গৃহে নিয়ে প্রধান অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করলেন। বিশেষ আনন্দে একটি রাত সেখানে কাটানো হলো। সুললিত স্বরে সেখানে কোরআন পাঠ হলো। একজন ইমাম বক্তৃতা দিলেন, পরে তুর্কী ও পার্শী ভাষায় গান করা হলো।

বুখারা থেকে আমরা রওয়ানা হলাম ধর্মপ্রাণ সুলতান তারমা শিরিনের তাবুর উদ্দেশ্যে। বাগান ও খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত নাখশাব (Qarshi) নামক শহরের পাশ দিয়ে ছিল আমাদের পথ। পরদিন অপরাহ্নে আমরা সুলতানের তাবুতে পৌঁছলাম। একজন সওদাগর আমাদের একটি তাবু ধার দিলেন রাত কাটানোর জন্যে। সুলতান শিকারের উদ্দেশ্য বাইরে গেছেন বলে আমি তার প্রতিনিধি আমীর তাক্‌বুঘার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তার সমজিদের নিকটে আমার বাসস্থান নির্দেশ করে দিলেন এবং পূর্ববর্ণিত তুর্কী তাবুর মতো একটি তাবুও আমাকে দিলেন। সেই রাত্রেই আমার এক ক্রীতদাসী বালিকা একটি সন্তান প্রসব করলো। প্রথমে শুনেছিলাম সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে কিন্তু পরে দেখলাম পুত্র নয় কন্যা। কন্যা হলেও তার জন্ম হয়েছিলো শুভ মুহূর্তে কারণ তার জন্মের পর আমার যা কিছু ঘটেছে সবই আনন্দের ও সন্তুষ্টির । ভারতে পৌঁছবার দু'মাস পরে তার মৃত্যু হয়। যথাস্থানে তার বর্ণনা দেওয়া আছে।

তুর্কীস্তানের সুলতান তারমাশিরিন একজন শক্তিশালী বাদশাহ। তিনি শাসনকার্যে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং তার রাজ্য ও সৈন্যসংখ্যা বিশাল। তার রাজ্য চীন ভারত ইরাক ও সুলতান উজবেগের রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত । এ-সব রাজ্যের অধিপতিরা সবাই তাকে উপঢৌকন পাঠাতেন ও সম্মান[৭] করতেন। তার পূববর্তী দুটি ভাই-ই কাফের(Infidel) ছিলেন । একদিন মসজিদে আমরা রীতি অনুসারে ফজরের নামাজ শেষ করতেই শুনতে পেলাম সুলতান সেখানে উপস্থিত আছেন। তিনি জায়নামাজ থেকে উঠতেই আমি তাকে ছালাম করতে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে তুর্কী ভাষায় অভ্যর্থনা জানালেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তিনি তাঁর দরবার কক্ষে হাজির হতেই নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে জনসাধারণ এসে হাজির হলো নিজের-নিজের নালিশ জানাতে। অতঃপর তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন । আমি দেখতে পেলাম তাবুর ভেতরে সোনালী কাজ করা রেশমী কাপড়ে আবৃত একখানা আসনে তিনি বসে আছেন। তাবুর ভিতরে সোনালী জরির কাজ করা রেশমী আস্তর লাগানো। মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত একটি মুকুট ঝুলানো রয়েছে সুলতানের মাথার একহাত উপরে। প্রধান আমীররা আসন গ্রহণ করেছেন তার ডাইনে ও বামে। মাছি তাড়াবার ক্ষুদ্র পাখা হাতে সামনে বসেছেন শাহ্‌জাদারা। আমার সফর সম্বন্ধে নানা প্রশ্নাদি করলেন। দোভাষীর

কাজ করলেন তার প্রধান বিচারক (chancellor) । আমরা তাঁর সঙ্গে গিয়ে নামাজে যোগদান করতাম। (তখন ছিল অসহ্য শীতের সময়) । তিনি কখনও ফজর ও রাত্রের নামাজের জামাতে অনুপস্থিত থাকতেন না। একদিন আসরের নামাজের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন সুলতানের একজন ভৃত্য এসে নির্দিষ্ট জায়গায় সুলতানের জায়নামাজখানা বিছিয়ে ইমামকে বললো, "হুজুর আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন। তিনি অজু করে এক্ষুণি আসছেন।" ইমাম তার উত্তরে পার্সীতে বললেন, "নামাজ খোদার জন্য না তারমাশিরিনের জন্য ?" এই বলে তিনি মোয়াজ্জিনকে তকবির পড়তে বললেন। নামাজ অর্ধেক শেষ হবার পরে সুলতান এলেন। তিনি এসে বাকী দু'রাকাত নামাজ শেষ করলেন মসজিদের দরজার কাছে পাদুকা রাখবার জায়গায় দাঁড়িয়ে। তারপরে প্রথম দু'রাকাত নামাজ পড়ে হাসতে-হাসতে তিনি ইমামের সঙ্গে মোসাফাহ্ করতে এগিয়ে এলেন। নিজের জায়গায় বসে পরে সুলতান আমার দিকে ফিরে বললেন, "তুর্কীর সুলতানের সঙ্গে একজন পার্সী দরবেশ কি রকম ব্যবহার করলেন, দেশে ফিরে আপনার দেশবাসীকে তা বলবেন।" এ শেখ প্রতি শুক্রবার খোত্‌বা পড়তেন সুলতানকে সৎকার্যে উৎসাহ দিয়ে এবং অসৎ ও অত্যাচারমূলক কার্যে কঠোর ভাষায় নিষেধ জানিয়ে সুলতান নীরবে তা শুনতেন ও অশ্রুবর্ষণ করতেন। ইমাম সুলতানের দেওয়া কোনো উপহার কখনো গ্রহণ করতেন না, তাঁর সঙ্গে একত্র বসে খেতেন না বা তাঁর দেওয়া পোশাক-আশাকও পরতেন না। তিনি একজন খাটি ধর্মপ্রাণ খোদার বান্দা ছিলেন। সুলতানের সঙ্গে চুয়ান্ন দিন কাটিয়ে আমি আমার যাত্রা পুণরায় শুরু করতে মনস্থ করলাম। তখন তিনি আমাকে সাত'শ রৌপ্য দিনার নকুল জাতীয় জীবের লোমবিশিষ্ট একটি কোট দিলেন। শীতের জন্য এক'শ দিনার মূল্যের এ কোটটি আমি চেয়েছিলাম। তা'ছাড়া দু'টি ঘোড়া ও দু'টি উটও তিনি আমাকে দিলেন। তার কাছে বিদায় নিয়ে সমরকন্দে এসে পৌছলাম। সমরকন্দ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও সুন্দর শহর। শহরটি একটি নদীর তীরে নির্মিত। আসরের নামাজের পরে অধিবাসীদের সবাই নদীর তীরে ভ্রমণের জন্য আসে। এক সময়ে নদীর পারে বড়-বড় প্রাসাদ ছিল। এখন তার অধিকাংশই ধ্বংসের কবলে। শহরেরও সেই একই অবস্থা। তার না আছে প্রবেশ দ্বারা না আছে কোনো প্রাচীর। শহরের বাইরে রয়েছে কুতাম ইবনে আব্বাসের মাজার। সমরকন্দ বিজয়ের সময় তিনি শহীদ ৮ হন। আদিবাসীরা প্রতি রবিবার এবং বৃহস্পতিবার রাত্রে এ মাজার জেয়ারত করতে আসে। তাতারারও অনেক গরু, ভেড়া ও অর্থ মানত্‌স্বরূপ নিয়ে মাজার জেয়ারতে আসে। সে সব ব্যয় করা হয় মুসাফের ও সরাইখানার জন্য।

সমরকন্দ থেকে আমরা তিরমিধ (তিরমিজ) পৌছি। এ-বড় শহরটিতে সুন্দর-সুন্দর অট্টালিকা ও বাজার আছে। এবং মধ্য দিয়ে একটি খাল প্রবাহিত হয়ে গেছে। এখানে সুস্বাদু আঙ্গুর ও নাশপাতি পাওয়া যায় প্রচুর। তাছাড়া পাওয়া যায় মাংস ও দুধ। সোডা সাজিমাটির পরিবর্তে এখানকার লোকেরা দুধ দিয়ে মাথা ধোয়। এখানকার স্নানাগারে একটি প্রকাণ্ড জালা ভরতি দুধ রয়েছে। আগন্তুকদের প্রত্যেকেই এক পেয়ালা করে দুধ

নিয়ে নিজের মাথা ধোয়। তাতে চুল তাজা ও চকচকে হয়ে উঠে। ভারতের লোকেরা তিলতেল মাথায় দেয় এবং পরে সাজিমাটি দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলে। তাতে শরীর স্নিগ্ধ থাকে, চুল চকচকে ও লম্বা হয়। সে-জন্যই ভারতবাসীদের এবং সেখানে যারা বাস করে তাদের দাড়ি লম্বা হয়। তিরমিজের পুরাতন শহরটি নির্মিত হয়েছিল অকসাস্ নদীর তীরে। অতঃপর চেঙ্গিজ যখন সে-শহর ধ্বংস করেন তখন পুনরায় এ-শহরটি নির্মিত হয় নদীর তীর থেকে দু'মাইল দূরে। শহরে পৌছবার আগেই ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গে এখানকার শাসনকর্তা আলা আল-মুল্ক খোদাওন্দজাদার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমাদিগকে মেহ্মান হিসাবে গণ্য করবার হুকুম দেন এবং প্রত্যহ আমাদের জন্য খাদ্যবস্তু পাঠান।

অক্সাস্ নদী পার হয়ে আমরা খোরাসানে প্রবেশ করি। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বালুকাময় অনুর্বর জনমানবহীন পথে দেড় দিন চলার পরে বলখে উপস্থিত হই। সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও শহরটি জনমানবহীন হয়ে গেছে। কিন্তু এ-শহর খুব মজবুত করে তৈরী বলে এখনও জনহীন বলে মনে হয় না। অভিশপ্ত চেঙ্গিজ এ-শহর ধ্বংস করেন এবং শহরের মসজিদটির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি শুনেছিলেন মসজিদের একটি স্তম্ভের নিচে ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে। সেজন্য স্তম্ভগুলোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তিনি ভেঙে ফেলেন। অবশেষে কিছুই না পেয়ে সেগুলো ভগ্নাবস্থায় পরিত্যাগ করে যান। বলখ থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা কুহিস্তানের পাবর্ত্যপথে সাতদিন চলি। পথে অনেক গ্রাম, স্রোতস্বিনী ও ডুমুর জাতীয় গাছ আছে। অনেকগুলো সরাইখানায় ধর্মনিষ্ট লোকেরা বাস করেন। তারপর আমরা উপস্থিত হই খোরাসানের বৃহত্তম শহর হিরাতে। এ-প্রদেশে বৃহৎ শহর চারটি । তার ভেতর হিরাত ও নায়াসাবুর (নিশাপুর) বসতিপূর্ণ এবং বলখ ও মারুভ (Merv) ধ্বংস কবলিত।

হিরাতের সুলতান প্রসিদ্ধ হোসায়েন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আলঘোরীর পুত্র। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তার দুঃসাহসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। খোদার অনুগ্রহে (by the Divine favour) তিনি দু'টি যুদ্ধে জয়লাভ করেন।[৯] নিজামউদ্দিন মাওলানা নামে একজন প্রসিদ্ধ আওলিয়া যৌবন হিরাতে বাস করতেন। তার খোতবা ও ধর্মোপদেশ শুনবার জন্য বহুলোক তার কাছে সমবেত হতো। তারা সবাই তাকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করতো। দুর্নীতি দমনের জন্য তাকে নিয়ে তারা একটি সঙ্ঘ গঠন করেছিল। সুলতানের জ্ঞাতিভ্রাতা ইমাম মালিক ওয়ারানা সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। যেখানেই তারা কোনো দুষ্কার্যের খবর পেতো, এমন কি দুষ্কার্যকারী স্বয়ং সুলতান হলেও সেখানেই তারা গিয়ে দুষ্কার্য বন্ধের চেষ্টা করতো। শোনা যায়, একবার তারা খবর পেলো, সুলতানের প্রাসাদেই একটি অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কাজেই তারা সে কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। তখন সুলতান তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাসাদের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু দেখতে-দেখতে প্রাসাদের প্রবেশ পথে প্রায় ছয় হাজার লোক এসে সমবেত হলো। তাদের ভয়ে ভীত হয়ে সুলতান নিজামউদ্দিনকে এ-শহরের অপরাপর প্রধান ব্যক্তিদের ডেকে পাঠালেন। সুলতান

মদ্যপান করছিলেন। জনতা প্রাসাদের ভেতরেই তাকে ইসলামের শরিয়ত অনুসারে শাস্তি [১০] দিয়ে শান্ত হলো। পরে একজন তুর্কী আমীরের দ্বারা নিজামউদ্দিন নিহত হন। কোনো ব্যাপারে আমীর তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। সুলতানের জ্ঞাতিভ্রাতা মালিক ওয়ারমা নিজামউদ্দিন সংস্কারমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ-ঘটনার পর সুলতান মালিক ওয়ারনাকে রাজদূত হিসাবে সিজিস্তানের রাজদরবারে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি সিজিস্তানে গিয়ে পৌঁছলে সুলতান তাকে ফিরে আসতে বারণ করেন। অবশেষে মালিক ওয়ারনা ভারতে চলে যান। সিন্ধু ত্যাগ করে আসার সময় আমার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি একজন অমায়িক লোক ছিলেন। তাছাড়া তিনি ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন এবং শিকার করতে ক্রীতদাস ও ভৃত্য রাখতে এবং জাঁকজমকশালী পোষাক পরিধান করতে ভালবাসতেন। কিন্তু এ-প্রকৃতির লোকের জন্য ভারত উপযোগী দেশ নয়। ভারতের বাদশাহ্ তাঁকে ছোট একটি শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সেখানেই হিরাতের একজন লোকের হস্তে তিনি নিহত হন। হিরাত থেকে এসে এ-লোকটি তখন ভারতে বসবাস করছিলো শুনা যায়। ভারতের বাদশাই সুলতান হোসায়েনের অনুরোধে আততায়ীকে এ-ব্যাপারে প্ররোচনা দেন। সে-কারণে মালিক ওয়ারনার মৃত্যুর পরে সুলতান হোসায়েন ভারত সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন।

হিরাত ছেড়ে আমরা যাই জাম শহরে। উর্বর অঞ্চলে অবস্থিত 'জাম' মাঝামাঝি আকারের একটি শহর।[১১] এখানকার গাছপালার মধ্যে অধিকাংশই তুঁত গাছ। কাজেই এখানে প্রচুর রেশম উৎপাদন হয়। প্রসিদ্ধ তাপস ও দরবেশ আহ্‌মদ-উল-জামের নামানুসারে এ-শহরের নামকরণ হয়েছে। তার বংশধরেরাই এখন এ-শহরের মালিক। জাম শহর সুলতানের অধিকারভুক্ত নয়। দরবেশ জামের বংশধরগণ বিত্তশালী ব'লে খ্যাত। অতঃপর আমরা খোরাসানের অন্যতম বৃহৎ শহর তুস্ নগরে হাজির হই। সেখান থেকে যাই মাশাদ-আর-রিদা (মেসেদ)। এটিও বহু ফলগাছ, নদীনালা ও কারখানা যুক্ত[১২] একটি বড় শহর। এখানকার প্রসিদ্ধ সমাধিস্তম্ভের শীর্ষে একটি সুদৃশ্য গুম্বুজ আছে। সমাধির দেওয়ালগুলি রঙীন টালিদ্বারা নির্মিত। ইমামের সমাধিস্তম্ভের উল্‌টোদিকেই খলিফা হারুন-অর-রশিদের সমাধি। সমাধির উপরস্থ মঞ্চে আলোকাধার রয়েছে। কোনো শিয়া মতাবলম্বী এখানে জিয়ারতের জন্য এলে হারুণ-আর-রশিদের সমাধির উপর পদাঘাত করে এবং আর-রিদার জন্য দোয়া করে।

সেখান থেকে আমরা সারাখের মধ্য দিয়ে যাওয়ার (Zawa) উপস্থিত হই। যাওয়া ধর্মপ্রাণ শেখ কুতুবউদ্দিন হায়দারের [১৩] শহর। তিনি নিজের নামানুসারে দরবেশদের জামাতের নাম হায়দারী জামাত রেখেছেন। এ-সব দরবেশ হাতে, কানে ও শরীরের অন্যান্য অংশে লোহার আংটি ব্যবহার করেন। যাওয়া থেকে আমরা নায়াসাবুর গিয়ে হাজির হই। খোরাসানের চারটি রাজধানীর ভেতর নায়াসাবুর অন্যতম। এ-শহরের সৌন্দর্য ফলগাছ, ফলের বাগান, নদী-নালার জন্য একে ছোট দামেস্ক নাম দেওয়া হয়েছে। এখানে রেশম ও মখমলের পোষাক তৈরী হয়ে ভারতে রপ্তানী হয়। আমি প্রসিদ্ধ জ্ঞানী শেখ কুতুবউদ্দিনের আস্তানায় কিছুকাল বাসের সুযোগ লাভ করেছিলাম।

তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। আমি তাঁর আশ্চর্য-জনক কিছু কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখেছি। এ-শহরে আমি একজন অল্পবয়সী তুর্কী ক্রীতদাস খরিদ করেছিলাম। তিনি সেই ক্রীতদাসকে আমার সঙ্গে দেখেই বলে উঠলেন, "এ ছেলেটি তোমার জন্য ভাল হবে না। একে বিক্রি করে ফেলো।" তার উপদেশানুসারে আমি তাই করলাম, পরের দিনই এক সওদাগরের কাছে তাকে বিক্রি করে দিলাম। তারপর যথারীতি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। অতঃপর যখন আমি বিস্তামে এসে পৌছি তখন নায়াসাবুরের এক বন্ধু পত্র লিখে জানালেন যে, সেই ক্রীতদাস একটি তুর্কী বালককে হত্যা করেছে এবং সে জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। শেখের অলৌকিক কার্যের এটি চাক্ষুস্ প্রমাণ।

নায়াসাবুর থেকে আমরা আসি বিস্তাম।[১৪] বিস্তাম থেকে কান্দুস (Qundus) ও বাগলান।[১৫] দুটিই গ্রাম এবং শেখ ও ধার্মিক লোকদের বাসস্থান। কানদুসে একটি খালের পাশে আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম। এখানে শের-ই-শিয়া (কালো সিংহ) নামক একজন মিশরীয় শেখের একটি অতিথিশালা আছে। এখানকার শাসনকর্তা মসুলের অধিবাসী। তিনি বিশেষ যত্নে আমাদের মেহমানদারী করেন। এখানকার একটি বাগানের ভিতরে তাঁর বাসস্থান। আমাদের সঙ্গের ঘোড়া ও উটগুলোকে চরানোর সুবিধা পেয়ে সে গ্রামের বাইরে আমরা প্রায় চল্লিশ দিন কাটালাম। কারণ, এখানে অতি উত্তম গো-চারণ ভূমি রয়েছে। তা' ছাড়া ইতিপূর্বে ঘোড়া চুরির ব্যাপারে তুর্কী আইনের যে বিধানের কথা আগেই আমি বলেছি, এখানকার আমীরও সে আইন এখানে বলবৎ রেখেছেন বলে ঘোড়া চুরি যাবারও কোনো আশঙ্কা নেই। আমাদের ওখানে দশদিন অবস্থানের পরেই তিনটি ঘোড়া হারিয়ে যায়। তখন প্রায় পক্ষকালের মধ্যেই স্থানীয় তাতাররা, তাদের মধ্যে আমীর কর্তৃক ঐ আইন প্রয়োগ হবে আশঙ্কায় ঘোড়া তিনটি উদ্ধার করে দিয়ে যায়।

এখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের আরেকটি কারণ তুষারপাত। কারণ, পথে হিন্দুকুষ নামক একটি পর্বত আছে। হিন্দুকুষ নামের অর্থ হইল হিন্দু বা ভারতীয়দের হত্যাকারী। কারণ, ভারতবর্ষ থেকে ক্রীতদাস বালক-বালিকা আনবার সময় অত্যধিক শীত ও তুষারপাতের ফলে বহু সংখ্যক এখানেই মৃত্যুবরণ করে। সে-পথ পার হতে পূর্ণ একটি দিন লাগে।[১৬] গ্রীষ্মকাল পুরোপুরি আরম্ভ না-হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানেই রয়ে গেলাম। তারপর একদিন প্রত্যুষে চলতে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত চলে এ পর্বতটি অতিক্রম করে এলাম। উটগুলো তুষারের ভেতরে ডুবে যাবে ভয়ে আমরা পথে উটের পা ফেলার জন্য সামনে কম্বল বিছিয়ে দিতে লাগলাম। বাগলান থেকে যাত্রা করে আমরা যেখানে এলাম সে জায়গাটির নাম আন্দার (Andarab)। এক সময়ে এখানে একটি শহর ছিল কিন্তু তার চিহ্নও আজ লোপ পেয়েছে। একটি বড় গ্রামের কাছে এসে আমরা আস্তানা ফেললাম। মোহাম্মদ আল-মাহ্‌রাবি নামে একজন সৎলোকের একটি সরাইখানা এখানে আছে। আমরা তাঁর সঙ্গেই ছিলাম এবং তিনি আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন। তিনি আমাদের এতটা সম্মান করেছেন যে, খাওয়ার পরে আমরা যখন হাত

ধুয়ে ফেলতাম তিনি তখন সেই হাত ধোয়া পানি পান করতেন। পূর্বোক্ত হিন্দুকুষ পর্বতে আরোহণ করার আগে পর্যন্ত তিনি আমাদের অনুগমন করেন। এ পর্বতের উপর আমরা একটি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পাই। আমরা তাতে মুখ ধুয়েছিলাম। তার ফলে আমাদের মুখের ত্বক ঝলসে যায় এবং আমাদের কিছু কষ্ট ভোগ করতে হয়।

অতঃপর আমরা যেখানে এসে থামলাম সে জায়গাটির নাম বান্‌জ্‌হির (Panjshir) যার অর্থ 'পাঁচ পর্বত'। এক সময়ে সমুদ্রের মতো নীল পানি বিশিষ্ট এই নদীর বড় পাড়ে এখানে একটি জন বহুল সুন্দর শহর গড়ে উঠেছিল। তাতার সুলতান চেংগিজ-এ দেশটিও ধ্বংস করেন এবং তারপরে এ-শহরের আর আবাদ হয়নি। আমরা 'পাশে' নামীয় একটি পর্বতে এসে হাজির হলাম। এখানে আতা আউলিয়া অর্থাৎ আউলিয়াদের পিতা নামক একজন শেখের একটি দরগাহ আছে। তাঁকে 'সিসাদ সালাহ' নামেও ডাকা হয়। কারণ, কথিত আছে, তাঁর বয়স সাড়ে তিনশত বছর। তাঁর সম্বন্ধে লোকে উচ্চ ধারণা পোষণ করে এবং শহর ও গ্রাম থেকে বহুলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। এমন কি সুলতান ও শাহ্‌জাদীরা পর্যন্ত আসেন। তিনি আমাদের সসম্মানেই তাঁর মেহমানরূপে গ্রহণ করেন। আমরা তাঁর দরগার কাছে নদীর কিনারে তাঁবু ফেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি তাঁকে ছালাম করতেই তিনি আমাকে আলিঙ্গণ দান করলেন। তাঁর গায়ের চামড়া কোমল ও মসৃণ। তাঁকে দেখলে যে কেউ পঞ্চাশ বছর বয়সী বলে মনে করবে। তিনি আমাকে বললেন, প্রতি একশ বছর পরে তাঁর চুল ও দাঁত নতুন করে গজায়। তাঁর বিষয়ে আমার মনে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। একমাত্র খোদাই জানেন, তাঁর কথায় কতটা সত্যতা আছে।

সেখান থেকে আমরা এলাম পারওয়ান। এখানে আমীর বুরুনতাইর (Buruntayh) সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন এবং গজনাতে তাঁর প্রতিনিধির কাছে আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়ে পত্র লেখেন। আমরা চারক (চারিকর) গ্রাম অবধি পৌঁছলাম। তখন গ্রীষ্মকাল। সেখান থেকে আমরা গজনা পৌঁছলাম। খ্যাতনামা যোদ্ধা সুলতান মাহমুদ ইবনে সবুক্তগীনের শহর এই গজনা। প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি বহুবার ভারত আক্রমন করেন এবং একাধিক নগর ও দূর্গ অধিকার[১৭] করেন। এ শহরেই তাঁর সমাধি রয়েছে। সমাধির উপরে একটি (Hospice) নির্মিত হয়ে আছে। শহরের বৃহত্তর অংশ ধ্বংস কবলিত হয়ে সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এক সময়ে এটি বড় শহর ছিল। এখানে অত্যন্ত বেশি শীত অনুভূত হয়। সে-জন্য শীতকালে এ-শহরের বাসিন্দারা কান্দাহার শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। গজনা থেকে কান্দাহার নামে এ বড় ও সমৃদ্ধিশালী শহর তিন রাত্রির পথ। কিন্তু আমার সেখানে যাবার সুযোগ হয়নি। আমরা কাবুলে এসে পৌঁছলাম। পূর্বে কাবুল একটি প্রকাণ্ড শহর ছিল। এখন তার স্থান দখল করেছে আফগান নামক ইরানীদের বসতিপূর্ণ একটি গ্রাম। এদের দখলে কয়েকটি পর্বত ও গিরিবর্ত আছে। আফগানরা বিশেষ শক্তিশালী এবং তাদের অধিকাংশই দস্যু প্রকৃতির লোক। তাদের প্রধান পর্বতটির নাম কুহ্‌সোলেমান। কথিত আছে, পয়গম্বর

সোলেমান এ পর্বতে আরোহন করে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং ভারতে প্রবেশ না করে ফিরে আসেন। কারণ, ভারত তখন অন্ধকারাবৃত ছিল।

কাবুল থেকে অশ্বারোহণে আমরা কারমাশ পৌঁছলাম। আফগানদের অধিকারে কারমাশ দুটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি দূর্গ। এখানে পৌঁছলে পথিকদের তারা বাধা দেয়। সে-পথে আসবার সময় আমাদের সঙ্গেও তাদের একবার সংঘর্ষ বেধেছিল। পর্বতের নিম্নে ঢালু জায়গায় ছিল তাদের অবস্থান। আমরা তীর ছুঁড়তেই তারা পালিয়ে যায়। আমরা হালকা জিনিষপত্র সহ পথ চলছিলাম এবং আমাদের সঙ্গে ঘোড়া ছিল প্রায় চার হাজার। আমার ছিল উট। তার ফলে আমাকে কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে পড়তে হলো। আমি যে দলে তখন যুক্ত হলাম সে দলে কয়েকজন আফগানও ছিল। মোট বহরের ভার কমানোর উদ্দেশ্যে আমরা পথের পাশে কিছু খাদ্যবস্তু ফেলে গেলাম। উটগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে তাদের বোঝাও কমিয়ে দিলাম। পরের দিন আমাদের ঘোড়াগুলো ফিরে এসে সে-সব জিনিস নিয়ে যায়। আমরা সন্ধ্যার পরে কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলাম এবং শাশ নগরে রাত কাটালাম। তুর্কীদের দেশের সীমান্তে এটি জনঅধ্যুষিত শেষ শহর। এখান থেকে রওয়ানা হয়েই আমরা বিশাল মরুভূমিতে প্রবেশ করলাম। এ মরুভূমি পনরো দিনের পথ অবধি বিস্তৃত। এ মরুভূমি বছরে শুধু একবারই অতিক্রম করা যায় যখন ভারতে ও সিন্ধুদেশে বৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ জুলাই মাসের[১৮] প্রারম্ভে। এ মরুভূমিতেই মারাত্মক সাইমুম বায়ু প্রবাহিত হয়। আমাদের অগ্রবর্তী একটি কাফেলা এখানে এলে অনেক উট ও ঘোড়া প্রাণ হারায়। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ আমরা নিরাপদেই পাঞ্জাব অর্থাৎ পঞ্চনদী (সিন্ধুনদী) নামক সিন্ধুদেশের নদীর কাছে এসে পৌঁছলাম। এ নদীগুলো প্রবাহিত হয়ে বড় একটি নদীতে পড়ে এবং দেশে জল সেচনের কাজ করে। আমরা যখন এ নদীর কাছে এসে পৌঁছি তখন ৭৩৪ হিজরীর মহর্‌রম মাসের নতুন চাঁদ (১২ই সেপ্টেম্বর ১৩৩৩) আমাদের মাথার উপরে উঠেছে। এখানে পৌঁছবার পর গোয়েন্দা কর্মচারীগণ আমাদের সম্বন্ধে সকল বিবরণ ভারত-সম্রাটের কাছে লিখে পাঠালেন।

এ সফরের কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান ও দয়ালু খোদার।

ছয়

হিজরী সাত-শো চৌত্রিশ সাল। মহরম মাসের পয়লা রাত্রি মোতাবেক ইংরেজী ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর। মাথার ওপর মহরমের নূতন চাঁদ। আমরা এসে পৌঁছলাম সিন্ধু ও ভারত সাম্রাজ্যের সীমান্তে পাঞ্জাব (সিন্ধু) নদীর তীরে; প্রথমেই এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন সুলতানের গোয়েন্দা কর্মচারীরা। তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের লিখিত বিবরণী পাঠিয়ে দিলেন মুলতানের শাসনকর্তার কাছে। সিন্ধু থেকে রাজধানী দিল্লী পদব্রজে পঞ্চাশ দিনের পথ। কিন্তু সরকারী ডাক-ব্যবস্থায় গোয়েন্দা কর্মচারীদের পত্র সুলতানের হাতে পৌঁছতে লাগে মোটেই পাঁচ দিন। ভারতে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা দুই প্রকার। প্রথমত: ঘোড়সওয়ার দূতের সাহায্যে চালিত ডাক। প্রতি চার মাইল পথের এক তৃতীয়াংশ গেলেই পাওয়া যায় একটি করে লোকালয়। লোকালয়ের বাইরে তিনটি তাঁবু খাটানো। তাঁবুর মধ্যে তৈরী হয়ে বসে থাকে ডাক-হরকরা। তাদের প্রত্যেকের হাতেই দেড় গজ লম্বা একটা লাঠি। লাঠির মাথায় পিতলের ঘন্টা বাঁধা। এক হাতে পত্র আর-অপর হাতে ঘন্টা বাঁধা লাঠি নিয়ে প্রথম ডাক হরকরা শহর থেকে বেরিয়েই প্রাণপণে দৌড়াতে আরম্ভ করে। এ-দিকে ঘন্টার আওয়াজ কানে যেতেই তাঁবুর হরকরা তৈরী হয়ে দাঁড়ায় দৌড়বার জন্য। তারপর আগের লোকটা পৌঁছতেই পত্রখানা ছিনিয়ে নিয়ে ঘন্টা বাজাতে-বাজাতে সেও দৌড়াতে আরম্ভ করে। এমনি করে পত্রখানা গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছে। ঘোড় সওয়ার ডাকের চেয়েও শেষোক্ত ডাক কিন্তু দ্রুতগামী। অনেক সময় এ-উপায়ে সুলতানের জন্য খোরাসান থেকে ভারতবর্ষে ফল আমদানী করা হয়। ভারতে খোরাসানী মেওয়ার কদর খুব বেশি। ঠিক একই উপায়ে আবার নামকরা অপরাধীদের (Criminals) এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। অপরাধীকে খাটিয়ার ওপর তুলে বাহকরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। সুলতান যখন দৌলাতাবাদে বাস করেন তখন কংক (গঙ্গা) নদী থেকে তাঁর পানীয়

জল-বাহকেরা এই উপায়েই বয়ে নিয়ে আসে। অথচ দৌলতাবাদ থেকে গঙ্গা চল্লিশ দিনের পথ।

গোয়েন্দা কর্মচারী কোনো নবাগতের বিষয় লিখে পাঠালে সুলতান তা' অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। কর্মচারিরাও এ-ব্যাপারে খুব যত্ন নিয়ে থাকেন। নবাগত বিদেশীর চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদ কেমন, সঙ্গে কত লোকজন, ক'টি বাঁদী, চাকর, পশুই বা ক'টি সব কিছুর বিবরণ সুলতানকে লিখে পাঠানো হয়। তাঁর আচার ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে হাবভাবের খুঁটিনাটি কিছুই বাদ পড়ে না।

সিন্ধুর রাজধানী মুলতানে পৌঁছে নবাগত ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় সুলতানের অনুমতি-পত্রের জন্যে। তাকে কতোটুকু আতিথেয়তা দেখাতে হবে অনুমতি-পত্রের সঙ্গে তারও নির্দেশ সুলতানের কাছ থেকেই আসে। এখানে বিদেশী লোকদের মর্যাদা ঠিক করা হয় তার কাজকর্ম ও চলাফেরার হাবভাব দেখে। কারণ, তার বংশ পরিচয় থাকে সকলের অজ্ঞাত। সুলতান মাহমুদ বিদেশীদের সম্মান করেন নিজের অধীনে তাঁদের শাসনকর্তা বা অপর কোনো উচ্চপদে বহাল করে। তাঁর সভাসদ, রাজকর্মচারী, উজির, হাকিম ও আত্মীয় স্বজনের অধিকাংশই বিদেশাগত। তাঁর হুকুম অনুসারেই এখানেই বিদেশীদের উপাধি হয়েছে 'আজিজ' বা মাননীয়।

বাদশার কোনো অনুগ্রহ লাভের জন্য দরবারে হাজির হলেই কিছু না-কিছু উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। প্রতিদানে বাদশা সেই উপঢৌকনের বহুগুণ ফিরিয়ে নেয়। প্রজাসাধারণ যখন এই উপঢৌকন আদান-প্রদানের ব্যাপারে অভ্যস্থ হয়ে উঠলো, ভারত ও সিন্ধুর মহাজনগণ তখন প্রজাদের হাজার-হাজার দিনার ধার দিয়ে অথবা উপঢৌকনের সামগ্রী জোগান দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। মহাজনরা বিদেশী আগন্তুকদের প্রয়োজন মতো টাকা তো ধার দেয়ই; অধিকন্তু নিজেরাও খাটে। তারপর নবাগত ব্যক্তি একদিন সুলতানের সঙ্গে দেখা করে যে মূল্যবান উপঢৌকন পায় তার থেকেই তাদের দেনা পরিশোধ হয়। মহাজনদের এ ব্যবসায়টি বেশ লাভজনক। সিন্ধুতে পৌঁছে আমাকেও এই পন্থাই অনুকরণ করতে হলো। একজন মহাজনের কাছ থেকে আমি ঘোড়া, উট ও শ্বেতকায় পেলাম। এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করে নিলাম। এ-ছাড়া গাজনার এক ইরাক সওদাগরের কাছ থেকে আগেই আমি ত্রিশটি ঘোড়া, একটি উট এবং এক বোঝা তীর কিনেছিলাম। সে-গুলোও পরে সুলতানের দরবারে সওগাত দিয়েছি। এই মহাজনটি কিছুদিনের জন্য খোরাসানে চলে যায় এবং ভারতে ফিরে এসে আমার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। একমাত্র আমাকে দিয়েই সে বহু টাকা মুনাফা করে একজন খ্যাতনামা মহাজন বা সওদাগর বলে গণ্য হয়। এ-ব্যাপারে বহু বছর পরে এই মহাজনটির সঙ্গে আমার একবার দেখা হয় আলেপ্পো বন্দরে। আমার যথাসর্বস্ব তখন বিধর্মীরা লুট করে নিয়ে গেছে। সে-অবস্থায় এ-লোকটির শরণাপন্ন হয়ে কোনো সাহায্যই আমি সেদিন পেলাম না।

সিন্ধু নদী পার হয়ে আমাদের পথ আরম্ভ হলো নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে। এই বনেই জীবনের প্রথম আমি একটি গণ্ডার দেখতে পেলাম। ক্রমাগত দু'দিন হাঁটার পর আমরা এসে পৌছলাম জানানী নামক এক শহরে। সিন্ধু নদীর তীরে জানানী সুন্দর একটি শহর। এর অধিবাসীদের বলা হয় সামিরা। সাতশো বারো খ্রীষ্টাব্দে আল-হাজ্জাজ এর কাল থেকে এদের পূর্বপুরুষরা এখানে বসবাস করেছে। এরা কারো সঙ্গেই কখনো একত্র আহার করতে রাজী হয় না। এমন কি আহারের সময় কাউকে দেখাও দেয় না। তা'ছাড়া নিজেদের গণ্ডীর বাইরে কখনো বিয়ে-থা করতে বা দিতে রাজী হয় না। জানানী ছেড়ে আমরা গিয়ে পৌছলাম সিওয়াসিতান (সেহওয়ান) নামক এক বড়ো শহরে। শহরটার বাইরেই বালুকাময় মরুভূমি। একমাত্র বাবলা জাতীয় গাছ ছাড়া এ-মরুভূমিতে অপর কোনো গাছপালার চিহ্নই নেই। এখানকার নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও একমাত্র লাই ছাড়া বড়ো একটা কিছুই ফলে না। অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য যোয়ার ও মটরের তৈরী রুটি। তা'ছাড়া এখানে পাওয়া যায় প্রচুর মাছ আর মোষের দুধ, এরা ছোটো এক প্রকার টিকটিকি জাতীয় জীবের মাংস খায়। এ ক্ষুদ্র জীবটিকে এদের খেতে দেখেই আমার কিন্তু ঘৃণার উদ্রেক হয়। আমি কখনো ও-জিনিষ খেতে রাজী হইনি।

আমরা সিওয়াসিতানে এসে পৌছি গ্রীষ্মের সবচেয়ে গরমের সময়টায়। অসহ্য গরম। আমার সঙ্গীরা তো প্রায় উলঙ্গই কাটাতে লাগল। তারা শুধু কোমরে জড়াতো এক টুকরা কাপড় আর কাঁধে ভিজিয়ে রাখতো এক টুকরা। গ্রীষ্মের প্রবল উত্তাপে অল্পক্ষণের মধ্যেই কাপড় শুকিয়ে যেতো, অনবরত তারা সে কাপড় পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতো।

এই শহরেই আমি খোরাসানের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আলা-অল-মুলকের প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এক সময়ে তিনি ছিলেন হিরাতের কাজী। সেখান থেকেই ভারতে আসেন এবং সিন্ধুর লাহারী শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আমি তাঁর সঙ্গেই এ-অঞ্চলে ভ্রমণে বের হব সঙ্কল্প করি। শাসনকর্তা আলা-অল-মুলকের পনর-খানা জাহাজ। নিজের লটবহর এবং লোকজন নিয়ে এই সব জাহাজের সাহায্যে তিনি নদী-পথে যাতায়াত করেন। জাহাগুলোর একখানার নাম 'আহাওড়া'—দেখতে ঠিক আমাদের দেশের এক মাস্তুল ও ছোট্ট পালওয়ালা জাহাজের মতো কিন্তু পাশে চওড়া, লম্বায় ছোট। আহাওড়ার মধ্যখানে সিঁড়িওয়ালা কাঠের তৈরি একটি কেবিন। কেবিনটির উপরিভাগে স্বয়ং আলা-অল-মুলকের বসবার আসন। তাঁর সামনে বসেন আমীর ওমরাগণ, দক্ষিণ ও বামে বসে ক্রীতদাসের দল, নিচে দাঁড় টানে চল্লিশজন দাঁড়ী। আহাওড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দু'পাশে চলতে থাকে অপর চারখানা জাহাজ। তার দু'খানায় থাকে পতাকা এবং দামামা শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র আর গায়কের দল। প্রথমেই বেজে ওঠে দামামা আর শিঙ্গা, তারপর আরম্ভ হয় গান। এমনি করে একটার পর একটা চলতে থাকে ভোর হতে শুরু করে মধ্যাহ্ন-আহারের সময় অবধি। আহারের সময় হলেই জাহাজগুলো একত্র সংলগ্ন করা হয়। গায়ক ও বাদকের দল আহাওড়ায় গিয়ে ওঠে। শাসনকর্তার আহার শেষ না হওয়া অবধি সেখানে একটানা গান বাজানো চলতে থাকে। শাসনকর্তার আহার শেষ হলে অপর সবাই আহার করে। তারপর জাহাজ আবার চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যা হলে

নদীর তীরে তাঁবু খাটানো হয়। শাসনকর্তা তীরে অবতরণ করলে পুনরায় নৈশ-আহারের আয়োজন হয়। নৈশ-আহারে দলের প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে যোগদান করে। রাত্রে এশার নামাজের পর তাঁবুতে পালা করে প্রহরীদল স্থাপন করা হয়। এক দলের কাজ শেষ হলেই দলের একজন চীৎকার করে সময় ঘোষণা করে। তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে ওঠে দামামা আর শিঙ্গা। ফজরের নামাজ শেষ হলেই আহারের পর আবার যাত্রা শুরু হয়।

এমনি করে পাঁচদিন চলার পর আমরা এসে পৌছলাম আলা-অল-মুলকের এলাকা লাহারী শহরে। সমুদ্রতীরে সিন্ধুনদীর মোহনায় লাহারী একটি চমৎকার শহর। এখানে বড়ো রকমের একটি পোতাশ্রয় আছে। য়েমেন, ফার এবং অন্যান্য বহু দেশের লোকজন সর্বদা এখানে যাতায়াত করে। এ-জন্য এখানকার খাজাঞ্চীখানার আয় খুব বেশি। আলা-অল-মুলক আমাকে বলেছিলেন, শুধু এই শহরের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ষাট লক্ষ মুদ্রা। এ-আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগই স্বয়ং শাসনকর্তার প্রাপ্য। একদিন ঘোড়ায় চড়ে আলা-আল-মুলকের সঙ্গে আমি লাহারীর শত মাইল দূরে তারানা নামক এক সমতল ভূমিতে বেড়াতে যাই। যেখানে দেখতে পেয়েছিলাম বিভিন্ন জানোয়ার ও মানুষের অসংখ্য প্রস্তর-মূর্তি। মূর্তিগুলোর অধিকাংশই তখন বিকৃত ও বিধ্বস্ত—কোনটার মাথা, কোনটার বা পা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যব, মটর, কলাই, মসুর প্রভৃতি শস্যের আকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলো পাথরও সেখানে রয়েছে। আর রয়েছে শহরের ও গৃহের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। খোদাই-করা পাথরের প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে খোদাই'করা পাথরের একটি বেদী। বেদীর উপরে পিঠমোড়াভাবে বদ্ধ অবস্থায় একটি মানুষের মূর্তি। জায়গাটায় দুর্গন্ধময় পানির একটা নহরও আছে। একটি দেয়ালের গায়ে রয়েছে ভারতীয় অক্ষরে শিলালিপি।

এ-শহরে পাঁচদিন কাটাবার পর আলা-অল-মূলক রাহা-করচ বাবদ প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। অতঃপর আমি রওয়ানা হলাম বাকার শহরের উদ্দেশ্যে। সুন্দর শহর এই বাকার। সিন্ধু নদীর একটি খাল বাকার শহরকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছে। খালের উপরে চমৎকার একটি মুসাফিরখানা। রাহাগীদের এখানে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। বাকার ছেড়ে আমি উপস্থিত হই উজ (উচ্) শহরে। শহরটি অপেক্ষাকৃত বড়ো। চমৎকার বাজার এবং কোঠাবাড়ীবিশিষ্ট এই শহরটি নদীর পারে অবস্থিত। সে সময় শরীফ জালাল উদ্দিন আল-কিজ্জি এখানকার শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক আর দয়ালু। আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা জন্মেছিল। তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়—আমি যখন দিল্লীতে অবস্থান করছিলাম তখন। সুলতান মাহমুদ দৌলতাবাদ রওয়ানা হবেন, আমাকে বলে গেলেন রাজধানীতে অবস্থান করতে। শরীফ জালাল উদ্দিন সে-সময় আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, সুলতান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর নিজের জমিদারীর আয়ে আমার ব্যয় নির্বাহ করতে। কারণ আমার নিজের খরচের জন্যে অনেক টাকার দরকার। আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে মোট পাঁচ হাজার

দিনার তাঁর জমিদারীর আয় থেকে পেয়েছিলাম। খোদা যেন শত গুণে এর প্রতিদান তাঁকে দেন।

উজ থেকে আমি হাজির হই মুলতানে। মুলতান সিন্ধুর রাজধানী এবং প্রধান আমীরের বাসস্থান।

মুলতান যেতে দশ মাইল দূরে একটি নদী, নাম খসরু-আবাদ। নদীটি বড়ো। নৌকার সাহায্য ছাড়া পার হবার উপায় নেই। যারা এখানে নদী পার হতে আসে, তাদের জিনিষ-পত্র তল্লাশী করা হয়। সওদাগররা এ-পথে যা কিছু নিয়ে আসে তার এক -চতুর্থাংশ এখানে কর বাবদ দিয়ে যেতে হয়। প্রতিটি ঘোড়ার জন্য দিতে হয় সাত দিনার। আমার জিনিষ-পত্রও তল্লাশী হবে এ-প্রস্তাব আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হল। সাধারণ লোকে যাই মনে করুক, আমার সঙ্গে মূল্যবান তেমন কিছুই ছিল না। খোদার অনুগ্রহে সে-সময়ে মূলতান শাসনকর্তার একজন উপচ্চপদস্থ কর্মচারী সেখানে এসে হাজির হন। তাঁর হুকুমে আমি সেবার তল্লাশীর হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাই। নদীর তীরেই আমাদের রাত্রি কাটাতে হল। পরদিন ভোরে দেখা হল স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে। শহরে বা জেলার যেখানে যা-কিছু ঘটে বা বিদেশের যে-কেউ আসে আগে তার সম্বন্ধে যথাযথ সংবাদ সুলতানকে পৌঁছে দেওয়া এ-ব্যক্তির কাজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় জমে ওঠে। তাঁকে সঙ্গে করেই আমি সুলতানের শাসনকর্তা কুতুব-আল-মূলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই।

কুতুব-অল-মুলকের সম্মুখে হাজির হতেই তিনি নিজে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং করমর্দন করে পার্শ্বে আসন গ্রহণ করতে বললেন। আমি তাঁকে উপহার দিলাম শ্বেতকায় একজন গোলাম, একটি ঘোড়া এবং কিছু কিস্‌মিস ও বাদাম। কাউকে উপহার দেওয়ার পক্ষে এ-সব জিনিষই উত্তম। কারণ, কিস্‌মিস্‌, বাদাম এ-দেশে জন্মায় না, খোরাসান থেকে আমদানী করতে হয়। শাসন-কর্তার আসনটি কার্পেট মোড়া বেদীর উপরে। সিপাহসালাররা বসেন তাঁর দক্ষিণে ও বামে, সাধারণ সৈনিকরা পশ্চাতে। সৈনিকদল পর্যবেক্ষণের কাজ তাঁর সাক্ষাতেই হয়ে থাকে। তিনি কতকগুলো ধনুক রাখেন কাছে। কোনো সৈনিক তীরন্দাজের দলে ভর্তি হতে এলে তাকে একটা ধনুক দেওয়া হয় টানতে। ধনুকগুলো দৃঢ়তার তারতম্য হিসাবে পর-পর সাজানো থাকে। ধনুক ব্যবহারে সৈনিক যে পরিমাণ শক্তির পরিচয় দেয় তার প্রাপ্য বেতন সেই অনুপাতে নির্ধারিত হয়। কেউ ঘোড়সওয়ার সৈনিক হতে এলে তাকে দেওয়া হয় একটা ঘোড়া। ঘোড়াটা কদমে চলতে থাকবে, সে অবস্থায় সৈনিক তার হাতের বর্শা দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করবে। তা'ছাড়া নিচু দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একটা আংটা, ঘোড়সওয়ার চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে চেষ্টা করে বর্শার সাহায্যে আংটাটা তুলে নিতে। চেষ্টা যার সফল হয় সেই সবচেয়ে ভাল ঘোড়সওয়ার। যারা ঘোড়সওয়ার তীরন্দাজ হতে চায় তাদের জন্য মাটিতে ফেলে রাখা হয় একটা বল। চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে বলটাকে বিদ্ধ করতে হবে তীর দিয়ে। এ ব্যাপারে যে যতটুকু সফলকাম হবে তার বেতন সে অনুপাতে কম-বেশি হবে।

আমাদের মূলতান পৌঁছবার ছ'মাস পরে একদিন বাদশার একজন কর্মচারী এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে এলেন পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁরা এলেন আমাদের দিল্লী যাত্রার আয়োজন করতে। প্রথমেই তাঁরা আমার ভারত আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভারতের সুলতানকে সম্মান করে বলা হতো খোন্দআলম বা দুনিয়ার প্রভু। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, খোন্দআলমের খেদমতে এসেছি তাঁর অধীনে চাকুরী করব বলে। সুলতানের হুকুম ছিল, ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে না এলে খোরসানের কাউকে ভারতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। আমার উত্তর শুনে তারা একজন কাজী এবং একজন দলিল লেখককে ডাকলেন। আমার ও আমার সঙ্গীদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাক্ষী-সাবুদ রেখে রীতিমত একটা দলিল তৈরি হল। সঙ্গীদের কেউ-কেউ অবশ্য স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাবে অসম্মত হল। অতঃপর আমাদের মধ্যে শুরু হল রাজধানী দিল্লী যাত্রার আঞ্জাম। মূলতান থেকে দিল্লী বিভিন্ন জনপদের মধ্যে দিয়ে একটানা চল্লিশ দিনের পথ। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন তিরমিজের কাজী খোদাওন্দজাদা। তিনি রওয়ানা হয়েছেন স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে। মূলতানের চল্লিশ জন বাবুর্চি এসেছে তাঁর সঙ্গে। প্রতি রাত্রে তারা আহার্য প্রভৃতি তৈরি করে।

মূলতান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা এসে পৌঁছি আবুহার নামক শহরে। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে ঐটিই আমাদের প্রথম শহর। এ-শহরের পরেই এক দিনের পথব্যাপী বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। সমতল ভূমির শেষপ্রান্তে দূরধিগম্য পর্বতশ্রেণী-হিন্দু বিধর্মীদের বাস স্থান। তাদের অনেক মুসলমান শাসনাধীনে রায়ত। শাসনকর্তার নিযুক্ত একজন মুসলিম সর্দারের অধীনস্থ গ্রামে তারা বাস করে। আর অবশিষ্ট সবাই বিদ্রোহী এবং যোদ্ধা। পার্বত্য দূর্গে বসবাস করে এবং লুট তরাজের জন্যে দল বেঁধে বেরিয়ে আসে। এ-পথে আসতেই আমাদের সঙ্গে একদল দস্যুর সাক্ষাৎ হয়। ভারতবর্ষে আমার সঙ্গে দস্যুর সংঘর্ষ ঐ প্রথম। আমাদের প্রধান দলটি আবুহার ত্যাগ করে এসেছিল খুব ভোরে। আমি আমার ক্ষুদ্র দলবল নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম মধ্যাহ্ন অবধি। আরবী, পারশী ও তুর্কী মিলিয়ে আমাদের দলে ছিলাম মোট বাইশ জন ঘোড়-সওয়ার। সমতল ভূমিতে পৌঁছতেই আশিজন বিধর্মী এসে আমাদের আক্রমন করে। তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন ছিল ঘোড়-সওয়ার। আমার সঙ্গীরা সবাই ছিল সাহসী এবং সুদক্ষ। যুদ্ধে বিপক্ষের একজন ঘোড়-সওয়ার এবং বার জন পদাতিক মারা গেল। শত্রু পক্ষের একটি তীরে আমি এবং অপর একটি তীরে আমার ঘোড়াটি আহত হয়ে পড়ল। খোদা আমাকে রক্ষা করলেন, —তাদের তীরগুলো মোটেই দ্রুতগামী ছিল না। আমাদের দলের আরও একজনের ঘোড়া আহত হয়েছিল। শত্রুদের যে-ঘোড়াটা আমরা ধরেছিলাম সেটাই তাকে দেওয়া হলো। আহত ঘোড়াটা হত্যা করে আমাদের দলের তুর্কীদের দেওয়া হলো খেতে। মৃত বিধর্মীদের মাথাগুলো কেটে নিয়ে আমরা আবুবকরের প্রাসাদে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। মাথাগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হলো।

দু'দিন পরে আমরা হাজির হলাম আজুদাহান (পাক্‌পত্তন) শহরে। ছোট এই শহরটির মালিক ধর্মপ্রাণ শেখ ফরিদউদ্দীন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি তাঁবুতে

ফিরছিলাম, দেখতে পেলাম আশেপাশের লোকজন সবাই ছুটাছুটি করে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দলেরও অনেকে তার মধ্যে আছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, একজন হিন্দু কাফেরের মৃতদেহ দাহ করবার আয়োজন হয়েছে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকেও সেই সঙ্গে দাহ করা হবে। দাহকার্যের পর আমার সঙ্গীরা এসে বলল, এই হিন্দু নারী শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মৃতদেহটি আলিঙ্গন করেই ছিল।

এ-ঘটনার পর প্রায়ই দেখেছি মূল্যবান পোষাক ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে চলেছে ঘোড়-সাওয়ার হিন্দুনারী। তার পশ্চাতে থাকে অনুসারী দল; সম্মুখে বাজ্‌তে থাকে দামামা ও জয়ঢাক। তার সঙ্গে থাকে ব্রাহ্মণগণ। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ। সুলতানের রাজত্বে হিন্দুদের সতীদাহের জন্য সুলতানের অনুমতি চাইতে হয় এবং চাইলেই তাঁর অনুমতি পাওয়া যায়। স্বামী মৃত দেহের সঙ্গে স্ত্রীকে দাহ করা হিন্দুদের পক্ষে একটি প্রশংসনীয় কাজ; কিন্তু অবশ্য কর্তব্য নয়। কোনো পরিবারে সতীদাহ হলেই সে পরিবারের সম্মান বেড়ে যায় এবং সতীত্বেরও প্রশংসা হয়। কোনো বিধবা সহমরণে সম্মত না-হলে তাকে মোটা কাপড় পরাতে হয়, এবং আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে থেকেই বিষাদময় জীবন যাপন করতে হয়; কিন্তু কেউ সহমরণে বাধ্য করতে পারে না।

একবার আমজরি (ধর এর নিকটবর্তী আমঝেরা) শহরে আমি তিনজন বিধবাকে দেখেছিলাম। তাঁদের তিনজনেরই স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং তারা সহমরণে স্বীকৃত হয়েছে। মূল্যবান পোষাক সজ্জিত হয়ে এবং গন্ধদ্রব্য মেখে তারা এক একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে। প্রতিজনের ডান হাতে একটি নারকেল, বাঁ হাতে মুখ দেখার আর্শি। তাদের ঘিরে চলেছে ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনের দল। আগে আগে চলেছে জয়ঢাক, দামামা আর শিক্ষা বাদকের দল। সঙ্গের বিধর্মীরা প্রত্যেকেই বিধবাদের মারফত স্ব-স্ব মৃত পিতা, মাতা বা বন্ধুর কাছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের অনুরোধ জানাচ্ছে। বিধবারাও মৃদু হেসে সম্মতি জানাচ্ছে। সতীদাহ কিভাবে করা হয় দেখবার জন্যে সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমি তাদের অনুসরণ করলাম। তিন মাইল পথ গিয়ে আমরা এসে পৌছলাম একটা অন্ধকার জায়গায়। জায়গাটা সেঁতসেঁতে এবং ঝাক্‌ড়াগাছে পূর্ণ। তার মধ্যে রয়েছে চারিটি বেদী। বেদীর ওপর একটি করে পাথরের মূর্তি। বেদীগুলোর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। গাছের নিবিড় ছায়ায় জলাশয়টি এ-ভাবে ঢেকে আছে যে, সূর্যের আলো সেখানে কখনও প্রবেশ করতে পারে না। জায়গাটা মনে হয় নরকের মত—খোদা আমাদের সে নরক থেকে রক্ষা করুন।

সেখানে গিয়েই জলাশয়ে নেমে বিধবারা তাদের কাপড় জামা ও গহনা খুলে ফেল্‌ল। সে-গুলো সবই ভিক্ষাস্বরূপ দান করা হলো। তারপর তাদের প্রত্যেককে একখানা করে মোটা কাপড় দেওয়া হলো। তারই এক অংশ কোমরে জড়িয়ে বাকি অংশে তারা মাথা কাঁধ ঢাকলো। জলাশয়ের কাছে নিচু জায়গায় আগুন জ্বালা হয়েছে। আগুনের শিখা যাতে বেড়ে ওঠে সে-জন্য ঢেলে দেওয়া হয়েছে তিলের তেল। জনপনর দাঁড়িয়ে আছে সরু কাঠ নিয়ে আর জনদশেক রয়েছে কাঠের মোটা-মোটা টুকরো নিয়ে। জয়ঢাক ও দামামা বাজনাওয়ালারা বিধবাদের আসবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

আছে। আগুন দেখে যাতে বিধবারা ভয় না পায় সে-জন্যে কয়েকজনে কম্বল ধরে আগুন ঢেকে রেখেছে। বিধবাদের একজনকে দেখলাম, এসে তাদের হাত থেকে কম্বলটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর বলে উঠল, আগুন দেখিয়ে আমাকে ভয় পাওয়াবে? এ যে আগুন তা আমি জানি। আমাকে ছেড়ে দাও। এই বলে সে জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে আগুনকে নমস্কার করে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে জয়ঢাক, দামামা আর সিঙ্গা বেজে উঠল। প্রথমে সরু কাঠগুলো নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর বিধবা নারী যাতে না নড়তে পারে সেজন্যে মোটা কাঠগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। সবাই ভীষণ সোরগোল করে উঠল। আমার সঙ্গীরা যদি তাড়াতাড়ি করে পানি এনে আমার মুখে ছিটিয়ে না দিতো তাহলে আমি ঘোড়া থেকে পড়েই যেতাম। এরপরই সেখান থেকে চলে এলাম।

গঙ্গানদীতে ডুবে আত্মহুতি দেবার প্রথাও ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে। গঙ্গানদীতে হিন্দুরা তীর্থস্নানে যায় এবং চিতাভস্ম নিক্ষেপ করে। তারা বলে থাকে, গঙ্গা স্বর্গের নদী। গঙ্গায় ডুবে যারা আত্মাহুতি দিতে যায় তারা বলে যে, কোনো পার্থিব কারণে তারা ডুবে মরছে না, ডুবে মরছে কুশাই (গোঁশাই) এর সান্নিধ্য লাভের জন্যে। তাদের ভাষায় গোঁশাই ঈশ্বরের নাম। গঙ্গায় ডুবে যারা মরে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে দাহ করা হয় এবং দেহাবশেষ পুনরায় গঙ্গায়ই নিক্ষেপ করা হয়।

এবার আমাদের পূর্বের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক। আজুদাহান থেকে রওয়ানা হয়ে চার দিন চলার পর আমরা এসে হাজির হলাম সারাসাতি (সারসুতি বা সিরসা) শহরে। এখানে উৎকৃষ্ট ধরণের এক প্রকার চাউল পাওয়া যায়। সে চাউল রাজধানী দিল্লীতে রপ্তানী হয়।এ-শহরের রাজস্বের আয় খুব বেশী; কিন্তু আয়ের সঠিক পরিমাণ কত তা আমার স্মরণ নেই। সেখান থেকে আমরা যাই হান্‌সিতে। হান্‌সি সুন্দরভাবে তৈরী জনবহুল একটি চমৎকার শহর। শহরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দু'দিন পরে হান্‌সি থেকে আমরা এসে হাজির হলাম মাসুদাবাদে। মাসুদাবাদ দিল্লী থেকে দশ দিনের পথ। সেখানে আমরা তিন দিন কাটাই। সুলতান সে সময় রাজধানীর বাইরে কনৌজে ছিলেন। কনৌজ দিল্লী থেকে দশ দিনের পথ। সুলতানের উজির এবং বেগমমাতা তখন রাজধানীতে হাজির ছিলেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে উজির কয়েকজন উপযুক্ত কর্মচারী পাঠিয়ে ছিলেন। দূতের সাহায্যে পত্র দিয়ে সুলতানকে তিনি আমাদের আগমন সংবাদও পাঠিয়েছিলেন। মাসুদাবাদে আমরা যে তিনদিন কাটালাম তারই মধ্যে সুলতানের জবাব এসে হাজির হল। কাজী, চিকিৎসক, শেখ আর আমীরদের কয়েকজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অতঃপর আমরা মাসুদাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে পালাম নামক একটি গ্রামের কাছে এসে বিশ্রাম করলাম। পরের দিন পৌঁছলাম দিল্লীতে।

ভারতের প্রধান নগর দিল্লী যেমনি বিশাল, তেমনি ঐশ্বর্যশালী। শক্তি ও সৌন্দর্যের চমৎকার সমন্বয়। দিল্লী নগর যেরূপ প্রাচীরে ঘেরা, পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। শুধু ভারতেরই নয়—সমগ্র মুসলিম প্রাচ্যের বৃহত্তম নগর দিল্লী।

দিল্লী নগর আশেপাশের চারটি শহর নিয়ে গঠিত। প্রথমটি হিন্দু বিধর্মীদের তৈরী 'খাঁটি দিল্লী। এ-শহরটি মুসলমান দখলে আসে ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে । দ্বিতীয় শহরটির নাম সিরি। সিরি খলিফার বাসস্থানরূপেও পরিচিত ছিল। আব্বাসীয় বংশের খলিফা মুস্তানসিরের পৌত্র গিয়াস উদ্দিনকে সুলতান এ-শহরটি দান করেছিলেন। তৃতীয় শহরটির নাম তোগলকাবাদ। বর্তমান সুলতানের পিতা সুলতান তোগলক এ-শহরের নির্মাণকর্তা। শহরটি নির্মাণের একটি বিশেষ কারণ আছে। পূর্ববর্তী কোন এক সুলতান মোহাম্মদ তোগলককে একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন ঠিক এ-জায়গাটিতে একটি শহর তৈরী করতে। সুলতান তোগলককে সেদিন পরিহাস করে বলেছিলেন, তুমি যখন সুলতান হবে তখন এখানে শহর তৈরী করো। খোদার ইচ্ছায় কালক্রমে তিনি সুলতান হলেন এবং এখানে সত্যই একটি শহর নির্মাণ করে নিজের নামে তার নাম করণ করলেন। চতুর্থ শহরটির নাম জাহানপানা। বর্তমান সুলতানের বাসস্থানরূপে এটি পৃথক করা। তিনিই এ-শহরটি নির্মাণ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি প্রাচীর দিয়ে তিনি শহর চারিটি একত্র ঘিরে ফেলবেন। এ-প্রাচীরের কিছুটা তৈরী হলে তার বিপুল ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করে তিনি সে কাজ ত্যাগ করেন।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ মসজিদটি বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তৈরী। মসজিদের দেয়াল, ছাদ ও মেঝে সাদা মার্বেলের তৈরী। সুন্দরভাবে চৌকোণ ক'রে কাটা পাথরগুলো সীসা দিয়ে আঁটা । মসজিদের কোথাও কাঠ ব্যবহার করা হয়নি। এবং তেরটি গুম্বুজ সবই পাথরের তৈরী। মিম্বরটিও পাথরের তৈরী। মসজিদের মধ্যস্থানে বিস্ময়কর একটি মিনার। মিনারটি কি ধাতুর তৈরী কেউ তা বলতে পারে না। এখানকার একজন বিদ্বান ব্যক্তি বলেছেন মসজিদের মিনারটি 'হাফ্‌ত কুশ' বা সপ্ত ধাতুর মিশ্রণে প্রস্তুত। মিনারের এক আঙ্গুল চওড়া একটি অংশ পালিশ করা হয়েছে। সে অংশটি বেশ চক্‌চকে। লোহা এর উপর কোন দাগ কাটে না। মিনারটি ত্রিশ হাত লম্বা। পুব দিকের প্রবেশ দ্বারে পাথরের উপরে দু'টি পিতলের মূর্তি ফেলে রাখা হয়েছে। যে-কোন মস্‌জিদে ঢুক্‌তে বা বেরিয়ে যেতে মূর্তিগুলোর উপর পা দিয়ে যায়। পূর্বে এ স্থানটিতে একটি দেব মন্দির ছিল। পরে দিল্লী মুসলমান অধিকারে এলে এটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়। মসজিদের উত্তরাংশে মিনার। এর সঙ্গে তুলনা হয় এমন একটি মিনারও ইসলাম-জগতে আর নেই। সুউচ্চ এ-মিনারটি লাল পাথরের তৈরী এবং কারুকার্যময় লিপি-শোভিত। মিনারের মাথার গোলকটি উজ্জ্বল শ্বেত-পাথরের তৈরী এবং উপরের ছোট গোলকগুলো স্বর্ণ-নির্মিত। উপরে উঠবার সিঁড়িটি এত প্রশস্ত যে, একটি হাতী উপরে উঠে যেতে পারে। একজন বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখে শুনেছি, পাথর নিয়ে একটি হাতীকে তিনি ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে দেখেছেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন মসজিদের পশ্চিমাংশে এর চেয়েও উচ্চ একটি মিনার প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার এক তৃতীয়াংশ তৈরী হতেই তিনি এন্তেকাল করেন। এ-মিনারটি পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বস্তু। এ-মিনারের সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি তিনটি হাতী উপরে উঠে যেতে পারে। এ-অসমাপ্ত মিনারের এক-তৃতীয়াংশই উচ্চতায় অপর মিনারটির সমান। কিন্তু অসমাপ্ত মিনারটি প্রশস্ত বলে দেখতে এতটা উচ্চ মনে হয় না।

দিল্লীর বাইরে প্রকাণ্ড একটি জলাশয়ের নামকরণ হয়েছে সুলতান লালমিশের নামে। দিল্লীর অধিবাসীরা এখান থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে। বৃষ্টির জলে পূর্ণ এ-জলাশয়টি দু'মাইল লম্বা এবং এক মাইল চওড়া। এর মধ্যস্থলে চৌকোণ পাথরে তৈরী দু'তলা একটি অট্টালিকা। জলাশয়টি যখন পরিপূর্ণ থাকে তখন শুধু নৌকাযোগে এ-অট্টালিকায় যাওয়া যায়, অন্য সময় সর্ব-সাধারণ নৌকার সাহায্যে ছাড়াই যেতে পারে। এর ভেতর একটি মসজিদও আছে। প্রায় সর্বদাই মসজিদটি মুছল্লিদের দ্বারা পূর্ণ থাকে। জলাশয়ের পাড়গুলো শুকিয়ে গেলে এখানে ইক্ষু, শশা, তরমুজ ও লাউ প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। তরমুজ ও লাউগুলো আকারে ছোট কিন্তু খেতে মিষ্টি। দিল্লীও খলিফার আবাসস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে বৃহত্তর আরও একটি জলাশয় আছে। এর চারি-পার্শ্বস্থ চল্লিশটি অট্টালিকায় গায়ক ও বাদ্যকরগণ বাস করে।

দিল্লীর জ্ঞানী ও ধার্মিক অধিবাসীদের মধ্যে এমাম কামালউদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ও নম্র। দিল্লী নগরের বাইরের এক গুহায় তিনি বাস করতেন এবং গুহাবাসী বলে পরিচিত ছিলেন। আমার একজন ক্রীতদাস বালক একবার পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর তাকে আমি দেখতে পাই একজন তুর্কীর গৃহে। আমি বালকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি। কিন্তু শেখ কামালউদ্দিন আমাকে সে কাজে নিবৃত্ত করেন। তিনি বলেছিলেন বালকটি তোমার পক্ষে ভাল হবে না, তাকে না আনাই উচিত। তুর্কী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে রফা করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আমাকে একশত দিনার দিয়ে বালকটিকে নিজের কাছে রেখে দেন। এর ছয় মাস পরে একদিন ঐ বালক তার মনিবকে হত্যা করে। সুলতানের বিচারে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় তুর্কীর পুত্রদের হাতে। অবশেষে তারাও বালকটিকে হত্যা করে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। শেখের এ অলৌকিক শক্তি দেখে আমি তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং পার্থিব জগৎ ছেড়ে নিজের যা-কিছু ছিল সব গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দেই। কিছু দিন আমি তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলাম; তাঁকে দেখতাম তিনি দশ দিন রোজা রাখেন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় দাড়িয়ে এবাদৎ করেন। এমাম কামালউদ্দিনের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর পর সুলতান আমাকে ডেকে পাঠান এবং তার ফলে আমি পুনরায় পার্থিব জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি।

সমস্ত মানুষের মধ্যে এই সুলতানের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল একাধারে রক্তপাত করা এবং দান ধ্যান করা। তার দ্বারে হয়ত দেখা যেত একজন দরিদ্রকে বিত্তশালী হতে অথবা একজন জীবন্ত লোককে প্রাণদান করতে। এর কোন ব্যতিক্রম প্রায়ই হতো না। তার দানশীলতা ও সাহস এবং অপরাধীদের প্রতি অত্যাচার ও নির্মম ব্যবহারের অনেক গল্প পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা হলেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে নম্র এবং সাম্য ও সুবিচার দেখতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর দরবারে ধর্মীয় সব অনুষ্ঠানগুলোই কঠোরভাবে পালন করা হতো। নামাজ আদায়ের জন্যও তিনি কঠোর ব্যবস্থা করতেন এবং নামাজে অবহেলা দেখালে কঠিন শাস্তি বিধান করতেন।

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তার দানশীলতা । এ-সম্বন্ধে এমন কতকগুলো গল্প আমি বলব, যার চমৎকারিত্ব অপর যে-কোন গল্পকে ছাড়িয়ে যায়। আমি খোদা, ফেরেস্তাগণ এবং পয়গম্বরকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি,—সুলতানের অসাধারণ দয়া-দাক্ষিণ্যের সে সব গল্প বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি জানি, যে-সব কাহিনীর বর্ণনা আমি দেব, তার কিছুটা অনেকেরই কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কেউ কেউ অসম্ভব বলেও মনে করবেন। কিন্তু-যা কিছু আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যার ভেতরে আমি নিজেও অংশতঃ জড়িত ছিলাম, তার সম্বন্ধে সত্য কথা না বলে উপায় কি?

দিল্লীতে সুলতান মাহমুদের যে প্রাসাদ তা' দার-সারা নামে পরিচিত। দার-সারার দরওয়াজা ছিল অনেকগুলি। প্রথম দরওয়াজায় থাকত দ্বাররক্ষীর দল, তার একটু দূরে জয়ঢাক ও শানাই বাদকেরা। এদের কাজ হল যখন কোন আমীর ওমরাহ বা বিখ্যাত কোন ব্যক্তি দরবারে আসেন তখন নিজের নিজের বাজানো এবং আগন্তকের নাম ঘোষণা করা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরওয়াজায় ঠিক একই ব্যবস্থা। প্রথম দরওয়াজার বাইরে আছে কয়েকটি বেদী। বেদীর উপরে মোতায়েন থাকে একদল জল্লাদ, তাদের ভিতর নিয়ম হল, বাদশাহ্ কারও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে দরবার-গৃহের সামনে। সেখানেই তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। প্রাণদণ্ডের পরে লাশটি সেখানেই তিনরাত্রি ফেলে রাখা হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রকাণ্ড বেদীর উপরে বসে প্রদান নকিব। নকিবের হাতে সোনার রাজদণ্ড। মাথায় স্বর্ণও মণিমুক্তা খচিত পাগড়ী । পাগড়ীর উপরে ময়ুরের পালক। দ্বিতীয় দরওয়াজা দিয়ে এগিয়ে গেলেই সুবিস্তৃত দরবার-গৃহ । দর্শকদের বসবার নির্দিষ্ট স্থান।

তৃতীয় দরওয়াজায় যে বেদী আছে তাতে বসে লেখক বা মুন্সীগণ। সুলতানের অনুমতি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ যাতে এ-দরওয়াজা দিয়ে ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা মুন্সীদের একটি প্রধান কাজ। অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কর্মচারীদের কে কে আসবে তারও নির্দেশ সুলতানই দেন। এই দরওয়াজার কেউ এলেই মুন্সীরা তৎক্ষণাৎ তার পরিচয় এবং আগমনের সময় লিখে রাখে। সাধারণতঃ মাগরেবের নামাজের পরে সুলতান এ-গুলো দেখেন। মুন্সীদের আরেকটি কাজ হল, প্রাসাদে যারা অনুপস্থিত থাকে তাদের হিসেব রাখা। সুলতানের অনুমতি নিয়ে অথবা বিনা অনুমতিতে প্রাসাদের কেউ যদি তিন দিন বা তার বেশী অনুপস্থিত থাকে তবে পুনরায় অনুমতি লাভের আগে প্রাসাদে ঢুকতে পায় না। যদি কেউ অসুস্থতা বা অন্য কোন অজুহাত দেখায় তবু নিজের ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসতে হয় সুলতানের জন্য।

তৃতীয় দরওয়াজা পার হয়েই আরেকটি প্রকাণ্ড দরবার-গৃহ । এটির নাম হাজার উস্তান বা হাজার স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির সবই কাঠের তৈরী। স্তম্ভের মাথায় কাঠের কারুকার্য খচিত সুদৃশ্য ছাদ। ছাদের নীচেই বসে সুলতানের আ'ম দরবার।

সাধারণ নিয়মানুযায়ী সুলতানের দরবার বসে অপরাহ্নে; কিন্তু অনেক সময় সকালের দিকেও তিনি দরবার ডাকেন। একটি ছোট বেদীর উপরে সাদা কার্পেট বিছানো, তারই উপর সুলতানের মসনদ। পায়ের উপর পা রেখে তিনি বসেন। তার পাশে দুটি আর পেছনে একটি প্রকাণ্ড তাকিয়া। সুলতান আসন গ্রহণ করলে উজির দাড়ান তার সামনে, তারপর পদানুসারে অন্যান্য কর্মচারীরা। তখন নকিবরা উচ্চস্বরে 'বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করে। প্রায় শতেক শাস্ত্রী এসে দাড়ায় সুলতানের ডাইনে আর শতেক দাড়ায় বামে। তাদের কারো হাতে থাকে ঢাল, তলোয়ার. কারো হাতে তীর -ধনুক । অন্যান্য কর্মীরাও ডাইনে ও বামে সারি বেধে দাড়ায়। তারপর রাজকীয় সাজে সাজিয়ে সেখানে আনা হয় ষাটটি ঘোড়া। ঘোড়াগুলির অর্ধেক দাড় করানো হয় ডাইনে অর্ধেক বামে। তারপরে আনা হয় পঞ্চাশটি হাতী । হাতীগুলির পিঠে রেশমী বস্ত্রের আচ্ছাদন। দাঁত মোড়ানো হয়েছে লোহা দিয়ে। হাতীর এই লোহা বাঁধানো দাঁত দিয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের হত্যা করা হয়। প্রতিটি হাতীর উপর একজন করে মাহুত। মাহুতের হাতে ছোট কুঠার জাতীয় একটি লোহার অস্ত্র। হাতীর পিঠে প্রকাণ্ড সিন্দুকের মত একটি বস্তু। এর ভিতর কমবেশী কুড়িজন যোদ্ধা অনায়াসে থাকতে পারে। এই হাতীগুলিকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মাথা নত করে সুলতানকে যথারীতি কুর্ণিশ করতে। হাতীগুলি যখন একযোগে সুলতানকে কুর্ণিশ করে, নকিব, নায়েব ও দেওয়ান প্রভৃতি কর্মচারীরা তখন পুনরায় উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ্' বলে উঠে। এরপর একে একে লোকজন এসে যখন নিজ-নিজ নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ায় নকিবরা তখনও 'বিস্‌বিল্লাহ্' বলে। আগন্তুকের পদ-মর্যাদানুসারে বিসমিল্লাহ্ বলার সুরের উচ্চতা বাড়ানো বা কমানো হয়। বিধর্মী এসে যদি সুলতানকে কুর্ণিশ জানায় তাহলে নকিবেরা বিসমিল্লাহর পরিবর্তে বলে ওঠে খোদা তোমাকে সুপথে চালিত করুন।

'যদি সুলতানের জন্য কোন উপঢৌকন নিয়ে কেউ দরওয়াজায় এসে হাজির হয়, নকিবরা তখন সুলতানকে গিয়ে সে খবর পৌছায়। সুলতানের কাছে পৌছতে তিন জায়গায় তিনবার তাদের কুর্ণিশ জানাতে হয়। আগন্তুককে নিয়ে যাবার হুকুম পেলে প্রথমে একজন পরিচারকের হাতে উপঢৌকনের বস্তু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিচারক সেগুলি নিয়ে সুলতানের কাছে দাড়ায়। এরপর সুলতান আগন্তুককে কাছে ডাকেন। আগন্তুককেও যেতে-যেতে তিনবার কুর্ণিশ জানাতে হয়। তাকে সর্বশেষ আরেকবার কুর্ণিশ করতে হয় সুলতানের কাছে পৌছে। সুলতান তখন অত্যন্ত আদর সহকারেই আগন্তুককে সম্বোধন করেন ও যথারীতি কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। আগন্তুক তেমন উপযুক্ত পাত্র হলে সুলতান তার সঙ্গে মোসাহেফা করে বা আলিঙ্গন দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। পরে উপঢৌকনের জিনিষগুলি হাত দিয়ে নেড়ে দেখে নিজের সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেন; এবং উপঢৌকন দাতাকে উৎসাহিত করেন। সুলতান আগন্তুকদের অনেক সময় সম্মান-সূচক পোষাক দান করেন এবং সেই সঙ্গে কিছু নগদ অর্থও দিয়ে থাকেন।

[47] ইবনে বতুতার সফরনামা-১১০

সুলতান যখন কোন দেশভ্রমনের পরে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তার হাতীগুলিকে সাজানো হয় সুন্দর করে। ষোলটি হাতীর উপরে রঙীন রেশমী ষোলটি ছাতা। ছাতাগুলি সোনা ও জহরতের কারুকার্য খচিত থাকে। পথের স্থানে স্থানে তৈরী করা হয় কয়েকতলা উঁচু কাঠের মঞ্চ। মঞ্চগুলিও মণ্ডিত করা হয় রঙীন রেশমী বস্ত্র দিয়ে। মঞ্চের প্রত্যেক তলায় নৃত্যরত সুসজ্জিত নর্তকীর দল। প্রত্যেকটি মঞ্চের মধ্যস্থানে চামড়ার তৈরী জলাধার। তার ভিতর রাখা আছে সুপেয় সরবৎ। দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সবাইকে সরবৎ পান করতে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিতরণ করা হয় পান সুপারী । দুই সারি মঞ্চের মধ্যবর্তী পথেও কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। সুলতানের অশ্ব তার উপর দিয়েই যায়। পথের দুপাশের বাড়ীর দেয়ালগুলিতেও রঙীন কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নগরের প্রবেশদ্বার থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদ পর্যন্ত এভাবে সাজানো হয়। সুলতানের গোলামদের থেকে বাছাই করা একদল পদাতিক মিছিলের সম্মুখভাগে চলতে থাকে। তাদের সংখ্যা হবে কম করেও কয়েক হাজার। মিছিলের পেছনে থাকে জনসাধারণ এবং সৈন্যদল।

একবার সুলতানের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সময় দেখেছিলাম হাতীর পিঠে রাখা হয়েছে তিন চারিটি গুলতি (Catapults) । সুলতানের রাজধানীতে পদার্পণের সময় থেকে শুরু করে প্রাসাদের প্রবেশ পর্যন্ত সর্বক্ষণ সেই গুলতির সাহায্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নিক্ষেপে করা হচ্ছে দর্শক জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে।

এখন আমি সুলতানের দানশীলতা ও উদারতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

শেহাবউদ্দিন ছিলেন কাজরুণের একজন প্রসিদ্ধ সওদাগর। সে সময়ে আল-কাজীরুণী নামে ভারতেও একজন খ্যাতনামা সওদাগর ছিলেন। দুজনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আল-কাজরুণীর দাওয়াত পেয়ে একবার শেহাবউদ্দিন এলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সুলতানের জন্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। দুইবন্ধু উপহারের জিনিসপত্র নিয়ে সুলতানের কাছে আসবার পথে একদল বিধর্মীর দ্বারা আক্রান্ত হন। বিধর্মীরা আল-কাজারুণীকে পথেই হত্যা করে এবং সমস্ত মালপত্র অপহরণ করে। সওদাগর শেহাবউদ্দিন কোন রকমে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। তাই লুণ্ঠন ও নরহত্যার সংবাদ কানে যেতেই সুলতান শেহাবউদ্দিনকে ত্রিশ হাজার দিনার দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দিতে হুকুম করলেন। কিন্তু সওদাগর শেহাবউদ্দিন তাতে রাজী হলেন না। তিনি বলে পাঠালেন আমি এজন্য আসিনি। আমি এসেছিলাম মহামান্য সুলতানকে দর্শনের বাসনা নিয়ে। শেহাবউদ্দিনের কথা পুনরায় সুলতানকে লিখে জানানো হলো। সুলতান পরম সন্তুষ্ট হয়ে হুকুম করলেন শেহাবউদ্দিনকে সসম্মানে দিল্লীতে নিয়ে আসতে । শেহাবউদ্দিন দিল্লী পৌছে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি তাঁকে মূল্যবান উপহার দিয়ে সমাদর জানালেন। তারপরে কয়েক দিন শেহাবউদ্দিনকে অনুপস্থিত দেখে সুলতান তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শুনা গেল তিনি অসুস্থ। সুলতান একথা শুনেই তার একজন পারিষদকে হুকুম করলেন খাজাঞ্চীখানা থেকে এক লক্ষ স্বর্ণ টংগা (তঙ্কা) বের করে শেহাবউদ্দিনকে দিতে। (এক টংগা মরক্কোর আড়াই দিনারের

সমান) এ টাকা দিয়ে ভারতীয় যে কোন পণ্য কিনে দেশে নিয়ে যাবার স্বাধীনতাও শেহাবউদ্দিনকে দেওয়া হলো। সুলতান হুকুম দিলেন শেহাবউদ্দিনের সওদা কিনা শেষ হবার আগে সে সওদা আর কেউ যেনো না কিনে। তাছাড়া সম্পূর্ণ লোক-লস্কর ও সাজসরঞ্জামসহ তিনখানা জাহাজও সুলতান মঞ্জুর করলেন শেহাবউদ্দিনকে পৌছে দিতে। শেহাবউদ্দিন হরমুজ দ্বীপে গিয়ে প্রকাণ্ড একটি গৃহ নির্মাণ করলেন। আমি পরে এ-গৃহটি দেখেছিলাম এবং শেহাবউদ্দিনকেও দেখেছিলাম সর্বস্বান্ত হয়ে সিরাজের সুলতানের কাছে দান ভিক্ষা করতে। ভারতের ধন-দৌলতের রীতিই ছিল এই। কচিৎ এখান থেকে ধন–দৌলত নিয়ে কেউ স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। যদি কখনও কেউ ধন-দৌলত নিয়ে যায়ও তবে এমন এক বিপদে সে পড়বে যার ফলে অচিরেই তাকে যথাসর্বস্ব খোয়াতে হবে। হরমুজের বাদশাহ ও তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে এক গৃহবিবাদের ফলে শেহাবউদ্দিন সব কিছু ছেড়ে হরমুজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ডাক্তার শামসউদ্দিন ছিলেন একাধারে দার্শনিক এবং স্বভাব কবি। তিনি একবার সুলতানের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা রচনা করলেন। কবিতাটিতে ছিল সাতাশটি স্তবক। সুলতান প্রতিটি স্তবকের জন্য কবিকে এক হাজার রৌপ্য দিনার পারিতোষিক দিলেন। এর আগে এ-ধরণের কাব্যরচনার জন্য কোন সুলতানই এত বেশী টাকা পারিতোষিক দেন নাই। তাঁরা সাধারণতঃ দিয়েছেন একটি কবিতার জন্যে এক হাজার দেহ্‌রাম অর্থাৎ বর্তমান সুলতানের দানের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ। সিরাজে সাজউদ্দিন নামে একজন কাজী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও ধর্মপ্রাণতার খ্যাতি শুনে সুলতান তাঁকে দশ হাজার রৌপ্য দিনার পাঠিয়ে দেন। এ ছাড়া সমরখন্দের নিকটে সাগার্জ নামক এক জায়গায় বোরহানউদ্দিন নামে একজন ধর্মপ্রচারক ও ইমাম ছিলেন। তিনি অর্থব্যয়ের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত উদার। অনেক সময় তিনি নিজের যথাসর্বস্ব ব্যয় করে বসে থাকতেন এবং অপরকে কিছু দেবার প্রয়োজন হলে অনায়াসে ঋণ গ্রহণ করতেন। সুলতান ইমাম বোরহানউদ্দিনের কথা শুনে তাকে চল্লিশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে দিল্লীতে আগমনের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। ইমাম পারিতোষিক গ্রহণ করে নিজের ঋণ পরিশোধ করলেন কিন্তু সুলতানের কাছে এসে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। বলে পাঠালেন, "যে সুলতানের সম্মুখে গিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের দাড়িয়ে থাকতে হয়, আমি সে সুলতানের কাছে যেতে রাজী নই।"

ভারতের একজন আমীর একবার কাজীর দরবারে নালিশ করলেন, সুলতান তাঁর ভাইকে বিনা কারণে হত্যা করেছেন। সুলতান নিরস্ত্র অবস্থায় পদব্রজে গিয়ে কাজীর দরবারে হাজির হলেন এবং যথারীতি কাজীকে অভিবাদন করলেন। সুলতান কাজীকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন দরবারে সুলতানের উপস্থিতিতে দণ্ডায়মান না হতে। কাজেই সুলতান কাজীর সম্মুখে সাধারণ আসামীর মত দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কাজী সুলতানের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন না। তাঁকে মামলায় রায় দিতে হলো সুলতানের বিরুদ্ধে। সুলতান সে রায় বিনাদ্বিধায় মেনে নিলেন এবং রায়ের মর্মানুসারে ফরিয়াদীকে সন্তুষ্ট করে বিদায় করলেন। আরেকবার একজন মুসলমান সুলতানের কাছে টাকা পাবে

বলে নালিশ করলো। কাজী সুলতানের বিরুদ্ধে ডিগ্রি দিলেন এবং সুলতান ডিগ্রির টাকা পরিশোধ করলেন।

একবার ভারতে ও সিন্ধুতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক মণ গমের দাম হলো ছয় দিনার। সুলতান হুকুম দিলেন, আবাল বৃদ্ধ বনিতা বা আমীর ফকির নির্বিশেষে দিল্লীর প্রতিটি অধিবাসীকে ছয় মাসের আহার্য রাজকীয় শস্য-ভাণ্ডার থেকে খুলে দিতে। রাজকর্মচারীরা দিল্লীর অধিবাসীদের নামের তালিকা করে ফেললো। সবাই দলে দলে এসে ছয় মাসের বরাদ্দ আহার্য নিয়ে যেতে লাগলো।

দরিদ্রের প্রতি সুলতানের করুণা, সুবিচার, অসাধারণ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যেসব সদ্গুণের কথা বলেছি, সে সব থাকা সত্বেও তিনি নিষ্ঠুর কম ছিলেন না। এমন কি কথায় কথায় তিনি রক্তপাত করতে কসুর করতেন না। তিনি ছোট বড় সকল রকম অপরাধেরই শাস্তি বিধান করতেন। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি কখনও অপরাধীর পদমর্যাদা বা তার বিদ্যাবত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শাস্তির তারতম্য করতেন না। প্রতিদিন শত শত লোককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, পিঠমোড়া বেঁধে সুলতানের দরবারে আনা হতো এবং তাদের মধ্যে কাউকে প্রাণদণ্ড, কাউকে প্রহার অথবা অমানুষিক ভাবে শারীরিক জ্বালা যন্ত্রণা দেওয়া হতো। তাঁর রীতি ছিল একমাত্র শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন প্রত্যেক কয়েদীকে কয়েদখানা থেকে বের করে দরবার-গৃহে আনা হবে। শুক্রবার দিনটি কয়েদীদের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট। সেদিন তারা কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে এবং কথঞ্চিৎ আরামে থাকতে পারে।

মাসুদ খাঁ নামে সুলতানের একজন বৈপিত্রেয় (Half-brother) ভাই ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের কন্যা। মাসুদ খাঁর মতো সুন্দর সুপুরুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। তিনি বিদ্রোহের আয়োজন করছেন বলে সুলতান একবার সন্দেহ করলেন। তাই মাসুদ খাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। মাসুদ সুলতানের ভয়ে বিশেষ করে তার দেওয়া অকথ্য শারীরিক জ্বালা যন্ত্রণার ভয়ে অপরাধ স্বীকার করলেন। তিনি জানতেন এ ধরনের অপরাধের জন্য কাউকে সন্দেহ করা হলে স্বীকারোক্তি আদায় না করা পর্যন্ত সুলতান যে অসহ্য শারীরিক অত্যাচার করতে হুকুম করেন তা সত্যিই অমানুষিক। সে অত্যাচারের চেয়ে মৃত্যুবরণ করা বরং শ্রেয়। হতভাগ্য মাসুদের স্বীকারোক্তি শুনে সুলতান হুকুম করলেন, বাজারের প্রকাশ্য স্থানে নিয়ে তার মাথা কেটে ফেলতে এবং শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তার মৃতদেহ যথারীতি তিন দিন সেই প্রকাশ্য স্থানে ফেলে রাখতেও তিনি হুকুম দিলেন।

সুলতানের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয় তার ভিতর সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগটি হলো প্রজাদের দিল্লী শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করা। এর কারণ হলো, প্রজারা নাকি সুলতানকে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে চিঠি লিখতো। সেই চিঠি খামে ভরে রাত্রির আঁধারে তারা নিক্ষেপ করতো দরবার-গৃহে। চিঠির উপরে লিখিতভাবে অনুরোধ থাকতো, সুলতান ছাড়া অপর কেউ যেনো সে চিঠি না পড়েন। সুলতান সে সব চিঠি খুলে দেখতেন, তাকে উদ্দেশ্য করে গালাগালি বর্ষণ ছাড়া আর কিছুই তাতে নেই। এর

ফলে সুলতান স্বভাবতঃই নিজকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। অবশেষে ক্রোধান্ধ সুলতান মনস্থ করলেন, দিল্লী শহরকে তিনি শ্মশানে পরিণত করে ছাড়বেন। এ সঙ্কল্পের পরেই তিনি দিল্লীর অধিবাসীদের সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি কিনে ফেললেন এবং দিল্লী ত্যাগ করে তাদের সবাইকে দৌলতাবাদে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ করলেন। তারা দিল্লী ছেড়ে যেতে প্রথমে অস্বীকার করলো। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তিন রাত্রি পার হয়ে যাবার পরে কেউ যেনো দিল্লীতে অবস্থান না করে। অধিকাংশ লোকই দেশত্যাগের এ মর্মান্তিক আদেশ মেনে নিল, কেউ অবশ্য নিজনিজ গৃহে লুকিয়ে রইলো। সুলতান সমস্ত গৃহ-তল্লাসীর হুকুম দিলেন। সুলতানের অনুচরেরা দিল্লীর রাস্তায় দু'জন লোকের দেখা পেল। তাদের একজন বিকলাঙ্গ ও আতুর, অপর জন অন্ধ।

সুলতানের সম্মুখে তাদের হাজির করা হলো। সুলতান তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন তাদের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধানের । সুলতানের হুকুম অনুসারে আতুর লোকটিকে যুদ্ধকালীন পাথর নিক্ষেপের যন্ত্রের সাহায্যে দূরে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। অন্ধ লোকটির প্রতি হুকুম হলো, তার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নেওয়া হবে দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ চল্লিশ দিনের পথ। হতভাগ্য অন্ধের দেহ পথেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, শুধু পা দু'খান গিয়ে পৌছলো দৌলতাবাদ। সুলতানের এ কুকীর্তি দেখে সবাই নিজ নিজ আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী ফেলেই দিল্লী পরিত্যাগ করলো। ফলে দিল্লী একটি পরিত্যক্ত শহরে পরিণত হলো। একজন অতি বিশ্বস্ত লোক আমাকে বলেছেন, এ-ঘটনার পরে একদিন রাত্রে সুলতান গিয়ে প্রাসাদের ছাদের উপর উঠলেন এবং দিল্লী শহরের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোন গৃহে একটি প্রদীপও দেখতে পেলেন না। এমনকি কোথাও সামান্য আগুনের চিহ্ন বা ধূম উঠতেও দেখলেন না। এ দৃশ্য দেখে তিনি বলে উঠলেন "এতদিনে আমার মনে শান্তি এসেছে, আমার রাগ প্রশমিত হয়েছে।" তারপরে তিনি অন্যান্য শহরের বাসিন্দাদের লিখে পাঠান দিল্লী শহরে এসে বসবাস করতে। তার ফলে এই হলো যে, যারা দিল্লীতে এলো তাদের পরিত্যক্ত শহরগুলো তো ধ্বংস হলোই অধিকন্তু দিল্লীও আর আগের মতো জনবহুল নগরীতে পরিণত হলো না। তার কারণ দিল্লী সারা দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ শহর। ঠিক এই অবস্থায় আমরা এসে দিল্লী পৌছলাম। দিল্লী তখন জনবিরল শুন্য শহর।

এবার আমাদের আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা রাজধানীতে কি করে পৌছলাম এবং সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে কি ভাবে আমার ভাগ্য ফিরে এলো তাই এখন বলছি। আমরা দিল্লী যখন পৌছলাম সুলতান তখন রাজধানীর বাইরে ছিলেন। আমরা প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরওয়াজা অতিক্রম করতেই প্রধান নকীব আমাদের নিয়ে হাজির হলেন প্রশস্ত একটি দরবার গৃহে। এখানে উজির আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। তৃতীয় দরওয়াজার পরবর্তী এই বিশাল কক্ষই 'হাজার উসতান' নামে পরিচিত। সেখানে হাজির হতেই উজির আভূমি নত হয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন; আমরাও প্রায় তেমনি ভাবে তাকে প্রত্যাভিবাদন

জানালাম। সুলতানের মসনদের উদ্দেশে নত হয়ে আমরা অঙ্গুলী দ্বারা মাটি স্পর্শ করলাম। আমাদের এ অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পরেই নকীব 'বিছমিল্লাহ্' বলে চীৎকার করে উঠলো এবং আমরা সবাই প্রস্থান করলাম।

অতঃপর সুলতানের মাতার প্রাসাদে গিয়ে আমরা তাঁকে কিছু উপঢৌকন দিলাম এবং আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসগৃহে প্রবেশ করলাম। আমাদের সেই গৃহে আসবাব-পত্র গালিচা, মাদুর, তৈজসপত্র, বিছানা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই মোতায়েন দেখতে পেলাম। ভারতে ব্যবহৃত বিছানা খুবই হালকা। একজন লোকই অনায়াসে তা বহন করতে পারে। সফরে যেতে হলে সবাই তার বিছানা নিয়ে যায় এবং একটি বালক ভৃত্য তা মাথায় বহন করে মনিবের অনুসরণ করে। চারটি কুদানো পায়ার সঙ্গে আড়াআড়ি চার টুকরা কাঠ জুড়ে এবং সেই সঙ্গে রেশমী বা সূতী ফিতা বুনে এ বিছানার সৃষ্টি । এ বিছানায় শুলে নরম অন্য কিছুরই দরকার হয় না। বিছানার সঙ্গে দু'টি তোসকও দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে আছে বালিশ আর বিছানার চাদর। সবই রেশমী। এখানকার রীতি হলো, তোষক বালিশের উপরে সূতী বা রেশমী আবরণী ব্যবহার করা। ময়লা হলে আবরণীটি ধুইয়ে ফেললেই মিটে যায়, বিছানা বরাবর পরিষ্কারই থেকে যায়।

পরদিন ভোরে আমরা গেলাম উজিরকে ছালাম করতে। তিনি আমাকে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রাসহ দু'টি তোড়া উপহার দিলেন। দিয়ে বললেন, "এ যৎ-সামান্য অর্থ দেওয়া হলো আপনার মাথা ধোওয়ার (সম্মানের) জন্য।" এছাড়া আর দিলেন চিক্কণ ছাগ-লোমে তৈরী একটি পোষাক। আমার সঙ্গী ভৃত্য ও গোলামদের একটি তালিকা তৈরী করে তাদের চার পর্যায়ে ভাগ করা হলো। প্রথম পর্যায়ে যারা তারা প্রত্যেক পেলে দুশো দিনার; দ্বিতীয় পর্যায়ে দেড়শো দিনার ; তৃতীয় পর্যায়ে একশো এবং সর্বশেষ বা চতুর্থ পর্যায়ে যারা তারা পেলো পঁয়ষট্টি দিনার। তারা সংখ্যায় ছিল প্রায় চল্লিশ জন। সবাই মিলে তারা মোট পেলো চার হাজার দিনারের বেশী। অতঃপর ঠিক হলো সুলতানের অতিথির বরাদ্দ। আমাদের জন্য বরাদ্দ হলো হাজার পাউণ্ড ভারতীয় ময়দা, হাজার পাউণ্ড গোশ্‌ত সেই সঙ্গে ঘি, চিনি, সুপারী পান কতটা ঠিক আমার স্মরণ নেই। ভারতীয় প্রতি পাউণ্ডের ওজন হলো মরক্কোর বিশ পাউণ্ড বা মিনারের পঁচিশ পাউণ্ডের সমান। পরে সুলতান আমার নামে কয়েকটি গ্রাম লিখে দিয়েছিলেন । তার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পাঁচ হাজার দিনার।

সাওয়াল মাসের ৪ঠা তারিখে (৪ঠা জুন ১৩৩৪খ্রীঃ) সুলতান ফিরে এলেন রাজধানী থেকে সাত মাইল দূরবর্তী তিলবাত দূর্গে। উজির আমাদের হুকুম করলেন সেখানে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা দূর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সুলতানকে উপহার দেবার জন্য ঘোড়া উট, ফলমূল তরবারী প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে দূর্গের প্রবেশ দ্বারে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একে একে দর্শনার্থীদের ভিতরে নিয়ে জরির কাজ করা মূল্যবান পরিচ্ছদ উপহার দেওয়া হলো। আমার পালা যখন এলো আমি ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলাম সুলতান একখানা কেদারায় বসে আছেন। প্রথমে আমি তাকে একজন সুলতান ওমরাহ্ বলে ভুল করেছিলাম। আমি দু'বার তাকে কুর্ণিশ করার পরে সুলতানের

একজন অন্তরঙ্গ ওমরাহ্ বলে উঠলেন "বিছমিল্লাহ্, ইনি মওলানা বদরউদ্দিন ।" এখানে সবাই আমাকে বদরউদ্দিন বলে সম্বোধন করতো। "মওলানা" (আমাদের প্রভু) পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপাধি। আমি সুলতানের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং হাত ধরে রেখেই পার্শীতে বললেন, "আপনার আগমন শুভ হয়েছে। আপনি নিঃসঙ্কোচে এখানে থাকুন। আপনার প্রতি খাতির যত্ন ও আমার অনুগ্রহের কোন অভাব হবে না। বরং সে সবের কথা আপনার মুখে শুনে আপনার দেশবাসীরা আপনার সঙ্গে এসে যোগদান করবেন।" এরপর তিনি আমার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার যথাযথ উত্তর দিলাম। আমাদের এই আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে যত বারই তিনি কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বললেন ততবারই আমি তার হস্তচুম্বন করলাম। এভাবে সাতবার আমি সুলতানের হস্তচুম্বন করলাম। সমস্ত দর্শনেচ্ছুরা পরে একত্রিত হলে সুলতান এক ভোজের আয়োজন করে তাদের আপ্যায়িত করলেন।

অতঃপর সুলতান প্রায়ই তার সামনে বসে আহার করতে আমাদের ডাকতেন। তখন তিনি আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে ভুলতেন না।

তিনি সবাইর জন্য ভাতা নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমার ভাতা বরাদ্দ হলো বছরে বার হাজার দিনার। এছাড়া আগে যে তিনটি গ্রাম লিখে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আরও দু'টি গ্রাম যোগ করে দিলেন।

একদিন উজির এবং সিন্ধুর শাসনকর্তা এসে আমাদের বললেন,"সুলতান বলেছেন, আপনাদের ভেতর উজির, সিপাহ্ সালার, হাকিম, শিক্ষক বা শেখ হবার যোগ্যতা যাঁর আছে সুলতান তাঁকে সে পদে নিয়োজিত করবেন।" উপস্থিত সবাই প্রথমে চুপ করে রইলেন। কারণ, তাঁরা এসেছিলেন কিছু ধনদৌলত লাভ করে' দেশে ফিরে যাবেন এই আশায়। তাদের কেউ নিজ-নিজ বক্তব্য পেশ করার পরে উজির আমাকে আরবীতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বক্তব্য কি?"

আমি বললাম,"ওজারত বা অন্য কোন পদ আমার কাম্য নয়। কাজীগিরি বা শেখগিরি আমার পেশা। পূর্বপুরুষরাও তাই করতেন।"

সুলতান আমার এ জবাবে খুব খুশী হয়েছিলেন। পরে আমাকে প্রাসাদে ডেকে দিল্লীর কাজীর পদে আমাকে বহাল করেন।

সাত

চীন দেশের বাদশাহ্ সুলতানকে মূল্যবান কতকগুলো উপহার পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে একশ ক্রীতদাস ও দাসী, পাঁচশ মখ্‌মল ও রেশমি-কাপড়ের টুক্‌রা, জরির পোষাক এবং অস্ত্রশস্ত্র। এসব পাঠিয়ে কারাজিল (হিমালয়) পাহাড়ের নিকটস্থ একটি মন্দির পূণনির্মাণের অনুমতি চেয়েছেন তিনি সুলতানের কাছে। চীন দেশীয় তীর্থ-যাত্রীদের এ মন্দিরটি সমহল নামক স্থানে অবস্থিত। ভারতের মুসলমান সৈন্যরা এক সময়ে এ-মন্দিরটি আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে ফেলে।[১] চীন সম্রাটের উপহার গ্রহণ করে সুলতান তাঁকে লিখে পাঠালেন, ইসলাম ধর্মের নিয়মানুসারে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। যারা মন্দির নির্মাণের জন্যে বিশেষ ধরণের কর দেয় মুসলিম সাম্রাজ্যে শুধু তাদেরই মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপরে লিখলেন, "আপনিও যদি 'জিজিয়া' কর দিতে সম্মত থাকেন তবে আপনাকে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে। যারা সত্য পথ অনুসরণ করে তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" পত্রের সঙ্গে তিনি পাল্টা উপহারও পাঠালেন। সে উপহার সম্ভার চীন থেকে প্রাপ্ত উপহারের চেয়ে অনেক বেশী। তার ভেতরে প্রধান ছিল একশ ভাল জাতের ঘোড়া, একশ শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস, একশ হিন্দু নর্তকী ও গায়িকা। বারশ বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রখণ্ড, সোনারূপার তৈজস-পত্র, সোনালী কাজকরা পোষাক পরিচ্ছদ, তরবারী, মুক্তার কাজ করা দস্তানা এবং পনের জন খোজা ভৃত্য।

সুলতান আমার সহগামী-দূত হিসাবে নিযুক্ত করলেন জান্‌জানের খ্যাতনামা বিদ্বান আমীর জহিরউদ্দিনকে। উপহার দ্রব্যের হেফাজতের ভার দিলেন কাফুর নামক একজন খোজার উপর। আমাদের জাহাজে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য এক হাজার সৈন্যসহ পাঠালেন আমীর মোহাম্মদকে।

আমাদের সঙ্গে ফিরে চললেন চীনের পনের জন দূত এবং তাদের ভৃত্যগণ, সব মিলে প্রায় শতেক লোক।

সুলতান আদেশ দিলেন, আমরা তাঁর রাজ্যের বাইরে গিয়ে-না-পৌঁছা অবধি-সরকার থেকেই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করা হবে। হিজরী ৭৪৩ সনের ১৭ই সফর

মোতাবেক ১৩৪২ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জুলাই আমাদের যাত্রা শুরু হল। যাত্রার জন্যে বিশেষ করে এ-দিনটি নির্দিষ্ট করার একটি কারণ ছিল। এখানকার লোকেরা প্রতিমাসের ২রা, ৭ই, ১২ই, ১৭ই, ২২শে এবং ২৭শে তারিখকে বিদেশ-যাত্রার জন্যে শুভদিন মনে করে।

প্রথম দিন যাত্রা করে আমরা দিল্লীর সাত মাইল দূরে তিলব্যাতে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে বায়না শহরে কুল-এ (আলিগড়) পৌছে একটি মাঠের উপর তাঁবু ফেললাম।

কুলে পৌছে শুনতে পেলাম কতিপয় অবিশ্বাসী হিন্দু আল-জালালী[২] শহরটি আক্রমণ করে ঘেরাও করে রেখেছে। এ শহরটি কুল থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। অগত্যা আমরা সে দিকেই রওয়ানা হলাম। ইত্যবসরে হিন্দু বিদ্রোহীরা শহরের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এবং তাদের প্রায় ধ্বংস করে এনেছে। আমরা সেখানে পৌছে তাদের পালটা আক্রমণ করার পূর্ব পর্যন্ত তারা আমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেনি। তাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল এক হাজার, পদাতিক তিন হাজার। কিন্তু তাহলেও দলের শেষ লোকটি অবধি আমাদের হাতে প্রাণহারায় এবং তাদের বহু ঘোড়াও অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়। অবশ্য আমাদের দলেরও কিছু সংখ্যক লোক নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল তেইশ জন অশ্বারোহী, পঞ্চান্ন জন পদাতিক, সেই সঙ্গে উপহার দ্রব্যের হেফাজতকারী কাফুর।

আমরা পত্রযোগে সুলতানকে কাফুরের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে সুলতানের জবাবের প্রতীক্ষায় রইলাম। এ সময়ে আল-জালালীর নিকটবর্তী দুরধিগম্য এক পাহাড় থেকে দলে-দলে হিন্দুরা এসে শহরের আশে-পাশে আক্রমণ চালাত। আমাদের দলের লোকেরা প্রায় প্রতিদিন তাদের প্রতিরোধ করতে বেরিয়ে যেত।

এ-উপলক্ষে একবার আমি কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে অশ্বোরোহণ করে একবার বেরিয়ে এক বাগানে বসে বিশ্রাম করছিলাম, কারণ তখন গ্রীষ্মকাল। এমন সময় অদূরে বহু লোক-জনের চীৎকার শুনতে পেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম বিদ্রোহী হিন্দুরা একটি গ্রাম আক্রমণ করেছে। আমরা তাদের পাল্টা আক্রমণ করতেই তারা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেল। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তাদের পিছু নিলাম।

এভাবে পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে একবার পাঁচ জন সঙ্গীসহ আমি দল থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়লাম। এ সময়ে এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সহসা আমাদের আক্রমণ করল। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমরা পালাতে চেষ্টা করলাম। প্রথমে তাদের দশজন আমার পিছু ধাওয়া করেছিল, শেষ অবধি তিন জন আমার পিছনে-পিছনে লেগেই রইল। আমার সামনে তখন আর পালাবার পথ নেই। সেখানকার জমিও প্রস্তরময়। একবার আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'খানা পাথরের ফাঁকে আটকা পড়ে গেল। অগত্যা আমি নেমে ঘোড়ার পা মুক্ত করতে বাধ্য হলাম। ভারতের রীতি-অনুযায়ী একজন লোক দু'খানা করে তরবারী সঙ্গে রাখে। ঘোড়ার

জিনের সঙ্গে বাঁধা আমার একখানা তরবারী মাটিতে পড়ে গেল। তরবারীখানা ছিল সোনার কারুকার্য খচিত। কাজেই আবার ঘোড়া থেকে নেমে আমাকে তরবারীখানা কুড়িয়ে নিতে হল। তখনও শত্রুপক্ষের তিনজন লোক আমার পশ্চাদ্ধাবন করছে। অবশেষে সামনেই গভীর একটি নালা দেখতে পেয়ে আমি নীচের দিকে নেমে গেলাম। তারপরে আর পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সাক্ষাৎ পাইনি।

অত:পর আমি বনের পাশে একটি উপত্যকায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটি রাস্তা পেয়ে আমি অনির্দিষ্ট ভাবে হাঁটতে লাগলাম। সে রাস্তা কোথায় গিয়ে পৌঁছে, তাও আমার জানা নেই। এমন সময় প্রায় চল্লিশ জন বিধর্মী তীর ধনুক নিয়ে আমাকে ঘেরাও করে ফেলল। আমার ভয় হল যে, পালাবার চেষ্টা করলেই তারা এক সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করবে। এদিকে আমি এখন একেবারে নিরস্ত্র বললেই চলে। কাজেই আমি নিরুপায় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে আত্মসমর্পন করলাম, কারণ আত্মসমর্পণকারী শত্রুকে তারা হত্যা করে না।

তারা আমাকে ধরে পরিধানের বস্ত্র ছাড়া আর সব কিছুই খুলে নিয়ে গেল। তারপরে আমাকে নিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর তাদের আস্তানায়। বৃক্ষাবৃত একটি পুকুরের কাছে তাদের আস্তানা। তাদের দেওয়া মটরশুঁটির তৈরী এক রকম রুটি খেয়ে পানি খেলাম। এদের দলে দেখলাম দু'জন মুসলমান রয়েছে। তারা ফারসী ভাষায় আমার সঙ্গে কথার্বাতা বলল, আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাইল। আমি যে সুলতানের নিকট থেকেই এসেছি, এটুকু গোপন করে আংশিকভাবে তাদের কাছে নিজের কথা বললাম। তারপর তারা বলল, "এদের হাতে অথবা অন্য লোকদের হাতে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাণ দিতে হবে। ইনি এদের সরদার।" এই বলে তাদের মধ্যে একজন লোককে দেখিয়ে দিল। কাজেই আমি তার সঙ্গে কথা বললাম। মুসলমান দু'জন দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

অত:পর সরদার আমাকে তিনজন লোকের জিম্মা করে দিল। তাদের একজন ছিল বৃদ্ধ, দ্বিতীয় জন তার ছেলে। তৃতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণকায় একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক। এ তিনজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলাম, আমাকে হত্যা করার ভার পড়েছে এদের উপর।

সেই দিনই বিকাল বেলা তারা আমাকে হাজির করল একটি গুহার কাছে। সেখানে কৃষ্ণকায় লোকটি আমার গায়ের উপর তার পা দিয়ে রাখল এবং বৃদ্ধ ও তার ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে উঠে তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল এবং আমাকে পুকুরে যেতে ইশারা করল। আমার তখন আশঙ্কা হল, এবার আমাকে হত্যা করা হবে। কাজেই আমি বৃদ্ধলোকটির সঙ্গে কথা বলে তার দয়া ভিক্ষা করতে লাগলাম। আমার উপর তার কিছুটা দয়া হল।

দুপুরে বেলা পুকুরের কাছে কিছু লোকজনের সোরগোল শুনা গেল। তারা মনে করল, তাদেরই দলের লোক। কাজেই তারা আমাকেও সেখানে যেতে বলল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল এ-দলের লোক তারা নয়। নতুন দলটি আমার প্রহরীদের পরামর্শ দিল তাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু এরা তাতে রাজী না হয়ে বরং আমাকে তাদের

সামনে রেখে বসে রইল। তাদের সামনে একগাছি শনের দড়ি। আমার মনে হল, আমাকে হত্যা করার সময় হয়তো এই দড়ি দিয়েই বাঁধবে আমাকে।

অনেকক্ষণ পরে শেষোক্ত দলের তিনজন লোক আমার কাছে এল। তাদের মধ্যে সুদর্শন এক যুবক আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে আমি মুক্তি দিলে খুশি হবে?

আমি সম্মতি জানাতেই সে বলল, বেশ যাও।

বলতেই আমি আমার গায়ের জামাটি খুলে তাকে দিলাম। বিনিময়ে সেও তার গায়ের একটি জামা আমাকে দিল। অত:পর আমি চলে এলাম কিন্তু সারাক্ষণ ভয় হতে লাগল, হয়ত তাদের মনের অবস্থার কোন রকম পরিবর্তন হলে আবার আমাকে গ্রেফতার করতে পারে। তাই আমি তাড়াতাড়ি একটা নল-খাগড়ার বনে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানেই কাটালাম।

যুবক আমাকে যে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল, সূর্যাস্তের পরে সেই রাস্তা ধরেই চলতে লাগলাম। রাস্তাটা একটি ছোট খালে গিয়ে পড়েছে সেখানে গিয়ে আমি তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। প্রায় দুপুর-রাত অবধি চলবার পর আমি একটা পাহাড়ের নিকট এসে সেখানেই রাত কাটালাম। ভোরে উঠে আবার আমার যাত্রা শুরু হল এবং দুপুর বেলা একটা উচ্চ পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌছলাম। এখানে কুল জাতীয় এক প্রকার ফল পেড়ে খেতে গিয়ে কাঁটার আঁচড় লেগেছিল আমার বাহুতে। বাহুর সে দাগ আজও মিলায়নি।

সপ্তম দিনে বিধর্মীদের এক গ্রামে গিয়ে পৌছলাম আমি। গ্রামে একটি কুপ আছে, শাক-সব্জীর ক্ষেতও আছে। আমি কিছু আহার্য চাইলাম কিন্তু গ্রামের লোকেরা আমাকে কিছুই খেতে দিতে রাজী হল না। একটি কুপের কাছে কিছু মূলো-শাক দেখতে পেয়ে অগত্যা আমি তাই খেলাম।

অষ্টম দিনে পিপাসায় আমি মৃতপ্রায় হলে গেলাম। একটি গ্রামে গেলাম, কিন্তু সেখানেও পানি পেলাম না।

রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে অবশেষে আমি একটি খোলা কুপের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কুপের কাছে একটি দড়ি আছে কিন্তু পানি তুলবার কোন পাত্র সেখানে দেখতে পেলাম না। আমার মাথায় এক টুকরো কাপড় ছিল। দড়ির মাথায় কাপড়ের টুকরোটি বেঁধে তাই ভিজিয়ে পানি তুলে মুখে দিলাম। কিন্তু তাতে তৃষ্ণা নিবারণ হল না। অবশেষে আমি আমার এক পাটী জুতো দড়িতে বেঁধে তারই সাহায্যে পানি তুলে পান করলাম। কিন্তু তাতে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারলাম না। কাজেই দড়ি বাঁধা জুতোখানা দ্বিতীয়বার কুপে ফেললাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় এবার দড়ি ছিঁড়ে জুতোখানা কুপের তলায় পড়ে গেল। অগত্যা দ্বিতীয় পাটী জুতোর সাহায্যে একই উপায়ে পানি তুলে আমাকে পান করতে হল।

তারপর সেই জুতোখানা কেটে তার উপরের অংশ আমার দুপায়ে বাঁধলাম দড়ি এবং ছেঁড়া কাপড়ের সাহায্যে।

আমি যখন পায়ে জুতোর চামড়া বাঁধছিলাম এবং এরপর কি করা যাবে তাই ভাবছিলাম তখন একটি লোক এসে আমার সামনে দাঁড়াল। আমি তার দিকে চোখ তুলে

চেয়ে দেখলাম, লোকটি কৃষ্ণবর্ণ। তার হাতে একটি জগ্ ও একখানা লাঠী, কাঁধে একটি ঝোলা। সে মুসলমানী কায়দায় আমাকে অভিবাদন জানাল, 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলে। আমি অনুরূপভাবে তাকে প্রত্যাভিবাদন জানালাম। তখন লোকটি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম, আমি একজন পথহারা ব্যক্তি। সে বলল, আমিও তাই।

তার সঙ্গে দড়ি ছিল। তার জগ্ ও দড়ির সাহায্যে পানি তুলে পান করতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় সে বলে উঠল, সবুর কর। এই বলে সে তার ঝোলার ভেতর থেকে এক মুঠো কাল মটর ও চাউল ভাজা বের করে আমাকে খেতে দিল।

খাওয়ার পরে ওজু করে সে দু'রাকাত নামাজ পড়ল। আমিও তাই করলাম। অত:পর সে আমার নাম জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম আমার নাম মোহাম্মদ। সে তার নিজের নাম বলল, 'আনন্দিতআত্মা'। তার নাম একটা ভাল লক্ষণ বলে মনে হল এবং আমার মনে স্বস্তি ফিরে এল।

সে একটু পরে বলল, আল্লার ওয়াস্তে তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি রাজী হলাম; কিন্তু এত দুর্বলতা বোধ করতে লাগলাম যে বেশীক্ষণ তার সঙ্গে চলতে পারলাম না। এক জায়গায় গিয়ে আমি বসে পড়লাম। তাকে বললাম যতদিন তোমার দেখা পাইনি ততদিন বেশ চলেছি কিন্তু তোমাকে পেয়ে যেনো আর চলতে পারছি না।

আমি হাঁটতে অক্ষম বলাতে আগন্তুক আমাকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং স্মরণ করতে বললেন, "খোদা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা।" আমি বার বার এ-কথা স্মরণ করতে লাগলাম। কিন্তু আমার চোখ যেন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর হঠাৎ যেন মাটীতে পড়ে যাচ্ছি মনে হওয়ায় আমার জ্ঞান ফিরে এল, আমি চোখ মেলে চাইলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে লোকটিকে ধারে কাছে আর কোথাও দেখতে পেলাম না। তা'ছাড়া আমি তখন একটি লোকালয়ে অবস্থান করছি।

গ্রামের ভেতর প্রবেশ করে দেখলাম, অধিকাংশ বাসিন্দা হিন্দু কিন্তু তাদের শাসনকর্তা একজন মুসলমান। প্রজাদের কাছে খবর পেয়ে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে সেই গ্রামের নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, গ্রামটির নাম 'তাজবুরা'। আমার দলের লোকেরা যেখানে আছে সেই কোয়েল এখান থেকে খুব দূরে নয়। গ্রামের শাসনকর্তা আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে একটি ঘোড়া আনালেন। বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে গোসল করালেন এবং গরম খাদ্য খেতে দিলেন। আমার আহারের পরে বললেন, আমার কাছে একটি জামা ও পাগড়ী আছে। একজন মিসরবাসী আরবের লোক এগুলো আমার জিম্মায় রেখে গেছে। কোয়েলে যে সেনাদল আছে, সে তারই একজন সৈনিক। আমি তখন সেগুলো আমাকে দিতে অনুরোধ জানালাম। সেগুলো আমার কাছে হাজির করা হলে দেখলাম, এগুলো আমার নিজেরই সম্পত্তি এবং আমিই কোয়েল থাকাকালে সেই আরবী লোকটিকে এগুলো দিয়েছিলাম। এ-ব্যাপারে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। সে লোকটি আমাকে কাঁধে তুলে এখানে এনেছিলেন তখন তাঁর কথাই আমি ভাবতে লাগলাম।

ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ল, আবু আবদুল্লাহ্ আল্-মুর্শিদী নামক একজন দরবেশের কথা। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, তুমি হিন্দুস্থানে পৌছে আমার ভাই দিলশাদের দেখা পাবে। তুমি সেখানে একটি বিপদে পড়বে এবং আমার ভাই তোমাকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

আমি এখন বুঝতে পারলাম, ইনিই দরবেশ আবু আবদুল্লাহ্ আল্-মুর্শিদীর ভাই। দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ঘটনার সময় ছাড়া আর কখনও এ লোকটির সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয় নাই।

সে রাত্রেই কোয়েলায় পত্র লিখে আমার নিরাপত্তার কথা বন্ধুদের জানালাম। খবর পেয়ে তাঁরা আমার জন্যে ঘোড়া ও পোষাক নিয়ে হাজির হলেন এবং আমাকে ফিরে পেয়ে বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম, কাফুরের মৃত্যুর পরে আমরা সুলতানকে যে চিঠি লিখেছিলাম তার জবাব এসে পৌঁচেছে। তিনি সমবুল নামক একজন খোজাকে কাফুরের স্থলাভিষিক্ত করে পাঠিয়েছেন এবং পুনরায় আমাদের যাত্রা শুরু করতে বলেছেন।

আমার বিপন্ন অবস্থার কথা লিখে সঙ্গীরা সুলতানকে আরও একখানা চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠিতে তারা এ যাত্রাকে অশুভ যাত্রা মনে করে আর অধিক অগ্রসর হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সুলতানের মনোভাব জানতে পেরে আমি তাদের মতে মত দিতে পারিনি। তারা তখন বলল, যাত্রার শুরুতেই কি রকম বিপদ-আপদ শুরু হয়েছে আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না। আপনার অনুরোধ অবশ্যই সুলতান রক্ষা করবেন। সুলতানের জবাবের জন্যে আমাদের এখানেই অপেক্ষা করা উচিত অথবা সুলতানের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।

আমি তাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে বললাম, আমরা এখানে অপেক্ষা করতে পারি না। যেখানেই আমরা যাই না কেন, সুলতানের জবাব সেখানেই পাব।

তারপর আমরা পুনরায় যাত্রা করে তাঁবু ফেললাম বার্জবুরা বা বার্জপুর নামক স্থানে গিয়ে। এখানে একজন শেখের একটি দরগাহ্ আছে। সুশ্রী ও ধর্মপ্রাণ এই শেখ নাভি থেকে পা অবধি শুধু একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করেন। এ জন্য সবাই তাঁকে নাঙ্গা মোহাম্মদ বলে থাকে। বার্জপুর থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা প্রথমে পৌছলাম আব-ই-সিয়া (কালিন্দী) নদী অবধি এবং সেখান থেকে কনৌজ। কনৌজ একটি সুগঠিত ও সুরক্ষিত বড় শহর। শহরটি প্রকাণ্ড একটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এ শহরে জিনিষপত্রের দাম বেশ সস্তা। আমরা এখানে তিনদিন কাটালাম। আমার সম্বন্ধে সুলতানকে যে পত্র দেওয়া হয়েছিল তার জবাব এখানে থাকতেই পেলাম। তিনি লিখেছেন, যদি ইবনে বতুতার কোন খোঁজই না পাওয়া যায়, তবে তাঁর জায়গায় তোমরা দৌলতাবাদের কাজী ওয়াজি-উল-মুল্‌ককে নিয়ে যাত্রা শুরু করবো।

কনৌজ থেকে আমরা মাওরী নামক ছোট একটি শহর ছাড়িয়ে বড় শহর মার-এ গিয়ে পৌছলাম।[৩] এ শহরের অধিকাংশ অধিবাসী বিধর্মী; কিন্তু শাসনকর্তা মুসলমান।

মালয়া নামক একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম থেকে এ-শহরটির নামকরণ হয়েছে। এরা সুশ্রী ও শক্তিশালী এবং মহিলারা খুবই সুন্দরী। মার ছাড়িয়ে আমরা গেলাম আলাবার বা আলাপুর।[8] এ-ছোট শহরটির অধিবাসীরাও অধিকাংশ হিন্দু এবং শাসনকর্তা আবিসিনিয়ার একজন মুসলমান। এক সময়ে ইনি সুলতানের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। অসীম সাহসিকতার জন্য ইনি সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। বিধর্মীরা বরাবর একে ভয় করে চলত। কারণ ইনি অনবরত তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে এবং তাদের বন্দী বা হত্যা করে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। ইনি যেমন শক্তিশালী তেমনি দীর্ঘকায় ছিলেন। শুনেছি একবার আহার করতে বসে ইনি একটি ভেড়ার গোশ্‌ত একাই খেয়ে ফেলতেন এবং খাওয়ার পরে প্রায় দেড় পাউণ্ড ঘি খেতেন। তাঁদের নিজের দেশের নিয়মও ছিল তাই। এই শাসনকর্তার একটি পুত্রও ঠিক তাঁরই মত সাহসী ছিল। অবশেষে একটি গ্রাম আক্রমণ করতে গিয়ে ইনি হিন্দুদের হাতে নিহত হন।

অত:পর আমরা গোয়ালিয়রে এসে হাজির হলাম। এখানে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি দূর্গ আছে। এই দূর্গের প্রবেশদ্বারে মাহুতসহ পাথরের খোদাই একটি হাতী দেখলাম। এখানকার শাসনকর্তা একজন ধার্মিক ও সৎব্যক্তি। ইনি পূর্বে একবার আমাকে বিশেষ সম্মান করেছিলেন। একদিন আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি একজন বিধর্মীকে তার কোন অপরাধের জন্য দু'টুকরা করে কাটতে উদ্যত হয়েছেন। দেখেই আমি তাঁকে বললাম, আল্লার নামে আমি অনুরোধ করছি, এ-কাজটি করবেন না। কারণ, আমি জীবনে কখনো চোখের সামনে নরহত্যা দেখিনি। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করে লোকটিকে কারাগারে রাখবার হুকুম করলেন। কাজেই আমার হস্তক্ষেপে একটি লোকের জীবন রক্ষা হল।

গোয়ালিয়র থেকে আমরা গেলাম পারওয়ান।পারওয়ান মুসলমানদের শহর কিন্তু এ-শহরের অবস্থান বিধর্মীদের অধিকৃত জায়গায়। এ-জায়গাটির আশে-পাশে অনেক ব্যাঘ্রের বাস। স্থানীয় একজন লোকের মুখে শুনলাম, শহরের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও রাত্রে একটি বাঘ প্রায়ই শহরে প্রবেশ করে এবং মানুষ ধরে নিয়ে যায়। এ-ভাবে এ-শহরের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেছে বলে শোনা যায়। অথচ বাঘটি কি ভাবে যে শহরে প্রবেশ করে তা কেউ বলতে পারে না।

অবশেষে একটা আশ্চর্যজনক গল্প শুনলাম। একজন লোক আমার কাছে গল্প করল, এ-বাঘটি আসলে একটি মানুষ। যাদুর বলে এ বাঘের আকৃতি ধারণ করতে পারে। এসব যাদুকরেরা যোগী নামে পরিচিত। আমি এ-গল্প বিশ্বাস করতে রাজী হলাম না; কিন্তু একাধিক লোকের কাছে এ-বিষয়ে আমি একই গল্প শুনেছি।

এই শ্রেণী যোগী বা যাদুগীররা অনেক অসম্ভব কাজ করতে পারে। তাদের কেউ মাসের পর মাস কাটাতে পারে পানাহার না করে। কেউ-কেউ মাটীর নীচে গর্ত করে তাতেই বাস করে। এ রকম একটি লোকের কথা শুনেছি, সে নাকি এক বছর ছিল

এমনি একটি গর্তে। এখানকার লোকেরা বলে, যোগীরা এমন পিল তৈরী করতে পারে—যার একটি খেয়ে কয়েক দিন বা মাস কাটিয়ে দেওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে কোন রকম তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। এ ছাড়া বহুদূরে কি ঘটছে তাও তারা অনায়াসে বলে দিতে পারে। সুলতান যোগীদের সম্মান করেন এবং তাদের সঙ্গ দান করে থাকেন। শুনলাম, যোগীদের মধ্যে অনেকে আছে শুধু শাক-সব্জী খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং বেশীর ভাগ যোগীরাই মাছ-মাংস স্পর্শ করে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে নিজেদের তারা এ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে যে বাহ্যিক প্রয়োজন তাদের অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

যোগীদের মধ্যে এমনও কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা একটি লোকের দিকে চোখ তুলে চাইলেই সেই লোকটি সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণ লোকরা বলে, এ ভাবে মৃত্যু ঘটেছে এমন কোন লোকের বক্ষ বিদারণ করে দেখা গেছে তার হৃদপিণ্ড নেই। অর্থাৎ হৃদপিণ্ড খেয়ে ফেলা হয়েছে। এ ধরনের যাদুগীর বা যোগীদের মধ্যে নারীই বেশী। সে সব নারী যাদুগীর মানুষের হৃদপিণ্ড ভক্ষণ করে তাদের বলা হয় কাফ্তার। দিল্লীতে যখন দুর্ভিক্ষ চলছে তখন এমনি একজন স্ত্রীলোককে আমার নিকট এনে বলা হয়েছিল, সে নাকি একটি শিশুর হৃদপিণ্ড ভক্ষণ করেছে। আমি তাকে সুলতানের লেফ্টেন্যান্টের কাছে পাঠাতে বললাম। লেফটেন্যান্ট বললেন, স্ত্রীলোকটি সত্যই কাফ্তার কি না তিনি তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

এই বলে হাতে পায়ে চারটি পানিভর্তি কলসী বেঁধে স্ত্রীলোকটিকে যমুনা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। স্ত্রীলোকটি কিন্তু ডুবে না গিয়ে পানির উপর ভেসে রইল। এর ফলে তাকে কাফ্তার বলে গণ্য করা হল। বলা বাহুল্য, যথারীতি স্ত্রীলোকটি ডুবে গেলে তাকে কাফ্তার বলে ধরা হত না। পরে হুকুম হল তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে। স্ত্রীলোকটির ভস্মাবশেষ শহরের নারী-পুরুষ সবাই মিলে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদের ধারণা এ ভস্ম গায়ে মাখলে এ-বছরের জন্যে অপর কোন কাফ্তার তাদের কোন রকম অনিষ্ট করতে পারবে না।

আমি যখন দিল্লীতে তখন একদিন সুলতান আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে একটি গোপন কক্ষে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দু'জন যোগীর সঙ্গে দেখতে পেলাম। দু'জন যোগীর একজন বসা অবস্থায় শূন্যে আমাদের মাথার উপর উঠে গেল। তখনও সে সেখানে শূন্যের উপর বসে আছে। এ অদ্ভুত দৃশ্য আমাকে এতটা ভীত ও বিস্মিত করেছিল যে, আমি তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারালাম। পরে ঔষধ খাওয়ানোর ফলে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসলাম। তখনও পর্যন্ত যোগী শূন্যেই বসে আছে। অবশেষে তার সঙ্গী যোগী ঝোলার ভেতর থেকে একখানা খড়ম বের করে মাটিতে ছুঁড়ে মারল। খড়মখানা শূন্যে অবস্থিত যোগীর ঘাড়ে বারবার আঘাত করতে লাগল এবং যোগী ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এসে আমাদের পাশে পূর্ববৎ বসে পড়ল। তখন সুলতান আমাকে বললেন, তুমি ভয় পাবে আমি জানতাম। তা না হলে আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার তোমাকে দেখাতে পারতাম। আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম; কিন্তু আমার

হৃদকম্প তখনও রয়েই গেল এবং আমি অসুখে পড়লাম। পরে ঔষধ খেয়ে আমাকে সুস্থ হতে হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যা'ক। পারওয়ান থেকে আমরা গিয়ে কাজাররা[৫] পৌছি। এখানে এক মাইল লম্বা একটি দিঘী আছে। দিঘীর পাড়ে দেবমূর্তিসহ দেবমন্দির। মূর্তিগুলো মুসলিমদের দ্বারা (অস্পষ্ট) করা হয়েছে। সেখান থেকে চান্দিরি হয়ে আমরা খিহার[৬] (ধর) শহরে এলাম। এ জেলার সবচেয়ে বড় প্রদেশ মালওয়াল এটি প্রধান শহর। দিল্লী থেকে এখানে আসতে চব্বিশ দিন লাগে। পথের পাশে স্তম্ভের গায়ে মাইলের সংখ্যা খোদিত আছে। পথিকরা সেই সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারে, কত মাইল তারা একদিনে এসেছে এবং আর কত মাইল এগিয়ে গেলে থাকবার জায়গা বা গন্তব্যস্থানে পৌছা যাবে। খিহার থেকে গেলাম উজ্জয়ন (উজ্জয়ন)। চমৎকার একটি জনবহুল শহর উজ্জয়ন। উজ্জয়ন থেকে এলাম দৌলত আবাদ। এ বিস্তৃত শহরটির প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে রাজধানী দিল্লীর সঙ্গে তুলনা চলে। তিনটি বিভিন্ন অংশে এ শহর বিভক্ত। প্রথমাংশ খাস দৌলতআবাদ সুলতান ও তাঁর সেনাদের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় অংশ কাটাক নামে পরিচিত। তৃতীয়াংশে দুয়াইগির (দেওগিরি) নামে প্রসিদ্ধ দূর্গ।

দৌলতআবাদে সুলতানের শিক্ষক প্রসিদ্ধ খান কুত্লু খান বাস করেন। তিনি এ শহরের শাসনকর্তা এবং সাগার, তিলিং (তেলিঙানা) প্রভৃতি অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি। এ জনবহুল প্রদেশটি তিন মাসের পথ অবধি বিস্তৃত এবং এর সবটাই খান ও তাঁর সহকারীদের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। উপরোল্লিখিত দুয়াইগির দূর্গ সমতলভূমি বেষ্টিত একটি টিলা। টিলার খননকার্য চালিয়ে চূড়ান্ত এ দূর্গ নির্মান করা হয়েছে। চামড়া দিয়ে তৈরী মইয়ের সাহায্যে সেখানে পৌছতে হয়। রাত্রে এ মইটি সরিয়ে উপরে তুলে রাখা হয়। সাঙ্ঘাতিক অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের এখানকার কারাগারে বন্দী করা হয়। এ কারাগারে বিড়ালের চেয়েও বড় আকারের অনেক ইঁদুর আছে। বাস্তবিক পক্ষে সে ইঁদুর দেখে বিড়াল আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে ভয়ে পালায়। শুধু ফাঁদ পেতে সে সব ইঁদুর ধরা যায়। আমি সে ইঁদুর দেখে সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। দৌলত আবাদের অধিবাসীরা মারহাট্টাদের বংশধর। খোদা তাদের নারীদের বিশেষ করে নাসিকা ও ভুরুযুগল অত্যন্ত সুন্দর করে গঠন করেছেন। এ শহরের বিধর্মী অধিবাসীরা সবাই ব্যবসায়ী। তারা অত্যন্ত ধনবান এবং মনিমুক্তার ব্যবসায় করে। দৌলত আবাদে গায়ক ও গায়িকাদের অতি সুন্দর ও বিশাল একটি বাজার আছে। সেখানে বহু সংখ্যাক দোকান। প্রত্যেক দোকানেই এমন একটি দরজা আছে যেখান দিয়ে এগিয়ে দোকানের মালীকের বাড়ী অবধি যাওয়া যায়। কার্পেট দিয়ে দোকানগুলো সুন্দর করে সাজানো, দোকানের মধ্যস্থলে বড় একটি দোলনার মতো বস্তু। সেখানে গায়িকা বসে বা শুয়ে থাকে। সব রকম অলঙ্কার দিয়ে তাকে সাজানো হয় এবং পরিচারকরা তার দোলনায় দোল্ দেয়। বাজারের মধ্যস্থলে কার্পেট মোড়া প্রকাণ্ড একটি সজ্জিত মঞ্চ। প্রতি বৃহস্পতিবার আসরের নামাজের পরে প্রধান বাদ্যকর এসে মঞ্চে বসেন। তার ভৃত্য ও ক্রীতদাসেরা

বসে তার সামনে। তখন গায়িকারা একের পর আরেকজন এসে নাচ গান করতে থাকে। মগরেবের নামাজের সময় অবধি এমনি নাচ-গান চলে। তারপর তারা চলে যায়। সেই বাজারেই নামাজ পড়ার জন্য মসজিদও রয়েছে। ভারতের কোনো বিধর্মী শাসক এ বাজারের ভেতর দিয়ে গেলেই মঞ্চের কাছে নামতেন এবং গায়িকা বালিকারা এসে তাঁর সামনে নাচগান করতো। একজন মুসলমান সুলতানও তাই করতেন।

আমরা নাধুরবার (নাধুরবার) শহর অবধি চলে গেলাম। এ ছোট শহরটিতে মারহাট্টাদের বাস। তাদের অধিকাংশই দক্ষ শিল্পী। অনেকে চিকিৎসক অথবা জ্যোতিষী। মারহাট্টাদের মধ্যে যারা উচ্চবংশীয় তারা ব্রাহ্মণ ও কাট্রী (ক্ষত্রিয়)। তাদের খাদ্য হলো চাউল, শাকসব্জি ও তিলের তৈল। জীবকে কষ্ট দেওয়া বা জীবহত্যা করা তারা পছন্দ করে না। তারা খাওয়ার আগে পুরোপুরি স্নান করে নেয়। অন্ততঃ ছয় পুরুষ দূরের কোনো ভগ্নী সম্পর্কীয় ছাড়া কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে এদের বিয়ে হতে পারে না। তারা কখনো মদ্যপান করে না। মদ্য পানকে সবচেয়ে বড় পাপ বলে মনে করে। ভারতের মুসলমানদেরও সেই মত। কোনো মুসলমান মদ্যপান করলে আশি চাবুক মেরে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তিন মাসকাল তাকে এমন এক কারাগারে (Matamore) বন্দী করে রাখা হয় যার দরজা শুধু খাবার সময় হলে খোলা হয়।

এ শহর থেকে আমরা শাখার (সন্‌গড়) এলাম। এ নামেরই (তাপ্তী) বড় একটি নদীর তীরে এ শহর। এখানকার বাসিন্দারা সৎ, ধার্মিক এবং বিশ্বস্ত।

তারপরে আমরা কিন্‌বায়া[৮] (Cambay) শহরে এসে পৌছলাম। সমুদ্রের একটি অংশ নদীর মতো হয়ে এগিয়ে এসেছে। তার পরেই এ শহর। এখানে জাহাজ চলাচল করতে পারে এবং পানিতে জোয়ার ভাঁটা হয়। আমি নিজে দেখেছি, এখানে ভাঁটার সময় জাহাজ কাঁদায় ঠেকে থাকে এবং জোয়ারের সময় ভেসে যায়। এ শহরের গঠন-প্রকৃতি এ মসজিদের ভাস্কর্যের জন্য এটি অন্যতম সুদৃশ্য শহর। এর কারণ, এখানকার অধিবাসীদের বেশীর ভাগই বিদেশী সওদাগর। তারা সর্বদাই চমৎকার এমারত ও সুন্দর মসজিদ তৈয়ার করে। এ কাজে তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এ শহর ত্যাগ করে আমরা কাওয়া[৯] এলাম। এ শহরটিও জোয়ার-ভাঁটা হয় এমন একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এটি জালানসি নামক বিধর্মী এক রাজার অধীনে। তাঁর বিষয়ে পরে বলা হবে। তারপর আমরা উপসাগরের কুলে কান্দাহার নামক একটি বড় শহরে পৌছি। এ শহরের মালীক একজন বিধর্মী। কান্দাহারের বিধর্মী সুলতানের নামই জালানসি। তাঁর রাজ্য মুসলিম রাজ্যেরই অন্তর্ভূক্ত বলে তিনি ভারতের বাদশাহ্‌কে প্রতি বছর উপঢৌকন[১০] পাঠিয়ে থাকেন। আমরা কান্দাহার পৌছলে তিনি আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং নিজে প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে আমাদের জায়গা করে দেন। খাজা বোহ্‌রার বংশধরেরা এবং তাঁর দরবারের অন্যান্য গণমান্য মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জাহাজের মালীক ইব্রাহিম। তাঁর ছ'খানা জাহাজ ছিল।

আমরা কান্দাহারে ইব্রাহিমের আল-জাগির নামক একটি জাহাজে আরোহণ করি। সুলতানের উপহারের সত্তরটি ঘোড়াও আমরা এ জাহাজে তুলি। আমাদের সঙ্গীদের ঘোড়ার সঙ্গে বাকি ঘোড়াগুলো তোলা হয় 'মানুর্ত' নামে ইব্রাহিমের এক ভাইয়ের জাহাজে। জালানসি আমাদের একখানা জাহাজ দেন। সে জাহাজে জহিরউদ্দিন সানবুল ও তাদের দলের অন্যান্যের ঘোড়া তোলা হয়। তিনি এ জাহাজে আমাদের জন্য পানি ও খাদ্য এবং পশুর জন্য খাদ্য দিয়ে যান। তিনি আল-উকারি নামক আরেকটি জাহাজে তাঁর ছেলেকেও আমাদের সঙ্গে পাঠান। এ জাহাজখানা গ্যানি নামক ছোট পোতবিশেষ। শুধু সামান্য একটু বেশী চওড়া। এ জাহাজে দাঁড়ের সংখ্যা ষাটটি। যুদ্ধের সময় তীর বা পাথর যাতে না পড়তে পারে সেজন্য দাঁড়ীদের উপরে ছাদ বা ছৈ লাগানো আছে। আমি উঠেছিলাম আল-জাগির নামক জাহাজে। তাতে রয়েছে পঞ্চাশ জন দাঁড়ী এবং পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী হাব্সী। ভারত মহাসাগরের বুকে নিরাপত্তার জন্য হাব্সীদের ব্যবস্থা। প্রতি জাহাজে এদের একজন থাকলেই ভারতীয় বোম্বেটে বা পৌত্তলিকদের কেউ ভয়ে কাছ ঘেস্‌বে না। দু'দিন পরে আমরা বইরাম[১১] দ্বীপে পৌছলাম। তার পরের দিন গেলাম কুকা (কার্থিওয়ারের গগা) শহরে। এ শহরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাজার আছে। তখন ভাঁটার সময় বলে আমাদের জাহাজ তীর থেকে চার মাইল দূরে নোঙ্গর করল। কিন্তু আমি কয়েকজন সঙ্গীসহ ছোট একটি নৌকায় তীরে গিয়ে উঠলাম। কুকার সুলতান একজন পৌত্তলিক। তার নাম— ডানকুল। তিনি ভারতের বাদশার আনুগত্য বাহ্যত স্বীকার করলেও আসলে তিনি একজন বিদ্রোহী।এ শহর থেকে জাহাজে পাল খাটিয়ে তৃতীয় দিনে আমরা সান্‌দাবুর (গোয়া)[১২] পৌছি। এখানে ত্রিশটি গ্রাম আছে। শহরটি একটি উপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। ভাঁটার সময় এ উপসাগরের পানি মিষ্টি বলে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু জোয়ারের সময় লবনাক্ত ও তিক্ত। দ্বীপের মধ্যস্থলে দু'টি শহর। তার একটির নির্মাতা বিধর্মীরা। মুসলিমরা এদেশ জয় করার পরে তারাই অপরটি নির্মাণ করে। আমরা এ দ্বীপের পাশ কাটিয়ে গিয়ে অপর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে নোঙ্গর করি। পরের দিন আমরা হিনাওর (হোনাভার, অনেরৈ) শহরে পৌছি। শহরটি বড় বড় জাহাজ চলাচলের যোগ্য একটি ক্ষুদ্র উপসাগরের তীরে অবস্থিত। 'পুষকাল' বা বর্ষার সময় এ উপসাগরটি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে চার মাস অবধি একমাত্র মৎস্য শিকারী ছাড়া অন্য কোন পোত যাতায়াত করতে পারে না। এ শহরের এবং উপকূলের সর্বত্র নারীরা শেলাই বিহীন কাপড় ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করে না। কাপড়ের এক প্রান্ত তারা কোমরে জড়ায় এবং অপর অংশ কাঁধের উপর দিয়ে মাথায় দেয়। তারা সুন্দরী এবং সতী। প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাকে একটি আংটি ব্যবহার করে। তাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকেই তারা কোরাণ কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। শহরে আমি তেরটি বালিকা বিদ্যালয় ও তেইশটি বালকদের বিদ্যালয় দেখেছি। জিনিষ আর কোথাও দেখতে পাইনি। এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সঙ্গে জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য করে। চাষোপযোগী কোনো ভূমি এদের নেই। হিনাওরের শাসনকর্তা সুলতান জালালউদ্দিন একজন পরাক্রমশালী অতি উত্তম ব্যক্তি। তাঁর রাজ্য হারিয়াব নামক একজন বিধর্মী রাজার অধীনে। হারিয়ারের কথা আমরা পরে বলবো।

সুলতান জালালউদ্দিনের নৌ-শক্তির জন্য ভীত হয়ে মালাবারের অধিবাসীরা তাকে নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক চাঁদা দেয়। ঘোড়সওয়ার ও পদাতিকসহ তাঁর সৈন্যসংখ্যা প্রায় ছ'হাজার। আরেকবার আমি প্রায় এগার মাসকাল তাঁর দরবারে কাটিয়েছিলাম আদৌ রুটী না-খেয়ে। কারণ, তাদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাত ছাড়া আর কিছুই না খেয়ে আমি আরও তিন বছর কাটিয়েছি মালদ্বীপে, সিংহলে, এবং করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলে। শেষ অবধি আমি পানির সঙ্গে ছাড়া ভাত গলাধকরণ করতে পারিনি। এবার আমরা সুলতানের সঙ্গে তিন দিন কাটালাম। তিনিই আমাদের আহার্য সরবরাহ করেছিলেন। তারপর আমরা তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম।

তিনদিন পর আমরা মরিচের দেশ মালাবারে পৌঁছলাম। এ দেশটি সানদাবুর (Goa) থেকে কাউলাম (ত্রিভাঙ্কুরের কুইলন) অবধি উপকূলে বিস্তৃত দু'মাসের পথ। সারাটা পথই গাছের ছায়ায় ঢাকা। প্রত্যেক আধ-মাইল অন্তর একটি করে কাঠের নির্মিত ঘরে মুসলমান বা অমুসলমান নির্বিশেষে বসবার জন্য বেঞ্চ পাতা আছে। প্রত্যেক ঘরেই একটি করে পানির কুপ এবং একজন অমুসলমান পরিচারক রয়েছে। পথিক যদি অমুসলমান হয় তবে সে তাকে পাত্রে ঢেলে পানি দেয় কিন্তু মুসলমান পথিক হলে তার অঞ্জলি ভরে পানি দেয়। যে পর্যন্ত তাকে থামতে না বলা হয় সে পর্যন্ত সে অঞ্জলিতে পানি ঢালতে থাকে। মালাবারের বিধর্মী বা অমুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রীতি এই যে, কোনো মুসলমান তাদের গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না অথবা তাদের পাত্র হতে আহার করতে পারবে না। যদি কোনো মুসলমান তা করে তবে সে পাত্র তারা ভেঙ্গে ফেলে অথবা সেই মুসলমানকে দিয়ে দেয়। যেখানে অন্য কোনো মুসলমান অধিবাসী নেই সেখানে মুসলমানকে খেতে দেওয়া হয় কলার পাতায়। এ পথের প্রত্যেক বিরতি স্থানেই মুসলমানদের ঘরবাড়ী আছে। মুসলমান পথিক সেখানে নেমে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে পারে। তাদের ঘরবাড়ী না থাকলে মুসলমানরা এ পথে সফর করতে পারতো না।

পদব্রজে যে পথ অতিক্রম করতে দু'মাস লাগে তার কোথাও এক ফুট জায়গা এখানে অনাবাদী পড়ে নেই। প্রত্যেক অধিবাসীরই নিজ-নিজ ফলের বাগান আছে। বাগানের মধ্যস্থলে কাঠের বেড়ায় ঘেরাও করা বাড়ী। বাগানের ভেতর দিয়ে পথ চলে গেছে। সে পথ বেড়ার কাছে এলেই একটি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়, আরেকটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পরবর্তী বাগানে যেতে হয়। এখানে কেউই কোনো জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করে না। শুধু সুলতানের নিজের ঘোড়া রয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান বাহন পাল্কী। ক্রীতদাস বা ভাড়া করা বাহকেরা পাল্কী কাঁধে বহন করে নিয়ে যায়। যারা পাল্কীতে উঠতে নারাজ তাদের জন্য পায়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার বাহন নেই। মালপত্র ও পণ্যদ্রব্য ভাড়া করা লোকেরা বহন করে। একজন সওদাগর হয়তো তার মালপত্র অন্যত্র নিয়ে যেতে একশ' বা ঐ রকম সংখ্যক লোককে ভাড়া করে। এ পথটির চেয়ে নিরাপদ পথ আমি আর কোথাও দেখিনি। কারণ, সামান্য একটি বাদাম চুরি করলেও এখানে চোরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। গাছের একটি ফল পড়লে

মালিক ব্যতীত তা অপর কেউ স্পর্শও করে না। বাস্তবিক পক্ষে আমরা সময়-সময় এ পথে চলতে অনেক বিধর্মীর দেখা পেয়েছি। তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। তাদের কাছে মুসলমানরা অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। শুধুমাত্র, আগেই যা বলেছি, তারা মুসলমানদের গৃহে ঢুকতে দেয় না অথবা নিজেদের পাত্রে তাদের খেতে দেয় না। মালাবার ভূমিতে বারজন বিধর্মী সুলতান আছেন। তাদের মধ্যে কারো কারো সৈন্যবল পঞ্চাশ হাজার। আবার অনেকের মাত্র তিন হাজার সৈন্যও আছে। কিন্তু তবু তাঁদের ভেতরে কোন রকম গরমিল নেই এবং সবল কখনো দুর্বলের রাজ্য গ্রাস করে না। প্রত্যেক শাসনকর্তার রাজ্যের সীমান্তে একটি করে কাষ্ঠ-নির্মিত প্রবেশদ্বার আছে। সেখান থেকে কার রাজত্ব আরম্ভ সে কথা খোদাই করে প্রবেশদ্বারে লেখা আছে। একে বলা হয় অমুক রাজার নিরাপত্তার দ্বার। যদি কোনো মুসলমান বা বিধর্মী অপরাধী এক রাজার রাজ্য থেকে অপর কোনো রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তার জীবন তখন নিরাপদ। যে রাজ্য থেকে সে পালিয়ে এসেছে সে রাজ্যের রাজা যদি পরাক্রমশালীও হন তবু তিনি আর আসামীকে ধরে নিতে পারেন না। এখানকার শাসনকর্তাগণ নিজেদের রাজ্যভার সন্তানদের না দিয়ে ভগ্নীর সন্তানদের উপর দিয়ে থাকেন। এ রীতি আমি একমাত্র আচ্ছাদিত মস্তক (veiled) মাসুকাদের ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত দেখিনি,তাদের বিষয়ে পরে উল্লেখ আছে।

মালাবারের যে শহরে আমরা প্রথম প্রবেশ করি তার নাম আবুসারার (বার্সেলোর)—বড় একটি জলাশয়ের পাড়ে বহু নারিকেল গাছ পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র একটি জায়গা। সেখান থেকে দু'দিন চলে আমরা এলাম ফাকানুর (বাকানর, বর্তমানে বারকার)[১৩] নামে জলাশয়ের পাড়ে আরেকটি বড় শহরে।এখানে অনেক ইক্ষু পাওয়া যায়। দেশের অপর কোথাও এ জিনিসের প্রাচুর্য নেই। ফাকানুরের মুসলমান সমাজের প্রধান ব্যক্তিকে বলা হয় বাসাডাও (Basadaw), তাঁর প্রায় ত্রিশটি যুদ্ধ জাহাজ আছে। তার সবগুলোই লুলা নামক একজন মুসলমানের পরিচালনাধীনে। সে একজন বোম্বেটে, দুষ্কৃতিকারী ও ডাকাত। আমরা সেখানে গিয়ে নোঙ্গর করতেই সুলতান তাঁর পুত্রকে প্রতিভূ হিসেবে আমাদের জাহাজে থাকতে পাঠালেন। আমরা তীরে নেমে তাঁর কাছে গেলে তিনি অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে তিন রাত্রি অবধি আমাদের মেহ্মানদারী করেন ভারতের বাদশার প্রতি সম্মানার্থে। তা ছাড়া আমাদের জাহাজের লোক-লস্করের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে কিছু লাভবান হবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। তাদের একটি রীতি এই যে, শহরের পাশ দিয়ে কোনো জাহাজ গেলেই সেখানে নোঙ্গর করতে হবে এবং শাসনকর্তাকে কিছু উপঢৌকন দিতে হবে। তারা একে 'বন্দরের অধিকার' বলে। যদি কেউ এ প্রথা অমান্য করে চলে যায় তাকে এরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে বল প্রয়োগে তাকে ফিরিয়ে আনে এবং দ্বিগুণ কর ধার্য করে যতদিন খুশী তাকে সেখানে আটক রাখে। ফাকানুর ছেড়ে তিনদিন পর আমরা মাঙ্গারুর (Mangalore) পৌছি। আদ্-দাম্ব নামক দেশের বৃহত্তম খাঁড়ির পারে এ শহরটি অবস্থিত। ফার্স এবং ইয়েমেনের অধিকাংশ সওদাগর এ শহরে এসে অবতরণ করে। এখানে প্রচুর মরিচ ও আদা পাওয়া যায়।

মাঙ্গারুরের শাসনকর্তা দেশের প্রসিদ্ধ শাসনকর্তাদের অন্যতম। তাঁর নাম রামাডৌ। এখানে প্রায় চার হাজার মুসলমানের একটি উপনিবেশ আছে। শহরের একটি উপকণ্ঠে তারা বসবাস করে। অনেক সময় তাদের সঙ্গে শহরবাসীদের বিরোধ বাধে কিন্তু সুলতান তখন তাদের মধ্যে শান্তি-স্থাপন করেন, কারণ সওদাগরদের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। পূর্ববর্তী সুলতানের মতো এ সুলতান তাঁর পুত্রকে জাহাজে না-পাঠালে আমরা তীরে অবতরণ করতে অস্বীকার করি। অতঃপর তাঁর পুত্রকে তিনি জাহাজে পাঠালে আমরা তীরে যাই। তিনি আমাদের বিশেষ সমাদর করেন।

মাঙ্গারুরে তিন দিন কাটিয়ে আমরা আবার পাল তুলে দিলাম হিলি[১৪] যাবার উদ্দেশ্যে। দু'দিন লাগলো হিলি পৌঁছতে। বড় বড় জাহাজ চলাচলের উপযোগী একটি প্রশস্ত খাড়ির পাড়ে এ শহরটি। চীন থেকে যে সব বন্দরে জাহাজ আসে তার ভেতর এ শহরটিই সবচেয়ে বেশী দূরে। চীনের জাহাজ শুধু এ বন্দরে, কাওলামে এবং কালিকটে আসে। এখানকার প্রধান মসজিদটির জন্য মুসলিম ও বিধর্মী সবাই এ শহরটিকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং সমুদ্রগামীরা মসজিদের নামে বহু মানত করে। এ মসজিদে কিছু সংখ্যক ছাত্র বাস করে। তারা মসজিদের আয় থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকে। এ ছাড়া মসজিদের একটি লঙ্গরখানা থেকে মুসাফের এবং গরীব মুসলমানদের আহার্য দেওয়া হয়। সেখান থেকে জারফাট্টান (Cannanore) দাহ্‌ফাট্টান এবং বাদফাট্টান যাই। এ শহর ক'টির সুলতানকে কুওয়াল (Kuwal) বলা হয়। তিনি মালাবারের শক্তিশালী সুলতানদের অন্যতম। দাহ্‌ফাট্টানে কুওয়ালের পিতামহ কর্তৃক নির্মিত একটি bain ও একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ আছে। কুয়ালের পিতামহ ইসলামে দীক্ষাগ্রহণ করে মুসলমান হন। বাদফাট্টানের অধিবাসীদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। বিধর্মীরা তাদের শ্রদ্ধা করে। ব্রাহ্মণরা মুসলমানদের ঘৃণা করে। সে কারণে এদের মধ্যে কোনো মুসলমান বসবাস করে না। বাদফাট্টান থেকে জাহাজ ছেড়ে আমরা ফান্দারায়না (পান্দেরানি) পৌঁছি। পান্দেরানি বাজার ও ফলের বাগান সমৃদ্ধ একটি বড় শহর। এ শহরে তিন-চতুর্থাংশ মুসলমানরা দখল করেছে। প্রত্যেক অংশেই একটি করে মসজিদ আছে। এ বন্দরে এসেই চীন দেশী জাহাজ শীতকাল কাটায়। এখান থেকে আমরা মালাবারের অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর কালিকটে পৌঁছলাম। এখানকার পোতাশ্রয়টি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পোতাশ্রয়। সূদুর চীন, সুমাত্রা, সিংহল, মালদ্বীপ, ইয়েমেন ও ফার্স থেকে লোকজন এখানে যাতায়াত করে এবং নানা দিক থেকে সওদাগরেরা এখানে[১৫] আসে।

কালিকটের সুলতান একজন বিধর্মী। তাকে বলা হয় "সামারী"। কোনো কোনো গ্রীকদের মতোই তিনি মুণ্ডিতশ্মশ্রু একজন বৃদ্ধ। এ শহরেও মিঁদকাল নামক প্রসিদ্ধ একজন জাহাজের মালিক বাস করে। তার অনেক ধনরত্ন ও ভারত, চীন, ইয়েমেন ও ফার্সের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য অনেক জাহাজ রয়েছে। আমরা শহরে গিয়ে পৌঁছলে প্রধান প্রধান অধিবাসীরা ও সওদাগরেরা এবং সুলতানের প্রতিনিধিরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। তাদের সঙ্গে ছিল জয়ঢাক, শিঙ্গা, বিউগ্‌ল এবং জাহাজের মাথায় পতাকা। অপূর্ব জাঁকজমক সহকারে আমরা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করি। এ রকম

জাঁকজমক এসব দেশের কোথাও দেখিনি। দুঃখ কষ্টের আগে এ জাঁকজমক আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হয়েছে। আমরা কালিকট বন্দরে নোঙ্গর করে তীরে গেলাম। বন্দরে তখন তেরো খানা চীন দেশীয় জাহাজ নোঙ্গর করে আছে। আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ঘর দেওয়া হলো থাকবার জন্য। চীন যাত্রার অনুকূল আবহাওয়ার অপেক্ষায় আমরা সেখানে তিন মাস কাটালাম বিধর্মী সুলতানের মেহ্মান হিসাবে। চীন সমুদ্রে শুধু চীন দেশীয় জাহাজেই যাতায়াত সম্ভব। সে জন্য এখানে তাদের বর্ণনা দিচ্ছি।

চীনের জাহাজ তিন প্রকার। বড় জাহাজগুলোকে বলা হয় চঙ্ক, মাঝারী আকারের গুলো জাও (Dhows) আর ছোট গুলো কাকাম। বড় জাহাজে তিন থেকে বারোখানা অবধি পাল খাটান হয়। পাল তৈরী করা হয় বাঁশের চাটাই দিয়ে। সেগুলো কখনো নামিয়ে রাখা হয় না, বাতাসের গতি দেখে শুধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জাহাজ যখন নোঙ্গর করা থাকে তখনও পালগুলো খাটানো থাকে। একটি জাহাজে লোকলস্করের সংখ্যা থাকে হাজার। তাদের ছ'শ নাবিক আর বাকি সবাই সৈনিক। সৈনিকদের মধ্যে আছে তীরন্দাজ, ঢালধারী এবং তরল ধাতু নিক্ষেপকারী। প্রতিটি বড় জাহাজের সঙ্গে তিনটি ছোট জাহাজও থাকতো। তাদের একটি 'অর্ধেক' আরেকটি 'এক-তৃতীয়াংশ' অন্যটি 'এক-চতুর্থাংশ'[১৬]। এ সব জাহাজ তৈরী করা হতো শুধু জইতুন ও সিংকালান (ক্যান্টন) শহরে। জাহাজগুলো চারতলা বিশিষ্ট। তাতে রয়েছে কামরা, কেবিন, সওদাগরদের জন্য সেলুন। কেবিনেও খাস-কামরা, ও স্নানাগার রয়েছে। কেবিনের অধিকারী নিজের কেবিন তালাবদ্ধ করে রাখতে পারে। অনেক সময় তারা ক্রীতদাসী অথবা নিজের স্ত্রী সঙ্গে রাখে। অনেক সময় এক-এক কেবিনের অধিবাসী হয়তো কোনো বন্দরে না পৌঁছা পর্যন্ত জাহাজের অপর যাত্রীদের কাছে অপরিচিতই থেকে যায়। নাবিকদের ছেলেমেয়েরা চৌবাচ্চায় তরি-তরকারী শাকশব্জী ফলায়। জাহাজে মালীকের প্রতিনিধির মর্যাদা একজন বড় আমীরের মতো। তিনি যখন তীরে যান, তাঁর আগে-আগে যায় তীরন্দাজরা আর বর্শা, তলোয়ার, ঢাক, শিঙ্গা প্রভৃতিসহ আবিসিনিয়ার ভৃত্যেরা। তাঁর গন্তব্য স্থানে যাবার পর সঙ্গীরা দরজার দু'পাশে বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ তিনি সেখানে অবস্থান করেন ততক্ষণ এরাও একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। চীনের কোনো-কোনো লোক একাই অনেকগুলো জাহাজের মালীক। সে সব জাহাজ প্রতিনিধিদের দ্বারা বিদেশে পাঠানো হয়। চীনদের মতো ধনীলোক দুনিয়ার আর কোথাও নেই।

চীন যাত্রার অনুকূল মৌসুম যখন শুরু হলো, সুলতান সামারী কালিকট বন্দরের তেরখানা জাহাজের একটিকে আমাদের যাত্রার উপযোগী করে তুললেন। সে জাহাজ বা জাঙ্কে যিনি মালীকের প্রতিনিধি তাঁর নাম সুলেমান। তিনি সিরিয়ার (প্যালেস্টাইন) অন্তর্গত সাফাদের অধিবাসী। আমি আগে থেকেই তাঁকে চিনতাম। তাই তাঁকে বললাম আমি আমার ক্রীতদাসী বালিকাদের জন্য নিজে একটি কেবিন চাই, কারণ তাদের সঙ্গে না-নিয়ে আমি কখনো সফরে বের হই না।

তিনি বললেন, চীনের সওদাগররা সবগুলো কেবিন তাদের আসা ও যাবার জন্য ভাড়া করে রেখেছে। আমার জামাইয়ের একটি কেবিন আছে। সেটা আমি আপনাকে দিতে পারি কিন্তু সে কেবিনটির স্নানাগার নাই। সম্ভবত আপনি সেটা অন্য কোনো কেবিনের সঙ্গে বদলী করে নিতে পারবেন।

আমি তখন আমার সঙ্গীদের মালপত্র জাহাজে উঠাতে বললাম। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ক্রীতদাসরাও জাহাজে গিয়ে উঠলো। সেটা ছিল বৃহস্পতিবার। কাজেই, আমি একদিন তীরেই রয়ে গেলাম পরের দিন জুমার নামাজে যোগ দেবো বলে। রাজা সান্‌বুল ও জহিরউদ্দিন তাদের উপহার-সামগ্রীসহ জাহাজে উঠে বললো, যে কেবিন আমরা পেয়েছি সেটি ছোট এবং অনুপযোগী। আমি ক্যাপ্টেনের কাছে সে কথা বলায়, তিনি বললেন, এর কোনো প্রতিকারে, উপায় নেই। কিন্তু আপনি যদি কাকামে যেতে রাজী থাকেন তবে সেখানে আপনার পছন্দ মতো কেবিন পাওয়া যাবে। আমি তাতেই রাজী হয়ে সঙ্গীদের মাল-পত্র ও ক্রীতদাস দাসীদের সহ কাকামে উঠতে বললাম। জুমার নামাজের আগেই আমাদের ওঠার কাজ শেষ হলো। এ সমুদ্রে একটা বিশেষ লক্ষণ হলো, প্রতিদিন বিকালেই ঝড় উঠবে। তখন কেউ জাহাজে উঠতে পারে না। জাঙ্কগুলো আগেই পাল তুলে রওয়ানা হয়েছে। শুধু দু'খানা জাঙ্ক তখনও রওয়ানা হয়নি। তার একখানায় ছিলো উপহার সামগ্রী আরেক খানার মালীক শীতকালটা ফান্দারায়নায় কাটাবে স্থির করেছে। এ ছাড়া ছিল কাকাম, যার কথা আগেই বলেছি। শুক্রবারের রাত আমরা তীরেই কাটালাম। ঝড়ের জন্য আমরাও জাহাজে উঠতে পারিনি, জাহাজে যারা ছিলো তারাও নেমে এসে আমাদের সঙ্গে মিলতে পারেনি। একটি কার্পেট ছাড়া শুয়ে ঘুমাবার উপযোগী আর কিছুই আমার সঙ্গে ছিলো না। শনিবার ভোরে জাঙ্ক ও কাকাম দু'টোই তীর থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। যে জাঙ্ক খানার ফান্দারায়না যাবার কথা সেখানাও ডাঙ্গায় উঠে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। যারা জাঙ্কে ছিলো তাদের অনেকে ডুবে মরেছে অনেকে অবশ্যি জীবন রক্ষা করেছে। সেই রাত্রেই সুলতানের উপহার দ্রব্যবাহী জাহাজ খানারও একই দুদর্শা ঘটলো এবং যারা আরোহী ছিলো তারা ডুবে মারা গেলো। পরের দিন ভোরে আমরা সানুবল ও জহিরউদ্দিনের লাশ পেলাম। যথারীতি জানাজা পড়ে আমরা তাদের সমাহিত করলাম। আমি কালিকটের বিধর্মী সুলতানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তখন প্রকাণ্ড একটা সাদা কাপড় কোমরে জড়িয়ে ছোট পাগড়ী মাথায় দিয়ে খালি পায়ে সমুদ্রের পাড়ে ছিলেন। একজন ক্রীতদাস তাঁর মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাঁর সামনে আগুন জ্বেলে রাখা হয়েছে। সমুদ্র থেকে ঝড়ে যেসব জিনিষপত্র ডাঙ্গায় উঠেছে বহু লোকজন তা কুড়িয়ে নিচ্ছিল। সুলতানের পুলিশ তাদের মেরে তাড়াবার চেষ্টা করছিল। শুধু এখানে ছাড়া মালাবারের সর্বত্র ঝড়ে ধ্বংস-প্রাপ্ত জাহাজের মালামাল সরকারী খাজাঞ্চীতে জমা হয়। কিন্তু কালিকটে মালীকেরাই মালামালের অধিকারি হয়। এ জন্যই কালিকট একটি সমৃদ্ধিশালী শহরে পরিণত হয়েছে এবং অনেক ব্যবসায়ীকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাঙ্কের কি দুরবস্থা হয়েছে তা দেখতে পেয়ে কাকামে যারা ছিলো তারা পাল তুলে কাকাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে চলে গেল। তার ফলে আমার জিনিষ পত্রসহ ক্রীতদাস দাসীও সেই সঙ্গে নিয়ে গেলো। শুধু একলা আমি সমুদ্রোপকূলে পড়ে রইলাম আজাদীপ্রাপ্ত আমার একজন ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে। অবশেষে আমার এ অবস্থা দেখে সেও আমাকে ত্যাগ করে গেলো। তখন আমার কাছে সম্বল মাত্র দশটি দীনার আর যে কার্পেটে ঘুমিয়ে ছিলাম সেটি।

আমি শুনেছিলাম, কাউলামে গিয়ে কাকাম ভিড়বে। কাজেই সেখানে যাবো বলে স্থির করলাম। সেখানে যেতে হেঁটে বা নদীপথে দশদিন লাগে। আমি নদীপথেই রওয়ানা হয়ে একজন মুসলমানকে ভার দিলাম আমার কার্পেটটি বয়ে নিতে। সেখানে নিয়ম হলো, বিকালে জাহাজ থেকে নেমে তীরবর্তী গ্রামে রাত কাটাতে হয়, ভোরে এসে আবার উঠতে হয় জাহাজে। আমরাও তাই করেছি। কার্পেট বহনের জন্য যে লোকটিকে আমি নিয়োগ করেছিলাম, সে ছাড়া জাহাজে আর কোনো মুসলমান নেই। আমরা যখন তীরে যেতাম তখন সে লোকটি বিধর্মীদের সঙ্গে মিশে মদ্যপান করতো এবং চেচাঁমেচি করে আমাকে বিরক্ত করতো। তার ফলে আমার দুর্দশা চরমে উঠলো। আমাদের যাত্রার পঞ্চম দিনে আমরা একটি পাহাড়ের উপর কুঞ্জকারী নামক স্থানে পৌছলাম। এখানে য়িহুদিরা বাস করে। তাদের শাসনকর্তা নিজেদের মধ্যকার একজন য়িহুদী। শুধু কাওলামের সুলতানকে তাদের কর দিতে হয়। এ নদীর তীরের সব গাছই দারুচিনির আর ব্রেজিল নামক রং তৈরীর গাছ। তারা সে সব গাছ জ্বালানী কাঠরূপে ব্যবহার করে। আমরাও রান্নার কাজে এ কাঠই ব্যবহার করেছি। দশম দিনে আমরা এসে কাওলামে পৌছলাম। কাওলাম মালাবার[১৮] অঞ্চলের একটি সুন্দর শহর। চমৎকার বাজার আছে এখানে। ব্যবসায়ীদের এখানে বলা হয় সুলি। তারা অত্যন্ত ধনবান। একজন ব্যবসায়ীই একটা জাহাজ মালপত্রসহ কিনে নিজের ঘরের মৌজুদ মাল দিয়ে বোঝাই করতে পারে। এখানে মুসলমান ব্যবসায়ীদের একটি উপনিবেশ আছে। খাজা মুহাজ্জাব নামক একজন ব্যবসায়ীর দ্বারা তৈরী প্রধান মসজিদটি অতি সুন্দর। মালাবারের এ শহরটি চীন থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী। এখানেই চীনের অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা এসে হাজির হয়। এ শহরে মুসলমানদের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান আছে। কাওলামের সুলতান তিরাওয়ারী নামক একজন বিধর্মী। তিনি মুসলমানদের সম্মান করেন। চোর ও বদ্‌মায়েসদের বিরুদ্ধে তাঁর আইন খুব কঠোর। আমি কিছুদিন কাওলামের এক মুসাফেরখানায় কাটালাম, কিন্তু আমার কাকমের কোনো সন্ধান পেলাম না। আমি সেখানে থাকাকালেই চীনের রাজদূতেরাও আসেন। যে সব জাহাজ ধ্বংস হয়েছে তার একটিতে তাঁরাও ছিলেন। চীনের ব্যবসায়ীরা তাঁদের জামা কাপড় দান করেন এবং তাঁরা চীনে ফিরে যান। পরে চীনে এঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়।

প্রথমে আমি মনে করেছিলাম, কাওলাম থেকে সুলতানের কাছে ফিরে গিয়ে উপহার-সম্ভারের দুর্দশার কথা তাঁকে বলবো। কিন্তু পরে ভয় হলো, আমি যা করেছি তারজন্য তিনি আমাকেই দোষী করবেন বলে। তিনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, আমি নিজে তাঁর উপহার দ্রব্যের সঙ্গে রইনি কেনো। অবশেষে আমি স্থির করলাম, হিনাওরের সুলতান জামালউদ্দিনের কাছে যাবো এবং কাকামের খবর না পাওয়া অবধি সেখানেই কাটাবো। কাজেই আমি কালিকটে ফিরে এলাম এবং সেখানে এসে ভারত সুলতানের একখানা জাহাজ পেয়ে তাতে চড়ে বসলাম। তখন সমুদ্রযাত্রার উপযোগী সময় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা তখন দিনের প্রথমভাগ জাহাজ চালিয়ে পরের দিন অবধি নোঙ্গর করে কাটাতাম। পথে একে-একে চারটি যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। আমরা খুব ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের কোনো অনিষ্ট করেনি। আমি হিনাওরে পৌছে সুলতানকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে বাসস্থান দিলেন কিন্তু কোনো ভৃত্য সেখানে ছিলো না। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়তে বললেন।

আমি অধিকাংশ সময় মসজিদে[১৯] কাটাতাম প্রত্যহ কোরাণ শরিফ পাঠ করে। পরে দিনে দুবারও কোরাণ পাঠ করেছি।

সুলতান জামালউদ্দিন তখন সান্দাবুর (গোয়া) অভিযানের জন্য বাহান্নখানা জাহাজ সজ্জিত করেছিলেন। সেখানকার সুলতান ও তাঁর পুত্রের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। পুত্র সুলতান জামালউদ্দিনের পত্র লিখেন সান্দাবুর অভিযানের জন্য। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, সান্দাবুর অভিযান করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন এবং জামালউদ্দিনের কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন। জাহাজগুলো যখন যাত্রার জন্য তৈরী হয়েছে তখন আমারও এ জেহাদে যোগদানের ইচ্ছা হলো। কাজেই, কোনো দৈববাণী পাবার জন্য আমি কোরাণ খুলে প্রথমেই একটি পৃষ্ঠার মাথায় পেলাম, খোদার পথে যারা থাকে খোদা তাদের সহায়তা করেন। এটি একটি উত্তম ভবিষ্যৎবাণী বলে আমার বিশ্বাস হলো। বিকালে সুলতান নামাজ পড়তে এলে বললাম, আমিও অভিযানে যোগ দিতে ইচ্ছা করি। তিনি বললেন, তা'হলে তোমাকে তাদের অধিনায়ক করা হবে। আমি তখন আমার কোরাণের দৈববাণীর কথা তাঁকে খুলে বললাম। তিনি তাতে এতো খুশী হলেন যে, নিজেও অভিযানের সঙ্গে যেতে তৈরী হলেন, যদিও এর আগে তিনি যেতে নারাজ ছিলেন। এক শনিবার তিনি একটি জাহাজে গিয়ে উঠলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই রইলাম। সোমবার বিকালে আমরা সান্দাবুর পৌছি। সেখানকার অধিবাসীরা যুদ্ধের জন্য তৈরীই ছিলো। কাজেই, ভোরের দিকে আমাদের জাহাজ তাদের দিকে অগ্রসর হতেই তারা জাহাজ লক্ষ্য করে কামানের সাহায্যে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। জাহাজে যারা ছিলো তারা তখন ঢাল ও তলোয়ার হাতে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমিও তাদের সঙ্গেই ঝাঁপ দিলাম। খোদা মুসলমানদের বিজয়ী করলেন। আমরা তরবারী হস্তে শহরে প্রবেশ করলাম। অধিবাসীদের বেশীর ভাগ তখন তাদের সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিন্তু আমরা যখন প্রাসাদ লক্ষ্য করে অগ্নি নিক্ষেপ করলাম তখন তারা বেরিয়ে আসতে লাগলো। এসে আমাদের হাতে ধরা দিলো। অতঃপর সুলতান তাদের মুক্তি দিলেন এবং তাদের স্ত্রীপুত্রদের তাদের সঙ্গে মিলতে দিলেন। তারা সংখ্যায় ছিলো প্রায় দশ হাজার। সুলতান শহরের একটি উপকণ্ঠে তাদের বাসস্থান করে দিলেন এবং নিজে গিয়ে প্রাসাদ দখল করলেন। তাঁর সভাসদ্‌রা রইলেন প্রাসাদের চারদিক ঘিরে।

শহর অধিকারের পর তিন মাস সান্দাবুরে কাটিয়ে আমি পুনরায় আমার যাত্রা শুরু করবার অনুমতি চাইলাম সুলতানের কাছে। তিনি তখন পুনরায় তাঁর কাছে যাবার জন্য আমাকে ওয়াদা করালেন। কাজেই আমি প্রথমে হিনাওর এলাম। সেখানে থেকে মাঞ্জারুর ও আগের মতোই অন্যান্য শহর হয়ে কালিকটে পৌছলাম। কালিকট থেকে গেলাম সুদৃশ্য শহর আস-সালিয়াটে। এখানে আস-সালিয়াট নামে পরিচিত একরকম কাপড় তৈরী[২০] হয়। বহুদিন এ শহরে কাটিয়ে আবার আমি কালিকটে ফিরে এলাম। তখন আমার দু'জন ক্রীতদাস ফিরে আসে। তারাও আমার কাকামে ছিলো। তাদের কাছে জানতে পারলাম, সুমাত্রার শাসনকর্তা আমার ক্রীতদাসী বালিকাদের নিয়ে গেছেন। জিনিষপত্রও নানাজনে আত্মসাৎ করেছে এবং সঙ্গীরা চীন, সুমাত্রা ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ কথা শুনে আমি হিনাওর ও সান্দাবুরে ফিরে এলাম পাঁচ মাস বাইরে থেকে। সেখানে তিন মাস কাটালাম।

আট

সান্দাবুরের যে বিধর্মী সুলতানকে পরাজিত করে আমরা শহরটি দখল করেছিলাম তিনি সে শহর পুনর্দখলের জন্য অগ্রসর হলেন। বিধর্মীরা সবাই পালিয়ে গিয়ে তাঁর দলে যোগ দিলো। আমাদের সৈন্যদের থাকতে দেওয়া হয়েছিলো আশেপাশের গ্রামগুলোতে। তারাও আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। বিধর্মীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আমরা মহাবিপদে পড়লাম। দুরবস্থা যখন চরমে পৌঁচেছে তখন আমি অবরুদ্ধ শহর ছেড়ে চলে এলাম কালিকট। কালিকটে এসে দিবাত-আল-মহল (মালদ্বীপ) সফরে যাবো স্থির করলাম। মালদ্বীপ থেকে জাহাজে উঠে দশ দিনের পরে আমরা মালদ্বীপ নামক দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছলাম। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য এই দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা হবে প্রায় দু'হাজার[১]। একশ' বা তার কম সংখ্যক দ্বীপ নিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী হয়েছে। এ বৃত্তে প্রবেশের একটি করে পথ বা প্রবেশ দ্বার এবং শুধু দ্বার দিয়ে জাহাজ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলে সেখান থেকে একজনকে তুলে নিতে হয় অন্য দ্বীপে যাবার পথ দেখাবার জন্য। দ্বীপগুলো এতো কাছাকাছি অবস্থিত যে একটি দ্বীপ ছাড়লেই অন্য দ্বীপের তাল গাছের ডগার নজরে পড়ে। যদি কোনো জাহাজ পথ হারায় তবে আর দ্বীপে পৌঁছতে পারে না। বায়ু স্রোত সে জাহাজকে করমণ্ডল উপকূলে বা সিংহলে নিয়ে ঠেকায়।

মালদ্বীপের অধিবাসীরা সবাই ধার্মিক ও সৎমুসলমান। দ্বীপগুলো বারোটি জেলায় বিভক্ত। তার প্রত্যেকটি একজন শাসনকর্তার অধীনে। শাসনকর্তার উপাধি 'কারদুই'। মহল নামক যে জেলার নামানুসারে এ দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ হয়েছে সেখানে সুলতানদের বাসস্থান। কোনো দ্বীপেই কোনো রকম ফসলের আবাদ নেই। একটী মাত্র জেলায় যবের মতো এক প্রকার শষ্য জন্মে। তাই আমদানী করা হয় মহলে। কল্‌বল্‌মাস নামক এক রকম মাছ এখানকার অধিবাসীদের খাদ্য। ছাগমাংসের গন্ধযুক্ত এ মাছ চর্বিহীন এবং দেখতে লাল। ধরার পরে মাছগুলো চার টুকরো করে কাটা হয় এবং হাল্‌কাভাবে রান্না করার পরে তালপাতার ঝুড়িতে করে শুকানো[২] (Smoked) হয়। ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে তারা সেগুলো আহার করে। এ মাছের কিছু কিছু রপ্তানী হয় ভারত, চীন ও

ইয়েমেনে। এসব দ্বীপে গাছ বলতে অধিকাংশই নারকেল গাছ। উপরোক্ত মাছের সঙ্গে নারকেল এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্য। নারকেল গাছ এক বিচিত্র বস্তু। প্রতিমাসে একটি হিসেবে বছরে বারোটি ফলের ছড়ি এ সব গাছে বের হয়। তার ফল কতক বড়, কতক ছোট, কতক সবুজ, কতক আবার শুষ্ক। এখানকার লোকে নারকেল দিয়ে দুধ, তেল ও মধু তৈরী করে— সে কথা আগেই বলেছি।

মালদ্বীপের অধিবাসীরা ইমানদার, ধার্মিক এবং সরলপ্রাণ। কিন্তু তারা শারীরিক দুর্বল এবং যুদ্ধে অপটু। প্রার্থনাই তাদের ধর্ম। একবার আমি যখন একটি চোরের হাত কেটে ফেলতে হুকুম দিয়েছিলাম, তখন সেখানে উপস্থিত কয়েকজন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। ভারতীয় জলদস্যুরা সে দ্বীপে কখনো চড়াও করে না বা দ্বীপবাসীদের উপর অত্যাচার করে না। কারণ, তারা অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে, কেউ সে দ্বীপের কিছুতে হস্তক্ষেপ করলে অচিরেই তার দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। এদের প্রত্যেক দ্বীপেই সুন্দর মসজিদ আছে। এখানকার লোকের অধিকাংশ বাসগৃহই কাটের তৈরী। এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে এবং ময়লা আবর্জনা এড়িয়ে চলে। নিজেদের গাত্র পরিষ্কার রাখবার জন্য এদের অধিকাংশই দিনে দু'বার করে গোসল করে। তা'ছাড়া এখানে অত্যাধিক গরম এবং শরীরে ঘাম ঝরে। তারা চন্দনতৈল বা ঐ জাতীয় প্রচুর গন্ধ তৈল ব্যবহার করে। পোশাক বলতে ব্যবহার করে শুধু চাদর (Apron)। পাজামার পরিবর্তে একখানা চাদর তারা কোমরে জড়ায়, আরেকখানা পিঠের উপর দেয় হাজীদের মতো। কেউ-কেউ পাগড়ী ব্যবহার করে। অনেকে তার পরিবর্তে শুধু একখানা রুমাল মাথায় জড়িয়ে রাখে। কোনো কাজী বা এমামের সঙ্গে দেখা হলে তারা পিঠের কাপড় সরিয়ে অনাবৃত পিঠে তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ি অবধি গমণ করে। এখানকার উচ্চ-নীচ সবাই নগ্নপদে চলাফেরা করে। গাছের ছায়াবৃত পথঘাটগুলো তারা সর্বদাই ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার রাখে। সে সব পথে হাটতে বাগানের ভেতরে হাঁটার মতোই মনে হয়। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই ঘরে ঢুকবার সময় তারা পা ধুয়ে ঢোকে। ধোয়ার পানি বারান্দায় রাখাই থাকে। পা ধোয়ার পরে তা মুছবার জন্য থাকে নারিকেল পাতায় তৈরী মোট এক রকম গামছা। মসজিদে ঢুকতে হলেও একই রীতি অনুসরণ করা হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, এখান থেকে মাছ রপ্তানী হয়। তা ছাড়া রপ্তানী হয় নারকেল, কাপড়, সূতী পাগড়ী, বহু প্রকার পিতল নির্মিত তৈজসপত্র, কড়ি এবং নারকেলের ছোবড়া । নারকেলের উপরের অংশ এরা গর্তে জড়ো করে রাখে এবং পরে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ছোবড়া বের করে। মেয়েরা পরে এগুলো দিয়ে দড়ি তৈরী করে। সে সব দড়ির সাহায্যে জাহাজের তক্তা বেঁধে জোড় লাগানো হয়। সে সব দড়ি ভারত, চীন ও ইয়েমেনে রপ্তানী হয়। এগুলো শনের দড়ি থেকে উত্তম। ভারতীয় ও ইয়েমেনের জাহাজ নারকেলের দড়ি দিয়েই বাঁধা হয়। কারণ ভারত মহাসাগরে পর্বতের বহু চুড়া আছে। তারকাঁটা দিয়ে তৈরী জাহাজ পবর্ত চুড়ার সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে যায়। নারকেলের এ দড়ি দিয়ে বাঁধা জাহাজ কখনো ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয় না। এ দ্বীপের বাসিন্দারা টাকা পয়সা হিসাবে কড়ি ব্যবহার করে। কড়ি সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা এক প্রকার

জীব। এ গুলোকে গর্তে রেখে দিলে ভিতরের মাংস পচে যায় এবং শাদা খোলস অবশিষ্ট থাকে। কেনা-বেচায় এ সব ব্যবহৃত হয় চার লক্ষ কড়ির পরিবর্তে এক স্বর্ণ দীনার হারে। অনেক সময় এর মূল্য কমে বারো অবধি বিনিময় হার হয়। তারা বাংলার অধিবাসীদের কাছে চাউলের পরিবর্তে কড়ি বিক্রি করে। বাংলায়ও এ জিনিস অর্থ হিসাবে ব্যবহার হয়। ইয়েমেনের লোকদের পণ্যের সঙ্গেও কড়ি বিনিময় হয়। তারা খালি জাহাজ সমুদ্রে স্থির রাখবার জন্য বালি বোঝাই না-করে কড়ি বোঝাই করে নেয়। কাফ্রীদের দেশেও মুদ্রা হিসাবে কড়ি ব্যবহৃত হয়। মালি ও গওগও-তে আমি ১,১৫০ কড়ি এক স্বর্ণ-দীনারের সঙ্গে বিনিময় হতে দেখেছি।

এখানকার নারীরা, এমন কি তাদের রাণীও, হাত আবৃত রাখে না। তারা চিরুণীর সাহায্যে মাথায় চুল আঁচড়ে এক পাশে রাখে। তাদের অধিকাংশই কোমর থেকে পা অবধি একখণ্ড কাপড় ব্যবহার করে। ফলে শরীরের অন্যান্য অংশ অনাবৃত থাকে। আমি যখন এখানে কাজীর পদে কাজ করেছিলাম তখন এ রীতি তুলে দিতে চেয়েছিলাম এবং কাপড় পরতে তাদের আদেশ করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে কৃতকার্য হতে পারিনি। মামলার সময় কোনো মেয়ে লোকেরই অনাবৃত অবস্থায় আমার সম্মুখে হাজির হবার হুকুম ছিলো না। এ ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারিনি। আমার কয়েকজন ক্রীতদাসী ছিলো। তারা দিল্লীর অনুকরণে কাপড় পরতো এবং মাথায় ঘোমটা দিতো। কিন্তু কাপড় পরতে তারা অভ্যস্ত ছিলো না বলে তাদের সৌন্দর্য না বাড়িয়ে বরং কিম্ভূতকিমাকার করে তুলতো। খাস করে তাদের একটি রীতি হলো পাঁচ দীনার বা তারও কম বেতনে কোনো গৃহে ভৃত্যের কাজ করা। সে ক্ষেত্রে তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব মনিবের। তারা এ কাজকে অবমাননাকর মনে করে না। তাদের অধিকাংশ বালিকাই এ কাজ করে। কোনো ধনীলোকের গৃহে দশ থেকে বিশ জন অবধি এ রকম বালিকা দেখতে পাওয়া যায়। কোনো বালিকা একটি পাত্র ভাঙলে তার দাম তাকেই দিতে হয়। এর বাড়ির কাজ ছেড়ে সে যদি অন্য বাড়িতে যেতে চায় তবে তার নতুন মনিব পুরানো মনিবের পাওনা শোধ করে দেয়। পুরানো মনিবের দেনা শোধ করে সে তখন নতুন মনিবের কাছে ঋণী হয়।

এ সব মেয়েদের আসল কাজ হলো নারকেলের ছোবড়ার দড়ি পাকানো। এখানকার যৌতুক খুব কম বলে এবং নারীসঙ্গ আনন্দদায়ক বলে এখানে বিয়ে করা খুবই সহজ। এখানে জাহাজ এসে পৌছলে খালাসীরা বিয়ে করে এবং অন্যত্র যাওয়ার প্রাক্কালে তাদের তালাক দেয়। বস্তুতঃ এ এক ধরনের সাময়িক বিবাহ। এখানকার নারীরা কখনো নিজের দেশ ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজী হয় না।

এ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপারে এই যে, এখানকার শাসনকর্তা খাদিজা নাম্নী একজন মহিলা। এক সময় তার পিতামহ ছিলেন শাসনকর্তা, তারপরে ছিলেন তার পিতা। তাঁর মৃত্যুর পরে শাসনভার ন্যস্ত হয় মহিলার ভাই শাহাবউদ্দিনের উপর। কিন্তু শাহাবউদ্দিন ছিলেন তখন নাবালক। পরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করা হলে খাদিজা এবং তাঁর কনিষ্ঠ দু'টি সহোদরা ছাড়া বংশের আর কেউ অবশিষ্ট

থাকে না। কাজেই খাদিজাই তখন সিংহাসনের অধিকারিনী হন। খাদিজার বিয়ে হয় তাদের ইমাম জামালউদ্দিনের সঙ্গে। তিনি উজিরের পদে উন্নীত হন এবং প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার অধিকারীও তিনিই হন। কিন্তু হুকুমজারী হয় খাদিজার নামে। ছুরির মত বাঁকা একটি লোহার যন্ত্রদ্বারা তালপাতার উপরে এখানে হুকুম লেখা হয়। একমাত্র কোরাণ ও ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ছাড়া আর কিছুই এখানে কাগজে লেখা হয় না। যখন কোনো বিদেশী এ দ্বীপপুঞ্জে আসে এবং দরবারে যায় তখন রীতি অনুসারে তাকে দু'খানা কাপড় সঙ্গে নিতে হয়। সুলতানাকে অভিবাদন করে একখানা কাপড় সে ছুড়ে দেয় পরে তাঁর স্বামী উজির জামালউদ্দিনের প্রতিও তদ্রূপ করে। তাঁর সৈন্যসংখ্যা প্রায় এক হাজার। বিদেশ থেকে তাদের বহাল করা হয়। কিছু সংখ্যক দেশী সৈনিকও অবশ্য তাঁর আছে। প্রত্যেক দিন প্রাসাদে এসে তারা সুলতানাকে অভিবাদন করে যায়। চাউল দিয়ে তাদের মাসিক বেতন পরিশোধ করা হয়। প্রত্যেক মাসের শেষে তারা দরবারে আসে, অভিবাদন করে এবং উজিরকে বলে, "আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ও বলবেন যে আমরা বেতনের জন্য এসেছি।" তখন তাদের বেতন দেবার হুকুম হয়। কাজী এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরাও যাদের উজিরই বলা হয়, প্রাসাদে এসে শ্রদ্ধা জানায় এবং খোজারা তাদের আগমনের সংবাদ পৌঁছে দিলে তারা প্রস্থান করে। অন্য যে কোনো রাজকর্মচারীর চেয়ে সাধারণের ভেতর কাজীর সম্মান সবচেয়ে বেশী। কাজীর আদেশ পালন করা হয় শাসনকর্তার বা তার চেয়েও গুরুত্ব সহকারে। তিনি প্রাসাদে কার্পেটে আসন গ্রহণ করেন। প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত রীতি অনুসারে কাজী তিনটি দ্বীপের উপস্বত্ব ভোগ করবার অধিকারী। এ দ্বীপপুঞ্জে কোন কারাগার নেই। কাঠের তৈরী মাল গুদামে অপরাধীদের বন্দী করে রাখা হয় । আমাদের মরক্কো দেশে যেমন খ্রীষ্টান কয়েদীদের রাখা হয় তেমনি এখানেও প্রত্যেক কয়েদীকে এক টুকরো কাঠের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়।

এ দ্বীপপুঞ্জে এসে প্রথমে যে দ্বীপে আমি অবতরণ করি তার নাম কান্নালুস। সুন্দর এ দ্বীপে অনেকগুলো মসজিদ। সেখানকার একজন ধর্মপ্রাণ লোকের বাড়ীতে আমি আশ্রয় গ্রহণ করলাম। মোহাম্মদ নামক দাফারের একজন লোকের সাক্ষাৎ পেলাম এ দ্বীপে। সে বলল, মহল দ্বীপে কাজী নেই। সেখানে গিয়ে উজিরের সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে আর আসতে দেবেন না। আমার ইচ্ছা ছিল, এখান থেকে মা'বার (করমণ্ডল), সিংহল, বাংলা এবং সেখান থেকেই চীনে রওয়ানা হব। কান্নালুসে পনেরো দিন কাটাবার পর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আবার যাত্রা করলাম। পথে অপর যে কয়টি দ্বীপে যাবার সুযোগ হলো, সব জায়গায়ই আমরা যথেষ্ট সমাদর ও আতিথেয়তা পেলাম। এমনি করে দশ দিন পরে আমরা সুলতানা ও তাঁর স্বামীর বাসস্থান মহালে পৌঁছে নোঙ্গর করলাম। এ দেশের নিয়মানুসারে বিদেশী কেউ এসে বিনা অনুমতিতে তীরে যেতে পারে না। তীরে যাবার অনুমতি পেয়ে আমি একটি মসজিদে ঢুকতে চাইলাম কিন্তু মসজিদের পরিচারক আমাকে উজিরের সঙ্গে প্রথম দেখা করা উচিৎ বলে জানালো। জাহাজের কাপ্তেনকে আগেই আমি বলে রেখেছিলামম, আমার কথা জিজ্ঞেস করলে, 'চিনি না' বলতে । কারণ

আমার ভয় ছিল, উজির আমার পরিচয় পেলেই আমাকে কাজীর পদে বহাল করে আটক রাখবেন। কিন্তু আমি জানতাম না যে, কে একজন যেনো আগেই আমার কথা লিখে জানিয়েছে এবং আমি যে দিল্লীতে কাজী ছিলাম তাও বলেছে। প্রাসাদে পৌছে তৃতীয় প্রবেশ পথের ধারে এক খোলা বারান্দায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। ইয়েমেনের কাজী ঈসা এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি উজিরকে অভিবাদন জানালাম। কাপ্তেন দশ টুকরো কাপড় এনেছিলেন। এক টুকরো কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে তিনি সুলতানকে অভিবাদন করলেন। তারপর আরেক টুকরো একই ভাবে ছুঁড়ে দিয়ে উজিরকে অভিবাদন করলেন। এভাবে সব কটি টুকরো শেষ হবার পর তাঁকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন আমি এঁকে চিনি না। অতঃপর তারা আমাদের কাছে পান ও গোলাব জল নিয়ে এলো। তাদের দেশে এসব সম্মানের চিহ্ন। একটি বাড়িতে আমরা থাকবার জায়গা পেলাম। একটি খোঞ্চা ভরতি ভাতের চারপাশে থালায় মাংস, মুরগী, ঘি এবং মাছ সহ আমাদের খাবার এসে পৌছল। দু'দিন পরে উজির আমাকে একটি পোষাক এবং আমার ব্যয় নির্বাহের জন্য এক লাখ কড়ি পাঠালেন।

দশ দিন পরে আরব ও পারস্যের কয়েকজন দরবেশ নিয়ে সিংহল থেকে একখানা জাহাজ এসে পৌছল। তাঁরা আমাকে চিনতে পারলেন এবং উজিরের পরিচালকদের কাছে আমার পরিচয় দিলেন। তাতে উজির আমাকে সেখানে রাখবার জন্য আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। রমজানের শুরুতে তিনি উজির ও আমীরদের এক ভোজসভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। পরে আমিও দরবেশদের সম্মানে একটি ভোজ দিতে ইচ্ছুক হয়ে উজিরের অনুমতি চাইলাম। কারণ দরবেশরা সিংহলে 'আদমের কদম' জেয়ারত করে এসেছেন। তিনি অনুমতি দিয়ে আমাকে পাঁচটি ভেড়া, চাউল, মুরগী, ঘি ও মসলা পাঠিয়ে দিলেন।

ভেড়া সেখানে মা'বার, মালাবার ও মাক্‌ডামা থেকে আমদানী হয় বলে খুবই দুষ্প্রাপ্য। আমি এসব সামগ্রী উজির সুলেমানের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে সুন্দরভাবে রান্না করিয়ে দিলেন। অধিকন্তু পিতলের থালাবাসন ও কার্পেট সরবরাহ করলেন। আমার ভোজসভায় যাতে কয়েকজন মন্ত্রী (Ministers) যোগদান করতে পারেন সেজন্য উজিরের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, এবং আমিও কিন্তু আসবো। তবে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। বাড়ী ফিরে দেখলাম, তিনি মন্ত্রী ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে আগেই সেখানে পৌছে গেছেন। উজির কাঠের একটি উঁচু বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলেন। যে সব মন্ত্রী ও আমীররা সেখানে হাজির হয়েছেন তাঁদের সবাই কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে উজিরকে সম্বর্ধনা জানাতে লাগলেন। এমনি করে সেখানে প্রায় এক'শ কাপড় জড়ো হলো এবং দরবেশরা সে সব নিয়ে গেলেন। অতঃপর খাদ্য পরিবেশন করা হলো। অতিথিদের খাওয়া শেষ হলে চমৎকার সুরে কোরাণ পাঠ হলো। দরবেশরা তখন তাঁদের শাস্ত্রানুসারে গান ও নৃত্য শুরু করলেন। আমি একটি আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তারা সেই আগুনের উপর হাঁটতে লাগলেন। মিষ্টি খাওয়ার মতো তাঁদের ভেতর কেউ-কেউ আগুন মুখে দিয়ে

খেতে লাগলেন। আগুন নিবে না-যাওয়া অবধি এমনি চললো। রাত্রি শেষ হয়ে এলে উজির চলে গেলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। সরকারী একটি বাগানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে উজির আমাকে বললেন, এ বাগানটি আপনার। আমি আপনার বাসের জন্য এর ভেতর একটি ঘর তৈরী করে দেবো। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাঁর সুখ-শান্তির জন্য মোনাজাত করলাম। পরে তিনি আমাকে দু'জন ক্রীতদাসী, কয়েক টুকরো রেশমী কাপড় এবং এক কৌটা জহরত পাঠিয়েছিলেন।

কিছুকাল পরে নিম্নবর্ণিত কারণে আমার প্রতি উজিরের ব্যবহার শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। উজির সুলেমান আমার সঙ্গে তার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠালেন। এ ব্যাপারে আমি উজির জামালউদ্দিনের অনুমতি চাইলাম। অনুমতি চাইতে যাকে পাঠালাম সে এসে বললো, এ প্রস্তাবে তিনি নারাজ, কারণ তার নিজের কন্যার ইদ্দতের কাল ফুরালে তাকেই তিনি আপনার কাছে বিয়ে দিতে চান। কিন্তু তাঁর কন্যা ভাল নয় আশঙ্কায় আমি তাকে বিয়ে করতে সম্মত নই। কারণ, এর আগেই তার দু'বার বিয়ে হয়েছে এবং রোসমতের আগেই দু'স্বামীই মারা গেছে। ইত্যবসরে আমিও ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এ দ্বীপে যে আসবে তার জ্বর হবেই হবে। কাজেই এ দ্বীপে ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প করে কিছু জহরত কড়ির পরিবর্তে বিক্রি করে ফেললাম। বাংলা দেশে যাবার জন্য একখানা জাহাজও ভাড়া করা হলো। তারপরে যখন আমি উজিরের কাছে বিদায় নিতে গেলাম তখন কাজী বেরিয়ে এসে বললেন, উজির বলছেন যদি আপনি যেতে চান তবে যা-কিছু আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা ফেরত দিতে হবে। আমি জবাবে বললাম, আমি তা দিয়ে কড়ি কিনে ফেলেছি। কাজেই সে সব নিয়ে যা-খুশী আপনারা করুন। তিনি আবার এসে বললেন, আপনাকে উজির সোনা দিয়েছেন, কড়ি তো দেননি। আমি বললাম, আমি সে সব বিক্রি করে সোনাই দেবো। কাজেই আমি সওদাগরদের কাছে কড়ি ফেরৎ দেবার জন্য গেলাম। কিন্তু উজির তাদের সে কড়ি ফেরত নিতে বারণ করে দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, যে কোনো রকমে আমার যাত্রা বন্ধ রাখা। অবশেষে তাঁর পাঠানো একজন সভাসদ এসে বললেন, উজির বলছেন, আপনি আমাদের কাছেই থেকে যান। তাতে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। আমি বুঝতে পারলাম আমি এখন তাদের ক্ষমতার ভেতরে রয়েছি। আমি স্বেচ্ছায় না-থাকলে আমাকে রাখবার জন্য এরা বলপ্রয়োগ করবে। কাজেই, নিজের ইচ্ছায় থেকে যাওয়াই ভাল। আমি তখন তার লোককে বললাম, বেশ, আমি তাঁর এখানেই থাকবো। লোকটি ফিরে গেলে উজির অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আমরা চাই আপনাকে আমাদের ভেতর রাখতে আর আপনি কিনা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চান। আমি তাঁকে অজুহাত দেখালাম, তিনি তা মেনে নিলেন। পরে বললাম, যদি আমাকে থাকতেই বলেন তবে আমার কিছু শর্ত আছে। তিনি বলে উঠলেন শর্ত মঞ্জুর হলো। কি সে শর্ত বলুন। আমি তখন বললাম, আমি পায়ে হেঁটে চলতে পারি না। (সেখানে রীতি হলো, উজির ছাড়া কেউ ঘোড়ায় চড়তে পারবে না। আমাকে একটা ঘোড়া দেবার পরে আমি যখন কোথাও

ঘোড়ায় চড়ে যেতাম তখন কৌতুহলী লোকজন ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে আমার পিছু ধাওয়া করতো। অবশেষে আমাকে উজিরের কাছে নালিশ করতে হলো। ফলে তিনি 'ডাঙ্কুরা' পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন যাতে কেউ আমার পিছু ধাওয়া না করে। 'ডাঙ্কুরা' পিতলের তৈরী বাটীর মতো। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তা বাজানো হয়। অনেক দূর থেকে সে বাজনা শুনা যায়। সর্বসাধারণের মধ্যে কোনো প্রকার ঘোষণা করতে হলে তা 'ডাঙ্কুরা' বাজিয়ে করতে হয়। উজির বললেন, আপনি যদি পাল্‌কী চড়তে চান তবে তাই করুন। তা' না হলে আমাদের একটা ঘোড়া আছে, ঘটকীও আছে একটা। আপনি যেটা খুশী নিতে পারেন। আমি ঘটকী পছন্দ করলাম। তখনই সেটা আমার কাছে আনা হলো। সেই সঙ্গে এলো পোষাক। তখন আমি বললাম, যে কড়িগুলো কিনেছিলাম তা দিয়ে কি করবো? তিনি বললেন, আপনার কোনো সঙ্গীকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন সেগুলো বিক্রি করে দেবার জন্য। আমি বললাম, পাঠাতে পারি যদি আপনিও আপনার একজন লোক দেন তাকে সাহায্য করতে। তিনি তাতে রাজী হলেন। তখন আমি পাঠালাম আমার সঙ্গী আবু মোহাম্মদকে এবং তারা পাঠালো আল-হাজ্ আলী নামক একজন লোককে।

রমজান শেষ হবার পরেই আমি উজির সোলেমানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলাম তাঁর কন্যাকে বিয়ে করবো বলে। উজির জামালউদ্দিনকে অনুরোধ জানালাম যাতে বিয়েটা তার সাক্ষাতে প্রাসাদেই সমাধা হয়। তিনি তাতে সম্মত হলেন এবং রীতি অনুযায়ী পান ও চন্দনকাঠ পাঠিয়ে দিলেন। সব মেহ্‌মানরা এলেন কিন্তু উজির সোলেমান বিলম্ব করতে লাগলেন। তাঁকে আনতে লোক পাঠানো হলো কিন্তু তবু তিনি এলেন না। দ্বিতীয়বার ডেকে পাঠাবার পরে তিনি তার কন্যা অসুস্থ বলে অজুহাত দেখালেন। পরে উজির আমাকে গোপনে বলেছিলেন। তার কন্যা এ বিয়েতে নারাজ, সে নিজেই নিজের কর্ত্রী। লোকজন এসে গেছে, কাজেই সুলতানার শাশুড়ীকে বিয়ে করার বিষয়ে আপনার মতামত কি? (তাঁর মেয়ের সঙ্গেই উজিরের ছেলের বিয়ে হয়েছে) আমি বললাম, বেশ ভালই। তখন কাজী ও সাক্ষী সাবুদ ডাকা হলো। বিয়ে পড়ানো হলো। উজির তাঁকে মোহরানা দিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁকে আমার কাছে পাঠানো হলো। তিনি একজন উত্তম নারী ছিলেন।

এই বিয়ের পরে উজির আমাকে জোর করেই কাজী পদে বহাল করলেন। তার কারণ, ওয়ারিশানের ভেতর কোনো সম্পত্তি ভাগ করে দেবার সময় কাজী সে সম্পত্তির দশ ভাগের এক ভাগ নিজের পারিশ্রমিক বলে গ্রহণ করতেন। তাঁর এ প্রথার জন্য আমি তাঁকে তিরস্কার করেছিলাম। বলেছিলাম ওয়ারিশানের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে আপনি শুধু ফি ছাড়া আর কিছুই পেতে পারেন না। এ ছাড়া কোনো কাজই তিনি ঠিকভাবে সমাধা করতেন না। আমাকে যখন নিযুক্ত করা হলো তখন থেকে আমি সব-কিছুই পবিত্র শরিয়ত অনুসারে করতে চেষ্টিত হলাম। সেখানে আমাদের দেশের মতো মামলা মোকদ্দমা নেই। তাদের মধ্যে প্রচলিত যে দুষনীয় রীতিটি প্রথম আমি সংশোধন করি তা ছিলো তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর পূর্ব-স্বামীর গৃহে অবস্থান। পুনরায় অন্যত্র বিবাহ না-হওয়া

অবধি তারা পূর্ব-স্বামীর গৃহেই বাস করতো। অচিরেই আমি এ প্রথা রদ করি। এ অপরাধে অপরাধী প্রায় পঁচিশজন লোককে আমার কাছে হাজির করা হয়। আমি তাদের প্রহার করে বাজারের ভিতর হাঁটিয়ে নিয়ে যাই এবং তাদের কবল থেকে মেয়েদের মুক্ত করে দেই। অতঃপর নামাজ পড়ার জন্যও আমি কঠোর আদেশ দেই। লোকদের উপর হুকুম ছিলো শুক্রবার নামাজের পরেই তারা রাস্তায় ও বাজারে দ্রুত বেরিয়ে যাবে এবং কারা নামাজে যোগদান করেনি তা দেখবে। আমি তাদের এসে অনুরূপভাবে প্রহার করে রাস্তায় মিছিল করাতাম। বেতনভুক এমাম ও মোয়াজ্জিনদের প্রতিও আমি তাদের কর্তব্যে তৎপর হতে বাধ্য করি। সে মতে সকল দ্বীপে চিঠি পাঠানো হয়। আমি মেয়েদের কাপড় পরাতেও চেষ্টা করেছি কিন্তু সে চেষ্টায় কৃতকার্য হতে পারিনি।

ইত্যবসরে আমি আরও তিনটি বিয়ে করেছি। তাদের একজন এক উজিরের কন্যা। তাকে এরা যথেষ্ট সম্মান করতো, কারণ এর পিতামহ একজন সুলতান ছিলেন। শাহাবউদ্দিনের পূর্ব-স্ত্রী ছিলেন আমার অন্যতমা স্ত্রী। এসব বিয়ের কারণে দুর্বল দ্বীপবাসীরা আমাকে ভয় করতে লাগলো এবং উজিরের কাছে আমার কুৎসা রটিয়ে আমাদের সম্পর্ক তিক্ত করে তুললো। একবার সুলতান শাহাবউদ্দিনের একজন ক্রীতদাসকে আমার নিকট হাজির করা হলো ব্যভিচারের অভিযোগে। প্রহারের পর আমি তাকে কারাগারে বন্দী করি। তাকে মুক্তি দেবার অনুরোধ করে উজির তার প্রধান সভাসদদের কয়েকজনকে আমার কাছে পাঠান। আমি তাঁদের বললাম, আপনারা কি এমন একজন নিগ্রো গোলামের পক্ষ সমর্থন করতে চান যে তার মনিবের ইজ্জতের হানি করেছে ? অথচ শাহাবউদ্দিন তার একজন ক্রীতদাসের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন বলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং পরে তাঁকে হত্যা করেন। তৎপর আমি সেই গোলামকে ডাকিয়ে এনে বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটালাম এবং তার গলায় দড়ি বেঁধে দ্বীপে টহল দেওয়ালাম। চাবুকের চেয়ে বাঁশের লাঠির প্রহার অপেক্ষাকৃত শক্ত। এ খবর শুনতে পেয়ে উজির ভয়ানক রেগে গেলেন। তিনি তার উজিরদের এবং সেনাপতিদের একত্র করে আমাকেও ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। যদিও সাধারণতঃ আমি তাকে কুর্নিশ করে থাকি, সেদিন কুর্নিশ না-করে সেদিন শুধু আচ্ছালাম আলাইকম বললাম। তারপর উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললাম আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি আমার কর্তব্য পালনে অক্ষম বলে পদত্যাগ করছি। উজির আমাকে লক্ষ্য করে কথা বলতে লাগলেন। আমি মঞ্চের উপর উঠে তার সামনে গিয়ে বসলাম এবং অনমনীয় মনোভাব নিয়ে তাঁর কথার উত্তর দিতে লাগলাম। ঠিক এমনি সময়ে মোয়াজ্জিন মাগ্‌রিবের নামাজের আজান দিয়ে উঠলেন আর উজিরও উঠে প্রাসাদের ভেতর চলে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, সবাই বলে আমি সুলতান। এ লোকটিকে ডেকে আনলাম আমার রাগ দেখাতে অথচ সেই আমাকে তার রাগ দেখাচ্ছে। আমি সেখানে যে সম্মান পেয়েছি তা শুধু ভারতের সুলতানের জন্য। কারণ তিনি আমাকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন তা তারা জানতো। তারা যদিও অনেক দূরে বাস করতো তবু তাদের মনে সুলতানের ভয় কম ছিলো না।

উজির প্রাসাদে প্রবেশ করেই পদচ্যুত আগের কাজীকে ডেকে পাঠালেন। এ লোকটি ছিলেন দুর্মুখ। এসেই তিনি আমাকে বললেন আমাদের মনিব জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি তাকে কুর্নিশ না করে এতো লোকের সামনে তার মর্যাদাহানি করলেন কেনো। আমি জবাবে বললাম, তার সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিলো বলেই আমি তাঁকে কুর্নিশ করতাম কিন্তু তার মনোভাবের পরিবর্তন দেখে আমি সে অভ্যাস ত্যাগ করেছি। মুসলমানের অভিবাদন হলো 'সালাম'। আমি তাঁকে যথারীতি 'সালাম' করেছি। উজির তাঁকে দিয়ে দ্বিতীয়বার আমাকে বলে পাঠালেন, আপনি শুধু চলে যেতে চাইছেন। কাজেই যাওয়ার আগে আপনার বিবিদের এবং যা যৌতুক পেয়েছেন সব ফিরিয়ে দিতে হবে। তাঁ ছাড়া দেনাও শোধ করতে হবে। আমি তাঁকে কুর্নিশ করে গৃহে ফিরে এলাম এবং সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দিলাম। উজির এসব জানতে পেরে এবং আমি তখনও চলে যেতে চাইছি বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন এবং আমাকে চলে যাওয়ার যে অনুমতি দিয়েছিলেন তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি তখন প্রতিজ্ঞা করলাম যে, চলে যাওয়া ছাড়া আমার অন্য পথ নেই। আমার সবকিছু জিনিষপত্র সমুদ্রতীরে এক মসজিদে নিয়ে রাখলাম। তারপর উজিরের মন্ত্রীদের দু'জনের সঙ্গে একটা চুক্তি করা হলো। আমার এক বিবির ভগ্নীর স্বামী হলেন মা'বারের (করমণ্ডল) রাজা। এ দ্বীপপুঞ্জ তাঁর অধিকারে নিবার জন্য আমি সেখান থেকে সৈন্য নিয়ে আসবো এবং আমি এখানে তার প্রতিনিধি হয়ে থাকবো। স্থির করা হলো, আমাদের সঙ্কেত হবে সাদা নিশান। যখন তাঁরা সাদা নিশান দেখবেন তখন তীরে বিদ্রোহ্ ঘোষণা করবেন উজিরের বিরুদ্ধে। উজির আমার সম্বন্ধে যতদিন না বিরূপভাব পোষণ করেছেন ততদিন আমি নিজে কখনো এরকম প্রস্তাব করিনি। তিনি ভীত হয়ে আমার সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, আমার জীবিত কালেই হোক বা মৃত্যুর পরেই হোক এ লোকটি একদিন ওজারত দখল করবেই করবে। তিনি সব সময়েই আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন এবং বলতেন, আমি শুনেছি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য ভারতের সুলতান তাকে অর্থ পাঠিয়েছেন। আমি সৈন্য নিয়ে ফিরে আসবো মনে করে আমার যাওয়ার নামেই তিনি ভয় পেতেন। তাই একখানা জাহাজ ঠিকঠাক করে না দেওয়া অবধি তিনি আমাকে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম। তাঁর মন্ত্রীরা এবং গণ্যমান্য লোকেরা মসজিদে এসে আমাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি তাদের বললাম প্রতিজ্ঞা না করে ফেললে আমি আপনাদের সঙ্গে ফিরেই যেতাম। তাঁরা তখন প্রস্তাব করলেন, আবার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমি অন্য কোন দ্বীপে গিয়ে ফিরে আসতে পারি। তখন তাঁদের সন্তুষ্ট করতে আমি বললাম, বেশ তাই হবে। রাত্রে যখন আমার যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলো তখন উজিরের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে এভাবে কাঁদতে লাগলেন যে তাঁর চোখের পানি আমার পায়ের উপর পড়লো। আমার বৈবাহিক আত্মীয়েরা এবং বন্ধুরা বিদ্রোহ করবে আশঙ্কায় উজীর পরের রাত্রি নিজে দ্বীপ পাহারা দিয়ে কাটালেন।

আমি যাত্রা করে উজির আলীর দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে এসে আমার স্ত্রী ভয়ানক ব্যথায় আক্রান্ত হলেন এবং ফিরে যেতে চাইলেন । কাজেই আমি তাকে তালাক দিয়ে সেখানেই রেখে এলাম এবং উজিরকেও একথা লিখে দিলাম কারণ আমার স্ত্রী ছিলেন তার পুত্র-বধুর মাতা। আমার দ্বীপগুলোর বিভিন্ন জেলায় ঘুরতে-ঘুরতে এমন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে এলাম যেখানে মাত্র একটি বাড়ি। তার মালীক একজন তাঁতী। তার স্ত্রী, পরিবারস্থ অন্যলোক, কয়েকটি নারকেল গাছ এবং মাছমারা ও অন্য দ্বীপে যাতায়াতের জন্য একখান ক্ষুদ্র নৌকা ছিলো। তার এ দ্বীপে কয়েকটি কলাগাছও আমরা দেখেছি কিন্তু দু'টি দাঁড়কাক ছাড়া আর কোন পাখী সেখানে আমাদের নজরে পড়েনি। আমরা পৌঁছতে দাঁড়কাক দু'টি এসে জাহাজের উপর উড়ে-উড়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। আমি হলপ করে বলতে পারি, আমি ঐ লোকটিকে হিংসা করেছি এবং মনে মনে ইচ্ছা করেছি, আহা এমন একটি দ্বীপ যদি আমার থাকতো তবে এখানেই আমার বাসস্থান করতাম এবং জীবনে শেষ দিন অবধি এখানেই কাটাতাম। অতঃপর আমরা 'মুলুক' দ্বীপে এলাম। ক্যাপ্টেন ইব্রাহিমের জাহাজটি এখানেই পড়ে ছিলো। এ জাহাজে করেই আমি মা'বার যাবার সঙ্কল্প করেছিলাম। ইব্রাহিম ও তাঁর সঙ্গীরা আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে যথেষ্ট সমাদর দেখালেন। উজির এ দ্বীপ থেকে প্রত্যহ আমাকে ত্রিশ দীনারের কড়ি, কিছু নারকেল , মধু, পান, সুপারী ও মাছ দিবার আদেশ দিয়েছিলেন। আমি মুলুকে সত্তর দিন ছিলাম এবং দু'টি বিয়ে করেছিলাম। দ্বীপের বাসিন্দারা আশঙ্কা করেছিলো যে, যাবার দিন ইব্রাহিম তাদের দ্বীপ লুট করে যাবেন। কাজেই তারা প্রস্তাব করলো, ইব্রাহিমের সমস্ত অস্ত্রপাতি তাঁরা শেষ দিন অবধি নিজেদের কাছে রেখে দেবে। এ নিয়ে মনান্তর উপস্থিত হলো। আমরা মহলে ফিরে এলাম কিন্তু পোতাশ্রয়ের ভেতরে ঢুকলাম না। তারপর সমস্ত ঘটনা উজিরকে লিখে জানালে তিনি জবাব দিলেন অস্ত্রপাতি আটক করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমরা মুলুকে ফিরে এসে ৭৪৫ হিজরীর রবিউস্ সানি মাসের মাঝামাঝি (22nd. August 1344) সেখান থেকে যাত্রা করলাম। চার মাস পরে উজির জামালউদ্দিন এন্তেকাল করলেন—খোদা তার রুহের উপর দয়া বর্ষণ করুন!

জাহাজে কোনো অভিজ্ঞ পরিচালক ছাড়াই আমরা যাত্রা করেছিলাম। এ দ্বীপ থেকে মা'বারের দুরত্ব তিন দিনের। কিন্তু আমরা নয় দিন চলার পরে নবম দিনে সেলান (Ceylon) দ্বীপে এসে পৌঁছলাম। এখানে এসে দেখতে পেলাম সারান দ্বীপের পাহাড় আকাশে মাথা তুলে আছে ধুম্রের স্তম্ভের [৩] মতো। আমরা সে দ্বীপে এলেই নাবিকেরা বললো, যে সুলতানের রাজ্যে সওদাগরেরা নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারে এ দ্বীপ সে রাজ্যের অন্তর্গত নয়। দ্বীপটি আয়রি শাকারবতী নামক একজন রাজার। তিনি অত্যাচারী এবং তাঁর বোম্বেটে জাহাজ আছে।[৪] আমরা এ দ্বীপের পোতাশ্রয়ে আশ্রয় নিতে ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু পর মূহুর্তে ঝড় উঠায় জাহাজ ডুবির ভয়ে আমি কাপ্তেনকে বললাম, আমাকে তীরে নামিয়ে দিন। আমি সুলতানের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করবো যাতে তিনি কোনো রকম দুর্ব্যবহার না করেন। আমার কথা মতো তিনি আমাকে তীরে

নামিয়ে দিলেন। তাতে বিধর্মীরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? আমি বললাম যে, আমি মা'বারের সুলতানের বন্ধু ও ভায়রাভাই। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জাহাজের মালপত্র তাঁর জন্য উপহার। তারা সুলতানের কাছে ফিরে গিয়ে সংবাদ পৌছালো। তিনি খবর পেয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর রাজধানী বাট্টালা (পুট্টালাম) শহরে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। কাঠের দেওয়াল ও কাঠের মিনার দিয়ে ঘেরা বাট্টালা একটি ছোট শহর। এ শহরের সমস্ত উপকূল ছেয়ে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে পড়ে আছে দারুচিনির গাছ। স্রোতে এসব গাছ ভেসে এসেছে। মা'বার ও মালাবারের লোকে বিনামূল্যে এসব সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কিন্তু এজন্য সুলতানকে তারা বোনা কাপড় বা ঐ রকম সব জিনিস উপহার দিয়ে থাকে। এ দ্বীপ থেকে মা'বার একদিন ও এক রাতের পথ।

আমি বিধর্মী রাজা আয়রি শাকারবর্তীর সামনে হাজির হতেই তিনি উঠে এসে আমাকে নিয়ে তার পাশে বসালেন। এবং অত্যন্ত সদয়ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমার সঙ্গীরা সচ্ছন্দে নেমে এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন। কারণ, মা'বারের সুলতান আমার বন্ধু। তারপর তিনি আমাকে সেখানে থাকতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তিনদিন তার সেখানে ছিলাম। এ তিন দিনে আমার প্রতি তার আদর-যত্ন ক্রমশঃ বেড়েছে। তিনি পার্শী ভাষা জানেন। আমার কাছে বিভিন্ন রাজা ও দেশের গল্প শুনে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। একদিন আমাকে কিছু মূল্যবান মুক্তা উপহার দিয়ে তিনি বললেন, লজ্জিত হবেন না, আপনার যা-কিছু মন চায় আমাকে বলুন। আমি বললাম, এ দ্বীপে এসে অবধি মনে একটা বাসনাই হয়েছে। এবং সে বাসনা হলো আদমের কদম মোবারক জেয়ারত করা। (তারা বলে আদম বাবা এবং হাওয়াকে বলে মামা)। তিনি বললেন, সে তো সহজ ব্যাপার। একজন লোক সঙ্গে নিয়ে আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবো। আমি বললাম, তাই আমি চাই। আর যে জাহাজে আমি এলাম সে জাহাজখানা যেনো নিরাপদে মা'বার রওয়ানা হয়ে যেতে পারে। আমি যখন ফিরে যাবো তখন আপনার নিজের জাহাজে আমাকে পাঠাবেন। তিনি তাতে বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই। আমি পরে যখন কাপ্তেনকে এ সব কথা বললাম, তখন তিনি বললেন, আপনি ফিরে না গেলে আমিও যাবো না। দরকার হলে আপনার জন্য এক বছর এখানে অপেক্ষা করবো।

সুলতানকে সে কথা বললাম। তিনি বললেন, আপনি ফিরে না আসা অবধি কাপ্তেন আমার মেহমান হিসাবে এখানেই থাকবেন।

তৎপর সুলতান আমাকে একখানা পাল্কী দিলেন। পাল্কীর বাহকেরা তাঁরই গোলাম। এ ছাড়া আমার সঙ্গে দিলেন চারজন যোগী—যাদের রীতি প্রতি বছর সেখানে গিয়ে তীর্থ করা, তিনজন ব্রাহ্মণ,[৫] তাঁর কর্মচারীদের দশজন এবং খাদ্যসম্ভার বহনের জন্য আরও পনেরো জন লোক। সে রাস্তায় পানির কোনো অভাব নেই। প্রথম দিন একটি নদীর ধারে গিয়ে আমরা তাঁবু ফেলি। সে নদীটি পার হয়েছিলাম বাঁশের ভেলার সাহায্যে। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা রাজার রাজ্যের শেষ-সীমান্তে মনার মণ্ডলি(মিনারী মাণ্ডেল) নামক সুন্দর একটি শহরে যাই। শহরের বাসিন্দারা আমাদিগকে একটি চমৎকার ভোজের আয়োজন করে আপ্যায়িত করেন। সে ভোজে উপাদেয় ভোজ্য

ছিলো মহিষের বাচ্চার গোশ্‌ত। মহিষের বাচ্চা তারা জীবন্ত অবস্থায় জঙ্গল থেকে ধরে আনে। বন্দর সালাওয়াট (Chilaw) নামক ছোট শহর ছাড়িয়ে যাওয়ার পরে আমাদের রাস্তা শুরু হলো নদী-নালাবহুল অসমান ভূমির মধ্য দিয়ে। দেশের এ অংশে যথেষ্ট হাতি আছে, কিন্তু শেখ আবু আবদুল্লার দোয়ার বরকতে তারা বিদেশীদের বা তীর্থযাত্রীদের কোনো অনিষ্ট করে না। তিনিই আদমের কদম মোবারকে যাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম এ রাস্তাটি নির্মাণ করেন। এখানকার বিধর্মীরা পূর্বে মুসলমানদের কদম মোবারকে তীর্থ করবার অনুমতি দিতো না এবং তাদের উপর অত্যাচার করতো। এমন কি তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বা ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত করতো না। কিন্তু শেখের সময়ে যে ঘটনা ঘটে তারপর থেকে তারা মুসলমানদের সম্মান করতে থাকে, গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেয়, তাদের সঙ্গে পানাহার করে এবং তাদের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মেলামেশাকেও সন্দেহের চোখে দেখে না। আজ অবধি তারা এ শেখকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে এবং তাকে বিখ্যাত শেখ বলে।

তৎপর আমরা এখানকার প্রধান সুলতানের রাজধানী কুনাকর শহরে পৌছলাম ৬। দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ একটি উপত্যকায় এ শহরটি অবস্থিত। নিকটেই Lake of Rubies নামে একটি হ্রদ আছে। এ হ্রদে মণি-মুক্তা পাওয়া যায়। শহরের বাইরে শাবুশ নামে পরিচিত শিরাজের শেখ ওসমানের একটি সমজিদ আছে। সুলতানও এখানকার বাসিন্দারা তাঁর কবর জেয়ারত করে ও সম্মানের চোখে দেখে। তিনি কদম মোবারকের একজন প্রদর্শক বা গাইড ছিলেন। পরে যখন তাঁর হাত ও পা কেটে ফেলা হয় তখন থেকে প্রদর্শকের কাজ করেন তাঁর পুত্রগণ এবং গোলামগণ। তাঁর হাত পা কাটার কারণ, তিনি একটি গরু হত্যা করেছিলেন। বিধর্মী হিন্দুদের একটি আইন আছে, কেউ গোহত্যা করলে তাকেও ঠিক সেই ভাবে কেটে হত্যা করা হবে অথবা গরুর চামড়ায় পুরে দগ্ধ করা হবে। শেখ ওসমানকে তারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো বলেই শুধু তাঁর হাত পা কেটে ছেড়ে দেন এবং একটি বাজারের আয় তাঁকে দান করেন।

কুনাকরের সুলতানকে কুনার বলা হয়। তাঁর একটি শ্বেতহস্তী আছে। সারা পৃথিবীতে আমি সেই একটি শ্বেতহস্তীই দেখেছি। উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি শ্বেতহস্তীতে আরোহণ করেন। তখন এর কপালে বড় বড় মণি-মুক্তা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। বাহরামান (Carbuncles) নামক চমৎকার মণি শুধু এ শহরেই পাওয়া যায়। তার কিছু সংখ্যক পাওয়া যায় হ্রদে এবং কিছু সংখ্যক মাটী খুঁড়ে। হ্রদ থেকে যেগুলো পাওয়া যায় এদের কাছে সেগুলো বিশেষ মূল্যবান। সিংহল দ্বীপের সর্বত্রই জহরত বা মণি পাওয়া যায়। এখানকার জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যে কেউ একটি অংশ কিনে নিয়ে মণির জন্য খনন করতে থাকে। কোনো কোনো মণি লাল, কোনো কোনোটা হলদে (পোখ্‌রাজ) কতগুলো নীল (নীলকান্তমণি)। তাদের ভেতর প্রচলিত রীতি অনুসারে এক শ' ফানাম মূল্যের মণি হলেই তা সুলতানের সম্পত্তি। তিনি সেগুলোর মুল্য দিয়ে নিজে গ্রহণ করেন। কম দামের মণি যারা পায় সেগুলো তাদেরই সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। এক শ' ফানাম ছয় স্বর্ণ দীনারের সমতূল্য।

কুনাকর থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা উস্‌তা মাহ্‌মুদ লুরী নামক এক গুহার কাছে এসে রইলাম। উস্‌তা মাহ্‌মুদ নামক একজন ধার্মিক লোক একটি পাহাড়ের পাদদেশে

হ্রদের ধারে এ গুহাটি খনন করেন। সেখান থেকে আমরা বানরের হ্রদে (Lake of Monkeys) এলাম। এসব পাহাড়ে বহু সংখ্যক বানর আছে। এখানকার বানরগুলোর রং কালো এবং লেজ লম্বা। মানুষের মতো পুরুষ বানরের দাড়ী আছে। শেখ ওসমান, তাঁর ছেলেরা এবং অপর অনেকে বলেছেন, এসব বানরের একজন প্রধান আছে। তাকে অন্যান্য বানর রাজার মতই মান্য করে। প্রধান বানর মাথায় গাছের পাতা দিয়ে তৈরী একটা ফিতের মতো জড়ায় এবং লাঠিতে ভর করে দাঁড়ায়। চারটি বানর লাঠি হাতে দাঁড়ায় তার ডাইনে বাঁয়ে। প্রধান বানর আসন গ্রহণ করলে অপর বানর চারটি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং প্রধান বানরের স্ত্রীবানর ও বাচ্চারা তার সামনে এসে প্রত্যেক দিন বসে । অন্যান্য বানররা তখন এসে দুরে দুরে বসে। এবার পূর্বের চারটি বানরের একটি উঠে অপর বানরদের উদ্দেশ্য কিছু বলতেই তারা চলে যায়। তৎপর ফিরে আসে হাতে কলা, লেবু বা তেমনি কোনো ফলমুল নিয়ে। প্রধান বানর, তার বাচ্চারা এবং সঙ্গী চারজন সে সব ফল খায়। একজন যোগী আমাকে বলেছেন যে, প্রধান বানরের সামনে একটি বানরকে উক্ত চার বানর লাঠি দিয়ে প্রহার করছে এবং প্রহারের পরে চুল ছিঁড়ছে বলে তিনি দেখেছেন। সেখান থেকে চলতে চলতে আমরা যে জায়গায় গেলাম তার নাম 'বুড়ীর কুঁড়ে'। এখানেই লোকালয়ের শেষ। সেখান থেকে কতকগুলো গুহার পাশ দিয়ে আমাদের আসতে হয়। এখানে এসেই আমরা উড়ন্ত জোঁক দেখতে পাই। সেগুলো জলার ধারে গাছে বা লতাপাতার মধ্যে বসে থাকে। মানুষ কাছে গেলে এরা তার উপর লাফ দিয়ে পড়ে। শরীরের যেখানে এরা পড়ে সেখানেই অবাধে রক্তপাত হতে থাকে। এজন্য এখানকার লোকেরা সর্বদা একটি লেবু সঙ্গে রাখে। লেবু রগড়ে তার রস জোঁকের উপর ফেললেই জোঁক পড়ে যায়। তখন তারা একটা কাঠের ছুরির মত চটা দিয়ে জায়গাটা চেঁছে দেয়। এজন্য তারা কাটের ছুরিও সঙ্গে রাখে।

সরণদ্বীপের একটি পর্বত (Adam's Peak) পৃথিবীর অন্যতম উচ্চ পর্বত। নয়দিনের পথ দূরে থাকতেই সমুদ্রের বুক থেকে আমরা এ পর্বত দেখেছি। আমরা যখন এ পর্বতে আরোহণ করেছিলাম। তখন দেখা যাচ্ছিলো আমাদের নীচে। সেজন্য নীচের কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এ পাহাড়ের বুকে সবুজ বনানী ও নানা রংয়ের ফুল রয়েছে। ফুলের মধ্যে হাতের তালুর মতো বড় বড় গোলাপও আছে। পাহাড়ের উপর কদম (Foot) পর্যন্ত পৌছবার দু'টি পথ। তার একটির নাম 'বাবা পথ' অপরটির নাম 'মামা পথ' অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার পথ। মামা পথটি সহজ এবং সেই পথেই তীর্থযাত্রীরা নেমে আসে। কিন্তু কেউ যদি সে পথে উপরে যায় তবে সে আদৌ তীর্থভ্রমণ করেছে বলে গণ্য হয় না। বাবা পথটি দূরারোহ। পূর্ব পুরুষের লোকেরা এ পর্বতের গায়ে একটি সিঁড়ি কাটে এবং লোহার খুঁটি পুতে শিকল লাগিয়ে আরোহীদের ধরতে সুবিধা করে দেয়।[৭] এ রকম দশটি শিকল আছে। তার দুটি পাদদেশে প্রবেশ পথে তারপর পর পর সাতটি । দশম শিকলটিকে বলা হয় ইমানের শিকল। এ রকম নাম হবার কারণ এই যে, এ অবধি উঠে কেউ নীচের দিকে চাইলে পড়ে যাবার ভয়ে খোদার নাম স্মরণ করে। এই শিকলটি ছাড়িয়ে গেলে বন্ধুর একটি পথ। দশম শিকল থেকে খিজিরের গুহার দুরত্ব সাত মাইল। গুহাটি প্রশস্ত একটি মালভূমির মধ্যে অবস্থিত। কাছেই মাছে পরিপুর্ণ একটি ঝরণা আছে। কিন্তু কেউ সেসব মাছ ধরে না। কাছেই

পথের দু'পাশে পাথর কেটে দু'টি পুষ্করিণী খনন করা হয়েছে। খিজিরের গুহায় পৌছে যাত্রীরা তাদের মালপত্র সেখানে রেখে দু'মাইল উপরে কদম মোবারকে পৌছে।

হজরত আদমের সেই পবিত্র কদম মোবারক একটি প্রশস্ত মালভূমিতে উচ্চ কালো প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত। পবিত্র পদটি এতো গভীরভাবে বসেছে যে ছাপটি স্পষ্ট বসেছে। লম্বায় এ পদচিহ্ন এগারো বিঘৎ । পুরাকালে চীনের লোকেরা এখানে এসে বুড়ো আঙুলের ছাপসহ পাথরের কিছু অংশ কেটে নিয়ে যায়। সেটি জয়তুনের একটি মন্দিরে রক্ষিত আছে। দেশের দূরাঞ্চলের লোকেরা অবধি এখানে তা জেয়ারত করতে আসে। যে পাহাড়ে কদম মোবারক রয়েছে সেখানে নয়টি গর্ত করা হয়েছে। এ সব গর্তে বিধর্মী তীর্থযাত্রীরা স্বর্ণ, মূল্যবান মণিমুক্তা ও অলঙ্কারাদি দিয়ে যায় । দরবেশদের দেখা যায়, খিজিরের গুহায় পৌছবার পর এ সব গর্তে যা রক্ষিত আছে তা নিবার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেছে। আমাদের বেলা কিছু পাথর ও সামান্য সোনা ছাড়া সেখানে কিছুই পাইনি। সে সব আমরা গাইডকে দিয়েছি। খিজিরের গুহায় তিনদিন কাটিয়ে সকালে ও বিকালে তীর্থযাত্রীদের কদম মোবারক জেয়ারত করতে হয়, এই-ই এখানে প্রচলিত নিয়ম। আমরাও এ নিয়ম পালন করেছি। তিনদিন এখানে কাটাবার পর আমরা মামা পথে নেমে এলাম। আসবার সময় পথে পাহাড়ের উপর কয়েকটি গ্রামে আমরা থেমেছি। পাহাড়ের পাদদেশে এমন একটি প্রাচীন গাছ আছে যার পাতা কখনো ঝরে পড়ে না। গাছটি যেখানে আছে সেখানে যাওয়া কারও সম্ভবপর নয়। এ গাছের পাতা চোখে দেখেছে এমন কোনো লোকের দেখা আমি পাইনি। এ পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকজন যোগী দেখেছি। তারা গাছের পাতা পড়বার প্রতীক্ষায় কখনো এ জায়গা ছেড়ে যান না। এ সম্বন্ধে লোকমুখে নানা অলীক গল্প শুনা যায়। তার একটি হলো, এ গাছের পাতা যে খাবে সে বুড়ো হলেও যৌবন ফিরিয়ে পায়। কিন্তু তা সত্য হতে পারে না। এ পাহাড়ের তলায়ই রয়েছে সেই হ্রদ যেখানে জহরত পাওয়া যায়। এ হ্রদের পানির বর্ণ উজ্জ্বল নীল।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে সমুদ্রোপকূলে দিনাওয়ার একটি বড় শহরে এসে পৌছলাম। এ শহরে ব্যবসায়ীদের বাস। এ শহরের বড় একটি মন্দিরে[৮] দিনাওয়ার নামে একটি মূর্তি রক্ষিত আছে। এ মন্দিরে প্রায় এক হাজার ব্রাহ্মণ ও যোগী বাস করে। এ ছাড়া স্ত্রীলোক, বিধর্মীদের কন্যা আছে প্রায় পাঁচশ । তারা প্রতিদিন রাত্রে মূর্তির সামনে নৃত্যগীত করে। এ শহর এবং তাঁর সর্বপ্রকার আয় মন্দিরের মূর্তির জন্য বরাদ্দ করা আছে। সেইখান থেকে মন্দিরবাসী ও তীর্থযাত্রীদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়। প্রায় মানুষের সমান উচ্চ এ মূর্তিটি স্বর্ণ নির্মিত। মূর্তির চোখের স্থানে দুটি প্রকাণ্ড মণি আছে। রাত্রে তা বাতির মতই জ্বল্ জ্বল্ করে বলে শুনেছি।

এখান থেকে রওয়ানা হয়ে আঠারো মাইল দূরে কালি (Point-de-Galle) শহর। সেখান থেকে আমরা পৌছি কালান্‌বো (Colombo), সিংহলে এটি অতি সুন্দর এবং বড় একটি শহর। এখানে উজির ও জলম্ভি সাগরের শাসনকর্তা বাস করেন। তাঁর সঙ্গে এক হাজার হাবসী থাকে। কালান্‌বো থেকে রওয়ানা হয়ে তিন দিন পর আমরা আবার বাটালা এসে আমরা পূর্বোক্ত সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কাপ্তেন ইব্রাহীম তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেখান থেকে একসঙ্গে আমরা মা'বার রওয়ানা হলাম।

নয়

আমাদের মা'বার যাবার পথে হঠাৎ সমুদ্রে ঝড় উঠলো এবং পানিতে জাহাজ প্রায় ভর্তি হয়ে গেলো। অথচ জাহাজে আমাদের কোনো অভিজ্ঞ পদপ্রদর্শক ছিলো না। অল্পের জন্য আমাদের জাহাজ পাহাড়ের ধাক্কায় ভেঙ্গে চুরমার হবার হাত থেকে রেহাই পেলো। তারপরে জাহাজ এসে এক চড়ায় ঠেকে গেলো। আমরা প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পড়েছিলাম। জাহাজ হালকা করার জন্য যাত্রীরা নিজেদের মালপত্র সবই সমুদ্রে নিক্ষেপ করে একে-অপরের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে রেখেছিলো। আমরা জাহাজের মাস্তুলটি কেটে সমুদ্রে ফেলে দিলাম। নাবিকরা তাই দিয়ে তৈরী করলো একটি কাঠের ভেলা। তখন আমরা তীর থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে। আমি ভেলায় উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার সঙ্গীরা (দু'জন বাঁদী ও অপর দু'জন সঙ্গী) আমাকে ডেকে বললো, আমাদের ফেলে আপনি ভেলায় চড়তে যাচ্ছেন ? কাজেই আমার আগে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে বললাম, তোমরা দু'জন যাও এবং যে বালিকাটিকে আমি পছন্দ করি তাকেও সঙ্গে নাও।

এই বালিকাটি তখন বলে উঠলো, আমি খুব ভাল সাঁতার কাটতে জানি। ভেলার একটা দড়ি ধরে আমি সাঁতার কেটেই ওদের সঙ্গে যেতে পারব।

কাজেই আমার সঙ্গীদের দু'জন, একজন বালিকা গেলো ভেলায় চড়ে আর অপর বালিকাটি গেলো সাঁতার কেটে। নাবিকরাও ভেলার সঙ্গে দড়ি বেঁধে তাই ধরে সাঁতার কেটে চলে গেলো। আমি আমার দরকারী জিনিসপত্র, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধ দ্রব্যাদি তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা নিরাপদেই তীরে পৌঁছেছিল কারণ হাওয়া তাদের অনুকূলে ছিলো। আমি নিজে জাহাজেই থেকে গেলাম। ক্যাপ্টেন হালের সাহায্যে তীরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। নাবিকরা চারখানা ভেলা তৈরী করতে আরম্ভ করলো কিন্তু সেগুলো তৈরী হবার আগেই রাত হয়ে গেলো এবং জাহাজও বোঝাই হয়ে গেলো পানিতে। আমি জাহাজের পেছনের সবচেয়ে উঁচু পাটাতনটির উপরে গিয়ে উঠলাম। ভোর না-হাওয়া অবধি সেখানেই কাটলো। ভোরে একদল বিধর্মী একটি নৌকায়

আমাদের কাছে এলে আমরা তাদের মা'বারের মাটিতে এসে পা ফেললাম। আমরা তাদের জানালাম যে, তারা যে সুলতানের প্রজা, আমরা তার বন্ধু। তখন একথা তারা সুলতানকে লিখে জানালো। ঘটনার বিবরণ আমিও তাকে লিখে জানালাম।

আমরা সেখানে তিন দিন কাটালাম। তিন দিন পরে সুলতানের পাঠানো কয়েকটি ঘোড়া ও কয়েকজন লোক নিয়ে একজন আমীর এলেন। তাদের সঙ্গে একখানা পালকী ও দশটি ঘোড়া ছিলো। আমি আমার সঙ্গীরা, ক্যাপ্টেন এবং একটি বালিকা ঘোড়ায় এবং অপর বালিকাটি পাল্‌কীতে আরোহণ করলো। অতঃপর হারকাটু [১] কেল্লায় পৌছে আমরা রাত কাটালাম। বাঁদী বালিকা, দু'জন বালিকা, গোলাম এবং আমার সঙ্গীরা এখানেই থেকে গেলো।

পরের দিন আমরা সুলতানের তাঁবুতে পৌছলাম। সুলতানের নাম গিয়াসউদ্দিন দামাখান। তিনি মরহুম সুলতান জালালউদ্দিনের এক কন্যাকে বিবাহ করেছেন।[২] আমি দিল্লীতে থাকাকালে তাঁর অপর কন্যাকে বিবাহ করি। সারা ভারতে প্রচলিত রীতি এই যে, সুলতানের সাক্ষাতে যেতে হলে পায়ে বুট (Boots)পরে যেতে হবে। আমার বুট ছিলো না বলে একজন বিধর্মী আমাকে এক জোড়া বুট দিলো। সেখানে অনেক মুসলিমও ছিলো; কিন্তু আমি দেখে অবাক হলাম যে, একজন বিধর্মী আমার প্রতি বেশী ভদ্রতা দেখালো।

সুলতানের কাছে যেতে তিনি আমাকে বসতে বললেন এবং নিকটেই তিনখানা তাবুর ব্যবস্থা করে দিলেন। তাবুতে কার্পেট এলো, খাবার জিনিসও এলো। পরে আমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করে মালদ্বীপে অভিযান করবার প্রস্তাবটি উত্থাপন করলাম। সে প্রস্তাব মঞ্জুর করে তিনি কোন্ কোন্ জাহাজ পাঠানো হবে তা স্থির করলেন । তাছাড়া সুলতানের জন্য উপঢৌকন ঠিক করে দিলেন এবং আমীর ও উজিরদের জন্যও পোশাক ও অন্যান্য উপহার পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সুলতানের ভগ্নীর সঙ্গে তার বিবাহের চুক্তিপত্রের একটি খসড়া তৈরী করবার ভারও আমার উপর দিলেন। সে দ্বীপপুঞ্জের গরীবদের জন্য তিনখানা জাহাজ বোঝাই করে খয়রাতি মাল পাঠাবার হুকুম হলো। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, "পাঁচ দিনের মধ্যে তোমাকে ফিরে আসতে হবে।"

তখন নৌ-সেনাপতি তাঁকে বললেন, আগামী তিন মাসের ভেতর সে-দ্বীপে জাহাজ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সে-কথা শুনে সুলতান আমাকে বললেন, বেশ, অবস্থা যদি তাই হয় তবে বর্তমান কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফাত্তানে চলুন। সেখান থেকে মুত্রা (মাদুরা) যাবেন এবং সেখান থেকেই অভিযান করা হবে।

যে-অঞ্চলের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হলো সে-অঞ্চলটি ছিলো গাছগাছাড়ায় ও নলখাগড়ায় পূর্ণ। নিরবচ্ছিন্ন সে-বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে যাওয়া সাধ্যাতীত ব্যাপার। সুলতান হুমকি দিলেন, সেনাদলের প্রতিটি লোক, ছোট বড় নির্বিশেষে একটি করে কুঠার হাতে নিয়ে যাবে গাছ ও আগাছা কেটে পথ করবার

জন্য। অতঃপর শিবির সন্নিবেশ করা হলে অশ্বারোহী সুলতান তার সেনাদলসহ অগ্রসর হলেন এবং সৈন্যগণ ভোর হতে দ্বিপ্রহর অবধি গাছ কেটে চললো। দ্বিপ্রহরে খাবার দেওয়া হয়, দলের পর দল এসে সৈন্যরা তখন আহার শেষ করে। আবার সন্ধ্যাবধি গাছ কাটার কাজ। জঙ্গলে যে সব বিধর্মীদের সঙ্গে তাদের দেখা হতো তাদের সবাইকে স্ত্রীপুত্রসহ তারা বন্দী করে শিবিরে নিয়ে আসতো। সৈন্যরা চতুর্দিকে কাঠের বেষ্টনী দিয়ে তাদের শিবির সুরক্ষিত করতো। বেষ্টনীর চারটি দরজা থাকতো। বেষ্টনীর বাইরে থাকতো তিন ফিট উঁচু কয়েকটি মঞ্চ। সে সব মঞ্চে রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে রাখার নিয়ম। সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে গোলামদের বা পদাতিকদের একজন পাহারাদার থাকে। তার হাতে থাকে সরু বেতের একটি আঁটি। যদি রাত্রে কোনো বিধর্মীদল শিবির আক্রমণের চেষ্টা করে তবে পাহারাদাররা সবাই নিজ নিজ বেতের আঁটি আগুনে জ্বালায় এবং সে আলোতে রাত্রি দিনের মতো আলোকিত হয়ে ওঠে। তখন ঘোড়সওয়ার ছুটে যায় বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে।

আগের দিন যে সব বিধর্মীদের ধরা হয়েছিলো পর দিন ভোরে তাদের চারভাগ করে কাঠের বেষ্টনীর চার দরজায় শুলে চড়ানো হলো। তাদের মেয়েদের এবং ছোট ছোট শিশুদেরও কেটে ফেলা হলো এবং মেয়েদের চুল খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। তারপর আবার শিবির সন্নিবেশ করে যথারীতি জঙ্গল কেটে পথ করা শুরু হলো। সেখানে যেসব বিধর্মী পাওয়া গেল তাদের প্রতিও পূর্বের মতোই ব্যবহার চললো। নারী ও শিশুহত্যার এ রীতি অত্যন্ত কাপুরুষোচিত কাজ। এ ধরণের কাজ অন্য কোনো রাজা করেছেন বলে আমার জানা নেই। এ অপরাধের জন্যই খোদা এ রাজার ধ্বংস ত্বরান্বিত করেন।

আমি শিবির ছেড়ে ফাত্তানে গিয়ে পৌছলাম। ফাত্তান নামক উপকূলবর্তী বড় শহরে চমৎকার একটি পোতাশ্রয় আছে।[৩] পোতাশ্রয়ের বড় বড় স্তম্ভের উপরে স্থাপিত একটি মঞ্চ আছে। কাঠের নির্মিত একটি আবৃত সিঁড়ি মঞ্চ অবধি উঠে গেছে। স্থানটি শত্রুদ্বারা কখনো আক্রান্ত হলে এরা তাদের সমস্ত জাহাজ এনে এ মঞ্চের সঙ্গে বাঁধে এবং তাতে সৈনিক এবং তীরন্দাজদের এনে রাখে, ফলে শত্রুরা আক্রমণের কোনো সুযোগ পায় না। এ শহরে পাথরে নির্মিত সুন্দর একটি মসজিদ আছে। প্রচুর আঙ্গুর ও চমৎকার বেদানা এখানে পাওয়া যায়। আমি এখানে ধর্মপ্রাণ শেখ মোহাম্মদ নিশাপুরীর সাক্ষাৎলাভ করি। যেসব পাগলা দরবেশ কাঁধে অবধি লম্বা বাবরী চুল রাখেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন । তাঁর সঙ্গে একটি সিংহ ছিলো, তিনি সিংহটিকে পোষ মানিয়েছেন। পোষমানা এ সিংহ দরবেশদের সঙ্গেই উঠাবসা ও আহার করতো। তার সঙ্গে আরও প্রায় ত্রিশ জন দরবেশ থাকতেন। তাঁদের একজনের ছিলো একটি সুদৃশ্য হরিণ। যদিও সিংহ হরিণ একই জায়গায় বসবাস করতো তবু সিংহ কখনোও হরিণের অনিষ্ট করতো না। আমি যখন ফাত্তানে তখন সুলতান অসুস্থ হয়ে শহরে এলেন। আমি তার সঙ্গে দেখা করে একটি উপহার দিয়ে এলাম। তিনি সেখানে বাস করতে এসে নৌসেনাপতিকে ডেকে বললেন, দ্বীপপুঞ্জে অভিযানের জন্য জাহাজগুলোকে সাজসজ্জায়

তৈরী করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করবেন না। তিনি উপহারের মূল্য ফেরৎ দিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন; কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। পরে অবশ্য এজন্য আমি দুঃখিত হয়েছিলাম, কারণ, তিনি এন্তেকাল করেন এবং আমি কিছুই পেলাম না। তিনি এক পক্ষকাল ফাত্তানে কাটিয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু আমি সেখানে আরও পক্ষকাল কাটালাম।

অতঃপর আমিও তার রাজধানী মুত্রা (মাদুরা) শহরে এলাম। মুত্রা প্রশস্ত রাস্তাঘাটযুক্ত একটি বড় শহর। আমি এসেই দেখলাম শহরটি প্লেগের কবলে পড়েছে। এ রোগে যে আক্রান্ত হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় অথচ বড়জোড় চতুর্থ দিনে মৃত্যুবরণ করে। ঘরের বাইরে যখন গিয়েছি তখন রোগাক্রান্ত ও মৃত ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। মুত্রায় পৌছে সুলতান ও তাঁর মাতা, স্ত্রী ও পুত্রকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় পেলেন। তিনদিন শহরে কাটিয়ে তিনি তিন মাইল দূরে এক নদীতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলে তিনি কাজীর গৃহের পাশে আমাকে বাস করতে হুকুম করলেন। এর ঠিক পনরো দিন পরেই সুলতান এন্তেকাল করলেন। এবং তাঁর ভাইপো নাসিরউদ্দিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। নতুন সুলতান হুকুম করলেন তাঁর পিতৃব্যের ইচ্ছানুসারে দ্বীপে অভিযানের জন্য নিযুক্ত সমস্ত জাহাজ আমার হেফাজতে দিতে হবে। পরে আমিও সাংঘাতিক এক প্রকার জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এ অঞ্চলে এ রকম জ্বর অত্যন্ত মারাত্মক বলে আমার মনে হয়েছিলো যে, আমার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। তখন আল্লাহ্ আমাকে তেঁতুলের সন্ধান দিলেন। তেঁতুল এ অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। আমি প্রায় আধসের পরিমাণ তেঁতুল পানিতে গুলে তাই পান করলাম। তার ফলে তিন দিন শিথিল অবস্থায় কাটানোর পর খোদা আমাকে আরোগ্য করলেন। এ ঘটনার পরে এ শহরের উপর আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলাম এবং সুলতানের কাছে বিদায়ের প্রার্থনা জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি যাবেন কেনো? দ্বীপে অভিযানের মাত্র এক মাস বাকি। জাঁহাপনার (মৃত সুলতান) ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে সব কিছু না-দেওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুণ। আমি অসম্মতি জানালাম। তখন তিনি আমার ইচ্ছামতো যে কোনো জাহাজে রওয়ানা হবার সুযোগ দিলেন এবং সেভাবে ফাত্তানে চিঠি লিখে দিলেন।

আমি ফাত্তানে ফিরে এসে দেখলাম, আটখানা জাহাজ ইয়েমেনে রওয়ানা হয়েছে। তার একটিতে আমি আরোহণ করলাম। পথে চারটি যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। জাহাজগুলো কিছু সময়ের জন্য আমাদেরও কাজে নিযুক্ত করে। পরে তারা প্রত্যাবর্তন করলে আমরা কাওলাম (কুইলন), চলে আসি। তখন অবধি আমি রোগের প্রকোপ কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে সেখানে তিন মাস কাটালাম। তারপর হিনাওরে সুলতান জামালউদ্দিনের কাজে যাওয়ার জন্য জাহাজে উঠলাম। হিনাওর ফাকানুর[৪] দ্বীপের মধ্যবর্তী ছোট একটি দ্বীপে আমরা যখন পৌছেছি তখন বিধর্মীদের বারোখানা যুদ্ধজাহাজ আমাদের আক্রমণ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে তারা আমাদের পরাজিত করলো এবং প্রয়োজনের জন্য রক্ষিত আমার সব কিছু সম্বল তারা নিয়ে গেলো। সেই সঙ্গে ছিলো অলঙ্কারাদি, সিংহলের রাজার দেওয়া জহরত, কাপড়-চোপড়, সফরের

প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস যা ধর্মপ্রাণ লোক ও দরবেশের কাছে পেয়েছিলাম। সবকিছু গিয়ে তখন বাকী ছিলো আমার পরিধানের পায়জামা। সে জাহাজে যারা ছিলো তাদের সবারই জিনিসপত্র রেখে নামিয়ে দেওয়া হলো তীরে। আমি ফিরে এলাম কালিকটে। সেখানে এসে একটি মসজিদে উঠলাম। একজন মৌলভী আমাকে একটি জামা দিলেন; সেখানকার কাজী দিলেন একটি পাগড়ী । একজন ব্যবসায়ী আরও একটি জামা দিলেন।

কালিকটে থাকতেই আমি জানতে পারি উজির জামালউদ্দিনের মৃত্যুর পরে সুলতানা খাদিজার (মালদ্বীপের) সঙ্গে উজির আবদুল্লার বিয়ে হয়েছে এবং আমার যে স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। কাজেই আমি সেই দ্বীপপুঞ্জে যাবার বিষয় চিন্তা করতে লাগলাম। কিন্তু উজির আবদুল্লার সঙ্গে শত্রুতার কথা মনে পড়ায় (দৈববানী লাভের আশায়) আমি কোরান খুলে একটি পৃষ্ঠায় পেলাম—ফেরেস্তাগণ নেমে এসে বলবে, 'ভয় করোনা, দুঃখ করোনা।' কাজেই নিজকে খোদার উপর সোপর্দ করে আমি যাত্রা করলাম। দশদিন পর কান্নালুস অবতরন করলে সেখানকার শাসনকর্তা এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং মেহ্মান হিসাবে রেখে আমার জন্য নৌকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। দ্বীপের কয়েকজন তখন উজির আবদুল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে আমার আগমনের সংবাদ দিলো। তিনি আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং কে আমার সঙ্গে এসেছেন জানতে চান। তাঁকে জানানো হয় যে, আমি আমার দুই বছর বয়স্ক পুত্রকে নেবার জন্য এসেছি।[৫] এ খবর পেয়ে ছেলের মা এসে উজিরের কাছে নালিশ করে। উজির তাকে বলেন, আমার পক্ষ থেকে তার ছেলে নিয়ে যেতে আমি বাধা দেবো না। উজির আমাকে মহল দ্বীপে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং যাতে সহজেই আমার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় তজ্জন্য তাঁর প্রাসাদের মিনারের সামনে একটি গৃহে আমাকে থাকতে দেন। আমার পুত্রকে আমার সামনে আনা হলে আমার মনে হলো, সেখানে রেখে আসাই সমীচীন। কাজেই তাকে তাদের কাছেই রেখে এলাম। পাঁচদিন সেখানে অবস্থানের পরে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসাই সঙ্গত মনে হলো। কাজেই আমি চলে আসবার জন্য সুলতানের অনুমতি চাইলাম। উজির আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছে যেতেই পাশে বসিয়ে তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর সঙ্গেই আমি আহার করলাম এবং যে চিলমচীতে হাত ধোন একই সঙ্গে সে চিলমচীতে হাত ধুলাম। তিনি অন্য কারো সঙ্গে একাজ করেন না। পান আনা হলে আমি বিদায় নিয়ে এলাম। তিনি আমাকে একটি পোশাক ও অনেক কড়ি উপহার পাঠালেন। আমার প্রতিও তিনি সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন।

অতঃপর পুনরায় যাত্রা করলাম। দীর্ঘ তেতাল্লিশ রাত্রি সমুদ্রের বুকে কাটিয়ে আমরা বাঙ্গালা (বাংলা) দেশে পৌছলাম। এ বিশাল দেশে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয় । সারা পৃথিবীতে আমি এমন কোনো দেশ দেখিনি যেখানে জিনিসপত্রের মুল্য বাংলার চেয়ে কম। পক্ষান্তরে এ একটি অন্ধকার (gloomy) দেশ। খোরাসানের লোকেরা বলে বাংলা ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ একটি নরক। (A hell full of good things) এক দেরহামে আটটি মোটাতাজা মুরগী, দু'দেরহামে একটি মোটাতাজা ভেড়া এখানে বিক্রি হতে

আমি দেখেছি। তাছাড়া ত্রিশ হাত লম্বা উৎকৃষ্ট ধরনের সূতী কাপড় মাত্র দু'দীনারে এখানে বিক্রি হতে দেখেছি। এক স্বর্ণ দীনারে অর্থাৎ মরক্কোর আড়াই স্বর্ণদীনারে এখানে একজন সুন্দরী ক্রীতদাসী বালিকা বিক্রি হয়। সমুদ্রোপকূলে[৬] বাংলার যে বৃহৎ শহরে আমরা প্রবেশ করি তার নাম সাদকাওয়ান। এ শহরের কাছেই গঙ্গা ও জুন নদী[৭] একত্র মিলিত হয়ে সাগরে পড়েছে। গঙ্গা নদীতে হিন্দুরা তীর্থ করতে আসে। এখানে নদীতে প্রকাণ্ড একটি নৌবহর আছে। তার সাহায্যে এরা লক্ষ্মণাবতীর[৮] অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

বাংলার সুলতান তখন ফখরউদ্দিন। শাসনকর্তা হিসাবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন। মুসাফেরদের বিশেষতঃ দরবেশ ও সূফীদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করতেন। এ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দিন । দিল্লীর সুলতান তার এক পৌত্রকে কারারুদ্ধ করেন। সুলতান মোহাম্মদ সিংহাসন আরোহণের পর তাকে মুক্ত করে দেন। শর্ত ছিলো নাসিরউদ্দিন তার রাজত্বের অর্ধেক তাকে দান করবেন। কিন্তু পরে তিনি সে শর্ত ভঙ্গ করলে সুলতান মোহাম্মদ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও তাঁকে হত্যা করে নিজের বেগমের কোনো আত্মীয়ের উপর এ দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। এ ব্যক্তিও সৈন্যদের দ্বারা নিহত হন। তখন লক্ষ্মণাবতী থেকে এসে এ-রাজ্য দখল করেন আলী শাহ্‌। ফখরউদ্দিন যখন দেখলেন রাজত্ব সুলতান নাসিরউদ্দিনের বংশধরদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে (তিনি তাঁদেরই অনুগত ছিলেন) তখন সাদকাওয়ানে ও বাংলায় বিদ্রোহ করে তিনি নিজকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন। তাঁর সঙ্গে আলী-শার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শীত ও বর্ষায় ফখরউদ্দিন নদীপথে লক্ষ্মণাবতীর উদ্দেশে অভিযান করতেন। কারণ তিনি নৌবলে বিশেষ বলীয়ান ছিলেন। কিন্তু আলী শাহ্‌র স্থল-সৈন্য কম ছিলেন বলে তিনি শীত-বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে স্থলপথে অভিযান চালাতেন। আমি সাদকাওয়ানে এসে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি, কারণ তিনি ভারত সুলতানের বিরোধী ছিলেন বলে আমার সাক্ষাতের ফলাফল সম্বন্ধে আমি সন্দিহান ছিলাম।

সাদকাওয়ান থেকে আমি কামারু পর্বতের দিকে রওয়ানা হই। সেখান থেকে কামারু এক মাসের পথ। বিশাল এ পবর্তমালা চীন ও মৃগনাভির দেশ থুরবাত (তিব্বত) পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পাবর্ত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা দেখতে তুর্কীদের মতো। তারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। ক্রীতদাস হিসাবে তাদের মূল্য অন্য যে কোনো জাতীয় ক্রীতদাসের চেয়ে বহুগুণ বেশী।[৯] এখানকার লোকেরা তাদের যাদবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য বিখ্যাত। আমার এ পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাব্রিজের শেখ জালালুদ্দিন নামক একজন প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করা। তাঁর বাসস্থান থেকে দুদিনের পথ দুরে থাকতেই আমি তাঁর চারজন শিষ্যের দেখা পেলাম। তারা আমাকে জানালেন শেখ তার সঙ্গী দরবেশদের বলেছেন, "পশ্চিম দেশের একজন সফরকারী তোমাদের কাছে এসেছেন, তোমরা গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করো।" আমার সম্বন্ধে তিনি কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তার উপর এ ব্যাপার নাজেল হয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে গুহার বাইরে অবস্থিত তাঁর আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে কোনো রকম আবাদী জমি নেই । কিন্তু মুসলমান ও অ-মুসলমান নির্বিশেষে সেখানকার অধিবাসীরা নানারকম উপহার দ্রব্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সে-সব উপহার ও মানতের জিনিসপত্রেই মুসাফের ও দরবেশদের ব্যয় নির্বাহ হয়। শেখের নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য

রয়েছে এক মাত্র গরু। প্রতি দশদিন অন্তর তিনি গরুর দুধ খেয়ে ইফতার করেন। একমাত্র তাঁর চেষ্টায়ই এ পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এদের ভেতর বাস করছেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলে তিনি দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং কোলাকুলি করলেন। আমার দেশ ও সফর সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করলে আমি যথাযথ উত্তর দিলাম। তিনি তখন বললেন, আপনি আরবদের সফরকারী।

তাঁর শিষ্যদের যারা উপস্থিত ছিলো তারা বললো, মওলানা, ইনি আরবদের ছাড়া অন্যদেরও সফরকারী।

তখন শেখ তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, হাঁ অন্যদেরও সফরকারী। কাজেই একে সম্মান করো!

তারা আমাকে আস্তানার ভেতর নিয়ে গেলো। আমি তিনদিন তাদের আতিথ্যে কাটালাম।

শেখের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম, তিনি ছাগলের লোমে তৈরী একটি আলখেল্লা পরিধান করে আছেন। আলখেল্লাটি দেখে আমার পছন্দ হলে মনে-মনে বললাম, আহা, শেখ যদি এটি আমাকে দান করতেন। পরে তাঁর কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম, তিনি উঠে গুহার এক কোণে গিয়ে আলখেল্লাটি খুলে এসে আমার গায়ে পরিয়ে দিলেন এবং নিজের মাথার গোলটুপিটিও আমার মাথায় দিলেন। নিজে এলেন তালি লাগানো একটি পোশাকে। দরবেশরা আমাকে বললেন, শেখ সচরাচর এ আলখেল্লাটি পরিধান করেন না। শুধু আমি এখানে এলেই এটি পরিধান করে তিনি বলেছেন, "মরক্কোর অধিবাসী এ আলখেল্লাটি চেয়ে নেবেন। তাঁর থেকে এটি নেবেন একজন বিধর্মী সুলতান। এটি আমার ভাই সাঘার্জের বোরহানউদ্দিনকে দেবেন। তাঁর জন্যই এটি তৈরী হয়েছে।"

তাঁদের মুখে একথা শুনার পর আমি বললাম, এ পোশাকের ভেতর দিয়ে আমি শেখের দোয়া লাভ করেছি। এটি পরে মুসলমান বা বিধর্মী কোনো সুলতানের সাক্ষাতেই আমি যাবো না।

একথা বলে আমি শেখের কাছে বিদায় নিয়ে এলাম। তারপর চীন সফরে গিয়ে বহুদিন পরে খানসা (হ্যাং-চৌ-ফু) শহরে এসে হাজির হলাম। এখানে এসে লোকের ভিড়ে আমি সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। তখন আমার পরিধানে ছিলো সেই আলখেল্লাটি। সেখানে ঘটনাক্রমে এক রাস্তায় দেখা হলো সেখানকার উজির ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে। আমার উপর নজর পড়তেই তিনি আমাকে কাছে ডেকে হাত ধরে আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং কথা বলতে-বলতে সুলতানের প্রাসাদে নিয়ে হাজির করলেন। এখানে পৌঁছে আমি বিদায় নিতে চাইলাম, কিন্তু তিনি আমার কথায় আদৌ কান দিলেন না। তিনি আমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে হাজির করলেন। সুলতান আমাকে সুলতানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি তাঁর কথার জবাব দেবার সময় তিনি আলখেল্লাটির দিকে নজর দিলেন এবং এটি তাঁর পছন্দ হলো। উজির তখন আমাকে বললেন, এটি খুলে ফেলুন।

আমি তাঁর কথা অমান্য করতে পারলাম না। কাজেই সুলতান সে আলখেল্লাটি নিয়ে আমাকে দশটি জামা, একটি ঘোড়া ও জিন এবং কিছু অর্থ দিতে হুকুম করলেন। এ

ঘটনায় আমি রাগান্বিত হয়েছিলাম কিন্তু পরে মনে পড়লো শেখের কথা। তিনি বলেছিলেন, একজন বিধর্মী সুলতান একদিন এ আলখেল্লাটি নিয়ে নেবেন। তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হওয়ায় আমার বিস্ময়বোধ করতে লাগল।

পরের বছর খান-বালিক (পিকিং) শহরে আমি সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশ করলাম এবং শেখ বোরহানউদ্দিনের দরগা খুঁজে বের করলাম। দেখলাম, সেই আলখেল্লাটি গায়ে দিয়ে তিনি তখন পড়তে বসেছেন। বিস্মিত হয়ে সেটি হাতে নিয়ে আমি পরীক্ষা করতে লাগলাম। তাই দেখে তিনি বললেন, আগে থেকেই সব জানেন তবে আর পরীক্ষা করছেন কি? আমি বললাম, সত্যই। এ আলখেল্লাটি খানসার সুলতান আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

"এটি খাস করে আমার ভাই জালালউদ্দিন আমার জন্যই তৈরী করেছিলেন। তিনি আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন অমুক অমুকের হাত দিয়ে আলখেল্লাটি তোমার কাছে গিয়ে পৌছবে।"

অতঃপর বোরহানউদ্দিন সে পত্রখানা বের করলেন। সেটি পাঠ করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শেখ জালালউদ্দিনের এ নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি বিস্ময় বোধ করলাম। এ ব্যাপারে যা-কিছু ঘটেছে সবই আমি শেখ বোরহানউদ্দিনকে খুলে বললাম। তিনি বললেন আমার ভাই জালালউদ্দিন এসবের চেয়েও অনেক বেশী কিছু করতে পারেন। ...আমি শুনেছি, প্রতিদিন তিনি মক্কায় ফজরের নামাজ আদায় করেন এবং প্রতি বছর হজ করেন। কারণ আরফা এবং হজের সময় তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান কেউ তা বলতে পারেন না।

শেখ জালালউদ্দিনের কাছে বিদায় নিয়ে আমি হাজং পৌছি। কামারু পর্বত থেকে উৎপন্ন একটি নদীর দু'পাড়ে বিস্তীর্ণ এ সুন্দর শহরটি। নদীটির নাম নীল নদী।[১০] এ নদী পথেই বাংলা ও লক্ষ্মণাবতী যেতে হয়। মিশরের নীল নদের মতো এই নদীটির দু'পাশে অনেক স্রোতচালিত কল, ফলের বাগান ও গ্রাম রয়েছে। মুসলমান সুলতানদের শাসনাধীনে এখানে বিধর্মীরা বাস করে। তাদের উৎপন্ন অর্ধেক শষ্য জরিমানা স্বরূপ কর্তন করা হয়। তাছাড়া তাদের ট্যাক্সও আদায় দিতে হয়। আমরা পনেরো দিন অবধি এ নদী দিয়ে ভাটির দিকে এগিয়ে গেলাম; নদীর দু'পাশে গ্রাম ও ফলের বাগান দেখে মনে হচ্ছিল আমরা যেন একটি বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছি। অসংখ্যা নৌকা চলাচল করছে এ নদীতে। প্রত্যেক নৌকায় একটি করে ঢাক। এক নৌকার সঙ্গে অপর একটি নৌকার দেখা হলেই উভয়ে নিজ নিজ ঢাক পিটায় এবং একে অপরকে অভিবাদন জানায়। সুলতান ফখরউদ্দিনের হুকুম, দরবেশদের কাছ থেকে এ নদীতে চলাচলের জন্য কোনো কর আদায় করা হবে না। তাঁদের কারো খাদ্যের সংস্থান না থাকলে খাদ্যও দিতে হবে। কোনো দরবেশ শহরে এলে তাঁকে অর্ধ দীনার দেওয়া হয়। পূর্ব বর্ণিত মতে পনেরো দিন নদীপথে চলে আমরা সোনারকাওয়ান[১১] এসে পৌছলাম। এখানে এসে একটি নৌকা পেলাম যেটা যাভা (সুমাত্রা) যাত্রার জন্য তৈরী। এখান থেকে সুমাত্রা চল্লিশ দিনের পথ। আমরা সেই নৌকায় আরোহণ করলাম।

দশ

আমরা বরাহনকদের দেশে এসে পৌঁছলাম। এরা ইতর শ্রেনীর লোক এবং কোনো ধর্ম মানে না। সাগরের পাড়ে ঘাস দিয়ে ছাওয়া নল খাগড়ার তৈরী কুঁড়ে ঘরে এরা বাস করে। এদের প্রচুর কলাগাছ ও পান-সুপারীর গাছ আছে। এদের পুরুষদের গঠন আমাদেরই মতো, শুধু মুখটির আকৃতি কুকুরের মুখের মতো, কিন্তু মেয়েদের বেলা আবার তা নয়। তারা যথেষ্ট সুন্দরী। পুরুষরা উলঙ্গ থাকে, এমন কি লজ্জাস্থানও আবৃত করে না। সময় সময় নলের তৈরী একটি থলে এদের কোমর থেকে ঝুলতে দেখা যায়। মেয়েরা গাছের পাতা দিয়ে দেহের সম্মুখ ভাগ আবৃত রাখে। তাদের মধ্যে ভিন্ন মহল্লায় বাংলা ও সুমাত্রার বহু মুসলমান বাস করে । এখানকার অধিবাসীরা সমুদ্রের তীরে এসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কেনাবেচা করে এবং হাতির সাহায্যে পানি বয়ে এনে তাদের সরবরাহ করে। কারণ, সমুদ্রোপকূল থেকে পানি অনেক দূরে। সেখানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের তারা পানি আনতে দেয় না। কারণ, মেয়েরা সুশ্রী পুরুষদের দেখে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবে বলে তারা আশঙ্কা করে। এদেশে হাতি প্রচুর; কিন্তু সুলতান ছাড়া সে সব কেউ বিক্রি করতে পারে না। তিনি কাপড়ের বিনিময়ে হাতি বিক্রি করেন।

তাদের সুলতান আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন হাতিতে চড়ে। হাতির পিঠে চর্মের জিন্। তিনি নিজেও পরেছেন ছাগচর্মে তৈরী লোমওয়ালা পোশাক। মাথায় তিন রঙের রেশমী ফেটি বাঁধা। হাতে নলের একটি বর্শা। তাঁর সঙ্গে বিশজন আত্মীয়। তারাও হাতি চড়ে এসেছে। আমরা সুলতানকে কিছু মরিচ, আদা, দারুচিনি, মালদ্বীপের শুট্‌কি মাছ, বাংলাদেশের কাপড় উপহার দিলাম। তারা নিজেরা কাপড় ব্যবহার করে না; কিন্তু ভোজের সময় তারা হাতি কাপড়ে আবৃত করে। এ দ্বীপে যে সব জাহাজ ভিড়ে তার প্রতিটি জাহাজ থেকেই সুলতান একটি বাঁদী, একজন শ্বেতকায় গোলাম, একটি হাতিকে আবৃত করবার উপযোগী যথেষ্ট কাপড় এবং নিজের স্ত্রীর কোমরে ও পায়ের আঙ্গুলে ব্যবহারের জন্য স্বর্ণালঙ্কার আদায় করেন। যদি কেউ তা দিতে অস্বীকার করে তবে তারা জাদু চালনা করে এবং তার ফলে সমুদ্রে এমন ঝড় ওঠে যে, সে ব্যক্তি তাতেই ধ্বংস হয় বা ধ্বংসের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে।

এদের ছেড়ে পঁচিশদিন পর আমরা জাওয়া (সুমাত্রা) গিয়ে পৌছি। জাওয়া থেকেই জাওয়ী নামক ধূপের নামকরণ হয়েছে। অর্ধদিনের পথ দূরে থাকতেই এ দ্বীপটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বীপটি যেমন উর্বর তেমনি শস্য-শ্যামল। দ্বীপের সর্বত্রই নারকেল সুপারী, লবঙ্গ, ভারতীয় মুসব্বর, কাঁঠাল, আম, জাম, মিষ্টি লেবু ও বেত গাছ দেখা যায়। টিনের টুকরা ও চীন দেশীয় অশোধিত সোনার সাহায্যে এখানকার বাসিন্দারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে। সুগন্ধযুক্ত যে-সব গাছপালা এখানে জন্মে তার অধিকাংশই বিধর্মীদের অধিকৃত অঞ্চলে। মুসলিম অঞ্চলে এ সব গাছের প্রাচুর্য কম। আমরা পোতাশ্রয়ে পৌছলে দ্বীপের লোকেরা ছোট-ছোট নৌকায় নারিকেল, কলা, আম ও মাছ নিয়ে আমাদের কাছে এলো। এ সব জিনিস সওদাগরদের উপহার দেওয়া তাদের একটি রীতি। ব্যবসায়ীরাও সাধ্যমত তাদের এ উপহার প্রকারান্তরে ফিরিয়ে দেয়। নৌসেনাপতির প্রতিনিধিও আমাদের জাহাজে এলেন। আমাদের সঙ্গীয় সওদাগরদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে তিনি আমাদের তীরে যাবার অনুমতি দিলেন। কাজেই আমরা তীরবর্তী একটি বন্দরে নেমে গেলাম। সমুদ্রোপকূলে এটি একটি বৃহৎ গ্রাম। সারহা নামক অনেক ঘর এখানে আছে। শহর থেকে এ জায়গাটা চার মাইল দূরে। নৌ-সেনাপতির প্রতিনিধি আমার সম্বন্ধে সুলতানকে চিঠি লেখায় তিনি আমীর দৌলাসাকে কাজী ও অন্যান্য আইনজ্ঞ লোকদের আমার সঙ্গে দেখা করতে হুকুম করলেন। সুলতানের একটি ঘোড়া এবং আরও কয়েকটি ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দেখা করতে এলেন। আমি ও আমার সঙ্গীরা ঘোড়ায় চড়ে সুলতানের রাজধানী সুমাত্রায় রওয়ানা হলাম। কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা সুমাত্রা একটি বড় ও সুদৃশ্য শহর। জাওয়ার সুলতান আল-মালীক আজ-জহির একজন বিশেষ খ্যাতনামা উদার প্রকৃতির শাসক। তিনি ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি সর্বদাই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদে নিযুক্ত আছেন এবং অভিযান চালনা করেন। তাহলেও তিনি একজন সহৃদয় প্রকৃতির লোক। তিনি পায়ে হেঁটেই শুক্রবার জুম্মার নামাজে যান। তাঁর প্রজারাও সানন্দে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে ও স্বেচ্ছায় অভিযানে অংশগ্রহণ করে। আশেপাশের সমস্ত বিধর্মীর উপর এদের আধিপত্য বেশী। শান্তিরক্ষার জন্য বিধর্মীরা কর দান করে।

প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে আমরা কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, পথের দু'পাশে মাটিতে কতকগুলো বর্শা পুতে রাখা হয়েছে। এ অবধি এসে ঘোড়া থেকে নামতে হবে তারই নির্দেশ দিচ্ছে বর্শাগুলো। ঘোড়ার পিঠে যারা আসে এর বেশী তারা যেতে পারে না। আমরা তাই এখানে এসে ঘোড়া থেকে নামলাম। দরবার-গৃহে পৌছে সুলতানের প্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। তিনি উঠে আমাদের সঙ্গে মোসাফাহ্ করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে গিয়ে বসলে তিনি আমাদের আগমন-বার্তা সুলতানকে লিখে সইমোহর করে একজন ভৃত্যের হাতে দিলেন। চিঠির অপর পৃষ্ঠে সুলতানের লিখিত জবাব নিয়ে ভৃত্য ফিরে এলো। অত:পর একজন ভৃত্য নিয়ে সে একটি বাফশা বা কাপড়ের থলে হাতে দিলেন। চিঠির অপর পৃষ্ঠে সুলতানের লিখিত জবাব নিয়ে ভৃত্য। সুলতানের প্রতিনিধি থলেটি নিয়ে আমাকে হাত ধরে ছোট-একটি ঘরে নিয়ে হাজির

করলেন। তিনি দিনের বেলা বিশ্রামের সময় এ ঘরে কাটান। তাই বাক্‌শা থেকে তিনটি আঙরাখা বের করা হলো। তার একটি খাঁটি রেশমী, আরেকটি রেশম ও সূতার মিশ্রণ, অপরটি রেশম ও লিনেন। অ্যাপ্রন জাতীয় আরও তিনটি পোশাক যাকে এরা বলে অন্তর্বাস, বিভিন্ন ধরনের আরও তিনটি মধ্যবাস (middle clothing), উলের তিনটি আলখেল্লা, তার একটি শাদা এবং তিনটি পাগড়ী। তাদের রীতি অনুসারে পায়জামার পরিবর্তে একটি অ্যাপ্রন ও একটি করে প্রত্যেক রকমের পোশাক পরে নিলাম। আমার সঙ্গীদেরও তাই করতে হলো। আহারের পর আমরা প্রাসাদ ত্যাগ করে ঘোড়ায় চড়ে কাঠের দেওয়ালঘেরা একটি বাগানে গিয়ে হাজির হলাম। বাগানের মধ্যস্থলে কাঠের তৈরী একটি ঘর। সূতী মখ্‌মল কাপড়ের ফালি দিয়ে কয়েকটি মেঝে মোড়া হয়েছে। ফালিগুলোর কয়েকটি রঙীন, বাকি কয়েকটি রঙীন নয়। আমরা প্রতিনিধির সঙ্গে সেখানে বসলাম। অতঃপর আমীর দৌলাসা দু'জন বাঁদী ও দু'জন গোলাম নিয়ে এসে বললেন, সুলতান বলেছেন, এ উপহার তাঁর ক্ষমতার উপযোগী, ভারতের সুলতান মোহাম্মদের উপযোগী নয়। এরপর প্রতিনিধি চলে গেলেন, আমীর দৌলাসা রইলেন আমাদের সঙ্গে।

আমীরের সঙ্গে এভাবে আমার আলাপ পরিচয় হলো যেনো, তিনি দিল্লীর সুলতানের কাছে দূত হিসাবে এসেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

তিনি বললেন, সুলতানের সঙ্গে দেখা করবার আগে মুসাফেরকে পথের ক্লান্তি দূর করবার জন্য তিন রাত্রি বিশ্রাম করতে হয়। এই আমাদের দেশের রীতি।

আমরা তিনদিন সেখানে কাটালাম। দৈনিক তিনবার আমাদের খাবার দেওয়া হতো। প্রতি ভোরে ও সন্ধ্যায় দেওয়া হতো ফল ও দুর্লভ ধরনের মিষ্টি। চতুর্থ দিনটি ছিলো শুক্রবার। আমীর এসে বললেন, নামাজের পরে আজ আপনি মসজিদের রাজকীয় চত্বরে সুলতানের দেখা পাবেন।

নামাজ শেষে আমি সুলতানের কাছে যেতে তিনি আমার সঙ্গে মোসাফাহ্ করলেন, আমি তাঁকে কুর্নিশ করলাম। তাঁর বাঁ পাশে আমাকে বসিয়ে তিনি সুলতান মোহাম্মদ ও আমার সফরের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। আসরের নামাজ অবধি তিনি মসজিদের মধ্যেই কাটালেন। নামাজের পর একটি কামরায় ঢুকে তিনি পোশাক পরিবর্তন করে এলেন। সাধারণতঃ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা যে ধরনের পোশাক পরেন, শুক্রবার মসজিদে আসতে সুলতান সে রকম পোশাক পরেন। পোশাক পরিবর্তন করে তিনি তাঁর রাজকীয় পোশাক রেশমী ও সূতী আলখেল্লা পরিধান করলেন। মসজিদের বাইরে এসে তিনি প্রবেশদ্বারে দেখলেন হাতি ও ঘোড়া তৈরি রয়েছে। সুলতান যখন হাতিতে সওয়ার হন তখন তাঁর সঙ্গীরা যান ঘোড়ায়, আর সুলতান ঘোড়ায় চড়লে বাকি সবাই হাতিতে। এ ক্ষেত্রে তিনি সওয়ার হলেন একটি হাতির পিঠে। কাজেই আমরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁর সঙ্গে দরবার-গৃহে হাজির হলাম। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে (যেখানে বর্শা রয়েছে) গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলাম, কিন্তু সুলতান হাতির পিঠেই প্রাসাদের যেখানে দরবার বসেছে

সেখানে নিজের আসনের সামনে উপস্থিত হলেন। কয়েকজন পুরুষ গায়ক এসে তাঁর সামনে গান গেয়ে গেলো। তারপর আনা হলো কয়েকটি ঘোড়া। রেশমী কাপড়ে সে সব ঘোড়ার পিঠ আচ্ছাদিত, পায়ে সোনার ঘুঙুর, গলায় জরির কাজ করা রেশমী কাপড়। এ ঘোড়াগুলো তাঁর সামনে এসে নৃত্য করতে লাগলো। যদিও এ জিনিস আমি দিল্লীর শাহী-দরবারে দেখেছিলাম, তবু ঘোড়ার নৃত্য দেখে আশ্চর্য হলাম।

সুমাত্রার শাহী-দরবারে পনেরো দিন কাটালাম। এদিকে চীন-যাত্রার মৌসুম তখন এসে গেছে। কারণ, বছরের যে-কোন সময়ে চীনে যাত্রা করা সম্ভব নয়। কাজেই সুলতানের কাছে যাত্রা শুরু করার অনুমতি চাইতে হলো। তিনি আমাদের জন্য একটি জাঙ্ক বা চীন দেশীয় নৌকার সাজসরঞ্জাম ঠিক করে যাত্রার উপযোগী করে দিলেন এবং পথের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও অনেক উপহার দিলেন। খোদা যেন তাঁকে এর প্রতিদান দেন। সুলতানের একজন পারিষদ এসে উপহার দ্রব্য জাঙ্কে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমরা একাধিক্রমে একুশ রাত তাঁর রাজ্যের উপকূল ঘেঁষে নৌকা চালিয়ে এলাম। একুশ দিন চলার পর বিধর্মীদের দেশ মূল-জাওয়া এসে পৌঁছলাম। এ দেশটির দৈর্ঘ্য দু'মাসের পথ। এখানে প্রচুর সুগন্ধি মসল্লাপাতি, কাকুলি ও কামারি নামক উৎকৃষ্ট মুসাব্বর পাওয়া যায়। কাকুলা ও কামারা এ রাজ্যের দু'টি অংশ। এ নামানুসারে মুসাব্বরের নাম কাকুলি ও কামারি হয়েছে। সুমাত্রার সুলতানের রাজ্যে শুধুমাত্র ধূপ, কর্পূর, সামান্য পরিমাণ লবণ, ও ভারতীয় মুসাব্বর পাওয়া যায়; কিন্তু এ সব দ্রব্যের বেশীর ভাগই পাওয়া যায় মূল-জাওয়ায়।

কাকুলা বন্দরে পৌঁছে আমরা দেখলাম, কতকগুলো জাঙ্ক জলদস্যুদের উপর অভিযান চালাবার জন্যে এবং অপর যে জাঙ্কই তাদের প্রতিরোধ করতে আসুক তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতে তৈরি হয়ে আছে।

আমরা বন্দরে নেমে গেলাম। সুন্দর পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কাকুলা একটা চমৎকার শহর। দেওয়ালটি এতো চওড়া যে, তিনটি হাতি উপর দিয়ে পাশাপাশি যেতে পারে। শহরের বাইরে প্রথম যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ভারবাহী হাতি ভারতীয় মুসাব্বর বয়ে নিয়ে চলেছে। এখানকার লোকেরা বাড়ীতে মুসাব্বর জ্বালায়। আমাদের জ্বালানী কাঠের যা দাম এদের জন্য মুসাব্বরের দামও তাই, অনেক সময় তারও কম। অবিশ্যি তাদের নিজেদের ভেতর বেচাকেনার সময়ই দর সস্তা। বাইরের লোকের কাছে এক বোঝা মুসাব্বরের পরিবর্তে এরা এক থান সূতী কাপড় আদায় করে। কারণ, সূতী কাপড় এ দেশে রেশমী কাপড়ের চেয়েও মূল্যবান। এদেশে হাতির প্রাচুর্য খুব বেশী। এখানকার লোকেরা হাতির পিঠে আরোহণ করে এবং মালামাল বহনের জন্যও ব্যবহার করে। প্রত্যেক লোককেই দেখা যায় যে, তার হাতীগুলো বাড়ীর দরজায় বেঁধে রেখেছে। প্রত্যেক দোকানদার অবধি বাড়ী ফিরে যাওয়া বা মালামাল আনয়নের জন্য নিজের কাছে হাতি রাখে। চীনে এ কালে (উত্তর চীনে) হাতি সম্বন্ধে একই ব্যবস্থা।

মূল-জাওয়ার সুলতান একজন বিধর্মী। তাঁকে দেখলাম প্রাসাদের বাইরে একটি বেদীর পাশে মাটিতে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজকর্মচারিগণ। সৈন্যরা তাঁর

সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছিল। সবাই পদাতিক সৈন্য, কারণ একমাত্র সুলতানের নিজস্ব ঘোড়া ছাড়া আর কোনো ঘোড়া নেই। আরোহণ ও যুদ্ধের জন্য হাতি ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারও সেখানেই নেই। সুলতানকে আমার কথা বলায় তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, যারা সত্য ধর্ম পালন করে তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা 'আস্‌সালাম' শব্দটি ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলো না। সুলতান আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার বসবার জন্য একখানা কাপড় এনে বিছিয়ে দিতে বললেন। আমি তখন দোভাষীকে বললাম, সুলতান নিজে মাটিতে বসলে আমি কি করে কাপড়ের উপর বসতে পারি?

দোভাষী বললেন, এটা তাঁর অভ্যেস।.....

আপনি মেহমান এবং প্রসিদ্ধ একজন সুলতানের কাছ থেকে এসেছেন বলে ইনি আপনাকে সম্মান দেখাচ্ছেন।

তখন আমি বসলাম। ভারত সুলতানের কথা সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করে তিনি বললেন, আপনি একজন মেহমান হিসাবে তিন দিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন। পরে আপনি চলে যেতে পারেন।

সুলতান যখন দরবারে বসেছেন তখন তাঁর সামনে একজন লোক ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছুরিখানা অনেকটা পুস্তক বাঁধাইকারীদের যন্ত্রের মতো। নিজের ঘাড়ের উপর সেই ছুরিখানা রেখে সে অবোধ্য ভাষায় লম্বা একটি বক্তৃতা দিলো। তারপর দু'হাতে শক্ত করে সে ছুরি ধরে নিজের গলা কেটে ফেললো। ছুরিখানা এত তীক্ষ্ণ ধার ছিলো এবং সে তা ধরে ছিল এমন শক্তভাবে যে তার মাথাটা কেটে মাটিতে পড়ে গেলো। তার এ কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে রইলাম। সুলতান আমাকে বললেন, আপনাদের দেশে এমন কেউ করে কি?

আমি বললাম, এ ধরণের ব্যাপার জীবনে আমি দেখিনি।

তিনি হেসে বললেন, এরা আমাদের গোলাম। আমাদের প্রতি অনুরাগ দেখানোর জন্য এরা এভাবে আত্মাহুতি দেয়।

লাশটাকে সরিয়ে নিয়ে তিনি পোড়াবার হুকুম দিলেন। সুলতানের প্রতিনিধি, রাজকর্মচারী, সৈন্য ও নাগরিক সবাই লাশটির সৎকারের জন্য চলে গেলো। সুলতান মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও ভ্রাতাদের জন্য পর্যাপ্ত ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। এ ঘটনার পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের সম্মান অনেক বেড়ে গেলো।

সেদিন দরবারে উপস্থিত একজন লোক আমাকে বলেছিলো, ঐ মৃত ব্যক্তি লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ঘোষণা করছিলো, সে সুলতানকে ভালবাসে, সুলতানের ভালবাসার জন্য সে নিজের জান কোরবান করছে। কারণ, তার পিতাও সুলতানের পিতাকে ভালবেসে নিজের জান কোরবান করে গেছেন এবং পিতামহ কোরবান করেছেন সুলতানের পিতামহের ভালবাসায়।

অতঃপর আমি দরবার থেকে চলে এলাম। সুলতান আমাকে তিন দিনের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার পাঠিয়ে দিলেন।

সমুদ্রপথে পুনরায় যাত্রা শুরু করে চৌত্রিশ দিন পর আমরা নিশ্চল এক সমুদ্রে এসে পড়লাম। এ সমুদ্রের পানির রং লালচে ধরণের। লোকে বলে, নিকটস্থ একটি জায়গার মাটির রংয়ের দরুণ পানির রং এমন হয়েছে। সমুদ্রের বুকে হাওয়া বাতাস, ঢেউ বা কোনো রকম সচলতার কোনো চিহ্ন নেই, যদিও এর বিস্তৃতি বিশাল। এ কারণেই প্রতিটি চীন দেশীয় জাঙ্কের সঙ্গে তিনটি করে নৌকা থাকে। আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা জাঙ্ক টেনে নেয়, দাঁড় বেয়ে এগিয়ে নেয়। তা'ছাড়াও প্রত্যেক জাঙ্কে মাস্তুলের মতো বড় বিশখানা করে দাঁড় আছে। প্রায় ত্রিশজন করে দাঁড়ী। দু'লাইনে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে প্রতিটি দাঁড় টানে। দাঁড়গুলোর সঙ্গে কাছির মতো মোটা দু'গাছি দড়ি বাঁধা থাকে। একদল দড়িটি নিজেদের দিকে টেনে ছেড়ে দেয়, তখন আবার অপর দল সেটা নিজেদের দিকে টানে। এ রকম করতে-করতে তারা গানের সুরে সাধারণতঃ লা-লা শব্দ করে। এ সমুদ্রে আমাদের সাঁইত্রিশ দিন কাটে। আমাদের এ অগ্রগতিতে নাবিকরা বিস্মিত হয়ে গেলো। কারণ, এ সমুদ্র পার হতে সাধারণতঃ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত লাগে। বিশেষ অনুকূল অবস্থার মধ্যেও সবচেয়ে কম চল্লিশ দিন সময় এ সমুদ্রে কাটে।

অতঃপর আমরা তাবালিসির রাজ্যে এসে পৌছলাম। তাবালিসি এখানকার রাজার নাম। এ দেশটি বিশাল। এ দেশের রাজা চীনের রাজার বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজার অনেকগুলো জাঙ্ক আছে। চীনেরা কতগুলো শর্ত মেনে না-নেওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে এ সব জাঙ্কের সাহায্যে যুদ্ধ করেন। এখানকার বাসিন্দারা পৌত্তলিক। দেখতে তারা সুশ্রী এবং শরীরের গঠন তুর্কীদের মতো। তাদের গাত্রবর্ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাল্‌চে। এরা যেমন সাহসী, তেমন যুদ্ধে পটু। মেয়েরা অশ্বারোহণ করে এবং তীরন্দাজ হিসেবেও তারা পটিয়সি। যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা পুরুষের মতোই সমান দক্ষ। কায়লুকারী শহরের এক বন্দরে আমরা বাস করেছি। তাদের যে সব সুন্দর ও বড় শহর আছে তার ভেতর এটি একটি। পূর্বে এ শহরে তাদের রাজপুত্র বাস করতেন। বন্দরে এসে আমরা নোঙ্গর করতেই সৈন্যরা এগিয়ে এলো। আমাদের কাপ্তেন রাজপুত্রের জন্য কিছু উপহার দ্রব্য নিয়ে তাদের কাছে গেলেন। রাজপুত্রের কথা জিজ্ঞেস করায় সৈন্যরা জানালো, রাজা তাঁকে অন্য একটি জেলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন এবং এখানকার শাসনভার দিয়েছেন তাঁর কন্যা উরদূজার উপর।

আমরা যেদিন কায়লুকারী পৌছি তার পরদিন এ রাজকুমারী তাঁর রীতি অনুযায়ী জাহাজের কাপ্তেন, কেরানী, সওদাগর, আড়কাঠি, পদাতিকদের সেনাপতি ও তীরন্দাজদের সেনাপতিকে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করলেন। কাপ্তেন তাঁর সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তাতে স্বীকৃত হলাম না। কারণ, বিধর্মীদের খাদ্য গ্রহণ আমাদের জন্য ধর্মানুমোদিত নয়। তাঁরা রাজকুমারীর কাছে যেতেই, কেউ অনুপস্থিত আছে কিনা তিনি জানতে চাইলেন। কাপ্তেন বললেন, একজন লোক শুধু

আসেনি। তিনি একজন বখশী (তাদের ভাষায় কাজী) এবং তিনি আপনার খাদ্য গ্রহণ করেন না।

একথা শুনে তিনি আমাকে ডাকতে হুকুম করলেন। জাহাজের লোকজনসহ তাঁর রক্ষীরা এসে আমাকে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানালো। আমি গিয়ে দেখলাম তিনি পূর্ণ রাজকীয় শানশওকতের সঙ্গে বসে আছেন। তাঁকে অভিবাদন জানাতে তুর্কী ভাষায় তিনি জবাব দিলেন এবং আমি কোন্ দেশ থেকে এসেছি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, ভারত থেকে এসেছি।

তিনি বললেন, মরিচের দেশ?

'হ্যাঁ।'

অতঃপর তিনি এদেশ-ওদেশের নানা ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। আমার জবাব শুনে তিনি বললেন, আমি নিশ্চয়ই একবার ভারত অভিযান করে জয় করবো। সে দেশের ধনসম্পদ ও সৈন্যবল আমাকে আকর্ষণ করে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই করুন।

তিনি আমাকে পোশাক, দু'টি হাতি বোঝাই চাউল, দুইটি মহিষ, দশটি ভেড়া, চার পাউন্ড সিরাপ, চারটি মর্তমান (বড় বৈয়াম) দিতে হুকুম করলেন। বৈয়ামগুলিতে আদা, মরিচ, লেবু, ও আম ভরতি ছিলো।

কাপ্তেন বললেন, এ যুবরাজ্ঞীর সেনাদলে এমন সব নারী, পরিচারিকা ও ক্রীতদাসী আছে যারা পুরুষের মতোই যুদ্ধ করতে পারে। তিনি নিজে তাঁর নারী-পুরুষ সৈন্যদের সঙ্গে অভিযানে যান এবং বিশেষ-বিশেষ যোদ্ধাদের সঙ্গে একক যুদ্ধ করেন। কাপ্তেন একথাও বললেন, কোন এক যুদ্ধে তাঁর অনেক সৈন্য মারা যায়, তার ফলে তারা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তখন তিনি নিজে শত্রু সৈন্য ভেদ করে অগ্রসর হন এবং যে রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে তাঁর সম্মুখে গিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে বর্শা দ্বারা আঘাত করেন। ফলে সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর সৈন্যদল পলায়ন করে। যুবরাজ্ঞী তখন বর্শায় বিদ্ধ করে রাজার মস্তকটি নিয়ে আসেন। অতঃপর রাজার আত্মীয়েরা বহু অর্থের বিনিময়ে সে মস্তকটি ফিরিয়ে নেয়। যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে এ-ঘরের শাসনভার দেন। আগে এর শাসনভার ন্যস্ত ছিল তাঁর ভাইয়ের উপর। কাপ্তেন আরো বললেন, অনেক যুবরাজ তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তিনি বলেছেন, একক যুদ্ধে যিনি তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন তিনি তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করতে রাজী নন। যুদ্ধে পরাজিত হবার ভয়ে কেউ আর এ প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হয়নি।

অতঃপর তাবালিসির দেশ ছেড়ে অনুকূল বাতাসে দ্রুত পাল খাটিয়ে আমরা সতেরো দিন পরে চীন দেশে গিয়ে পৌছলাম।

এগারো

প্রচুর ফল, শস্য ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সম্পদে সম্পদশালী চীন একটি বিশাল দেশ। সম্পদের দিক থেকে প্রতিযোগিতা করতে পারে দুনিয়ায় এমন দেশ আর নেই। খান-বালিকা (পিকিং) শহরের কাছে বানরের পর্বত (Mountain of Apes) নামক পর্বতমালা থেকে আবে-হায়াত (Water of Life) নামক একটি নদী এ দেশের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ছ' মাসের পথ অবধি বয়ে গিয়ে সিন-আস-সিন (ক্যান্টন)[১] অবধি পৌঁচেছে। মিশরের নীল নদের মতো এ নদীর দু'তীরে রয়েছে গ্রাম, মাঠ, ফলের বাগান ও বাজার। শুধু নীল নদের তুলনায় এ নদীর তীরবর্তী দেশগুলো অধিকতর শস্য-শ্যামল এবং জনবহুল। নদীর স্রোতে চালিত কলও এখানে বেশি। মিশরের মতো এমন কি মিশরের চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রচুর ইক্ষু চীনে জন্মে আর জন্মে কুল ও আঙ্গুর। চীন দেশের কুল দেখবার আগে আমি ভাবতাম দামেস্কের ওসমানী কুলের সমতুল্য কুল আর কোথাও নেই। খারিজম ও ইসপাহানের মতো এখানে চমৎকার তরমুজও পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেসব ফল আছে তার সবই এখানে পাওয়া যায়। তার কতকগুলো সমকক্ষ কতকগুলো উৎকৃষ্ট। এখানে যবও প্রচুর জন্মে। এমন উৎকৃষ্ট যব আমি কোথাও দেখিনি। এখানকার মসুর ও মটর সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

চীনা বাসন-কোসন কেবল মাত্র জয়তুন ও সিন-কালান শহরে তৈরী হয়। এ অঞ্চলের কোনো কোনো পাহাড়ের মাটী কাঠকয়লার মতোই জ্বলে। সে মাটী দিয়েই এ-সব তৈরি করা হয়। পরে আমরা সে বিষয় আলোচনা করবো। এ মাটী তারা তাদের এক রকম পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত করে। তারপর তিন দিন অবধি তা আগুনে পুড়িয়ে তার উপর পানি ঢালে। এর ফলে এক রকম কাদা তৈরি হয়। সে কাদা পরে গাঁজানো হয়। একমাসকাল গাঁজানো কাদা দিয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাসন-কোসন (Porcelain) তৈরি হয়। তার বেশি দিন দরকার হয় না। দশদিন গাঁজানো কাদার তৈরি জিনিষ নিকৃষ্ট। এখানে এসব চীনেমাটীর জিনিষের দাম আমাদের দেশের অতি সাধারণ বাসন-কোসনের সমান অথবা তার চেয়েও কম। এসব ভারতে এবং অন্যান্য দেশে চালান

হয়। এমন কি এসব জিনিষ পশ্চিমে আমাদের দেশ অবধি গিয়ে পৌঁছে। এখানকার বাসন-কোসন অন্য যে কোনো বাসনের তুলনায় উৎকৃষ্ট।

চীন দেশের মোরগ মুরগী আকারে খুব বড়—এমন কি আমাদের দেশের রাজহাঁসের চেয়েও বড়। এখানকার মুরগীর ডিম আমাদের দেশের রাজহাঁসের ডিমের চেয়েও বড়। কিন্তু এখানকার রাজহাঁস মোটেই বড় নয়।[২] আমরা একবার একটা মুরগী কিনে রান্নার আয়োজন করছিলাম। দেখলাম একটা মুরগীর গোশত একপাত্রে ধরে না। কাজেই দু'পাত্রে তা রাখতে হলো। এখানকার মোরগ আকারে প্রায় উটপাখীর সমান। অনেক সময় মোরগের গায়ের সমস্ত পালক ঝরে পড়ে যায়, তখন তার বিশাল লাল দেহটা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সর্ব প্রথম আমি একটা চীনা মোরগ দেখতে পাই কাওলাম শহরে। আমি সেটাকে উটপাখী ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার মালিক আমাকে বলেছিলো, চীনে কোনো কোনো মোরগ এর চেয়েও বড় হয়। সে সত্যি কথাই যে বলেছিলো তা এখন নিজেই দেখে বুঝতে পারলাম।

চীনের অধিবাসীরা বিধর্মী। তারা হিন্দুদের মতো পুতুল পূজা করে এবং মৃতদেহ দাহ করে [৩]। চীনের রাজা চেংঙ্গিস খাঁর বংশধর একজন তাতার। প্রতি শহরেই মুসলমানদের বসবাসের জন্য একটি পৃথক মহল্লা আছে। সেখানে শুক্রবার নামাজের জন্য এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য মসজিদও আছে। এখানে মুসলমানদের সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। বিধর্মী চীনারা শূকর ও কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে এবং বাজারেও তা বিক্রি হয়। তারা ধনী ও সঙ্গতিপন্ন কিন্তু তাদের খাদ্যে ও পোষাকে তা বুঝা যায় না। একজন বিরাট ধনী সওদাগর ধন দৌলতের যার সীমা নেই, তাকেও দেখা যায় সাধারণ একটি শার্ট পরে থাকতে। কিন্তু একটি ব্যাপারে চীনারা গর্ব করতে পারে। তা হলো তাদের সোনা-রূপার বাসন। তাদের প্রত্যেকের হাতে দেখা যায় একটি লাঠি। লাঠিতে ভর করে তারা হাঁটে এবং লাঠিকে তারা 'তৃতীয় পা' বলে। রেশমের প্রচলন এখানে খুব বেশী। কারণ, রেশমের গুটিপোকা এখানে ফলের উপরে লাগে এবং ফল খেয়েই বাঁচে। তাদের জন্য বিশেষ কোনো যত্ন নিতে হয় না। সেজন্য রেশমের প্রচলন এতো বেশী যে নিতান্ত গরীবদের পর্যন্ত তা ব্যবহার করতে দেখা যায়। সওদাগরদের অভাবে রেশমের কোনো মূল্যই সেখানে থাকতো না। এক টুকরো সূতী কাপড়ের পরিবর্তে চীনে বেশ কয়েক টুকরো রেশমী কাপড় পাওয়া যায়। এদের ব্যবসায়ীদের একটি রীতি এই, যার যা সোনা বা রূপা আছে তার সব গালিয়ে একটি তাল তৈরি করে। অনেক সময় তার ওজন হয় কম বেশী এক হন্দর। পরে সে তাল ঘরের দরজার উপর রেখে দেয়।

চীনের লোকেরা কেনা-বেচায় সোনার দীনার বা রূপার দেরহাম ব্যবহার করে না। সোনা বা রূপা যাই তারা পায় সব গালিয়ে পূর্ববর্ণিত মতে তাল তৈরি করে রাখে। দেশের সমস্ত বেচা-কেনা চলে রাজার মোহরাঙ্কিত হাতের তালুর সমান কাগজের সাহায্যে। এরকম পঁচিশ টুকরো কাগজে হয় এক বালিশ্‌ট। অর্থের পরিমাণ হিসাবে এক বালিশ্‌ট আমাদের এক দিনারের সমান [৪]। ক্রমাগত হাত বদল হতে-হতে এসব

নোট যখন ছিঁড়ে যায় তখন আমাদের টাঁকশালের মতোই এক অফিসে নিয়ে ছেঁড়ার পরিবর্তে নতুন নোট পাওয়া যায়। এ পরিবর্তনের জন্য কোনো রকম মূল্য দিতে হয় [৫] না। কারণ যারা এসব নোট তৈরি করে তারা সুলতানের নিকট হতে নিয়মিত বেতন পেয়ে থাকে। এ অফিসের পরিচালনভার দেওয়া হয় প্রধান একজন আমীরের উপর। যদি কেউ একটি রৌপ্য দেরহাম বা দীনার নিয়ে কোনো কিছু কিনতে বাজারে যায় তবে জিনিষের বিনিময়ে কেউ তা নিতে রাজী হয় না বা তার প্রতি মনোযোগ দেয় না। তার দেরহাম বালিশ্‌টে পরিবর্তন করার পরে তাই দিয়ে যা-খুশী সে কিনতে পারে।

চীন এবং ক্যাথের [৬] সকল বাসিন্দাই কাঠকয়লার পরিবর্তে তাদের দেশের এক রকমের মাটীর তাল ব্যবহার করে। এ মাটী আমাদের দেশের সাজিমাটীর মতো এবং রঙও সাজিমাটির মতো। সাজিমাটীর বোঝা বহনের জন্য হাতি ব্যবহৃত হয়। এ মাটী তারা কাঠকয়লার আকারে ভাঙ্গে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন এ মাটী কাঠকয়লার মতোই জ্বলতে থাকে, কিন্তু এ মাটীর আগুনের উত্তাপ কাঠকয়লার আগুনের উত্তাপের চেয়ে অনেক বেশী। এ মাটী পুড়ে ছাই হলে সে ছাই পানি দিয়ে ছানানো হয়। পরে তাই শুকিয়ে আবার রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এমনি করে পুড়ে একেবারে নিঃশেষ হওয়া অবধি এ জিনিষ বার-বার ব্যবহার করা হয়। এ জিনিষের কাদার সঙ্গেই পাথর মিশিয়ে এরা যে বাসন কোসন তৈরি করে তা আগেই বলা হয়েছে[৭]।

চীনের সমস্ত অধিবাসীই শিল্পী হিসাবে অত্যন্ত নিপুণ, শিল্পে তাদের পূর্ণ দক্ষতা। তাদের এ বৈশিষ্ট্য সর্বত্র বিদিত এবং অনেক লেখকই তাঁদের গ্রন্থে এ বিষয়ে বার বার উল্লেখ করে গেছেন। সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি অঙ্কণে গ্রীক বা অন্য কোনো দেশের শিল্পীর সঙ্গেই তাদের তুলনা হয় না। কারণ, অঙ্কনশিল্পে তারা অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের এ অসামান্য গুণের একটি দৃষ্টান্ত আমি নিজেই পেয়েছি। আমি দ্বিতীয়বার এমন কোনো শহরে ফিরে আসিনি যেখানে প্রথম বারে আমাদের দেখে তাদের অঙ্কিত আমার ও আমার সঙ্গীদের ছবি দেওয়ালের গায়ে বা কাগজের টুকরায় ঝুলানো অবস্থায় বাজারে না-দেখেছি। যে শহরে সুলতান বাস করেন সে শহরে এসে চিত্রশিল্পীদের বাজারের ভেতর দিয়ে আমি ও আমার সঙ্গীরা সুলতানের প্রাসাদে গিয়েছিলাম। আমাদের পরণে ছিল ইরাকী ধরণের পোষাক। বিকেলে প্রাসাদ থেকে ফিরবার সময় সেই পথেই এসে দেখতে পেলাম আমার ও সঙ্গীদের ছবি কাগজে এঁকে তারা দেওয়ালে লাগিয়ে রেখেছে। আমরা তখন একে অপরের ছবি পরীক্ষা করে দেখলাম, প্রতিটি ছবি একেবারে নিখুঁতভাবেই আঁকা হয়েছে। শুনেছি, সুলতানের হুকুমে তারা এ-ছবি এঁকেছে। আমরা যখন প্রাসাদে উপস্থিত ছিলাম তখন তারাও সেখানে গিয়েছে এবং আমাদের অলক্ষ্যে সেখানে বসে এ ছবি এঁকে এনেছে। তাদের দেশে যারা যায় তাদের সবারই ছবি এঁকে রাখা এ দেশের একটি প্রচলিত রীতি। বস্তুতঃ এমন নিখুঁতভাবে তারা একাজ করে যে, কেউ যদি কোনো অপরাধ করে দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয় তবে তার ছবি দূর-দুরান্তে পাঠানো হয়। তারপরে তার খোঁজ করা হয় এবং ছবির অনুরূপ কাউকে পেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

যখন কোনো মুসলমান সওদাগর চীনের কোনো শহরে উপস্থিত হয় তখন তাকে তার পছন্দ মতো সেখানকার কোনো মুসলমান ব্যবসায়ীর গৃহে অথবা হোটেলে থাকার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। যদি সে ব্যবসায়ীর সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করে তবে তাঁর টাকা কড়ি গৃহস্বামী ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়। পরে বিশেষ সততা ও বদান্যতার সঙ্গে গৃহস্বামী সে টাকা কড়ির থেকে অতিথির ব্যয় বাবদ খরচ করে। অতিথির বিদায়ের সময় হলে সে টাকাকড়ি গণনা করা হয়। গণনায় কোনো কারণে কম হলে টাকার ভারপ্রাপ্ত গৃহস্বামী তা পূরণ করে দেন। অতিথি যদি কোনো হোটেলে থাকতে চায় তবে তাঁর টাকাকড়ি রাখা হয় হোটেলের মালিকের হেফাজতে। অতিথির যা কিছু প্রয়োজন মালিক তার সবই কিনে দেয় এবং পরে একটি হিসাব দাখিল করে। অতিথিদের মধ্যে যদি কেউ উপপত্নী রাখতে ইচ্ছে করে তবে হোটেল-মালিক একটি বালিকা-বাঁদী সংগ্রহ করে তাদের জন্য পৃথক বাসস্থান ঠিক করে দেয় এবং উভয়ের খাদ্য সরবরাহ করে। বাঁদীর মূল্য সেখানে কম, তবু চীনের সবাই তাদের পুত্রকন্যাদের বিক্রি করে। এ কাজকে তারা অবমাননাকর মনে করে না। ক্রেতার সঙ্গে ক্রীতদাস বা দাসীদের যেতে বাধ্য করা হয় না। পক্ষান্তরে তারা যেতে চাইলেও কোনো প্রকারে তাদের বাধা দেওয়া হয় না, ঠিক সে রকম, কোনো লোক যদি সেখানে এসে বিয়ে করতে চায় তবে তাও সে করতে পারে কিন্তু লাম্পট্যে অর্থ ব্যয় করতে পারে না। তারা বলে, মুসলমানদের ভেতর আমরা একথা আলোচনা হতে দিতে পারি না যে তাদের লোকেরা কেউ এদেশে এসে বিত্ত নষ্ট করেছে। কারণ, আমাদের এদেশ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন ও অসামান্য সৌন্দর্যের (স্ত্রীলোক) দেশ।

বিদেশী সফরকারীদের জন্য চীন একটি নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল দেশ। একজন লোক সঙ্গে বহু টাকাকড়ি নিয়েও অকুতভয়ে নয় মাসের পথ একাকী চলে যেতে পারে। নিম্ন উপায়ে তারা তার নিরাপত্তা বিধান করে। এ দেশে পথের প্রত্যেক বিরতিস্থানেই একজন কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি করে সরাইখানা আছে। তাঁর অধীনে কিছু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সেখানে রাখা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বা তার পরে সেই কর্মচারী তার কেরানীসহ সেখানে আসে এবং যারা সেখানে রাত্রিবাস করবে তাদের নাম-ধাম লিখে নেয়। তারপর নামের সেই তালিকা সিল মোহর করে রেখে সরাইখানায় তালাবদ্ধ করে রাখে। পরের দিন সূর্যোদয়ের পরে কেরানীসহ সেই কর্মচারী পুনরায় এসে অতিথিদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকে এবং তাদের পূর্ণ বিবরণী তালিকায় লিখে রাখে। তারপর পরবর্তী সরাইখানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের সবাইকে একটি লোকের হাওলা করে দেয়। সে লোক অতিথিদের যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে সেই সরাইখানা থেকে এ মর্মে লিখিয়ে আনে যে অতিথিরা সবাই সেখানে নিরাপদে পৌঁচেছে। পরিচালক লোকটি যদি লিখিত-চিঠি না দাখিল করতে পারে তবে তাদের নিরাপত্তার জন্য তাকেই দায়ী করা হয়। সিন-আস-সিন থেকে খান-বালিক অবধি তাদের দেশের সর্বত্রই এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। এসব সরাইখানায় সফরকারীর প্রয়োজনীয় সবকিছু এমনি কি হাঁস মুরগী অবধি থাকে। পক্ষান্তরে ভেড়া এখানে খুবই কম।

এবার আমাদের সফরের বিবরণী শুরু করা যাক। সমুদ্র-যাত্রার শেষে প্রথম যে শহরে আমরা এসে পদার্পন করি তার নাম জয়তুন। যদিও জয়তুন শব্দের অর্থ জলপাই, তথাপি এ দেশের কোথাও জলপাই নেই। এমন কি সমগ্র চীনে বা ভারতে কোথাও জলপাই নেই। কাজেই এটি একটি জায়গার নামমাত্র[৮]। জয়তুন একটি বিস্তীর্ণ শহর। দামেস্ক রেশম নামে পরিচিত। রেশম ও সার্টিনের বয়ন-কার্য এ শহরেই[৯] হয়। খান্‌সা ও খান্ বালিকের কাপড়ের চেয়েও এখানকার কাপড় উন্নত ধরণের। জয়তুনের বন্দর পৃথিবীর বড় বন্দরগুলোর অন্যতম, অথবা সবচেয়ে বড় বন্দর। আমি এ বন্দরে প্রায় শতেক বড় জাঙ্ক একত্র দেখেছি এবং ছোট জাঙ্ক এতো হাজার হাজার দেখেছি যে গুণে শেষ করা যায় না। সমুদ্রের একটি বৃহৎ খাঁড়ি ভেতর দিকে এসে বড় নদীর সঙ্গে মিশে এ বন্দরের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নিজেদের দেশের শহর সিজিলমাসর[১০] মতো চীনের এ শহরের এবং অন্য সমস্ত শহরের মধ্যস্থলে একটি লোকের ফলের বাগান, মাঠ ও বাসস্থান রয়েছে। এ জন্য এখানকার শহরগুলো বিস্তৃত। মুসলমানরা অন্য শহর থেকে পৃথক শহরে বাস করে।

যে আমীর সুলতানের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে দূত হিসেবে ভারতে গিয়েছিলেন, জয়তুন শহরে পৌঁছে সেদিন তাঁর দেখা পেলাম। ইনি আমাদের সঙ্গে আসতে পথে জাহাজডুবি হয়েছিলেন। আমাকে দেখেই ইনি সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বন্দর-রক্ষকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমি যাতে ভাল বাসস্থান পাই তার ব্যবস্থা করে দিলেন[১১]। মুসলমানদের কাজী, শেখ-উল-ইসলাম এবং প্রধান-প্রধান ব্যবসায়ীরা এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ব্যবসায়ীদের ভেতর ছিলেন তাব্রিজের শরাফউদ্দিন। ভারতে পৌঁছে এঁর কাছ থেকেই আমি টাকা ধার করেছিলাম এবং ইনি আমার সঙ্গে বিশেষ সদয় ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কোর-আনে হাফিজ ছিলেন এবং সর্বদা কোর-আন আবৃত্তি করতেন। এসব ব্যবসায়ীরা বিধর্মীদের দেশে যে অবস্থায়ই বাস করুক না কেনো, মুসলমানদের দেখলে অত্যন্ত খুশী হতেন। তাঁরা বলতেন, "ইনি ইসলামের দেশ থেকে এসেছেন। তারপর তাঁরা নিজেদের সম্পত্তির দশম অংশও (Tithe) তাঁকে দিতেন যাতে সেও তাঁদেরই মতো ধনী হতে পারে[১২]। জয়তুনে তখন যে সব প্রসিদ্ধ শেখ বাস করতেন তাঁদের মধ্যে কাজারুনের বোরহানউদ্দিনও ছিলেন। শহরের বাইরে তাঁর একটি আস্তানা আছে। ব্যবসায়ীরা কাজারুনের শেখ আবু ইস্‌হাকের উদ্দেশ্যে যা-কিছু মানত করে তা এখানেই আদায় দেয়।

বন্দর রক্ষক আমার সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হবার পরে আমার ভারত থেকে আগমন সম্বন্ধে তাঁদের সম্রাট কানকে[১৩] পত্র লিখে জানালেন। কানকে লিখিত চিঠির জবাব আসবার আগে যাতে আমি সিন্ (সিন-আস-সিন)–তাদের কথায় সিন-কালান[১৪] জেলা দেখে আসতে পারি সেজন্য বন্দর রক্ষককে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে একজন লোক পরিচালক হিসেবে দিতে। এ জেলাটি তাঁরই এলাকাধীনে। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করে একজন কর্মচারী আমার সঙ্গে দিলেন। আমাদের দেশের যুদ্ধ জাহাজের মতো একটি নৌকায় নদীর উজান পথে আমরা রওয়ানা হলাম। এ নৌকার বৈশিষ্ট্য এই যে,

দাঁড়িরা মাঝখানে[১৫] দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে এবং যাত্রীরা বসে আগে ও পিছনের দিকে। তাদের দেশে জন্মে এমনি এক ধরনের গাছের তৈরি চাঁদোয়া খাটানো হয় নৌকায়। এ জিনিষ দেখতে শনের মতো কিন্তু আসলে শন নয়, শনের চেয়েও সূক্ষ্ম (সম্ভবতঃ ঘাসের তৈরি কাপড় বা মাদুর) আমরা এ নদীর উজান পথে পাল খাটিয়ে যেতে সাতাশ দিন কাটালাম। প্রত্যেকদিন দুপুরের দিকে আমরা কোনো গ্রামের কাছে এসে নৌকা বাঁধতাম এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে নিতাম এবং জহুরের নামাজ পড়ে নিতাম। তারপর বিকেলে গিয়ে আরেকটি গ্রামে হাজির হতাম। এমনি করেই আমাদের দিন কাটছিলো সিন-কালান বা সিন-আস-সিন পৌঁছা অবধি। জয়তুনে এবং এখানে চীনে মাটীর জিনিষ তৈরি হয়। এর ধারে কাছেই আবেহায়াত নদী সমুদ্রে এসে মিশেছে। এজন্য জায়গাকে তারা 'পানির সভা' (The Metting of the Waters) বলে। এর আকারের জন্য এবং বাজারের উৎকর্ষতার জন্য সিন-কালান একটি প্রথম শ্রেণীর শহর। বড় বাজারগুলোর ভেতর একটি হলো চীনে মাটীর বাজার। এখান থেকে চীনে মাটীর জিনিষপত্র চীনের সর্বত্র, ভারত এবং ইয়েমেনে রপ্তানী হয়। এ শহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটি মন্দির আছে। মন্দিরে নয়টি তোরণ। প্রত্যেক তোরণেই মন্দিরের বাসিন্দাদের যাবার জন্য আসন পাতা রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তোরণের মধ্যস্থলে একটি জায়গায় অন্ধ ও খঞ্জেরা বাস করে। মন্দিরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তাদের খোরপোষ সরবরাহ করা হয়। সব কয়টি তোরণের মধ্যেই অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে রুগ্নব্যক্তিদের জন্য একটি হাসপাতাল আছে, রান্নার জন্য একটি ঘরও আছে। আর আছে ডাক্তার ও খাদ্য পরিবেশনকারী কর্মীদল। শুনেছি, জীবিকার্জনে অক্ষম বৃদ্ধেরা এ মন্দির থেকে তাদের খোরপোষ পায়, আর পায় অনাথ ও নিঃসম্বল বিধবারা।

তাদের একজন রাজা এ মন্দির তৈরি করে গেছেন এবং এ শহর, শহরের গ্রাম ও ফল-বাগিচার আর মন্দিরের জন্য দান করে গেছেন। এ রাজার একটি প্রতিকৃতি মন্দিরে রক্ষিত আছে। তারা তার পূজা করে।

এ শহরের এক অংশে মুসলমানদের বাসস্থান। সেখানে তাদের মসজিদ, মুসাফিরখানা, বাজার প্রভৃতি আছে। তাদের একজন কাজী ও একজন শেখও আছেন। চীনের প্রতি শহরেই একজন করে শেখ-উল-ইসলাম থাকবার নিয়ম। তাঁর কাছে মুসলমানদের সব কিছু ব্যাপার জানানো হয় এবং তিনি সেখানকার মুসলমান সমাজ ও সরকারের মধ্যস্থতা করেন। কাজী তাদের মধ্যকার আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসা করেন। আমার বাসস্থান ছিলো আওহাদউদ্দিন নামে সিন্‌জারের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির গৃহে। তিনি ছিলেন অমায়িক প্রকৃতির একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আমি তাঁর সঙ্গে চৌদ্দ দিন ছিলাম। এ সময়ে কাজী ও অন্যান্য মুসলমানদের কাছ থেকে একটার পর একটা উপহার অনবরত আমার কাছে এসেছে। প্রতিদিন তারা নতুন একটা আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করে গীতবাদ্যসহ সুসজ্জিত নৌকায় এসে তাতে যোগদান করতো। সিন-কালান শহরের পরে বিধর্মী বা মুসলমানদের কোনো শহরই নেই। শুনেছিলাম, সেখান থেকে ইয়াজুজ-মাজুজ দূর্গ প্রাচীর ষাট দিনের পথ। এর মধ্যবর্তী

স্থানে যাযাবর বিধর্মীদের বাস। সুযোগ পেলেই তারা নরমাংস ভক্ষন করে[১৮]। সেজন্য সে দেশে কেউ যায় না। আমিও সিন-কালানে এমন কারও দেখা পাইনি যে দূর্গ প্রাচীরে গিয়েছে অথবা গিয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আলাপ করেছে।

আমার জয়তুনে ফিরে আসবার কয়েকদিন পরেই কানের হুকুমানামা এসে পৌছলো। তিনি আমাকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে, আমার ইচ্ছানুসারে জলপথে, নতুবা স্থলপথে রাজধানীতে নিয়ে যেতে লিখলেন। নদীপথে ভ্রমণ করাই আমার পছন্দসই বলে শাসনকর্তাদের ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি একখানা জাহাজ ঠিক করা হলো আমার যাত্রার জন্য। শাসনকর্তা তাঁর কর্মচারীদের আমার সঙ্গে দিলেন। তিনি নিজে এবং কাজী মুসলমান ব্যবসায়ীরা আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্যও পাঠালেন। আমরা রাজকীয় অতিথি হিসাবে যাত্রা করলাম। কোনো এক গ্রামে গিয়ে আমরা মধ্যাহ্নভোজন করতাম এবং অপর এক গ্রামে গিয়ে করতাম সান্ধ্যভোজন। দশ দিন পর আমরা কানজানফু পৌছি। ফলের বাগানে[১৯] আবৃত একটি প্রশস্ত সমতলভূমিতে কানজানফু বেশ বড় একটি শহর। ফলের বাগানের জন্য শহরটিকে দামাস্কের ঘুটা[২০] বলে মনে হয়। আমরা সেখানে পৌছলে কাজী, শেখ-উল-ইসলাম এবং ব্যবসায়ীরা পতাকা, ঢাক-ঢোল, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যবাজনাসহ দেখা করতে এলেন। তাঁরা আমাদের জন্য ঘোড়া এনেছিলেন। কাজেই আমরা সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলাম এবং তাঁরা পায়ে হেঁটে আমাদের আগে-আগে চল্‌তে লাগলেন। কাজী ও শেখ-উল-ইসলাম ছাড়া আর কেউ আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়লেন না। স্বয়ং শাসনকর্তাও তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কারণ, সুলতানের অতিথিদের তারা খুব সম্মানের চোখে দেখে। এভাবে আমরা শহরে এসে পৌছলাম। এ শহরের চারটি দেওয়াল। প্রথম ও দ্বিতীয় দেওয়ালের মধ্যে বাস করে সুলতানের গোলামগণ। তাদের কেউ-কেউ রাত্রে এবং কেউ-কেউ দিনে শহর পাহারা দেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেওয়ালের মধ্যবর্তীস্থানে বাস করে অশ্বারোহী সৈন্যেরা এবং একজন জেনারেল যিনি শহরের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তৃতীয় দেওয়ালের মধ্যে বাস করে মুসলমানরা। এখানেই আমরা শেখের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহন করলাম। চতুর্থ দেওয়ালের মধ্যে চীনাদের বাস। শহরের চারটি এলাকার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়। এ শহরের একটি প্রবেশদ্বার থেকে অপরটির দূরত্ব তিন থেকে চার মাইল। আগেই বলেছি এখানে প্রত্যেকেরই নিজের বাড়ী, বাগান ও জমি আছে।

আমি কানজানফুতে থাকতে একদিন বিশেষ গণ্যমান্য একজন ডাক্তারের প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ সেখানে এসে ভিড়লো। তিনি সিউটার মওলানা কিয়ামউদ্দিন নামে পরিচিত। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলো। নাম শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ হলো। প্রচলিত অভিবাদনাদির পরে কথাবার্তা শুরু করে আমার মনে হলো তিনি আমার পূর্ব পরিচিত লোক। তাঁর দিকে একাগ্রভাবে চাইতে দেখে তিনি অবশেষে বলে উঠলেন, আপনি আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছেন যে দেখে মনে হয় আপনি আমাকে চেনেন।

কাজেই আমিও তখন বললাম, আপনি কোথা থেকে এখানে এসেছেন?

'সিউটা থেকে' তিনি জবাব দিলেন।

আমি বললাম, আমি এসেছি তান্‌জিয়ার থেকে।

একথা বলায় তিনি পুনরায় আমার সঙ্গে অভিবাদনের আদান-প্রদান করলেন। তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিলেন, সমবেদনায় আমারও চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। অতঃপর আমি বললাম, আপনি কি ভারতে গিয়েছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাজধানী দিল্লী আমি গিয়েছি।

একথা বলায় আমারও তাঁকে মনে পড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল-বুশরী?

জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ!

আমার মনে পড়লো, দাড়ী-গোঁফ না-উঠতে কিশোর ছাত্র অবস্থায় তাঁর মাতুল মারসিয়ার আবুল কাসেমের সঙ্গে দিল্লী এসেছিলেন। আমি তাঁর বিষয়ে সুলতানকে বলায় তিনি তাঁকে তিন হাজার দীনার দিয়েছিলেন এবং দিল্লীর দরবারে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চীনদেশে যাবার জন্য তৈরি হয়েছেন বলে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। চীনে এসে তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেছেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তাঁর কাছে শুনলাম, তাঁর পঞ্চাশ জন শ্বেতকায় গোলাম এবং সমসংখ্যক বাঁদী আছে। অন্যান্য অনেক উপহার সামগ্রীর সঙ্গে তিনি আমাকে দু'জন গোলাম ও দু'জন বাঁদী উপহার দেন। পরবর্তী এক সময়ে আমি তাঁর এক ভাইয়ের দেখা পাই কাফ্রীদের দেশে (নিগ্রোল্যান্ড)। দু'ভায়ের বাসস্থান কতো দূরে অবস্থিত!

কানজানফুতে পনেরো দিন কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। চীনদেশে যতো ভালকিছুই থাক, আমার কাছে এদেশ আকর্ষনীয় মনে হলো না। এদেশের বদ্ধমূল নীচতা ও ধর্মহীনতা আমার মনকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে। ঘরের বাইরে গেলেই নজরে পড়তো নানা রকম ন্যাক্কারজনক ব্যাপার। তা দেখে আমার এতো দুঃখ হতো যে নিতান্ত প্রয়োজন না-হলে আমি ঘরের বার হতাম না। চীনে যখনই আমার কোনো মুসলমানের সঙ্গে দেখা হতো তখনই মনে হতো স্বধর্মী একজন আত্মীয়ের দেখা পেলাম। ডাক্তার আল-বুশরী আমার প্রতি এতটা সদয় ছিলেন যে, চারদিনের পথ বায়াম কুত্‌লু [২১] পৌঁছা অবধি তিনি আমাদের সঙ্গে এলেন। এ ছোট শহরটিতে শুধু চীনাদের বাস। তাদের কিছু সংখ্যক সৈনিক, বাকি সবাই সাধারণ শ্রেণীর লোক। সেখানে মাত্র চার ঘর মুসলমানের বাস। তারা সবাই আমার এ জ্ঞানী বন্ধুর মুরিদ। আমরা তিন দিন তাদের একজনের গৃহে কাটিয়ে আবার রওয়ানা হলাম।

আমরা পূর্বের নিয়ম মতই এক গ্রামে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য এবং রাত্রের আহারের জন্য অন্য গ্রামে গিয়ে থেমে নদী পথে চলতে লাগলাম। এমনি করে সতেরো দিন পরে আমরা পৌঁছলাম কান্‌সা (হংচৌ) শহরে। [২২] পৃথিবীতে আমি যত শহর দেখেছি তার ভেতর এ শহরটিই সর্ববৃহৎ। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে এবং প্রয়োজনমত থেমে এ শহরটির

এপাশ থেকে ওপাশ অবধি যেতে তিন দিন সময় লাগে। এ শহরটিও চীনের পূর্ব-বর্ণিত নিয়মে তৈরি। এখানেও প্রত্যেকেরই নিজের বাড়ী ও বাগান আছে। এ শহরটি ছয় ভাগে বিভক্ত। সে সব বিবরণ পরে দেওয়া হবে। আমরা সেখানে পৌছলে অধিবাসীদের একটি দল এলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে শ্বেতপতাকা, জয়ঢাক, বাঁশী প্রভৃতি নিয়ে। এ দলে ছিলেন কাজী শেখ-উল-ইসলাম এবং এ শহরের একজন প্রধান বাসিন্দা মিশরের ওসমান ইবনে আফফানের পরিজনবর্গ নগরের শাসনকর্তা ও তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমরা নগরে প্রবেশ করলাম।

খানসা শহরের ছয়টি অংশ। প্রত্যেক অংশই পৃথক প্রাচীরে ঘেরা এবং সব কয়টি অংশ ঘিরে বাইরেও একটি প্রাচীর আছে। শহরের প্রথমাংশে প্রহরী ও তাদের পরিচালকের বাসস্থান। কাজীর কাছে শুনেছি, তাদের সংখ্যা বারো হাজার। তাদের সেই পরিচালকদের বাসায় আমরা প্রথম রাত্রি কাটালাম। দ্বিতীয় দিন আমরা শহরের দ্বিতীয়াংশে যে দরজা দিয়ে ঢুকলাম তার নাম য়িহুদী দরজা। এখানে বাস করে বহু সংখ্যক য়িহুদী, খৃষ্টান ও সূর্য ও পূজারী তুর্কী। এ অংশের শাসনকর্তা একজন চীনবাসী। আমাদের দ্বিতীয় রাত্রি তাঁর গৃহেই কাটে। তৃতীয় দিনে আমরা শহরের তৃতীয় অংশে প্রবেশ করি। এখানে মুসলমানদের বাস। এটি শহরের একটি চমৎকার অংশ। বাজারগুলো অন্যান্য মুসলিম দেশের বাজারের মতোই সাজানো গোছানো। এখানে মসজিদ মোয়াজ্জিন সবই আছে। আমরা শহরে ঢুকেই শুনতে পেলাম জহুরের নামাজের আজান দেওয়া হচ্ছে। এখানে আমরা ওসমান ইবনে আফফানের গৃহে স্থান পেলাম। তিনি একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী এবং এ শহরকে খুব পছন্দ করেন বলে নিজের গৃহ এখানে তৈরি করেছেন। তাঁর নামানুসারে শহরের এ অংশ ওসমানিয়া নামে পরিচিত। তিনি এখানে যথেষ্ট সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। তিনিই কানসা শহরের প্রধান মসজিদটা তৈরি করিয়েছেন এবং মসজিদের নানা রকম উন্নতি সাধন করেছেন। এখানকার মুসলমানদের সংখ্যা বিপুল। আমরা পনেরো দিন তাদের সঙ্গে কাটাই। প্রত্যেক দিন ও রাত্রেই আমাদের জন্য নতুনভাবে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হয়। তারা প্রত্যেকদিনই আমাদের জন্য উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে এবং শহরের নিত্য নূতন জায়গায় আমাদের নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে।

একদিন তাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে আমি চতুর্থ শহরে বা শহরের চতুর্থাংশে গিয়ে প্রবেশ করলাম। এখানেই রাজধানী এবং প্রধান শাসন-কর্তা কোয়ার্টে এখানে বাস করেন। আমরা প্রবেশ-দ্বারে পৌছতেই আমার সঙ্গীদের পৃথক করে নেওয়া হলো। তখন উজির এসে আমাকে প্রধান শাসনকর্তার প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। এ উপলক্ষ্যেই তিনি সিরাজের দরবেশ জালালউদ্দিনের দেওয়া আলখেল্লাটি নিয়ে নেন। সে কথা আগেই বলেছি। শহরের ছয়টি অংশের মধ্যে এ অংশটি সবচেয়ে বেশি সুন্দর। সুলতানের গোলাম ও ভৃত্য ছাড়া এখানে আর কেউ বাস করে না। এ অংশের ভেতর দিয়ে তিনটি নহর বয়ে গেছে। তার একটি খালের মতো। বড় নদী থেকে তা এসেছে। এ নদী দিয়ে শহরের ছোট-ছোট নৌকায় খাদ্যদ্রব্য ও কয়লা এসে পৌছে। অনেক প্রমোদতরীও এখানে আছে। শহরের মধ্যস্থলে একটি কেল্লা,[২৩] আকারে বিশাল।

কেল্লার মধ্যস্থলে শাসনকর্তার বাসস্থান। কেল্লায় অন্তর্গত অর্ধবৃত্তাকার খিলান-শ্রেণীতে বহু সংখ্যক কারিগর বসে পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রপাতি তৈরি করে। আমীর কোয়ার্টে বলেছেন এক সময়ে ষোল শ' দক্ষ কারিগর এবং তাদের প্রত্যেকের অধীনে তিন বা চারজন করে শিক্ষানবিশ ছিল। তারা সবাই ছিলো কানের গোলাম। তাদের সবারই গায়ে শিকল বেড়ি লাগানো। দুর্গের বাইরে তারা বাস করে। শহরের বাজার অবধি যাবার অনুমতি তাদের আছে কিন্তু প্রবেশদ্বারের বাইরে যাবার অনুমতি নেই। প্রতিদিন শাসনকর্তার সম্মুখ দিয়ে এক-এক বারে এক শ' জন করে হাঁটিয়ে নেওয়া হয়। তখন তাদের কাউকে খুঁজে না পেলে তার পরিচালক বা রক্ষককে দায়ী করা হয়। দশ বছর এভাবে কেউ কাজ করলে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করা হয়। তখন সে ইচ্ছে মতো আগের কাজও করতে পারে অথবা কানের রাজত্বের মধ্যে থেকে অন্য কাজও করতে পারে কিন্তু তাকে এলাকার বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় না। এমনি করে বয়স যখন তার পঞ্চাশ বছর হয় তখন আর তাকে কাজ করতে হয় না। সরকারী খরচে তার ভরণ-পোষণ চলে।[২৪] অনুরূপভাবে অন্যেরাও যখন পঞ্চাশে পদার্পণ করে অথবা কমবেশী পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ করে তবে তারাও সরকারী ভাতা পায়। তারপর ষাট বছর বয়স হলে তাকে শিশু বলে গণ্য করা হয়, এবং আইনগতভাবে সে তখন অপরাধের সাজা পাবার অযোগ্য। চীন দেশে বৃদ্ধদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। তখন তাদের বলা হয় 'আতা' অর্থাৎ পিতা।

আমীর কোয়ার্টেই চীনের প্রধান আমীর [২৫]। আমীর তাঁর প্রাসাদে আমাদের মুসলমান হিসাবে গ্রহণ করেন এবং আমাদের উপলক্ষ্যে একটি ভোজের আয়োজন করেন। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা সে ভোজ-সভায় যোগদান করেন। এ ধরণের ভোজকে তারা বলে তওয়া[২৬]। এজন্য আমীর মুসলমান বাবুর্চীর ব্যবস্থা করেন। ভোজ্যবস্তু যাতে হালাল হয় সেজন্য হারাই জানোয়ার জবাই করে রান্না করে। একজন বিশিষ্ট আমীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বহস্তে আমাদের খাদ্য পরিবেশন করেন। এবং গোশ্ত স্বহস্তে কেটে দেন। আমরা তিনদিন তাঁর প্রাসাদে মেহ্মান ছিলাম। আমাদের যাত্রা কালে তিনি তাঁর ছেলেকে আমাদের সঙ্গে খাল অবধি এগিয়ে দিতে পাঠান। এখানে আমরা একটি জাহাজে গিয়ে উঠলাম। জাহাজটি দেখতে বারুদবাহী জাহাজের মতো। গায়ক ও বাদকদল সহ্ আমীরজাদা আরেকটি জাহাজে গিয়ে উঠলেন। গায়কগণ চীন আরবী ও ফারসী ভাষায় গান গেয়ে আমাদের শুনালো। আমীরজাদা ফার্সীর সুরের একজন ভাল সমঝদার। গায়করা যখন আমাদের একটি ফার্সী গান গেয়ে শুনালো তখন তিনি সে গানটি বার বার গাইতে বললেন। তাতে সে গানটি আমার মুখস্থ হয়ে গেলো। চমৎকার সে গানটি হলো—

Ta' dil bimihnat da'dim
dar hahr-i fikr uftadim
Chun dar namaz istadim
qavi dimihrab andarim.[২৭]

উজ্জ্বল রঙের রঙীন পাল ও চন্দ্রাতপ খাটানো অনেক জাহাজ নিয়ে বহু লোক খালে এসে জড়ো হয়েছে। তাদের জাহাজগুলোও রং করা হয়েছে। তারা তখন কৃত্রিম যুদ্ধ আরম্ভ করলো ও লেবু ও কমলা-লেবু[২৮] একে অপরকে নিক্ষেপ করতে লাগলো। আমরা

সন্ধ্যায় আমীরের প্রাসাদে ফিরে সে রাত্রি সেখানেই কাটালাম। গায়ক ও বাদকরা সেখানে ছিল, তারা সুললিত সুরে গান গেয়ে শুনালো।

সে রাত্রে সেখানে একজন যাদুকর ছিলো। সে কানেরই একজন ক্রীতদাস। আমীর তাকে হুকুম করলেন তোমার কিছু খেলা দেখাও আমাদের।

লোকটি কাঠের একটি বল বের করলো। বলটির গায়ে কয়েকটি ছিদ্র এবং চামড়ার ফালি লাগানো। বলটি সে শূন্যে ছুঁড়ে মারতেই তা উর্ধ্বে উঠতে-উঠতে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। গ্রীষ্মের গরমে আমরা প্রাসাদের দরবার কক্ষের মধ্যস্থলে বসেছিলাম। লোকটির হাতে এক গাছি দড়ি ছাড়া আর কিছুই রইল না। তখন সে তার একজন শাগরেদকে ডেকে সেই দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে বললো। অবশেষে সেও দড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। যাদুকর তিনবার শাগরেদের নাম ধরে ডাকলো কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। তখন রাগের ভাণ করে একখানা ছোরা হাতে নিয়ে সেও দড়ি বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর সেই শাগরেদের একখানা কাটা হাত পড়লো উপর থেকে, পরে একখানা পা, তারপর বাকি হাত, পা এবং ধড়টা। সবশেষে পড়লো তার মাথা। তখন সে নিজে নেমে এলো হাঁপাতে হাঁফাতে। তার সমস্ত কাপড়-জামা রক্ত রঞ্জিত। নেমে এসে সে আমীরের সামনের মাথা চুম্বন করে চীন ভাষায় কি যেনো বললো। আমীরও তাকে কি যেনো হুকুম করলেন। তখন যাদুকর ছেলেটির হাত পা ঠিক জায়াগা মতো লাগিয়ে একটি লাথি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ দেহে উঠে দাঁড়ালো। বিস্ময়ে আমার হৃদকম্প হতে লাগলো। ভারতের সুলতানের দরবারে একবার এ রকম একটি ব্যাপার দেখে আমার ঠিক এমনি অবস্থাই হয়েছিলো। তখন তারা আমাকে কিছু ঔষধ এনে দেওয়ায় আমি সুস্থবোধ করলাম। কাজী আখতারউদ্দিন আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি বললেন, খোদার কসম করে বলতে পারি, দড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, হাত-পা কাটা কিছুই নয়, —সবই ভেল্‌কি।

পরদিন আমরা শহরের পঞ্চমাংশ বা বৃহত্তম অংশে প্রবেশ করলাম। এখানে সাধারণ লোকদের বাস। এখানকার বাজারগুলো উত্তম। বাজারে অনেক দক্ষ কারিকর আছে। এ শহরের নামে যে উৎকৃষ্ঠ শ্রেণীর কাপড় পাওয়া যায় তা' শহরের এ অংশেই তৈরি হয়। আমরা এখানকার শাসনকর্তার মেহ্‌মান হিসেবে একরাত কাটালাম। পরের দিন গেলাম শহরের ষষ্ঠ অংশে, যে দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করলাম তার নাম মাঝির দরজা। বড় নদীর তীরে অবস্থিত এ অংশে নাবিক, জেলে সূতার মিস্ত্রীর বাস। সে সঙ্গে আছে তীরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যেরা। তারা সবাই সুলতানের গোলাম। তাদের সঙ্গে অন্য কোনো শ্রেণীর লোক এখানে বাস করে না। এদের সংখ্যাও কম নয়। আমরা সেখানেও শাসনকর্তার মেহ্‌মান হয়ে এক রাত কাটালাম। আমীর কোয়ার্টে আমাদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সহ একটি জাহাজ যাত্রার জন্য সজ্জিত করালেন এবং আমাদের সুখ-সুবিধা বিদানের জন্য একজন পারিষদও পাঠালেন। আমরা চীনের এ শেষ শহর ত্যাগ করে খিতা (ক্যাথে) নামক দেশে প্রবেশ করলাম।

ক্যাথে পৃথিবীতে একটি সর্বোত্তম আবাদী জমিপূর্ণ দেশ। এ দেশের কোথাও এতোটুকু জমি অনাবাদী নেই। তার কারণ, কোনো জমি অনাবদী পড়ে থাকলেও তার বাসিন্দা বা আশেপাশের লোকদের সে জমির কর দিতে হয়। খান্‌সা শহর থেকে খান্‌-

বালিক (পিকিং) শহর অবধি এ নদীর উভয় তীরে ফলের বাগান, গ্রাম ও মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। খান্‌সা থেকে খান্‌-বালিক চৌষট্টি দিনের পথ। এ অঞ্চলের কোথাও মুসলমানদের দেখা পাওয়া যায় না। কচিৎ মুসলমান সফরকারীরা এখানে আসেন। কারণ, এ অঞ্চল মুসলমানদের স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্য নয়। এখানে কোনো বড় শহর নেই। অধিকাংশই গ্রাম ও বিস্তৃত[২৯] মাঠ। মাঠগুলো শস্য, ফলের গাছ ও ইক্ষু প্রভৃতিতে পূর্ণ। ইরাকের আনবার ও আনা মধ্যবর্তী চার দিনের পথ বিস্তৃত মাঠ ছাড়া এমন বিস্তৃত মাঠ আমি দুনিয়ার আর কোথাও দেখিনি। আমরা প্রতি রাত্রেই কোনো গ্রামে গিয়ে নামতাম এবং আমাদের জন্য সুলতানের মেহ্‌মান হিসাবে বরাদ্দকৃত রসদাদি গ্রহণ করতাম।

এভাবে আমরা খান-বালিক শহর-যা–খানিকু [৩০] নামেও পরিচিত, সফর শেষ করলাম। তাদের সম্রাট কানের রাজধানী খান-বালিক এ সম্রাটের রাজ্য চীন ও ক্যাথে অবধি বিস্তৃত। আমরা এখানে পৌঁছে রীতি অনুসারে শহরের দশ মাইল দূরে থাকতে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করলাম। আমাদের আগমন সংবাদ নৌ-সেনাপতিদের লিখিতভাবে জানানো হলে তাঁরা আমাদের বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। বন্দরে প্রবেশের পরে আমরা শহরে অবতরণ করলাম। পৃথিবীর বৃহত্তম শহরের ভেতর এটিও একটি। এ শহরটি চীন দেশের শহরের ধরনে নির্মিত নয়। চীন দেশের শহরের ভেতরেই বাগান থাকে। অন্যান্য দেশের মতো এখানকার বাগান নগর-প্রাচীরের বাইরে। শহরের মধ্যস্থলে সুলতানের প্রাসাদ একটি দুর্গের ন্যায়। তার বর্ণনা পরে দেওয়া হবে। আমি এখানে সাগার্জের শেখ বোরহানউদ্দিনের সঙ্গে অবস্থান করি। ভারতের সুলতান এঁকেই চল্লিশ হাজার দীনার পাঠিয়ে ভারতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু ইনি সে টাকা গ্রহণ করে নিজের দেনা পরিশোধ করেন এবং ভারতে যেতে অস্বীকার করে চীন যাত্রা করেন। এখানে কান তাঁকে সদর-আল-জিহান উপাধি দিয়ে তাঁর রাজ্যের সমস্ত মুসলমানদের শীর্ষে তাঁকে স্থান দিয়েছেন। লুর দেশে যেমন শাসনকর্তাকে বলা হয় 'আতাবেগ' [৩১] এখানে তেমনি যিনি রাজ্য পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় কান। এ কানের নাম পাশায় [৩২]। দুনিয়ার বুকে পাশায়ের এ রাজ্যের চেয়ে বড় রাজ্য অপর কোনো বিধর্মীর নেই। তাঁর প্রাসাদ শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটিই তিনি বাসস্থানরূপে ব্যবহার করেন। প্রাসাদের বহুলাংশ কাষ্ঠদ্বারা সুচারুভাবে নির্মিত।

আমরা যখন রাজধানী খান-বালিকে পৌঁছি তখন কান অনুপস্থিত ছিলেন। কানের ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় ফিরোজ নামক এক ব্যক্তি কারাকোরাম জেলায় এবং ক্যাথের[৩৩] বিশ-বালিগে বিদ্রোহ করেছিলেন বলে কান তাঁকে দমন করতে গেছেন। উল্লিখিত জায়গা থেকে রাজধানী আবাদী অঞ্চলের ভেতর দিয়ে তিন মাসের পথ। কান রাজধানী ত্যাগ করলে আমীরদের অধিকাংশ তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করে তাঁকে পদচ্যুত করাতে চায়, কারণ তিনি 'ইয়াসাক' বা তাদের পূর্বপুরুষ চেংগিস খাঁনের উপদেশাবলী মেনে চলেন না। এ চেংগিস খাঁই কয়েকটি মুসলিম দেশ ধ্বংস করেন। আমীররা কানের বিদ্রোহী ভাইপোর কাছে গিয়ে কানকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে লিখিতভাবে জানান এবং খানসা শহর তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য রাখতে বলেন। তিনি তাতে অস্বীকৃত হন। ফলে তাঁদের ভেতর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

আমাদের রাজধানীতে পৌঁছবার কয়েকদিন পরেই আমরা এ খবর শুনতে পাই। শহরটি সজ্জিত করা হয় এবং একমাস অবধি বাঁশী জয়-ঢাক প্রভৃতি বাদ্য-বাজনা ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। অতঃপর নিহত কান এবং সে সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা ও অন্যান্য প্রায় শতেক নিহত ব্যক্তিকে সেখানে আনা হয়। তারপর মাটী খনন করে মাটীর নীচে প্রকাণ্ড একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করা হয়। প্রকোষ্ঠটি মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত করে কানের দেহ রাখা হয় সেখানে। কানের সঙ্গে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রাসাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যবান পাত্রাদিও ভূগর্ভে রক্ষা করা হয়। সর্বশেষে সেই প্রকোষ্ঠে দেওয়া হয় কানের চারজন বাঁদী ও প্রধান পরিচারিকাদের দু'জন পানপাত্র বহন করা ছিল যাদের কাজ। তারপর প্রকোষ্ঠের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ করে সে জায়গায় মাটী চাপা দিয়ে বেশ বড়ো একটি টিলা তৈরি করা হয়। তখন তারা চারটি ঘোড়া নিয়ে আসে সেখানে। ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে থেমে না-যাওয়া অবধি কানের কবরের চারপাশে দৌড়াতে থাকে। ইত্যবসরে কবরের উপর কাঠের একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। তারপর ঘোড়া চারটি সেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয় তাদের লেজ থেকে মাথা অবধি[৩৪] একটি করে কাঠের দণ্ড ঢুকিয়ে। কানের উপরোক্ত আত্মীয়দেরও এমনি করে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে রাখা হয় তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহের তৈজসপত্রসহ। আত্মীয়দের মধ্যে দশজন ছিলেন প্রধান। তাঁদের প্রত্যেকের কবরের উপর ঝুলানো হয় তিনটি করে শূলবিদ্ধ ঘোড়া। বাকি সবার কবরের উপরে ঝুলানো হয় একটি করে।

এ দিনটি পালন করা হয় পবিত্র পর্বদিন হিসেবে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নারী-পুরুষ কেউ এ দিনের উৎসবে অনুপস্থিত থাকে না। সেদিন সবাই তারা শোকের পোশাক পরিধান করে। অমুসলিমরা পরে হাতাবিহীন সাদা ফতুয়া আর মুসলিমরা পরে লম্বা সাদা কোর্তা। কানের স্ত্রীরা এবং সভাসদগণ চল্লিশ দিন কবরের আশেপাশে তাঁবু ফেলে বাস করেন। কেউ-কেউ তার চেয়ে বেশী, এমন কি এক বছর অবধি সেভাবে কাটান। তাঁদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের জন্য সেখানে রীতিমত একটি বাজার বসে যায়। আমি যতদূর জানি, আজকাল এ-রকম রীতি আর কোনো জাতির মধ্যেই প্রচলিত নেই। ভারতীয় বিধর্মীরা এবং চীনের লোকেরা তাদের মৃতদেহ দাহন করে। অন্য সবাই মৃতদের দাফন করে কিন্তু আর কাউকে সে সঙ্গে দেয় না। বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছি, কাফ্রী দেশের অধিবাসীরা তাদের রাজা মারা গেলে একটি নাউস বা প্রকাণ্ড গর্ত খনন করে। তারপর সে গর্তে রাজার সঙ্গে তাঁর কতিপয় সভাসদ ভৃত্য এবং প্রধান প্রধান বংশের ত্রিশটি ছেলে ও মেয়ের হাত পা ভেঙ্গে সমাহিত করে। তাদের সঙ্গে কয়েকটি পানপাত্রও দিয়ে দেওয়া হয়।

কানের হত্যার পরে তাঁর ভাইপো ফিরোজ রাজ্য দখল করলে তিনি কারাকোরামে রাজধানী স্থাপন করা স্থির করেন। কারণ, এখান থেকে তাঁর জ্ঞাতিভাই তুর্কীস্থানের রাজার ও ট্রান্সোক্সানিয়ার[৩৫] রাজ্য ছিল নিকটে। পরে কতিপয় আমীর, কানের হত্যাকালে যারা উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটায়, ফলে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

বারো

দেশে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে শেখ বোরহানউদ্দিন ও অন্য সবাই আমাকে পরামর্শ দিলেন, বিশৃঙ্খলাবস্থা ভালভাবে দানা বাঁধবার আগেই দক্ষিণ চীনে ফিরে যেতে। তাঁরা আমাকে সুলতান ফিরোজের কাছে নিয়ে গেলেন। সুলতান তাঁর তিন জন অনুচর আমার সঙ্গে দিলেন এবং পথের সর্বত্র আমাকে অতিথির মতো ব্যবহার করতে লিখে দিলেন।

আমরা নদীর ভাটিপথে খান্‌সা এবং সেখান থেকে কানৃজানফু ও জায়তুন এসে পৌঁছলাম। জায়তুনে পৌঁছে ভারত যাত্রার জন্য তৈরি কয়েকখানা চীনদেশীয় নৌকা জাঙ্ক দেখতে পেলাম। সে সব জাঙ্কের একখানার মালিক ছিলেন জাভার (সুমাত্রা) শাসনকর্তা আল-মালিক আজ-জাহির। জাঙ্কের খালাসীরাও সবাই ছিল মুসলমান। এজেন্ট আমার পূর্ব-পরিচিত ছিলেন বলে আমার আগমনে খুব খুশী হলেন। অনুকূল হাওয়ায় পাল খাটিয়ে দশ দিন চলার পরে আমরা যখন 'তাওলিসি' দেশের কাছাকাছি এসেছি তখন হাওয়ার গতির পরিবর্তন ঘট্‌লো, আকাশ মেঘে কালো হয়ে গেলো এবং প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো। দশ দিন অবধি সূর্যের মুখ দেখতে পেলাম না। দশ দিন পরে এমন এক সাগরে এসে পৌঁছলাম যার নাম আমাদের জানা ছিলো না। খালাসীরা সবাই তখন শঙ্কাকুল হয়ে উঠলো। তারা চীনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু চীনে ফিরে যাবার প্রশ্ন তখন অবান্তর। আমরা তখন কোন্‌ সাগরের বুকে ভাসছি না বুঝেই বিয়াল্লিশ দিন কাটিয়ে দিলাম ।

তেতাল্লিশ দিনের ভোরে প্রায় বিশ মাইল দূরে সাগরের বুকে দেখতে পেলাম একটি পর্বত। জাহাজের খালাসারা সবাই হতভম্ব। তারা বলাবলি করতে লাগলো আমরা এখন স্থলভাগের ধারে কাছেও নেই। সাগরে পর্বত আছে বলে আমাদের জানা নেই। বাতাস যদি আমাদের জাঙ্ক পর্বতের উপরে নিয়ে ফেলে তবে আর রক্ষা নেই। সবাই তখন আল্লাকে স্মরণ করতে লাগলো। কেউ-কেউ নতুন করে তওবা করে নিল। আমরাও খোদার দয়া ভিক্ষা করতে লাগলাম এবং রসুলুল্লাহ্‌ যাতে আমাদের জন্য খোদার কাছে

সুপারিশ করেন সেজন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম। সওদাগরেরা অনেক টাকা-পয়সা খয়রাত করবেন বলে মানত্ করতে লাগলেন। আমি নিজ হাতে একটি খাতায় তাদের মানতের কথা লিখে দিলাম। বাতাস একটু শান্ত হলো। তখন সুর্য উঠলে দেখতে পেলাম, পর্বতটি আকাশে মাথা তুলেছে, পর্বত ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে সুর্যের আলো এসে পড়েছে। আমরা তাই দেখে অবাক হয়ে গেলাম। খালাসীরা তখন কাঁদতে-কাঁদতে একে অপরের কাছ থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের এ আবার কি হলো?

তারা বললো, আমার যাকে পবর্ত মনে করেছিলাম সে একটা 'রক' পাখী। সে যদি একবার আমাদের দেখতে পায় তবে আর নিস্তার নেই।[১]

আমরা তখন সেই পর্বত থেকে মাত্র দশ মাইল ব্যবধানে রয়েছি। খোদার অসীম অনুগ্রহে তখন বাতাসের গতি আমাদের অনুকুলে এলো। তার ফলে আমরা অন্যদিকে চালিত হলাম এবং সেটাকে আর দেখতে পেলাম না এবং তার স্বরূপও জানতে পেলাম না।

অবশেষে দু'মাস পরে আমরা জাভায় পৌঁছে সুমাত্রা শহরে পর্দাপণ করলাম। জাভার সুলতান তখন বিশাল একদল বন্দী নিয়ে এক অভিযান থেকে ফিরেছেন। তিনি আমাকে দু'জন বালক ও দু'জন বালিকা পাঠিয়ে দেন এবং আমাকে সমাদরে স্থান দেন। সুলতানের ভ্রাতুস্পুত্রীর সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহে আমি উপস্থিত ছিলাম। এ-দ্বীপে দু'মাস কাটিয়ে আমি পুনরায় একটি জাঙ্কে আরোহণ করে যাত্রা শুরু করলাম। বিদায়কালে সুলতান আমাকে প্রচুর অগুরু, কর্পূর লবঙ্গ, চন্দককাঠ উপহার দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চল্লিশ দিন পরে আমরা কাওলাম (কুইলন) এসে পৌঁছলাম। এখানে অবতরণ করে আমি মুসলমানদের কাজীর গৃহের সন্নিকটে বাস করতে লাগলাম। সেটা ছিল রমজান (জানুয়ারী ১৩৪৭) মাস। এখানকার প্রধান মসজিদে আমি ঈদের নামাজ আদায় করি। কাওলাম থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা কালিকট গিয়ে কিছুদিন কাটাই। আমার ইচ্ছা ছিল দিল্লী ফিরে যাওয়া । কিন্তু ভালভাবে চিন্তা করার পরে ভয়ে দিল্লী যাত্রা স্থগিত রাখলাম। পুনরায় জাঙ্কে আরোহণ করে আটাশ দিন পর ধাফারী এসে পৌঁছলাম। তখন ৭৪৮ হিজরীর মহরম মাস(১৩৪৭এর এপ্রিল মাসের শেষাংশ)।

অতঃপর জাহাজে চড়ে আমরা ম্যাস্কট নামক ছোট একটি শহরে এলাম। এখানে প্রচুর কালব্ আল-মাছ পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমরা গেলাম কুরায়াত, শাব্বা, কাল্বা [২] ও কালহাত প্রভৃতি বন্দরে। এ সব বন্দরের কথা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব শহর হরমুজ প্রদেশের অংশ বিশেষ যদিও এগুলোকে ওমান জেলার অন্তর্গত বলে ধরা হয়। সেখান থেকে আমরা হরমুজ গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে তিন রাত কাটিয়ে গেলাম কাওরাস্তান, লার ও খুঞ্জুবালে। এ সবের কথাই আগে উল্লেখ করা হয়েছে । খুঞ্জুবাল থেকে এলাম কারজি[৩]। কারজিতে তিন রাত কাটিয়ে অন্যান্য কয়েকটি শহর ও গ্রাম পার হয়ে এলাম শিরাজ; শিরাজ থেকে ইসফাহান। সেখান থেকে তুস্তার (সুস্তার) হয়ে বস্‌রা। সেখানে পবিত্র যে সব কবর রয়েছে তা জেয়ারত করা হলো। এমনি করে

মাশ্‌-হাদ আলী ও হিলা হয়ে বাগদাদ এলাম ৪৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে (জানুয়ারী, ১৩৪৮)। মরক্কো থেকে এসেছেন এমনি একজন লোকের সঙ্গে সেখানে আলাপ হলো। তারিফার বিপর্যয়ের খবর এবং খ্রীষ্টানদের আল-খাদ্রা (আল্‌ জেসিরাস) দখলের [৪] খবর পেলাম তাঁর কাছে। ইসলামের যে ক্ষতি তাতে হয়েছে খোদা যেনো তা পূরণ করেন।

আমি উপরে বর্ণিত তারিখে যখন বাদদাদ পৌঁছি তখন বাগদাদ ও ইরাকের সুলতান ছিলেন শেখ হাসান [৫]। ভূতপূর্ব সুলতান আবু সাইদের তিনি ফুপাতো ভাই। শেখ হাসানের স্ত্রীকে যেমন আবু সাঈদ বিয়ে করেছিলেন তেমনি শেখ হাসানও আবু সাঈদের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী দিলশাদকে বিবাহ করেন এবং আবু সাঈদের ইরাক রাজ্য দখল করেন। দিলশাদ ছিলেন আমীর চুবানের পুত্র দিমাস্ক খাজার কন্যা। আমরা যখন বাগদাদে পৌঁছি সুলতান হাসান তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন তুর দেশের শাসনকর্তা সুলতার আতাবেগ আফরাসিয়াব-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

বাগদাদ ছেড়ে আমরা গেলাম আনবার। আনবার থেকে পর পর এলাম হিত্‌ হাদিসা এবং আনা[৬]।

এটি পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী ও উর্ব্বর জেলা। এখানে রাস্তার দু'পাশে এতো দালান কোঠা যে হেঁটে যেতে মনে হবে কোনো বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আগেই আমরা বলেছি, একমাত্র এ জেলা ছাড়া চীনের নদীর তীরবর্তী দেশগুলোর তুলনা হয় না। আনা থেকে রওয়ানা হয়ে পৌঁছলাম রাহবা শহরে। রাহবা সিরিয়ার[৭] সীমান্তে সবচেয়ে সুন্দর শহর। সেখান থেকে গেলাম আস্‌-সুখ্‌না নামক আরেকটি সুন্দর শহরে।[৮] এ শহরের অধিবাসীরা প্রধানতঃ খৃষ্টান। এ শহরের নাম আস-সুখ্‌না (গরম শহর) হবার কারণ হলো, এখানকার পানির উষ্ণতা। এখানে নারী ও পুরুষদের জন্য স্নানাগার রয়েছে। এখানকার লোকেরা রাত্রে পানি আনে এবং ঠাণ্ডা হবার জন্য পানি ছাদের উপর রেখে দেয়।

অতঃপর আমরা গেলাম হজরত সুলেমানের শহর তাদমুর (পালমিরা)। এ শহরটি জিন্‌দের [৯] দ্বারা তাঁর জন্যে নির্মিত হয়। সেখান থেকে বিশ বছর পরে আবার ফিরে এলাম দামাস্ক শহরে। আমার একজন স্ত্রীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এখানে রেখে গিয়েছিলাম। ভারতে থাকাকালে শুনেছিলাম, সে পরে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেছে। তাই শুনে আমি ভারতীয় মুদ্রায় চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা দীনার পাঠিয়ে দেই পুত্রের নানার কাছে। তিনি ছিলেন মরক্কোর অন্তর্গত মিকনাসা (মেকুইনেজ) নামক জায়গার অধিবাসী। দামাস্কে পৌঁছে আমার ছেলের খবর নেওয়া ছাড়া আর কোনো চিন্তাই রইলো না মনে। সৌভাগ্যক্রমে মসজিদে গিয়ে নুরউদ্দিন আস্‌ শাখাইর দেখা পেলাম। তিনি ছিলেন এমাম এবং মালিক বংশের শেখ বা প্রধান ব্যক্তি। আমি তাঁকে সালাম জানালাম কিন্তু তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি তখন নিজের পরিচয় দিয়ে ছেলেটির কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বারো বছর হবে সে মরে গেছে।

তাঁর কাছে শুনলাম, তাঞ্জিয়ারের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি জাহিরিয়া একাডেমীতে বাস করছেন। কাজেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের খবর জানবার জন্য। গিয়ে দেখলাম, তিনি একজন পূজনীয় শেখ। তাঁকে সালাম করে আমার বংশ-পরিচয় দিতেই তিনি জানালেন, আমার পিতা এন্তেকাল করেছেন পনেরো বছর আগে। মাতা এখনও জীবিত আছেন। বছর শেষ হওয়া অবধি আমি দামাস্কে কাটালাম, যদিও খাদ্যদ্রব্য সেখানে সেবার দুর্মূল্য এবং সাত আউন্স পরিমাণ রুটির মূল্য এক দেরহাম নাকরা (প্রায় পাঁচ পেনি)। সেখানকার এক আউন্স মরক্কোর চার আউন্সের সমান।

দামাস্ক থেকে এলাম আলেপ্পো। আলেপ্পো আসাতে পথে পড়লো হিমস, হামা, মা'রা, ও সারমিন। এখানে এলে একটি ঘটনা ঘটলো। আইনটাব্[১০] নামক শহরের বাইরে এক পাহাড়ের উপর বাস করতেন এক দরবেশ। প্রধান শেখ নামে তিনি পরিচিত। অনেক লোকজন আসতো সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করে দোয়া পাবার জন্যে। এছাড়া তিনি নিজে ছিলেন অবিবাহিত একজন মাত্র শিষ্য ছিল সঙ্গে তাঁর পরিচর্যার জন্য। এক দিন ধর্মোপদেশ দিতে-দিতে তিনি বললেন, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহ্ ওয়ালাম হে সাল্লাম) নারী ছাড়া থাকতে পারতেন না কিন্তু আমি তা পারি। এ জন্য কাজীর দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সাবুদ নেওয়া হলো, প্রমাণও পাওয়া গেলো। ব্যাপারটা তখন প্রধান সেনাপতির গোচরীভূত করা হলো। শেখ ও তাঁর শিষ্য দোষ স্বীকার করলেন। তখন চার মোজহাবের বিচারকগণ তাঁদের প্রাণদণ্ডের বিধান দিলেন। যথা সময়ে তাদের প্রাণদণ্ড হয়ে গেল।

জুন মাসের প্রথম দিকে আলেপ্পোতে খবর পেলাম গাজায় ভয়ানক প্লেগ দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় হাজারেরও উপর। আমি হিমস গিয়ে দেখলাম সেখানেও প্লেগের প্রকোপ। যেদিন সেখানে পৌছলাম সেদিনের মৃত্যু সংখ্যা সেখানে তিনশ'। কাজেই আমি দামাস্কে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং বৃহস্পতিবার গিয়ে সেখানে পৌছলাম। সেখানকার বাসিন্দারা তখন তিন দিন থেকে রোজা পালন করছে। শুক্রবার কদম মোবারক মসজিদে এসে জমায়েত হলো, আগেই তা পুস্তকের প্রথমাংশে বলেছি। তখন খোদা তাদের প্লেগের কবল থেকে মুক্তি দেন। তাদের সেখানে দৈনিক মৃত্যুর সর্বাধিক সংখ্যা দু'হাজার চার শ'তে উঠেছিলো।

তারপর আমি আজালুন গেলাম, সেখান থেকে গেলাম জেরুজালেম। সেখানে গিয়ে দেখলাম প্লেগের প্রকোপ কমে গেছে। আমরা আবার হেবরণে ফিরে গেলাম, সেখান থেকে গেলাম গাজা। গাজায় গিয়ে দেখলাম প্লেগে লোক মরে অধিকাংশ জায়গা বিরাণ পড়ে আছে। কাজীর কাছে শুনলাম সেখানে দৈনিক এগারো শ' লোক প্লেগে মরছে। আমরা সেখান থেকে দামিয়েত্তা এবং দামিয়েত্তা থেকে আলেকজান্দ্রিয়া গেলাম পদব্রজে। সেখানেও প্লেগের প্রকোপ তখন কমে এসেছে যদিও মৃত্যু-সংখ্যা দৈনিক এখানে এক হাজার আশি অবধি উঠেছিল।

অতঃপর কায়রো এসে হাজির হলাম। সেখানে এসে শুনলাম প্লেগে মহামারীর সময় দৈনিক একুশ হাজার লোকও মরেছে।[১১] কায়রো থেকে সাইদ (আপার মিশর) হয়ে এলাম আয়ধাব। সেখান থেকে জাহাজে উঠলাম জুদ্দায় যাবার জন্যে। জুদ্দা থেকে মক্কা এসে হাজির হলাম ৪৯ হিজরীর ২২শে শাবান (১৬শে নভেম্বর, ১৩৪৮) তারিখে।

এ বছরের হজব্রত (২৮শে ফেব্রুয়ারী–২রা মার্চ) পালন করে সিরিয়ার এক কাফেলার সঙ্গে তায়বা (মদিনা) পৌঁছলাম। সেখান থেকে জেরুজালেম ও গাজা হয়ে আবার ফিরে এলাম কায়রো । কায়রো এসে জানতে পারলাম, আমাদের খলিফা আবু ইনানের প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ মরোক্কোর মারিণ[১২] বংশের বিচ্ছিন্ন লোকদের পুণরায় একতাবদ্ধ করেছেন। আমরা শুনলাম আবু ইনান দেশের ছোট বড় সকলের প্রতি এমন অনুগ্রহ দেখিয়েছেন যে আপামর সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। একথা শুনে তাঁর রাজধানী দেখবার ইচ্ছা জাগলো আমার অন্তরে। তা'ছাড়া নিজের গৃহের স্মৃতিও তখন আমার মনকে উতলা করে তুলেছে, প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছে মনে নিজের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের দেখতে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে। কারণ, সে দেশের তুল্য আর কোন দেশই আমার চোখে কখনও পড়েনি।

তখন আমি একজন তিউনিসবাসীর ছোট একখানা সওদাগরী জাহাজে ৫০ হিজরীর সফর মাসে (এপ্রিল-মে, ১৩৪৯) রওয়ানা হয়ে জেরবা পৌঁছলাম। আমি সেখান নেমে রইলাম আর জাহাজ চলে গেলো তিউনিসের দিকে। সেখানে সে জাহাজ শত্রুর কবলে[১৩] গিয়ে পৌঁছল। জেবরা থেকে ছোট একখানা নৌকায় আমি কাবিস্ (গাবেস) পৌঁছে আবু মারওয়ান ও আবুল আব্বাস নামক প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয়ের আতিথ্য গ্রহণ করলাম। তাঁরা জেরবাও গাবেসের শাসনকর্তা মক্কির পুত্র। আমি তাঁদের সঙ্গে হজরতের জন্মদিন ফাতেহা দোয়াজ দাহারম পর্ব (১২ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৩১শে মে) উদযাপন করলাম।

অতঃপর সেখান থেকে নৌকাযোগে সাফাকাস (Sfax) এলাম এবং সমুদ্রপথে গেলাম বুলিয়ানা[১৪]। কয়েকজন আরবের সঙ্গে সেখান থেকে পদব্রজে তিউনিস শহরে যখন পৌঁছি তখন আরবরা তিউনিস অবরোধ করেছে। তিউনিসে ছত্রিশ দিন কাটাবার পর কাতালানদের সঙ্গে জাহাজে উঠলাম। জাহাজ সারদানিয়া (সারাদিনিয়া) দ্বীপে গিয়ে পৌঁছল। খৃষ্টান অধিকৃত দ্বীপের অন্যতম দ্বীপ সারদানিয়া। এখানে চমৎকার একটি পোতাশ্রয় আছে। পোতাশ্রয়টি চতুর্দিক কাঠ দিয়ে ঘেরা, এক জায়গায় একটি দরজা। এদের অনুমতি পেলেই কেবল সে দরজা খোলা হয় [১৫]। দ্বীপে সংরক্ষিত শহর আছে। তার একটিতে গিয়ে সেখানে আমরা অনেকগুলো বাজার দেখতে পেয়েছিলাম । দ্বীপের লোকেরা ষড়যন্ত্র করেছিলো,আমরা দ্বীপ ছেড়ে রওয়ানা হলে তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করবে এবং ধরে এনে ক্রীতদাস করে রাখবে। তাই টের পেয়ে আমি খোদার কাছে মানত্ করলাম, খোদা যদি নিরাপদে আমাদের এ দ্বীপ থেকে যেতে দেন তা হলে একাদিক্রমে দু'মাস রোজা রাখবো। পরে আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে দশদিন পর তেনেস পৌঁছি, সেখান থেকে পৌঁছি মাজুনা, মাজুনা থেকে মুস্তাঘানিম

(মোস্তাঘানেম) এবং তিলিম সান (তেল্‌মসেন)। আমি আল-উব্বাদ গিয়ে শেখ আবু মাদিনের[১৬] কবর জেয়ারত করি। তিলিমসান ছেড়ে আমি নাদ্রুমা সড়ক ধরে চলতে থাকি এবং সেখান থেকে আখান্দাকান্ সড়কে গিয়ে শেখ ইব্রাহিমের আস্তানায় গিয়ে একরাত কাটাই। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আজগানগানের[১৭] কাছে পৌঁছলে পঞ্চাশ জন পদাতিক এবং দু'জন অশ্বারোহী আমাদের আক্রমণ করে। তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তানজিয়ারের হাজী ইবনে কারিয়াত এবং তাঁর ভাই মোহাম্মদ। মোহাম্মদ পরে সমুদ্রের বুকে শহীদ হন। আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো বলে স্থির করে নিশান উড়িয়ে দিলাম। তার ফলে তারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি করলো এবং খোদাকে ধন্যবাদ যে তাদের সঙ্গেই আমরা অগ্রসর হলাম। তারপর আমরা তাজা শহরে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে গিয়ে খবর পাই আমার মাতা প্লেগ রোগে এন্তেকাল করেছেন। পরম দয়ালু খোদা তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন। পরে তাজা থেকে রওয়ানা হয়ে ৭৫০ হিজরীর সাবান মাসের শেষে এক শুক্রবার (১৩ই নভেম্বর,১৩৪৯) রাজধানী শহরে ফেজে পৌঁছি।

ফেজে পৌঁছে আমি পরম দানশীল আমাদের ইমাম, আমিরুল মোমেনিন হজরত আল্-মুতাওয়াক্কিল আবু ইনানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। খোদা তাঁর মহত্ব বৃদ্ধি করুণ এবং শত্রুকে দুর্বল করুণ। তাঁর পদমর্যাদার কাছে ইরাকের সুলতানের পদমর্যাদা, সৌন্দর্যের কাছে ভারতের বাদশাহের সৌন্দর্য, সদগুণের কাছে ইয়ামেনের সুলতানের মহৎ চরিত্র, সাহসের কাছে তুর্কী সম্রাটের সাহস, দয়ার কাছে গ্রীক সম্রাটের দয়া, জ্ঞানের কাছে জাভার সম্রাটের জ্ঞান আমি ভুলে গেলাম। আমি তাঁর গৌরবময় রাজ্যে এসে আমার সফর শেষ করলাম। আমি নিঃসন্দেহ যে এ দেশটি সর্বপ্রকারে সকল দেশের সেরা দেশ। কারণ এখানে প্রচুর ফল পাওয়া যায় এবং চলমান পানির স্রোত ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য কখনও নিঃশেষ হয় না। একসঙ্গে এতোগুলো গুণের সমন্বয় খুব কম দেশেই ঘটেছে।

পাশ্চাত্যের দেরহাম ছোট হতে পারে কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্য অত্যন্ত বেশী। আপনি যখন মিশর ও সিরিয়ার দেরহামের মূল্যের সঙ্গে এখানকার দেরহামের মূল্যের তুলনা করবেন তখন আমার কথার সত্যতা এবং পাশ্চ্যত্যের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি মিশরে এক দেরহাম নাক্‌বার পরিবর্তে আঠারো আউন্স ছাগমাংস বিক্রি হয়। এক দেরহাম নাক্‌রা পাশ্চাত্যের ছয় দেরহামের সমতুল্য।[১৮] পক্ষান্তরে মূল্য যখন বেশী থাকে তখনও পাশ্চাত্যের দুই দেরহামে অর্থাৎ নাক্‌রায় এক-তৃতীয়াংশে আঠারো আউন্স গোশ্‌ত পাওয়া যায়। মিশরে তরল মাখন (ঘি) আদৌ পাওয়া যায় না। মিশরের লোকেরা রুটীর সঙ্গে যে সব জিনিষ খায় পাশ্চাত্যের লোকেরা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। তারা বেশীর ভাগ খায় প্রকাণ্ড কড়াইতে তিল তেল দিয়ে রান্না করা মসুর বা মটর কলাই।[১৯] বাসিল্লা নামে এক রকম মটর রান্না করে তারা জলপাইর তেল সহ খায়; ছোট এক জাতের শশা সিদ্ধ করে তারা দৈ মিশিয়ে খায়; তারা একই উপায়ে সালাড্ তৈরী করে।[২০] বাদাম গাছের কুঁড়িও তারা

রান্না করে দৈ দিয়ে খায় এবং কচু রান্না করে খায়। পাশ্চাত্যে এ সব জিনিষ অতি সহজলভ্য। খোদা এখানকার অধিবাসীদের এ সব না খাইয়েও পারে কারণ, এখানে প্রচুর গোশ্‌ত, ঘি, মাখন, মধু এবং অন্যান্য খাদ্য পাওয়া যায়। মিশরে কাঁচা শাকসব্‌জীও দুষ্প্রাপ্য। বেশীর ভাগ ফলমূলই সেখানে আসে সিরিয়া থেকে। সস্তার সময়ে এক দেরহাম নাক্‌রায় তিন পাউণ্ড আঙ্গুর বিক্রি হয়। বারো আউন্সে তাদের এক পাউণ্ড।

সিরিয়ায় ফল প্রচুর পাওয়া যায় কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ফলের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা। সেখানে এক দেরহাম নাকরায় পাওয়া যায় এক পাউণ্ড আঙ্গুর (তাদের এক পাউণ্ড পাশ্চাত্যের তিন পাউণ্ডের সমান)। দাম যখন সেখানে সস্তা হয় তখন এক দেরহাম নাকরায় দু' পাউণ্ড পাওয়া যায়। একটি ডালিম বা নাশপাতি জাতীয় ফলের দাম আট ফল (তাম্রমুদ্রা) যা আমাদের এক দেরহামের সমতুল্য। এক দেরহাম নাকরায় যে পরিমাণ শাকসব্‌জী পাওয়া যায় তার চেয়ে আমাদের দেশের ছোট দেরহামের কেনা শাকসব্‌জীর পরিমাণ বেশী। সিরিয়ার এক পাউণ্ড পরিমাণ মাংস সেখানে বিক্রি হয় আড়াই দেরহাম নাকরায়। এ-সব বিবেচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে, পাশ্চাত্যে জীবিকা নির্বাহের ব্যয় স্বল্প, সেখানে ভাল জিনিসের প্রাচুর্য আছে এবং বসবাস করা আরামদায়ক ও সুবিধাজনক। অধিকন্তু আমির-উল-মোমেনিনের দৌলতেও পাশ্চাত্যের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি করেছেন।[২১]

তেরো

এ মহান সম্রাটের দর্শন ও তাঁর সর্বময় দয়া-দাক্ষিণ্য লাভের সুযোগ গ্রহণ করে আমি মায়ের কবর জেয়ারতের জন্য রওয়ানা হলাম। আমার বাসস্থান তান্‌জিয়ার শহরে পৌঁছে সেখান থেকে সাবটা (সেউটা) গিয়ে কয়েকমাস কাটালাম। সেখানে এক অসুখে পড়ে আমাকে তিন মাস ভুগতে হয়। খোদা পরে আমাকে সুস্থ করেন। পরে আমি জেহাদে এবং সীমান্ত রক্ষার কাজে যোগদান করবো বলে প্রস্তাব করি। কাজেই, আসিলার বাসিন্দাদের একটি ছোট জাহাজে উঠে সেউটা থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসিয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম (খোদা এদেশকে রক্ষা করুন)। দশমাস কাল জেবেল (জিব্রাল্টার) অবরোধ করে অত্যাচারী খৃষ্টান আদফুনাস্ তখন মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তখনও মুসলমানদের আন্দালুসিয়ায় যা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাঁর সবই তিনি গ্রাস করবেন। কিন্তু খোদা তাকে হিসাব-নিকাশের বাইরে নিয়ে গেলেন। তিনি ভয়াবহ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।[১] যে আন্দালুসিয়া আমি দেখেছি তার প্রথম অংশ মাউন্ট অব কংকোয়েষ্ট (জিব্রালটার)। পাহাড়ের চারদিক পদব্রজে প্রদক্ষিণ করে আমি মরক্কোর ভূতপূর্ব সুলতান আবুল হাসানের কীর্তি এবং তাঁর সঞ্চিত যুদ্ধোপকরণ দেখতে লাগলাম, সে সঙ্গে দেখলাম আমাদের অধিনায়ক পরে যা–কিছু অর্জন করেছেন। খোদা তাঁকে শক্তিশালি করুন। আমি এদেশ রক্ষাকারীদের একজন হয়ে বাকী জীবন কাটাইতে চাই।

ইবনে জুজায়ী বলেছেন, "মাউন্ট অব কঙ্কোয়েষ্ট ইসলামের একটি দুর্গ স্বরূপ। পৌত্তলিকদের গলায় এটি যেনো একটি হাড়ের মতো বিঁধে আছে। এখান থেকেই আরবদের দ্বারা বিখ্যাত স্পেন বিজয়ের আরম্ভ। মুসা ইনবে নুসাইর দ্বারা আজাদীপ্রাপ্ত তারিক ইবনে জিয়াদ এখানেই অবতরণ করে ৭১১ হিজরীতে প্রণালী অতিক্রম করেন। তার নামানুসারেই এর নাম হয়েছে জেবেল তারিক (তারিকের পর্বত শৃঙ্গ)। এ জায়গাকে বিজয় শৃঙ্গ বা মাউন্ট অব কঙ্কোয়েষ্টও বলা হয়, কারণ বিজয় এখান থেকেই আরম্ভ হয়। তারিকের নির্মিত প্রাচীরের এবং তাঁর সেনাদলের স্মৃতিচিহ্ন এখনও এখানে বিদ্যমান আছে তা' আরবদের প্রাচীর বলে পরিচিত। আলজেসিরাস অবরোধের সময় আমি নিজেও তা দেখেছি।

বিশ বৎসরেরও অধিককাল খ্রীষ্টানদের দখলে থাকবার পরে আমাদের ভূতপূর্ব অধিপতি আবুল হাসান জিব্রাল্টার পুর্নদখল করেন। বিপুল অর্থ ও শক্তিশালি সেনাদলসহ তিনি তাঁর পুত্র শাহজাদা আবু মালিককে পাঠান জিব্রালটার অবরোধের জন্য। ছ'মাস অবরোধের পর ৭৩৩ হিজরী (খৃঃ পূঃ ১৩৩৩) জিব্রাল্টার দখল করা হয়। জিব্রাল্টার তখন বর্তমান অবস্থায় ছিল না। আমাদের ভূতপূর্ব অধিপতি আবুল হাসান দূর্গশীর্ষে প্রকাণ্ড একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করেন। পূর্বে এখানে ছিল ছোট একটি মিনার মাত্র এবং তাও ক্ষেপণযন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সে-ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানেই তৈরী হয় এ নূতন সুরক্ষিত এমারত। এখানকার আয়ুধাগারটিও 'তার তৈরী। কারণ এখানে আগে কোন আয়ুধাগার ছিল না। এ ছাড়া, লাল পাহাড় আবেষ্টনকারী প্রকাণ্ড প্রাচীরটি, যা আয়ুধাগার থেকে টালির উঠান অবধি বিস্তৃত, তিনিই তৈরী করান। পরবর্তী কালে আমাদের খলিফা আবু ইনান (রাঃ) পুনরায় এর সুরক্ষণ ও শোভাবর্ধনের কাজ নিজ হাতে গ্রহণ করেন ও পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত প্রাচীরটি সুদৃঢ় করেন। এ প্রাচীরটিই সবচেয়ে সুদৃঢ় এবং প্রয়োজনীয়। তিনি সেখানে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ ও খাদ্য সামগ্রীও সরবরাহ করেন। তিনি এভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে খোদার প্রতি তাঁর অসীম আনুগত্যের পরিচয় দান করেন। জেবেলের ব্যাপারে তাঁর এতদূর আগ্রহ ছিল যে, তিনি জেবেল তারিক বা জেবেল পর্বত শৃঙ্গের একটি মডেলে তৈরী করতে হুকুম দেন। সেই মডেলে জেবেলের প্রাচীর, মিনার, কিল্লা, প্রবেশদ্বার, আয়ুধাগার, মসজিদ, বারুদাগার, শস্যভাণ্ডার প্রভৃতি সবই হুবহু দেখানো হয়। তার আকৃতিও জেবেলের মতোই করা হয় । এবং তাতে রেল মাউণ্ড বা লাল পাহাড়টিও দেখানো হয়। মডেলটি প্রাসাদের এক প্রান্তে অবস্থিত। এটি একটি অবিকল অনুকরণ ও নিখুঁত শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। জেবেল দেখে এলে যে ব্যক্তি এ মডেলটি দেখেছে সেই শুধু এর মূল্য বুঝতে পারে। জেবেলে কখন কি ঘটছে না-ঘটছে তা জানবার এবং জেবেলকে শক্তিশালি করা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার আগ্রহেই তিনি এ মডেলটি এভাবে তৈরী করান। সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর অছিলায় পশ্চিম উপদ্বীপে (স্পেন) ইসলামকে বিজয়ী করুণ এবং তাঁর যে আদেশ ছিল, তিনি বিধর্মীদের দেশ অধিকার এবং ক্রুশ পূজারীদের শক্তি হ্রাস করবেন, —সে আশাও ফলবতী হোক।"

আমাদের শেখের বিবৃতি আবার শুরু হল। জিব্রাল্টারের বাইরে আমি রন্ডা শহরে এলাম। রণ্ডা অতি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত মুসলমানদের একটি সুদৃঢ় কেল্লা। এখানকার কাজী ডাক্তার আবুল কাসিম মোহাম্মদ বিন এয়াহিয়া ইবনে বতুতা আমার খুল্লতাত ভাই। রাস্তায় পাঁচ দিন কাটিয়ে আমি এলাম মারবালা (মারবেল্লা) শহরে। এই দু'টি শহরের মধ্যবর্তী চলাচলের রাস্তাটি অত্যন্ত বন্ধুর ও দুর্গম। একটি উর্বর জেলায় অবস্থিত মারবালা সুন্দর ছোট শহর। সেখানে গিয়ে একদল ঘোড় সওয়ারকে পেলাম মালাকা যাওয়ার জন্য তৈরি। আমিও তাদের সঙ্গেই রওয়ানা হবার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু খোদা সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করলেন। তারা আমার আগেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল এবং পথে শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিল। সে বিবরণ পরে বলছি।

ঘোড় সওয়ারদের পরে রওয়ানা হয়ে আমি যখন মারবালা জেলা ছাড়িয়ে সুহাইল [২] জেলার সীমান্তে গিয়ে পৌচেছি তখন দেখতে পেলাম রাস্তার পাশের একটি গর্তে একটা ঘোড়ার মৃতদেহ। আরও কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম এক ঝাঁকা মাছ রাস্তায় ছড়িয়ে আছে।

আমার মনে কেমন সন্দেহের উদ্রেক হল। সামনেই ছিল একটা উঁচু মিনার যার উপর থেকে পাহারাদাররা চারদিকে নজর রাখ্‌ত। আমি আপন মনেই বলে উঠলাম, "যদি কোনো শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকে এখানে তাহলে মিনারের পাহারাওয়ালা আমাকে হুঁশিয়ার করে দেবে।" তারপর কাছেই একটা বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম একটা ঘোড়াকে মেরে রাখা হয়েছে সেখানে। আমি যখন সেখানে আছি তখন একটা চীৎকার শুনতে পেলাম আমার পেছনে (আমি দলের লোকদের ছেড়ে তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছি)। পিছন ফিরে দেখতে পেলাম, তাদের সঙ্গে রয়েছেন সুহাইল দূর্গের সেনাপতি। তিনি আমাকে জানালেন, শত্রুপক্ষের চারখানা ক্ষুদ্র জাহাজ সেখানে পৌঁচেছে। মিনারে যখন পাহারাদার ছিল না তখন কিছু সংখ্যক লোকও জাহাজ থেকে নেমেছে। মারবালা থেকে যে বারো জন ঘোড়সওয়ার এসেছিলো তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করেছে এই আক্রমণকারীরা। খৃষ্টানরা একজনকে হত্যা করেছে, একজন গেছে পালিয়ে। বাকি দশজন হয়েছে বন্দী। সে সঙ্গে তারা একজন জেলেকেও হত্যা করে। সেই জেলের মাছের চুপড়ীই আমি পথের পাশে পড়ে থাকতে দেখেছি।

অফিসারটি তাঁর বাসায় আমাকে রাত কাটাতে পরামর্শ দিলেন। তা'হলে তিনি পরে আমাকে মালাকা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। ঘোড়সওয়ার সীমান্ত রক্ষীদের কেল্লায় আমি রাত কাটালাম। তারা সুহাইল বাহিনী নামে পরিচিত। যে ক্ষুদ্র জাহাজগুলির কথা বলেছি সেগুলো তখনও ওখানেই ছিল। পরের দিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে আমার সঙ্গে রওয়ানা হলেন এবং আমরা যথাসময়ে মালাকা গিয়ে পৌঁছলাম। মালাকা আন্দালুসিয়ার অন্যতম সুন্দর ও বড় শহর। সমুদ্রের এবং স্থলভাগের উভয় প্রকার সুবিধাই এ শহরটির রয়েছে। তা'ছাড়া ফলমূল ও খাদ্য সম্ভারও এখানে প্রায় পাওয়া যায়। আমি দেখলাম এখানকার বাজারে একটি ছোট দেরহামের বিনিময়ে আট পাউণ্ড আঙ্গুর বিক্রি হচ্ছে। এখানকার পদ্মরাগ সদৃশ লাল মার্সিয়ান আনারের তুলনা দুনিয়ায় বিরল। তা ছাড়া ডুমুর জাতীয় ফল ও বাদাম মালাকা এবং মালাকার উপকণ্ঠ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচুর চালান হয়ে যায়। মালাকায় গিল্টি করা প্রচুর হাঁড়ি-বাসন তৈরি হয় এবং সে সবও দূর-দূরাঞ্চলে চালান হয়। বিস্তৃত পরিধি বিশিষ্ট এর মসজিদটির পবিত্রতার যথেষ্ট সুনাম আছে। মসজিদের চত্বরটি সৌন্দর্যে অতুলনীয়। চত্বরে কমলা লেবুর কয়েকটি সুউচ্চ গাছ রয়েছে।

মালাকায় পৌছে কাজীকে দেখলাম মসজিদে বসে আছেন কিছু সংখ্যক আইনজীবি ও শহরের গণ্যমান্য লোকজন নিয়ে। তাঁরা সবাই পূর্বোক্ত বন্দীদের মুক্তিপণ দিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। আমি তাঁকে বললাম, "খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ যিনি আমাকে বন্দীদের দশা থেকে রক্ষা করেছেন। ঘোড়সওয়াররা রওয়ানা হয়ে আসবার পর যা-কিছু ঘটেছে তাঁকে বললাম। সব শুনে তিনি খুব বিস্ময়-বোধ করলেন। তিনি এবং শহরের ইমাম আমাকে অতিথ্য-উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন।

মালাকার পর আমি চব্বিশ মাইল দূরে বাল্লাশ (ভেলেজ) শহরে এলাম। বাল্লাশও সুন্দর শহর। এখানে চমৎকার একটি মসজিদ আছে। মালাকার মত এখানেও প্রচুর আঙ্গুর, ডুমুর জাতীয় ফল ও অন্যান্য ফল-মূল পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমরা এলাম আল্ হামমা (আল্‌হামা) শহরটি ছোট হলেও এখানকার মসজিদটি মনোরম একটি জায়গায় অবস্থিত। শহরের কাছেই, প্রায় মাইল খানেক দূরে নদীর পারে আছে একটি
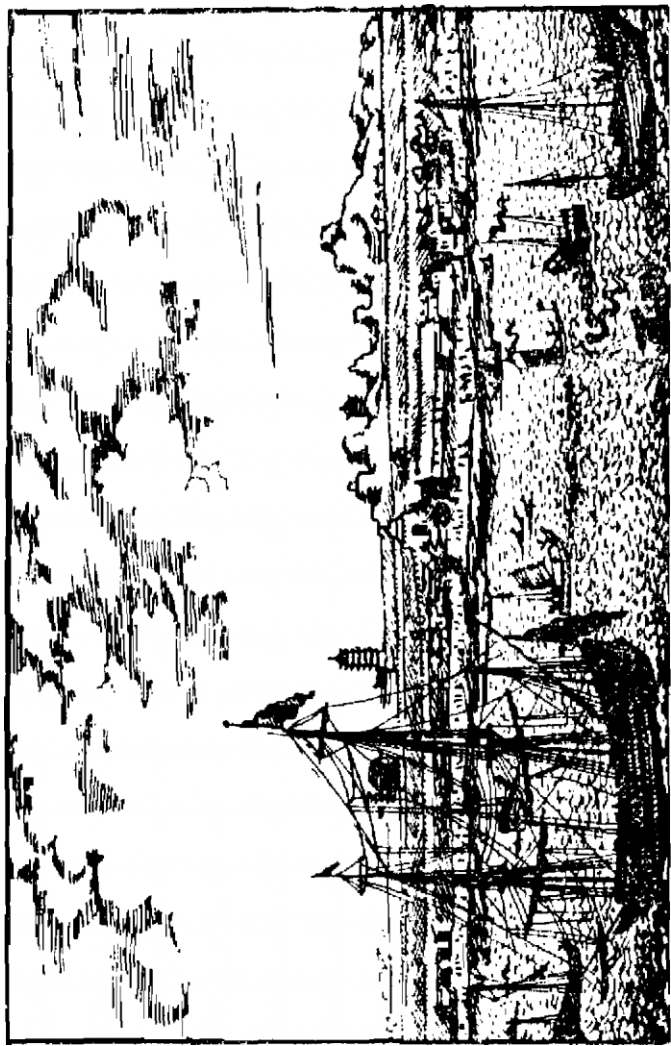
সপ্তদশ শতাব্দীতে সেনাবাহিনীর নির্দিষ্ট অবস্থানের দৃশ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পবিত্র-স্থান পরিদর্শনের দৃশ্য

উষ্ণ প্রস্রবণ (তার থেকেই এ শহরের নাম করণ হয়েছে আল হাম্‌মা)[৩]। এখানে পুরুষদের জন্যে একটি এবং মেয়েদের জন্যে একটি গোসলখানা আছে।

সেখান থেকে আমরা পৌঁছলাম গারণাটা (গ্রাণাডা)। আন্দালুসিয়ার প্রধান নগর গ্রানাডা সব শহরের রাণী। গ্রাণাডার শহরতলীও এত সুন্দর যে দুনিয়ার কোনো দেশের সঙ্গে তুলনা হয় না। প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত এ শহরতলীর ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে বিখ্যাত সান্নিল (জের্নিল) নদী এবং আরও বহু শহর। শহরের চারদিক ঘিরে রয়েছে ফুলফলের বাগান শস্যশ্যামল মাঠ, সুরম্য অট্টালিকা ও আঙ্গুর ক্ষেত। সবচেয়ে সুন্দর যে সব জায়গা তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো আইন-আদ-দামা (অশ্রুর ঝরণা)[৪] —ফলফুলের বাগানে ঘেরা একটি পাহাড়। অন্য কোনো দেশে তার সমতূল্য জায়গা দেখা যায় না। আমি যখন গারণাটায় যাই তখন সুলতান ছিলেন আবদুল হাজ্জাজ ইউসুফ। তিনি তখন অসুখে ভুগছিলেন বলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি [৫]। তাঁর মহীয়সী পুণ্যবতী মাতা আমাকে কিছু স্বর্ণ দিনার উপহার দিয়েছিলেন। আমি তার সদ্ব্যবহার করেছি।

গারণাটায় কিছু সংখ্যক বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ও প্রধান শেখের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। প্রধান শেখ সেখানকার সুফী সম্প্রদায়েরও প্রধান। গারণাটা শহরের বাইরে তাঁর আস্তানায় আমি কয়েকদিন তাঁর সহবাসে কাটাই। তিনি আমাকে বিশেষ সমাদর করেন এবং আমার সঙ্গে বিখ্যাত অতিথিশালায় আল্‌-আকাব (ঈগল পাখী)ঘাঁটী দেখতে যান। আল-আকাব একটি পাহাড়। শহর থেকে আট মাইল দূরে এ পাহাড়ের উপর থেকে গারণাটার আশপাশ দেখা যায়। আল্‌-আকাবের কাছেই রয়েছে আল্‌-বেরা[৬] শহরের ধ্বংসাবশেষ। পারস্য-সূফী মতাবলম্বী একজন দরবেশও গারণাটায় রয়েছেন। তাঁদের নিজ-নিজ দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে তাঁরা এখানে ঘর বাড়ী তৈরি করে বসবাস করেছেন। একজন এসেছেন সমরখন্দ থেকে, আরেকজন তাব্রিজ ও তৃতীয় জন কুনিয়া (কনিয়া) আরেক জন খোরাশান, দু'জন হিন্দুস্তান ইত্যাদি।

গারণাটা থেকে ফেরবার পথে আবার আল-হাম্‌মা বাল্লাশ ও মালাকা হয়ে ঢাকওয়ান কেল্লায় এলাম। প্রচুর পানি গাছপালা ও ফলমূলে সমৃদ্ধ চমৎকার জায়গা ঢাকওয়ান।[৭] ঢাকওয়ান ছেড়ে এলাম রন্‌ডা, রন্‌ডা থেকে জিব্রালটার। জিব্রালটারে একটি জাহাজে উঠলাম। এ জাহাজটির সাহায্যে আগেও আমি পার হয়েছিলাম। আর্সিলার (আরজিলা) অধিবাসীরা এ জাহাজের মালিক। আমি সাবটা (সিউটা) হয়ে এলাম আসিলা। আসিলায় কয়েক মাস কাটালাম। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে এলাম সালা (সালি)। সালা থেকে এলাম মারাকুশ শহরে। বিশালায়তন মারাকুশ একটি সুন্দর শহর। এখানে কয়েকটি মনোরম মসজিদ রয়েছে। প্রধান মসজিদটি কুতুবাইন মসজিদ বা পুস্তক-বিক্রেতাদের মসজিদ নামে পরিচিত। এখানে একটি সুউচ্চ মিনার রয়েছে। সেই মিনারে আরোহন করায় সারা শহরটি আমার দৃষ্টি গোচর হল। শহরের বেশী অংশই এমনভাবে ধ্বংসের কবলে পড়েছে যে বাগদাদের সঙ্গে এর তুলনা চলে। অবশ্য বাগদাদের বাজারগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল [৮]। মারাকুশেও সুবৃহৎ একটি কলেজ আছে। সুন্দর পরিবেশে সুদৃঢ়ভাবে গঠিত এ কলেজটি। আমাদের খলিফা আমির-উল-মোমেনিন আবুল হাসান (মরক্কোর ভূতপূর্ব সুলতান) এ কলেজের স্থাপয়িতা।

চৌদ্দ

মারাকুশ থেকে ফেজ অবধি সফর করলাম আমাদের সুলতানের পারিষদবর্গের সঙ্গে। সেখান থেকেই সুলতানের কাছে বিদায় নিয়ে কাফ্রীদের দেশে (Negrolands) রওয়ানা হয়ে পৌছলাম সিজিলমাসা শহরে। শহরটি চমৎকার। প্রচুর সুস্বাদু খেজুর পাওয়া যায় এখানে [১]। এখানকার খেজুরের প্রাচুর্যের তুলনা চলে বস্রার খেজুরের সঙ্গে কিন্তু এখানকার খেজুর অপেক্ষাকৃত উত্তম এবং 'ইরার' নামক যে খেজুর আছে দুনিয়ার কোথাও তেমন খেজুর পাওয়া যায় না। এখানে আমি সুপণ্ডিত আবু মোহাম্মদ আল-বুশরীর সঙ্গে বসবাস করলাম। এ আল-বুশরীর ভাইয়ের সঙ্গেই চীনের কান্জানফু শহরে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কি আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরা দু'জন দু'জায়গায় পড়ে আছেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট সমাদর করেছিলেন।

সিজিলমাসায় আমি কয়েকটি উট খরিদ করলাম। সেগুলির জন্য চার মাসের উপযোগী খাদ্যও খরিদ করে নিলাম। তারপর ৭৫২ হিজরীর ১লা মোহর্‌রম (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৩৫২) আবার এক কাফেলার সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লাম। অন্যান্য লোক ছাড়া এ কাফেলায় সিজিলমাসের কয়েকজন সওদাগর ছিলেন। পঁচিশ দিন পথ চলার পর তাগাজা নামক নগণ্য একটি গ্রামে এসে আমরা পৌছলাম। এ গ্রামের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার মসৃজিদ ও ঘরগুলি লবণের পাথর (Blocks of salt) দিয়ে তৈরী, ছাদ তৈরী উটের চামড়া দিয়ে। সেখানে গাছপালা নেই, আছে বালি আর বালি। বালির মধ্যে রয়েছে লবণের একটি খনি। খনি খনন করতে গিয়ে তারা লবণের স্থূল খণ্ডগুলি এভাবে পায় যেনো যন্ত্রের সাহায্যে চৌকোণাকার করে কেউ একটির পর একটি খণ্ড মাটির নীচে খনির ভিতর[২] সাজিয়ে রেখেছে। একটি উট এ রকম দু'টি খণ্ড (Slab)মাত্র বহন করতে পারে। মাসুফা উপজাতীয় ক্রীতদাসরা ছাড়া তাগাজায় আর কেউ বাস করে না। তারা খনি খননের কাজ করে এবং জীবন ধারণ করে দারা [৩] ও সিজিলমাসা থেকে আমদানী করা খেজুর, উটের গোশ্‌ত ও কাফ্রী দেশের জোয়ার (Millet) খেয়ে। নিজেদের দেশ থেকে কাফ্রীরা এখানে এসে লবণ নিয়ে যায়। ইবালাতানে এক বোঝা

লবণের দাম আট থেকে দশ মিত্‌কাল (Mithqals)। সে পরিমাণ লবণই মাল্লী শহরে বিক্রি হয় বিশ থেকে ত্রিশ মিত্‌কালে—এমন কি সময় বিশেষে চল্লিশ মিত্‌কাল অবধি দাম ওঠে। সোনা রূপার বিনিময়ে যেমন অন্যান্য দেশে জিনিষ কেনাবেচা হয় কাফ্রীরা তেমনি লবণের বিনিময়ে কেনাবেচা করে। লবণের বড় খণ্ডগুলিকে তারা টুক্‌রো করে কেটে তার সাহায্যে কেনাবেচার কাজ চালায়। তাগাজা নগণ্য শহর হলেও ব্যবসায়ে এখানে যা লাভ হয় তার পরিমাণ শত শত মণ স্বর্ণরেণুর [৪] সমান।

আমরা সেখানে কষ্টেসৃষ্টে দশ দিন কাটালাম। কারণ, সেখানকার পানি যেমন লোনা, মাছির উৎপাত তেমনি অত্যধিক। তাগাজা ছাড়িয়েই যে মরুভূমি আছে তা পার হবার জন্য তাগাজা হতেই পানি সরবরাহ করা হয়। মরুভূমি পার হতে দশ রাত্রি কেটে যায় কিন্তু পথে কচিৎ কোথাও পানি পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট নহর থেকেই আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পেয়েছিলাম। একদিন দু'টি টিলার মধ্যবর্তী স্থানে আমরা মিষ্টি পানির এক নহর পেয়ে গেলাম। তাতে তৃষ্ণা নিবারণ তো হলই, পরে কাপড়-চোপড়ও ধুয়ে নিলাম। এখানকার মরুভূমিতে ব্যাঙের ছাতা গজায় প্রচুর কিন্তু তা জোঁকে ছেয়ে থাকে। কাজেই লোকে পারদযুক্ত (Mercury) একপ্রকার তারের হার গলায় ঝুলিয়ে রাখে। পারদে জোঁক মরে যায়। আমরা তখন পথ চলছিলাম কাফেলা ছেড়ে অনেকটা অগ্রসর হয়ে। পথে যেখানেই আমরা পশু চারণের উপযোগী জায়গা পেয়েছি সেখানেই পশুগুলিকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়েছি। আমরা ঠিক এভাবেই চলছিলাম কিন্তু অবশেষে আমাদের দলের একজন লোক মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গেল। তারপর থেকে আমি আর কাফেলা ছেড়ে বেশী এগিয়েও যাইনি, পিছিয়েও পড়িনি। যেতে-যেতে আমরা আরেকটি কাফেলার দেখা পেলাম পথে। সে কাফেলার লোকেরা বলছিল তাদের একটি দলও কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। বালির মধ্যে জন্মে এমনি একটি ঝোপের আড়ালে সে দলের একজনকে আমরা পেলাম মৃতাবস্থায়। লোকটির কাপড় চোপড় পরাই রয়েছে, হাতে রয়েছে একটি চাবুক। এ জায়গা থেকে মাত্র এক মাইল দূরেই পানি পাওয়া যায়।

অতঃপর আমরা তাসারাহ্‌লা এসে পৌঁছলাম। এ জায়গার মাটীর নীচে পানি পাওয়া যায়। এখানে এসেই কাফেলা বিশ্রামের জন্য তিন দিন অবস্থান করে।[৫] "সে সময় তারা তাদের মোশকগুলি মেরামত করে পানি ভর্তি করে নেয় এবং মরুভূমির হাওয়ার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য সারা গায়ে চট্‌ জড়িয়ে সেলাই করে নেয়। এখান থেকেই তাক্‌শিফ (Takshif) পাঠানো হয়। মাসুফা উপজাতীয় এমন লোককে তাক্‌শিফ বলা হয়, কাফেলার দ্বারা নিযুক্ত যে লোক আগেই সংবাদ নিয়ে ইবালাতান পৌঁছে। কাফেলার যাত্রীরা তাক্‌শিফের সাহায্যে ইবালাতানে বন্ধু-বান্ধবের কাছে চিঠিপত্র পাঠায় যার ফলে সে সব বন্ধুবান্ধব আগন্তুকদের জন্য আগেই আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করে রাখতে পারে। বন্ধুবান্ধবেরা তখন চার রাত্রির পথ এগিয়ে আসে কাফেলার যাত্রীদের জন্য পানি বহন করে। ইবালাতানে বন্ধুবান্ধব বলতে যার কেউ নেই সে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখে সেখানকার কোনো নামকরা সওদাগরকে। তিনিই তখন তার সেবাযত্নের ভার গ্রহণ

করেন। অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটে যে তাক্‌শিফ মরুভূমির পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার ফলে, ইবালাতানের কেউই আর কাফেলার আগমন সংবাদ পায় না। তখন কাফেলার অনেকেই অথবা সবাই মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। এই মরুভূমিতে ভূতের প্রভাব আছে। তাকশিফকে একা পেলে তারা খেলাচ্ছলে তাক্‌শিফের মানসিক বিকৃতি ঘটায়। তার ফলে পথ হারিয়ে সে মৃত্যু বরণ করে। কারণ, মরু হাওয়ার দ্বারা ইতস্তত তাড়িত বালি ছাড়া সেখানে কোনো দিকে কোনো পথের চিহ্নই চোখে পড়ে না। এইমাত্র তুমি দেখতে পাবে এক জায়গায় বালির পাহাড় জমে আছে আরেটু পরেই সে পাহাড় জমবে আরেক জায়গায়। যারা সে পথে বহুবার যাওয়া আসা করেছে এবং যাদের উপস্থিত বুদ্ধি যথেষ্ট তারাই শুধু গাইডের কাজ করতে পারে। অতি বিস্ময়ের সঙ্গে আমি লক্ষ্য করছিলাম, আমাদের চালক বা গাইড ছিল এক চোক কানা, আরেক চোখে অসুক। কিন্তু তা' হলেও সব পথই তার ভালভাবে জানা ছিল। আমরা এক শত সোনার মিত্‌কাল মজুরী দিয়ে তাক্‌শিফ নিয়োগ করেছিলাম। সে ছিল মাসুফার বাসিন্দা। তাসারাহ্‌লা থেকে যাত্রার সপ্তম দিন রাত্রে আমাদের যারা এগিয়ে নিতে এসেছে তাদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আগুন আমাদের চোখে পড়ল, আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

এভাবে সিজিলমাসা থেকে যাত্রা করে দু'মাসের একদিন বাকি থাকতে আমরা ইবালাতা (ওয়ালাতা) এসে পৌছলাম।[৬] ইবালাতান প্রদেশটি কাফ্রীদেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। এখানে সুলতানের প্রতিনিধি ছিলেন ফারবা হোসেন নামে একটি ব্যক্তি। সেখানকার ভাষায় 'ফারবা' শব্দের অর্থই প্রতিনিধি বা ডেপুটি। সেখানে পৌছবার পরে আমাদের সঙ্গী সওদাগরেরা একটা খোলা ময়দানে কৃষ্ণকায় লোকদের পাহারায় মালবিও রেখে ফারবার সঙ্গে দেখা করতে গেল। একটি খিলানের নীচে গালিচা বিছিয়ে তিনি বসেছিলেন। তার সামনে রয়েছে বর্শা ও তীরধারী রক্ষীর দল, পিছনে দণ্ডায়মান মাসুফাদের প্রধান ব্যক্তি । ফারবা যখন কথা বলছিলেন সওদাগররা তখন দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল। যদিও তারা খুব কাছেই ছিল তবু ফারবা তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাবার জন্য কথা বলছিলেন একজন দোভাষীর মাধ্যমে। তাদের এ অভদ্রতা দেখে এবং শ্বেতকায়দের প্রতি ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করে ঠিক তখনই আমার অনুতাপ হয়েছিল এদেশ সফরে এসেছি বলে।

ইবনে বাদ্দা নামক সালার (সালি, রাবাট) একজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম। আমি তাঁকে পত্র দিয়েছিলাম আমার জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করবার অনুরোধ জানিয়ে। তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। অতঃপর ইবালাতানের মান্‌সা জু নামক 'মুশরিফ' বা পরিদর্শক (Inspector) আমাদের কাফেলার সবাইকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। সে আমন্ত্রণে যোগ দিতে প্রথমে আমি নারাজ ছিলাম কিন্তু সঙ্গীদের সানুনয় অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাদের সঙ্গে যেতে হল। প্রকাণ্ড একটি পাত্রের আকারে কাটা একটি লাউয়ের খোলের অর্ধাংশে আমাদের খাবার পরিবেশন করা হল সামান্য মধু আর দুধ মিশ্রিত জোয়ার চূর্ণ(Pounded

millet)। অতিথিরা তাই পান করে ফিরে এল। আমি তাদের বললাম,"এ জন্যই কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বুঝি আমাদের দাওয়াত করেছিল?"

জবাবে তারা বললো "হাঁ, এবং তাদের মতে এই সবচেয়ে উচ্চ ধরণের অতিথি-সৎকার।"

এ ব্যাপারের পরে আমার ধারণা হ'ল, এর বেশী এসব লোকের কাছে আশা করেও কোনো লাভ নেই। আমি মন স্থির করে ফেললাম, ইবালাতান থেকে যে হজযাত্রীর কাফেলা রওয়ানা হচ্ছে তাদের সঙ্গী হয়ে মরক্কোয় ফিরে যাবো। পরে অবশ্য আমি ভাবলাম মালীতে এদের রাজার রাজধানী দেখে গেলেই ভাল হবে।

এমনি করে ইবালাতানে আমার প্রায় পঞ্চাশ দিন কেটে গেল। এখানকার বাসিন্দারা আমাকে সম্মান ও সমাদর দেখিয়েছে। ইবালাতান ভয়ানক গরম জায়গা। ছোট ছোট কয়েকটি খেজুর গাছ এখানকার গৌরবের বস্তু। খেজুর গাছের ছায়ায় এখানে তরমুজের চাষ করা হয়। এখানে মাটী খনন করে পানি পাওয়া যায়। ছাগল, ভেড়ার গোশত ইবালাতানে প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই 'মাসুফা" উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। মিশরের দামী কাপড় দিয়ে তারা নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করে। এদের নারীরা অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী এবং পুরুষের চেয়ে নারীই সম্মান পায় বেশী।

এদের চালচলন ও বিধি–ব্যবস্থা বাস্তবিকই কিছুটা অসাধারণ। এখানকার পুরুষদের মনে কোনো ব্যাপারেই কোনো ঈর্ষা-দ্বেষ দেখা যায় না। এদের কেউ-ই পৈত্রিক উত্তরাধিকার দাবী করে না, পক্ষান্তরে মাতুলের উত্তরাধিকার দাবী করে। এদেশের লোকের উত্তরাধিকারী তার ভাগ্নেরা, নিজের ছেলেরা নয়। এ রকম প্রথা হিন্দুস্তানের মালাবার ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও আমি দেখিনি। কিন্তু সেখানকার লোকেরা বিধর্মী আর এরা মুসলমান, নির্ধারিত সময় নামাজ পড়ে, হাদিস চর্চা করে ও কোরান মুখস্থ করে। কিন্তু তা সত্বেও স্ত্রীলোকেরা এখানে পুরুষদের সামনে যেতে লজ্জা সঙ্কোচ করে না বা ঘোমটা দেয় না, যদিও নামাজ আদায় করতে কখনও কসুর করে না। কেউ যদি ইচ্ছা করে তবে তাদের বিয়ে করতে পারে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তারা বিদেশে চলে যেতে রাজী হয় না। কেউ রাজী হলেও তার পরিবারের অন্যান্য সবাই তাকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

সেখানকার মেয়েদের নিজ পরিবারের বাইরেও পুরুষ 'বন্ধু' বা 'সঙ্গী' থাকতে কোন বাধা নেই। পুরুষদের বেলায়ও ঠিক তেমনি, নিজ পরিবারের বাইরে 'বান্ধবী' বা 'সখী' থাকা দোষণীয় নয়। একজন পুরুষ হয়তো নিজের গৃহে ফিরে দেখতে পেল তার স্ত্রী নিজের কোন বন্ধুর বা সঙ্গীর মনোরঞ্জন করছে তখন সে তাতে কোনই আপত্তিই উত্থাপন করে না। একদিন আমি ইবালাতানে কাজীর বাড়ি গিয়ে তাঁর অনুমতি ক্রমে গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানে রয়েছে একজন অসামান্য সুন্দরী তরুণী। আমি তাকে দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু তাতে তরুণী লজ্জিত না হয়ে বরং আমাকে বিদ্রূপ করে হেসে উঠল এবং কাজী আমাকে বললেন, আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন

কেন? এতো আমার সঙ্গিনী। একজন ধর্মতত্ত্বজ্ঞ অধিকন্তু তীর্থযাত্রীর এ আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। শুনেছি কাজী নাকি তাঁর বান্ধবী সহ সেবার হজযাত্রায় যাবার জন্য সুলতানের অনুমতি চেয়েছিলেন। সেই বান্ধবী এ তরুণীই কিনা আমি জানি না কিন্তু সুলতান তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেননি।

ইবালাতান থেকে মালী যেতে দ্রুত চলেও চব্বিশ দিন লাগে। মালী যেতে মনস্থ করে মাসুফা থেকে একজন পরিচালক নিযুক্ত করে তিনজন সঙ্গীসহ যাত্রা করলাম। এ পথটি নিরাপদ বলে কাফেলা বা দল বেঁধে চলবার দরকার নেই। পথে অনেকগুলো বিশাল পরিধি বিশিষ্ট পুরাতন গাছ দেখতে পেলাম। সে সব গাছের এক একটির ছায়ায় পুর্ণ একটি কাফেলা আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এমন গাছও রয়েছে যার কোন শাখা বা পত্র নেই তবু তার কাণ্ডের ছায়াই একজন লোকের আশ্রয়ের জন্য যথেষ্ট। এসব গাছের কতকগুলোর ভেতরে অংশ পচে যাওয়ায় সেখানে বৃষ্টির পানি জমা হয়ে থাকে। তার ফলে কুপের কাজ চলে যায় এবং লোকে সে পানি পানও করে[৭]। কতকগুলো গাছে মৌমাছি ও মধু রয়েছে। লোকে তা সংগ্রহ করে নেয়। আমি বিস্মিত হলাম একজন তাঁতীকে এমনি একটি গাছের 'ফোঁকরে' নিজের তাঁত বসিয়ে তাঁত চালাচ্ছে দেখে।

এ অঞ্চলে পথ চলতে গিয়ে পথিকদের কোন রকম খাদ্য ও সোনারূপা বা টাকা-কড়ি সঙ্গে রাখবার দরকার হয় না। তারা সঙ্গে রাখে লবণ, কাচের তৈরী গহনা যাকে সাধারণতঃ পুতি বলা হয় এবং কিছু সুগন্ধি দ্রব্য। এসব নিয়ে কোনো গ্রামে হাজির হলেই কৃষ্ণকায়া নারীরা আসে তাদের জোয়ার, দুধ, মুরগী, মণ্ডে পরিণত পদ্ম ফল, চাউল, ফুনী [৮] (শর্ষের মত দেখতে এক প্রকার শস্য যা দিয়ে লাবসী তৈরী হয়) এবং ছাতু নিয়ে। মোসাফেররা যা খুশী তখন কিনতে পারে। কিন্তু তাদের চাউল খেয়ে বিদেশীদের অসুখ হয়। চাউলের চেয়ে ফুনী বরং ভাল। ইবালাতান ত্যাগ করার দশ দিন পর জাগারি [৯] নামক একটি বড় গ্রামে আমরা হাজির হলাম। সেখানে ওয়ান্জারাতা[১০] নামে পরিচিত কাফ্রী ব্যবসায়ীরা এবং তাদের সঙ্গে খারিজী[১১] সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। এ গ্রাম থেকেই ইবালাতানে জোয়ার আমদানী করা হয়। জাগারি থেকে আমরা বিখ্যাত নদী নীলনদের তীরে এসে পৌছলাম। নীলনদের তীরেই কারসাখু[১২] শহর। কারসাখু থেকে নীলনদ বয়ে গেছে কাবারা এবং সেখান থেকে জাঘা[১৩]। কাবারাও জাঘার সুলতানরা মালীর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করতেন। জাঘার অধিবাসীরা বহুকাল হতেই ইসলাম ধমাবলম্বী। বিদ্যাচর্চার প্রতি তাদের যথেষ্ট আগ্রহ ও অনুরাগ দেখা যায়। এখান থেকে নীলনদ নিম্নদিকে তাম্বুক্তু ও গগ (Gogo) ছাড়িয়ে গেছে। এ দু'টি জায়গার বর্ণনা পরে দেওয়া হবে। গগা থেকে নীলনদ এসেছে মুলি [১৪] শহরে। মুলি লিমিসদের [১৫] দেশ এবং মালী রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ। সেখান থেকে নীলনদ বয়ে গেছে কাফ্রীদের অন্যতম বৃহৎ শহর যুফী (Yufi)। কাফ্রী শাসনর্কতাদের মধ্যে যুফীর শাসনকর্তা একজন খ্যাতনামা[১৬] ব্যক্তি। কোনো শ্বেত লোক সে দেশে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ সেখানে যাবার আগেই অধিবাসীরা তাকে হত্যা করবে। যুফী থেকে নীলনদ নেমে গেছে নুবাদের

(Nubians) দেশে। নুবারা খৃষ্টধর্মাবলম্বী। নুবার পরে দানকুলা (Dongola) তাদের প্রধান শহর [১৭]। দানকুলার সুলতানের নাম ইবনে কান্‌জউদ্দিন। মিশরের সুলতান আল্‌-মালিক আন্‌-নাসিরের [১৮] সময় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর নীলনদ এসেছে জানাদিল (the Cataracts) । এখানেই কাফ্রী মুলুক শেষ হয়ে মিশরের আসওয়ান প্রদেশ আরম্ভ।

নীলনদের এদিকটায় একদিন পাড়ের অতি নিকটে আমি একটি কুমীর দেখতে পেয়েছিলাম। কুমীরটা ঠিক একটা নৌকার মত দেখাচ্ছিল। একদিন আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাতে নদীর পাড়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একজন কৃষ্ণকায় নদী ও আমার মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আদব ও শ্লীলতার এ অভাব দেখে আমি বিস্মিত হলাম এবং একজনের কাছে তা প্রকাশ করলাম। সে বলল, আপনার এবং কুমীরের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে কুমীরের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

অতঃপর আমরা কারসাখু থেকে রওয়ানা হয়ে মালীর দশ মাইল দূরে সানসারা নদীর তীরে এলাম। অনুমতি ছাড়া সেখানে কারও শহরে যাবার নিয়ম নেই। আমি আগেই সেখানকার শ্বেতকায়দের অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলাম আমার জন্য একখানা ঘর ভাড়া করে রাখতে। কাজেই এ নদীর পারে এসে বিনা বাধায়ই আমি খেয়া পার হয়ে গেলাম। এভাবে কাফ্রীদের [১৯] রাজধানী মালীতে এসে পৌছলাম।

শ্বেতকায়দের মহল্লায় গিয়ে মোহাম্মদ ইবনে-আল-ফকির কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আমার জন্য একখানা ঘর ভাড়া করা হয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে উঠলাম। তাঁর জামাতা এসে আমাকে মোমবাতি ও খাবার দিয়ে গেল। পরের দিন আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক সঙ্গে নিয়ে ইবনে-আল-ফকি নিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মালীর কাজী আবদুর রহমান এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আমার দেখা হল। তিনি সচ্চরিত্র একজন কাফ্রী হাজী। সেখানকার দোভাষী দুঘার সঙ্গেও আমার আলাপ হল। কাফ্রীদের[২০] মধ্যে তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। এঁরা সবাই আমাকে অতিথি হিসাবে খাদ্য পরিবেশন করেন এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। খোদা যেন তাঁদের মঙ্গল করেন। এখানে আগমনের দশদিন পরে আলু জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরী এক ধরনের লাবসী খেলাম। এ লাবসী এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। আমাদের দলের ছয়জনের সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং একজন এন্তেকাল করল। আমিও ফজরের নামাজ পড়তে গিয়েই সেখানেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। এ রোগের প্রতিষেধক কিছু আছে কিনা একজন মিশরীয়কে তা জিজ্ঞেস করায় সে আমাকে গাছ গাছড়ার শিকড় দিয়ে তৈরী 'বেদার' নামক এক রকম জিনিষ এনে দিল। তার সঙ্গে মৌরী ও চিনি পানিতে মিশিয়ে খেতেই আমার বমি হয়েই গেল। তার ফলে যা খেয়েছিলাম তার সবই বেরিয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পিত্তরসও বেরিয়ে গেল। খোদা আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করলেন কিন্তু দু'মাস আমাকে অসুস্থ থাকতে হল।

মালীর সুলতানের নাম মান্‌সা সুলায়মান। সুলায়মান ২১ তাঁর আসল নাম এবং মান্‌সা অর্থ সুলতান। তিনি একজন কৃপণ প্রকৃতির রাজা। তার কাছে কেউ কোনো মূল্যবান পারিতোষিক পাবার আশাও করতে পারে না। আমি অসুস্থ থাকায় এ দু'মাস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে প্যারিনি। অবশেষে তিনি আমাদের খলিফা মরোক্কোর ভূতপূর্ব সুলতান আবুল হাসানের স্মৃতি উদ্‌যাপনোপলক্ষে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সেনাপতি, চিকিৎসক কাজী, ইমাম প্রভৃতি সবাই তাতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে আমিও ভোজসভায় যোগদান করলাম। সেখানে কোরাণ শরীফ পাঠের পর খলিফা আবুল হাসান ও মান্‌সা সুলায়মানের জন্য মোনাজাত করা হল। অনুষ্ঠান শেষ হতেই আমি মান্‌সা সুলায়মানের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম। কাজী, ইমাম ও ইবনে-আল্‌-ফকি তাঁকে আমার পরিচয় দিতে তিনি তাঁদের ভাষায় উত্তর দিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন, "সুলতান খোদাকে ধন্যবাদ দিতে বল্‌ছেন।"

আমি বললাম, "সকল অবস্থার ভেতরেই তার প্রশংসা করি এবং তাকে ধন্যবাদ জানাই ২২।"

আমি সেখান থেকে ফিরে আসার পর সুলতান আমাকে মেহমান হিসাবে খাদ্য পাঠালেন। প্রথমে তা পাঠানো হয়েছিলো কাজীর গৃহে। কাজী নিজের লোক দিয়ে সে সব পাঠালেন ইবনে-আল-ফকির গৃহে। ইবনে-আল্‌-ফকি নগ্নপদেই তাড়াতাড়ি আমার গৃহে প্রবেশ করে বললেন"উঠে দাঁড়ান, এই যে আপনার জন্য সুলতানের দেওয়া, পারিতোষিক এসেছে।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং পারিতোষিক বলাতে ভাবলাম, নিশ্চয়ই সুলতান আমাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও অর্থ পাঠিয়েছেন। কিন্তু দেখলাম তিনি পাঠিয়েছেন তিন খান রুটি, পিঠা, ও তেলে ভাজা এক টুকরো গরুর গোশত এবং এক পাত্র টক দৈ। এ সামান্য বস্তু উপলক্ষে করে এতটা ঘটা তারা করতে পারে দেখে আমি সশব্দে হেসে উঠলাম।

এ ঘটনার পর দু'মাস আমি আর কিছুই পেলাম না। তারপর শুরু হল রমজান মাস। ইত্যবসরে আমি প্রায়ই সুলতানের প্রাসাদে যেতে আরম্ভ করেছি। সেখানে গিয়ে সুলতানকে সালাম দিয়ে কাজী ও ইমামের পাশে বসে থাকতাম। তখন দোভাষী দুঘার আমাকে একদিন বললেন,"সুলতানের সঙ্গে নিজে কথা বলুন। আমি পরে আপনার তরফ থেকে তাকে আপনার প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলব।"

রমজানের প্রথম দিকে সুলতান যখন এক দরবারের আয়োজন করলেন, আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম,"আমি দুনিয়ার অনেক দেশ সফর করেছি এবং সেখানকার সুলতানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আজ চার মাস হতে চলেছে আমি এখানে এসেছি কিন্তু আজ অবধি হুজুর আমাকে কোনো পারিতোষিক বা অন্য কিছুই দেননি। আপনার সম্বন্ধে আমি অপর সুলতানদের কাছে কি বলব?"

সুলতান বললেন, "আমি আপনাকে দেখিনি বা কেউ আপনার কথা আমাকে জানায়ওনি।"

তখন কাজীও ইবনে-আল-ফাকি দাঁড়িয়ে বললেন, "ইনি হুজুরকে আগেই একদিন সালাম জানিয়েছেন এবং হুজুর তাঁকে খাবার পাঠিয়েছেন।"

এ কথার পর তিনি আমার বাসের জন্য একখানা ঘর এবং দৈনিক ব্যয়নির্বাহের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে দিলেন। পরে ২৭ শে রমজানের রাত্রে তিনি কাজী, ইমাম ও শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে কিছু অর্থ বিতরণ করলেন [২৩]। একে তারা জাকাত(ভিক্ষা) বলে। তাঁদের কিছু অংশ ৩৩ $\frac{১}{৩}$ মিস্‌কাল আমাকেও দেওয়া হল। এবং মালী ত্যাগের সময় তিনি আমাকে এক শ' স্বর্ণমিসকাল উপঢৌকন দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো সময় সুলতানের নিজের প্রাসাদের চত্বরে দরবারের আয়োজন হয়। সেখানে একটি গাছের নীচে তিন ধাপওয়ালা একটি বেদী আছে। এরা বেদীকে বলে পেম্‌পি[২৪]। বেদীটি রেশমী কাপড়ে মোড়া গদীযুক্ত। উপরে রয়েছে চাঁদোয়ার মত রেশমী ছাতা, তার উপরে সোনার তৈরী একটি পাখী। পাখীটির আকার একটি বাজপাখীর সমান। হাতে একটি ধনুক, পিঠে ঝুলানো তূণ নিয়ে সুলতান বেরিয়ে আসেন প্রাসাদের এক কোণের একটি দরজা খুলে। তার মাথায় একটি টুপি সোনালী ফিতায় বাঁধা। ফিতার অগ্রভাগের আকার ছুরির মত এবং লম্বায় এক বিঘতের বেশী। ইউরোপের তৈরী এক প্রকার কাপড়ের নাম মুতানফাস। লালরঙের মখমলসদৃশ্য সেই কাপড়ে তৈরী আঙরখো সুলতানের সাধারণ পোষাক। সুলতানের আগে-আগে আসে তাঁর বাদকদল। তাদের হাতে সোনা ও রূপার দোতারা বাদ্যযন্ত্র বা গীটার। সুলতানের পশ্চাতে থাকে তিন শ' সশস্ত্র ক্রীতদাস। অতি আরাম আয়াসে ধীর পদক্ষেপে সুলতান হেঁটে আসতে থাকেন, হাঁটতে-হাঁটতে সময়-সময় থেমেও যান। বেদী অবধি পৌছে তিনি চারদিক তাকিয়ে দেখেন, তারপর মসজিদের ইমাম যেমন করে মিম্বারে উঠে দাঁড়ান তেমনি করে তিনিও বেদীতে ওঠেন। সুলতান আসন গ্রহণ করতেই জয়ঢাক, নাকড়া ও শিঙা বেজে ওঠে। তিনজন ক্রীতদাস দৌড়ে যায় রাজার অমাত্য ও সেনানায়কদের ডেকে আনতে। তারা তখন এসে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর আনা হয় জিন্‌ ও লাগাম লাগানো দু'টি ঘোড়া এবং সে সঙ্গে দু'টি ছাগল। তারা মনে করে এগুলো কোনো কিছুর কুদৃষ্টি থেকে তাদের রক্ষা করবে। তখন দোভাষী দুঘা এসে প্রবেশদ্বারে দাঁড়ায় এবং বাকি সবাই থাকে গাছের নীচে।

কাফ্রীরা সবাই তাদের রাজার খুব অনুগত। রাজার কাছে আচারে ব্যবহারে তারা নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করে। 'মান্‌সা সুলায়মান কি'[২৫] বলে তারা সুলতানের নামে শপথ গ্রহণ করে। দরবারে বসে তিনি কাউকে সমন দিলে সে ব্যক্তি গায়ের জামা ও পাগড়ী খুলে ছেঁড়া জামা পরিধান করে মাথায় একটি ময়লা গোল টুপি দিয়ে পাজামা ও অন্যান্য পোশাক হাঁটু অধিক তুলে দরবারে প্রবেশ করে। তারপর সে অগ্রসর হয় নিজকে অত্যন্ত হেয় অপরাধী মনে করে। এবং কনুইয়ের সাহায্যে মাটীতে শক্ত ঘা দিয়ে সুলতান যা বলেন তা শুনবার জন্য পিঠ বাঁকিয়ে মাথা নত করে দাড়ায়। যদি কেউ রাজাকে কিছু বলে তার জবাব পায় তাহলে পিঠের কাপড় উম্মোচন করে পিঠ ও মাথার

উপর দিয়ে ধুলি নিক্ষেপ করতে থাকে ঠিক যেমন করে কোনো স্নানার্থী তার গাত্রে পানি সিঞ্চন করে। তবু তারা কেনো যে অন্ধ হয় না তাই ভেবে আমি অবাক হয়ে যেতাম। দরবারের সময় সুলতান যদি কোনো মন্তব্য করেন তবে উপস্থিত শ্রোতারা মাথার পাগড়ী নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে। সময়-সময় তাদের একজন সুলতানের সামনে উঠে দাঁড়ায় এবং সুলতানের জন্য সে কি করেছে তা প্রকাশ করে। সে বলে, "অমুক দিন আমি এ কাজ করেছি অথবা আমি অমুক দিন অমুককে হত্যা করেছি।" এ বিষয় যারা জ্ঞাত থাকে তারা তখন তার কথা সমর্থন করে তীর ছুঁড়বার মত করে তার নিজের ধনুকের ছিলো টানে। তখন সুলতান যদি বলেন যে সত্য কথাই বলেছে অথবা যদি তাকে তিনি ধন্যবাদ দেন তবে সে পিঠের কাপড় সরিয়ে পিঠে ও মাথায় ধূলা ছড়াতে থাকে। এই তাদের ভদ্র ব্যবহার।

ইবনে জুজাই বলেন, "শুনেছি হাজী মুসা-আল-ওয়ানজারাতি(ম্যান-ডিংগো) যখন মান্‌সা সুলায়মানের দূত হিসাবে খলিফা আবুল হাসানের দরবারে এসেছিলেন তখন তাঁর একজন সঙ্গী এক টুকরি ধূলিও সঙ্গে এনেছিল। আমাদের খলিফা যখনই কোনো ভাল কথা বলতেন তখনই দূত তাঁর নিজের দেশের রীতি অনুযায়ী সেই ধূলা গায়ে নিক্ষেপ করতেন।"

আমি মালীতে থাকাকালে দু'বার কোরবানী ও একবার ঈদুল ফেতর দেখেছি। এ সব উৎসবের দিনে জহুরের নামাজের পর সুলতান গিয়ে পেমপিতে আসন গ্রহণ করেন। তখন যুদ্ধের সাজসজ্জা বহনকারীরা সুদৃশ্য অস্ত্রপাতি যথা, সোনা ও রূপার তৈরী তুণ, সোনার কারুকার্য খচিত তরবারী, তরবারীর সোনালী খাপ, রূপার বর্শা, স্ফটিকের রাজদণ্ড প্রভৃতি সেখানে এনে হাজির করে। ঘোড়ার জিন্-রিকাবের মত এক রকম রৌপ্য অলঙ্কার হাতে দিয়ে চারজন আমীর সুলতানের পেছনে দাঁড়িয়ে মাছি তাড়ান। সেনাপতি, কাজী ও ইমাম এসে তাদের নির্দিষ্ট আসনে বসেন। দোভাষী দুঘা আসেন তাঁর চার বিবি ও বাঁদীদের নিয়ে। বাঁদী-বালিকাদের সংখ্যা প্রায় শতেক। তাদের পরিচ্ছদ অতি মনোরম। মাথায় স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত ফিতা। ফিতায় ঝুলানো সোনা ও রূপার বল । দুঘার আসন হিসাবে সেখানে একখানা চেয়ার রাখা হয়। নলদ্বারা তৈরী এবং নিম্নদিকে লাউয়ের খোলায় লাগানো একটি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দোভাষী সুলতানের সাহসিকতাও বীরত্বসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। মেয়েরা তাঁর সঙ্গে গান করে এবং ধনুক নিয়ে খেলা করে। তাদের সঙ্গে থাকে মাথার শাফা টুপি ও লাল রংএর উলেন খেলকা পরিহিত প্রায় ত্রিশ জন যুবক। কাঁধ থেকে ঝুলানো জয়ঢাক বাজায় সে সব যুবকেরা। তারপরে আসে তাঁর শিষ্য বালক দল। তারা খেলা করে এবং সিন্ধুর অধিবাসীদের মত শূন্যে চাকা ঘুরায়। এ খেলায় তাদের তৎপরতা ও উৎসাহ প্রশংসনীয়। তাদের তরবারী খেলাও চাতুর্যপূর্ণ। দুঘা নিজেও ভাল তরবারী খেলতে পারেন। অতঃপর সুলতান দোভাষীকে পুরস্কার দিতে হুকুম করেন। দু'শ মিশ্‌কাল মূল্যের স্বর্ণরেণু পূর্ণ একটি তোড়া তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এবং তা উপস্থিত সকলের সম্মুখে ঘোষণা করা হয়। তখন সেনা-নায়করা উঠে তাঁদের ধনুকে টঙ্কার দিয়ে সুলতানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। পরের দিন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদমর্যাদানুযায়ী এক একটি উপহার দেন দোভাষীকে। প্রতি শুক্রবার আসরের নামাজের পরে দুঘা উপরোল্লিত অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি করেন।

ভোজের দিনে দুঘার অনুষ্ঠানের পরে আসেন কবিরা। গ্রাস নামক গায়কপাখীর অনুকরণে পালকের দ্বারা তৈরী বেশবাসে সজ্জিত হয়ে তারা প্রবেশ করেন। দেখতে যাতে গ্রাস পাখীর মাথার মতই দেখায় সেজন্যে লাল চক্ষু বিশিষ্ট একটি কাঠের মাথা কবিদের মাথায় বসানো হয়। তাঁরা এই হাস্যকর পোশাকে সজ্জিত হয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে নিজ-নিজ কবিতা আবৃত্তি করেন। শুনেছি তাদের সে কবিতা বহুলাংশে খোতবার মত। কবিতায় তারা বলেন, "যে পেম্পি আজ আপনি দখল করে আছেন সেখানে অমুক-অমুক রাজা এক সময়ে আসন গ্রহণ করেছেন এবং অমুক-অমুক সৎকাজ করে গেছেন। আপনিও সেরূপ সৎকাজ করুণ যাতে মৃত্যুর পরেও আপনার সুনাম বজায় থাকে।" কবিতা আবৃত্তির পর প্রধান কবি পেম্পির সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে প্রথমে ডান কাঁধে ও পরে বাঁ-কাঁধে নিজের মাথা রাখেন। এ সময়ে কবি নিজের ভাষায় সারাক্ষণই কথা বলতে থাকেন। পরে আবার পেম্পি থেকে নেমে আসেন। তাদের এ রীতি ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনেরও পূর্ব থেকে চলে আসছে এবং আজও অবধি তা বজায় আছে।[২৬]

মানসা সুলায়মানকে তার লোভের জন্য কাফ্রীরা সবাই না-পছন্দ করত। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান ছিলেন মান্‌সা মাঘা এবং তাঁরও পূর্বে রাজত্ব করে গেছেন মান্‌সা মূসা। তিনি ছিলেন দয়ালু ও ন্যায়পরায়ন শাসক। শ্বেতকায় লোকদের তিনি ভালবাসতেন এবং পারিতোষিক দিতেন[২৭]। ইনিই আবু ইসহাক আস-সাহিলিকে একদিনে চার হাজার মিশ্‌কাল দান করেছিলেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, তিনি একদিন মাদরিক ইবনে ফাককুসকে হাজার মিশ্‌কাল দান করেছিলেন। মাদরিক ইবনে ফাক্‌কুসের পিতামহই মান্‌সা মূসার পিতামহকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন।

কাফ্রীরা কতকগুলি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। কদাচিৎ তাদের অবিচারী হতে দেখা যায়। অবিচারের প্রতি তাদের যেমন ঘৃণা এমন ঘৃণা অন্য কোনো জাতির মধ্যে কমই দেখা যায়। তাদের কেউ সামান্য অবিচারের দোষে দোষী হলেও সুলতান তাকে কখনো ক্ষমা করেন না। তাদের দেশে মানুষের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজমান। বিদেশী সফরকারী বা দেশের অধিবাসী—কারও পক্ষেই দস্যুতস্কর বা অত্যাচারীর ভয়ে ভীত হওয়ার কারণ নেই। কোনো শ্বেতকায় তাদের দেশে মারা গেলে তার পরিত্যক্ত অপরিমেয় হলেও তারা তা বাজেয়াপ্ত করে না। বরং মৃতব্যক্তির প্রকৃত ওয়ারিশ না পাওয়া পর্যন্ত সে সম্পত্তি তারা বিশ্বাসী কোনো শ্বেতকায় ব্যক্তির হেফাজতে গচ্ছিত রাখে। যথাসময়ে নামাজ আদায় করা সম্বন্ধে তারা বিশেষ সতর্ক। বিশেষ করে তাঁরা জামাতে নামাজ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং ছেলেমেয়েদের সেরূপ শিক্ষাই দিয়ে থাকে। শুক্রবার মসজিদে যেতে বিলম্ব করলে সে মসজিদের কোথাও ভিড়ের জন্য দাঁড়াবার জায়গা পায় না। এজন্য সেখানকার রীতি হলো, জায়নামাজসহ আগেই ছেলে বা বালকভৃত্যকে মসজিদে পাঠিয়ে দেওয়া। সে গিয়ে ভাল একটি জায়গায় জায়-নামাজ বিছিয়ে রাখে এবং মনিব না-আসা অবধি সেখানে অপেক্ষা করে। খেজুর গাছের মত এক রকম গাছের পাতা দিয়ে তারা নামাজের মাদুর তৈরী করে নেয়। সে গাছ খেজুর গাছের মত হলেও তাতে কোনো ফল হয় না।

তাদের আরও একটি প্রশংসনীয় কাজ হলো, শুক্রবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাক পরিধান করা। যদি কোনো ব্যক্তির ছেঁড়া একটি কামিজ ছাড়া আর কিছুই না-থাকে তবুও সেটি সযত্নে ধৌত করে সে শুক্রবার জুমার নামাজে যোগদান করবে। এ ছাড়া কোরাণ শরীফ কণ্ঠস্থ করার প্রতিও তাদের যথেষ্ট আগ্রহ। এ-কাজে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো শৈথিল্য দেখলে তারা তাদের বেঁধে রাখে এবং কোরাণের পড়া কণ্ঠস্থ না-করা পর্যন্ত মুক্তি দেয় না । এক পর্বের দিনে আমি কাজির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের বেঁধে রেখেছেন । কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, "এদের কি আজ ছেড়ে দেবেন না?"

তিনি বললেন, "কোরাণের পড়া মুখস্থ না-করা অবধি ওদের ছাড়া হবে না।"

তাদের ভেতর কতকগুলি কুরীতিও প্রচলিত আছে। চাকরাণী বাঁদী বা যুবতী মেয়েরা কোনো রকম বস্ত্র পরিধান বা করেই অবাধে উলঙ্গ অবস্থায় সকলের সামনে আনাগোনা করে। মেয়েরা সুলতানের সামনে যেতেও কোনো রকম আচ্ছাদন ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করে না। এমন কি সুলতানের কন্যারাও উলঙ্গ থাকে। তারপর রয়েছে মাথায় ও গায়ে ধূলা ছড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের রীতি এবং উপরে বর্ণিত কবির জল্‌সার হাস্যকর অনুষ্টান । তাদের ভেতর অনেকেরই আরেকটি দুষণীয় অভ্যাস হলো গলিত মাংস এবং কুকুর ও গাধার মাংস ভক্ষণ।

আমি মালীতে পৌছে ৭৫৩ হিজরীর ১৪ই জমাদিয়ল আউয়াল মাসে (২৮শে জুন, ১৩৫২ খৃষ্টাব্দ) এবং মালী ত্যাগ করি পরের বছরের ২২শে মহর্‌রম (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৩৫৩)। আমার সঙ্গী ছিলেন আবুবকর ইবনে ইয়াকুব। আমরা মিমার পথে চলতে লাগলাম। আমার একটি উট ছিল। আমি সেই উটে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ ঘোড়ার মূল্য এখানে খুব বেশী। প্রতিটির মূল্য প্রায় একশ মিশ্‌কাল! আমরা প্রশস্ত একটি খালের ধারে এসে পৌছলাম। নীলনদ থেকে এ খালটি বয়ে এসেছে। নৌকা ছাড়া এ খাল পার হওয়া যায় না। এখানে মশার উৎপাত খুব বেশী। রাত্রে ছাড়া কেউ পথ চলতে পারে না। এখানে পৌছার পর বিশালকায় ষোলটি জন্তু নজরে পড়ল সে গুলিকে হাতী মনে করে আমি বিস্মিত হলাম। কারণ সে দেশে হাতী যথেষ্ট দেখা যায়। পরে দেখতে পেলাম, জন্তুগুলি সব খালে গিয়ে নামল। তখন আমার সঙ্গী আবুবকরকে জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলি আবার কি রকম জীব?"

তিনি বললেন,"এগুলি হিপোপোটেমাস, ডাঙ্গায় চড়ে বেড়াতে এসেছে।" হিপোপোটেমাস আকারে ঘোড়ার চেয়ে বড় কিন্তু তাদের কেশরও আছে লেজও আছে। এমন কি তাদের মাথাও ঘোড়ার মাথার মতই, শুধু পা হাতীর পায়ের মত। হিপোপোটেমাস আরেকবার দেখেছিলাম নীলনদ দিয়ে তাম্‌বাকতু থেকে গাওগাও যাবার পথে। নদীতে সাঁতার কাটতে-কাটতে সেগুলি এক একবার মাথা তুলে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। নৌকার লোকেরা নদীর কিনার ঘেসে চলছিল, তাদের ভয় পাছে বা হিপোপোটেমাস তাদের নৌকাই ডুবিয়ে দেয়।

তাদের আরও একটি প্রশংসনীয় কাজ হলো, শুক্রবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাক পরিধান করা। যদি কোনো ব্যক্তির ছেঁড়া একটি কামিজ ছাড়া আর কিছুই না-থাকে তবুও সেটি সযত্নে ধৌত করে সে শুক্রবার জুমার নামাজে যোগদান করবে। এ ছাড়া কোরাণ শরীফ কণ্ঠস্থ করার প্রতিও তাদের যথেষ্ট আগ্রহ। এ-কাজে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো শৈথিল্য দেখলে তারা তাদের বেঁধে রাখে এবং কোরাণের পড়া কণ্ঠস্থ না-করা পর্যন্ত মুক্তি দেয় না । এক পর্বের দিনে আমি কাজির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের বেঁধে রেখেছেন । কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, "এদের কি আজ ছেড়ে দেবেন না?"

তিনি বললেন, "কোরাণের পড়া মুখস্থ না-করা অবধি ওদের ছাড়া হবে না।"

তাদের ভেতর কতকগুলি কুরীতিও প্রচলিত আছে। চাকরাণী বাঁদী বা যুবতী মেয়েরা কোনো রকম বস্ত্র পরিধান না করেই অবাধে উলঙ্গ অবস্থায় সকলের সামনে আনাগোনা করে। মেয়েরা সুলতানের সামনে যেতেও কোনো রকম আচ্ছাদন ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করে না। এমন কি সুলতানের কন্যারাও উলঙ্গ থাকে। তারপর রয়েছে মাথায় ও গায়ে ধুলা ছড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের রীতি এবং উপরে বর্ণিত কবির জলসার হাস্যকর অনুষ্ঠান । তাদের ভেতর অনেকেরই আরেকটি দুষণীয় অভ্যাস হলো গলিত মাংস এবং কুকুর ও গাধার মাংস ভক্ষণ।

আমি মালীতে পৌছে ৭৫৩ হিজরীর ১৪ই জমাদিয়ল আউয়াল মাসে (২৮শে জুন, ১৩৫২ খৃষ্টাব্দ) এবং মালী ত্যাগ করি পরের বছরের ২২শে মহররম (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৩৫৩)। আমার সঙ্গী ছিলেন আবুবকর ইবনে ইয়াকুব। আমরা মিমার পথে চলতে লাগলাম। আমার একটি উট ছিল। আমি সেই উটে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ ঘোড়ার মূল্য এখানে খুব বেশী। প্রতিটির মূল্য প্রায় একশ মিশ্‌কাল! আমরা প্রশস্ত একটি খালের ধারে এসে পৌছলাম। নীলনদ থেকে এ খালটি বয়ে এসেছে। নৌকা ছাড়া এ খাল পার হওয়া যায় না। এখানে মশার উৎপাত খুব বেশী। রাত্রে ছাড়া কেউ পথ চলতে পারে না। এখানে পৌছার পর বিশালকায় ষোলটি জন্তু নজরে পড়ল সে গুলিকে হাতী মনে করে আমি বিস্মিত হলাম। কারণ সে দেশে হাতী যথেষ্ট দেখা যায়। পরে দেখতে পেলাম, জন্তুগুলি সব খালে গিয়ে নামল। তখন আমার সঙ্গী আবুবকরকে জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলি আবার কি রকম জীব?"

তিনি বললেন,"এগুলি হিপোপোটেমাস, ডাঙ্গায় চড়ে বেড়াতে এসেছে।" হিপোপোটেমাস আকারে ঘোড়ার চেয়ে বড় কিন্তু তাদের কেশরও আছে লেজও আছে। এমন কি তাদের মাথাও ঘোড়ার মাথার মতই, শুধু পা হাতীর পায়ের মত। হিপোপোটেমাস আরেকবার দেখেছিলাম নীলনদ দিয়ে তাম্‌বাকতু থেকে গাওগাও যাবার পথে। নদীতে সাঁতার কাটতে-কাটতে সেগুলি এক একবার মাথা তুলে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। নৌকার লোকেরা নদীর কিনার ঘেসে চলছিল, তাদের ভয় পাছে বা হিপোপোটেমাস তাদের নৌকাই ডুবিয়ে দেয়।

এদেশের লোকের হিপোপোটেমাস শিকারের কৌশলটি চমৎকার। এ কাজে শক্ত দড়ি লাগানো বর্শা তারা ব্যবহার করে। বর্শা নিক্ষেপ করলে তা যদি জন্তুটার পায়ে বা ঘাড়ে লাগে তবে এপিট-ওপিঠ হয়ে যায়। তারপর তারা সেই জন্তুটাকে দড়ির সাহায্যে টেনে ডাঙ্গায় তোলে। তারা তখন সেটাকে মেরে তার মাংস ভক্ষণ করে। নদীর তীরে হিপোপোটেমাসের বহু পরিমাণ হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এ নদীর ধারেই বড় একটি গ্রামে এসে আমরা উঠলাম । গ্রামের মোড়ল ফারবা মাঘা নামে একজন কাফ্রী হাজী। তিনি একজন সৎ লোক। ইনি সুলতান মানসা মুসার সঙ্গে হজ করেছেন। ফারবা মাঘার কাছে শুনলাম, একবার সুলতান মানসা মুসা যখন এ

খালের ধারে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে একজন শ্বেতকায় কাজী ছিলেন। এ কাজী চার হাজার মিশকাল নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। সুলতান তা জানতে পেরে ভয়ানক রেগে যান এবং সেই শ্বেতকায় কাজীকে নরখাদক জংলীদের দেশে নির্বাসিত করেন। কাজী চার বছর তাদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন। পরে সুলতান তাকে আনিয়ে তার দেশে পাঠিয়ে দেন। লোকটি শ্বেতকায় ছিলেন বলেই জংলীরা তার মাংস ভক্ষণ করেনি। জংলীদের ধারণা, শ্বেতকায় লোকদের মাংস হজম হয় না, কারণ তাদের মাংস 'পরিপক্ক' নয়। পক্ষান্তরে তাদের মতে কৃষ্ণকায় লোকদের মাংস পরিপক্ক।

নরখাদক এ কাফ্রীদের একটি দল একবার এসেছিল সুলতান মানসা সুলায়মানের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে তাদের আমীরও ছিল। এরা কানে বড় বড় আংটী ব্যবহার করে। আংটীর ভেতরকার পরিধি হবে প্রায় এক বিঘত। গাত্রাবরণ হিসাবে ব্যবহার করে আঙরাখা। তাদের দেশে একটা স্বর্ণখনি আছে। সুলতান সসম্মানে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। একটি নিগ্রো বালিকাকে তাদের হাতে দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন। তারা সেই বালিকাকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করল। তারপর সুলতানকে ধন্যবাদ জানাতে এল সেই বালিকার রক্ত মুখে ও হাতে মেখে। শুনেছি সুলতানের দরবারে এলে এই তাদের প্রচলিত অনুষ্ঠান। এদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একজন আমাকে বলেছে নারীদেহের বক্ষ ও হাতের মাংস এদের কাছে সবচেয়ে পছন্দসই।

খালের পারে অবস্থিত এ গ্রামটি ছাড়িয়ে আমরা কুরি মানসা শহরে এসে পৌছলাম[২৯]। এখানে পৌছতেই আমার বাহন উটটি গেল মরে। উটের রাখাল এসে আমাকে এ খবর দিল। আমি মৃত উটটিকে দেখতে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে কাফ্রীরা তা যথারীতি খেয়ে ফেলেছে। আমি তখন আরেকটি উট কিনবার জন্য দু'টি ছেলেকে পাঠালাম জাখারি। উট কিনে ফিরে আসবার অপেক্ষায় কুরি মানসায় দু দিন থাকতে হলো।

সেখান থেকে মিমা শহরের বাইরে[৩০] কয়েকটি কুপের পাশে এসে আমরা আস্তানা ফেললাম। সেখান থেকে এলাম তামবাকতু। নদীর ধার থেকে তামবাকতুর দুরত্ব চার মাইল। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মাসুফা সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা মুখে ঘোমটা ব্যবহার করে। এদের শাসনকর্তার নাম ফারবা মুসা। তিনি যখন একজন মাসুফাকে একটি দলের আমীরের পদে নিয়োগ করলেন আমি ঠিক তখন তাঁর কাছেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাকে রংকরা কাপড়ের আঙরাখা, পাগড়ীও পায়জামা উপহার দিয়ে একটি ঢালের উপর বসতে আদেশ করলেন। তাঁর দলের সরদাররা তখন তাকে মাথায় তুলে নিল। গারনাটার (গ্রানাডার) প্রতিভাবান কবি আবু ইস্‌হাক আস্‌-সাহিলীর কবর এ শহরে অবস্থিত। এ কবি নিজের দেশে আততুবায়জিন (ছোট রঞ্জন পাত্র) নামে পরিচিত।[৩১]

তামবাকতু থেকে এক-কাঠের তৈরী একটি ছোট নৌকায় চড়ে নীল নদের পথে নিম্ন দিকে রওয়ানা হলাম। পথে প্রতি রাত্রে আমরা তীরবর্তী গ্রামে গিয়ে লবণ, মসলা ও পুঁতির পরিবর্তে মাংস মাখন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে নিতাম। এমনি করে এমন একটি জায়গায় পৌছলাম যার নামটি আজ আমার স্মরণে নেই। সেখানকার শাসনকর্তা একজন চমৎকার লোক। তাঁর নাম ছিল হাজী ফারবা সুলায়মান। তিনি ছিলেন তাঁর সাহস ও শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর ধনুকটি কেউ ব্যবহার করতে সাহস পেত না। তাঁর মত বিশাল ও দীর্ঘকায় লোক আমি আর কোথাও চোখে দেখিনি। এ শহরে থাকতে একদিন আমার কিছু ভুট্টার প্রয়োজন হওয়ায় শাসনকর্তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম করলাম। সেদিন ছিল ফাতেহা দোয়াজ দাহাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর দরবারে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাদের খেতে দেওয়া হল ডাকনু নামে

এক প্রকার পানীয়। ভুট্টার ছাতু পানি দিয়ে গুলে মধু বা দুধ মিশিয়ে তৈরী সে পানীয়। শুধু পানি পান করে তারা অসুস্থ হয় বলে পানির পরিবর্তে এ জিনিষই পান করে । ভুট্টার অভাবে তারা পানির সঙ্গে মধু বা দুধ মিশিয়ে নেয়। তারপর এলো একটি কাচা তরমুজ। তার কিছুটা নিয়ে আমরা সদ্ব্যবহার করলাম। গায়ে পায়ে তখনও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি এমন একটি বাচ্চা ছেলেকে কাছে ডেকে ফারবা সুলায়মান আমাকে বললেন, "অতিথি হিসাবে আপনাকে উপহার দিলাম। ছেলেটির ওপর নজর রাখবেন যেনো কখনো পালিয়ে না যায়।"

সেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি চলে আসছিলাম। তিনি বললেন "একটু অপেক্ষা করুন, খেয়ে যাবেন।"

তখন তাঁর একজন বাঁদী এসে হাজির হল সেখানে। দামেস্কের এক আরব বালিকা এই বাঁদী। আমার সঙ্গে সে আরবীতে কথা বলছিল এমন সময় সুলতানের বাড়ীর ভেতরে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। সুলতান বালিকাকে বাড়ীর ভেতর পাঠালেন কান্নার কারণ জানতে। সে ফিরে এসে খবর দিল এইমাত্র সুলতানের একটি কন্যা মারা গেছে। তাই শুনে তিনি বললেন, "কান্না আমি পছন্দ করিনে। আসুন আমরা নদীর পাড়ে যাই।"

তিনি নীলনদের তীরে তাঁর আরও যে সব বাড়ী রয়েছে সেখানে যাওয়ার কথা বলছিলেন। একটা ঘোড়া আনানো হলে তিনি আমাকে ঘোড়ায় আরোহণ করতে বললেন। কিন্তু আমি বললাম,"আপনি হেঁটে গেলে আমি ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারিনা।"

অতঃপর উভয়েই আমরা হেঁটে নদীর ধারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে আহার করলাম। আহারের পর বিদায় নিয়ে চলে এলাম। কৃষ্ণকায় কাফ্রীদের ভেতর তার মত দয়ালু ও সৎ লোক আমি আর কোথাও পাইনি। তাঁর দেওয়া সেই বালকটি আজও আমার সঙ্গে আছে।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গগো এসে পৌঁছলাম। নীলনদের তীরে কাফ্রী দেশের[৩২] সবচেয়ে সুন্দর ও বড় শহর গগো(Gogo) । প্রচুর চাউল, দুধ ও মাছ এখানে পাওয়া যায়। এখানে ইনানী নামক এক প্রকার শসা পাওয়া যায় যার তুলনা কোথাও নাই। এখানকার অধিবাসীরা কড়ির সাহায্যে কেনাবেচা করে এবং মালীতেও [৩৩] অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রায় একমাস কাল সেখানে কাটিয়ে গাদামাসের একদল সওদাগরের সঙ্গে স্থলপথে আমরা তাগাদ্দার দিকে চলতে থাকি। তাদের দলের চালক ও নেতা ছিলেন উচিন নামে একজন হাজী। তাদের ভাষায় উচিন বলে নেক্ড়ে বাঘকে। আমার সঙ্গে আমার বাহন স্বরূপ একটি উট ছিল। আরেকটি মাদী উট ছিল আমার জিনিষপত্র বহনের জন্য। কিন্তু এক মঞ্জিল পার হয়ে যাবার পর মোটবাহী উটটি আর অগ্রসর হতে পারছিল না। তখন হাজী উচিন উটের পিঠের মালপত্র নামিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে কিছু-কিছু করে ভাগ করে দিলেন। এবং তারাই তা ভাগাভাগি করে বইতে লাগল। দলের ভেতর তাদালার একজন মাগরাবিন ছিল। সে কিছুতেই তার অংশের বোঝা বহন করতে রাজী হল না। আমার সঙ্গী বালকটি একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে তার কাছে পানি চেয়েছিল, তাও সে দেয়নি।

অতঃপর আমরা বর্বর বার্দামাদের দেশে প্রবেশ করলাম। নিরাপত্তার জামিন ছাড়া তাদের দেশে কেউ সফর করতে পারে না। এখানে পুরুষের চেয়ে কোনো নারীর জামিনের মূল্য অধিক। নিখুঁত সৌন্দর্যে ও দেহ সৌষ্ঠবে এখানকার নারীরা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ফর্সা এবং তারা যথেষ্ট দৃঢ়কায়। তাদের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন সবলকায় নারী আমি দুনিয়ার [৩৪] কোথাও দেখিনি। এখানে এসে অত্যধিক গরমে ও পিত্তাধিক্যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন পথ চলার গতি বাড়িয়ে আমরা তাগাদ্দা এসে পৌঁছলাম। তাগাদ্দার ঘরবাড়ী লাল পাথরে তৈরী। তাম্রখনির পাশ দিয়ে এখানে

পানি আসে বলে পানির স্বাদ ও রং বিকৃত। সামান্য পরিমাণ গম ছাড়া আর কোনো খাদ্যশস্য এখানে জন্মে না। গম যা জন্মে তা দিয়ে ব্যবসায়ীদের ও বহিরাগতদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটে। ব্যবসায় ছাড়া অধিবাসীদের আর কোনো পেশা নেই। প্রত্যেক বছর তারা মিশর গিয়ে সেখানকার সব রকম সুক্ষ্ম বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য আমদানী করে। তারা বিলাসিতা ও আরাম আয়াসে বাস করে এবং নিজেদের দাসদাসীর সংখ্যা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। মালী ও ইবালাতানের অধিবাসীরাও তাই করে। তারা শিক্ষিতা কোনো বাঁদীকে কখনো বিক্রি করতে রাজী হয় না, বিক্রি করলেও অত্যন্ত উচ্চ মূল্য হাঁকে[৩৫]।

তাগাদ্দায় পৌঁছে আমি একজন শিক্ষিতা বাঁদী কিনতে চাইলাম কিন্তু কোথাও তা পেলাম না। পরে কাজী তাঁর বন্ধুর একটি বাঁদীকে আমার কাছে পাঠালেন। আমি পচিশ মিশকাল দিয়ে তাকে খরিদ করলাম। পরে তার মনিব তাকে বিক্রি করে খুব অনুতপ্ত হ'ল এবং তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইল। কাজেই আমি বললাম, "আরেকটি বাঁদী কোথায় পেতে পারি জানালে আমি একে ফেরত দিতে পারি।"

সে তখন 'আলী আগিলের' একটি বাঁদীর কথা বলল। এ আলী আগিলই তাদালার সেই মাগরাবিন যে আমার মালপত্র বহন করতে রাজী হয়নি এবং আমার ভৃত্যকে পানি খেতে দেয়নি। কাজেই আমি এ বাঁদীটিকে কিনে প্রথমটি ফেরত দিলাম। এ বাঁদীটি প্রথমটির চেয়ে ভাল ছিল। পরে মাগরাবিনও তার বাঁদী বিক্রি করে যথেষ্ট অনুতপ্ত হ'ল ও তাকে ফেরত চাইল। এজন্য সে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করতে লাগল কিন্তু তার দুর্ব্যবহারে প্রতিশোধের জন্য আমি তার প্রস্তাব মেনে নিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। অবশেষে সে বাঁদীর দুঃখে পাগল হয়ে যাবে অথবা মরে যাবে এমন অবস্থা হওয়ায় তার সঙ্গে কেনাবেচা বাতিল করতে হল।

তাম্রখনিটি তাগাদ্দা শহরের বাইরে। তারা খনি থেকে তামা তুলে এনে বাড়ীতে শোধন করে। এ কাজ তাদের গোলাম ও বাদীরাই করে। শোধিত লাল তামা দিয়ে তারা অনুমান দেড় বিঘত লম্বা তার তৈরী করে। এ সব তাল হালকাও হয় ভারীও হয়। এক স্বর্ণ মিশকালের পরিবর্তে চার শ ভারী তাল বিক্রি হয়। হালকা তাল হলে ছয় বা সাতশ' পাওয়া যায় এক মিশকালে। তামার তালের সাহায্যে তাদের বেচা কেনাও চলে। হালকা তাল দিয়ে তারা কিনে মাংস ও জ্বালানী কাঠ এবং ভারী তাল দিয়ে বাঁদী, গোলাম, ভুট্টা মাখন ও গম।

তাগাদ্দা থেকে তামা রপ্তানী হয় বর্বর দেশের অন্তর্গত কুবার শহরে, জাঘাই[৩৬] ও বারনু দেশে। তাগাদ্দা থেকে বারনুর দূরত্ব চল্লিশ দিনের পথ। বারনুর বাসিন্দারা মুসলমান। ইদ্রিস নামে তাদের একজন রাজা আছেন। তিনি প্রজাদের সামনে কখনো দেখা দেন না। এবং পর্দার আড়ালে থেকে ছাড়া তাদের সঙ্গে কখনও কথা [৩৭] বলেন না। এ দেশেই উৎকৃষ্ট বাঁদী, খোঁজা পুরুষ এবং জাফরাণী রঙে রং করা কাপড় পাওয়া যায়। তাগাদ্দার তামা অন্যান্য দেশ ছাড়াও জাওজাওয়া এবং মুয়াবতাবুনদের দেশে রফতানী হয়[৩৮]।

তাগাদ্দায় থাকা কালে আমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করলাম। তিনিও বর্বর সম্প্রদায় ভুক্ত। তাঁর নাম আইজার। তিনি তখন যেখানে ছিলেন শহর থেকে সেখানে যেতে একদিন লাগে। কাজেই একজন চালক নিযুক্ত করে আমি একদিন রওয়ানা হলাম। আমার আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি জাজিম বিহীন এক ঘোড়ায় চড়ে দেখা করতে এলেন। ঘোড়ায় জাজিম ব্যবহারের রেওয়াজ তাদের দেশে নেই। জাজিমের পরিবর্তে রয়েছে জাজিমের উপরে দেবার চাকচিক্যময় একটুকরা কাপড়। সুলতানের গায়ে আলখেল্লা, পরিধানে পায়জামা, মাথায় পাগড়ী—সবই নীল রঙের।

সঙ্গে ছিল তাঁর ভাগনেয়রা। ভাগনেয়রাই তার রাজত্বের উত্তরাধিকারী। তিনি এগিয়ে আসতে আমি উঠে গিয়ে তাঁর করমর্দন করলাম। আমার আগমনের কারণ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলে আমি সবিস্তারে তাঁকে সব বললাম। তিনি ইয়ানিতিবুননের একটি তাবুতে আমার বাসস্থান নির্দেশ করলেন। এরা আমাদের দেশের বুসফানদের ৩৯ সমতুল্য। আমার আহারের জন্য তিনি পাঠালেন রোস্ট করা একটি ভেড়া এবং কাঠের একটি পাত্রে গোদুগ্ধ। আমাদের তাবুর কাছেই ছিল সুলতানের মাতা ও তার ভগ্নীর তাঁবু। তাঁরা আমাদের সঙ্গে দেখা করে সালাম করে গেলেন। মাগরিবের নামাজের পরে তাদের গাভী দোহনের সময়। সুলতানের বাবা সে সময়ে আমাদের দুধ পাঠাতেন। তারা দুধ পান করে সন্ধ্যার পরে এবং ভোরে। খাদ্যশস্যের কিছুই তারা খায় না এবং খেতে জানেও না। তাদের সঙ্গে আমি ছয়দিন ছিলাম। প্রতিদিনই দুটি করে রোস্ট করা ভেড়া—একটি সকালে, একটি সন্ধ্যায় সুলতানের নিকট থেকে আমি পেয়েছি। তা ছাড়া তিনি আমাকে একটি মাদী উট এবং দশ মিশকাল মূল্যের স্বর্ণ দান করেছিলেন। পরে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাগাদ্দা ফিরে এলাম।

তাগাদ্দায় ফিরে আসার পরেই আমাদের খলিফার এক আদেশ পত্র নিয়ে এক দূত এসে হাজির। তিনি আমাকে তার রাজধানীতে ফিরে যেতে আদেশ করেছেন। আমি তার আদেশপত্রটি চুম্বন করে আদেশ পালনে যত্নবান হলাম। সওয়ারের উপযোগী দু'টি উট ৩৭ মিশকালে খরিদ করে আমি তাবাত যাত্রার আয়োজন করলাম। সত্তর দিনের উপযোগী খাদ্য সঙ্গে নিলাম কারণ তাগাদ্দা ও তাবাতের মধ্যে কোথাও খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না। কাপড়ের টুকরার বিনিময়ে মাংস, দুধ এবং মাখন পাওয়া যায়।

বিশাল একটি কাফেলার সঙ্গে আমি তাগাদ্দা ত্যাগ করলাম ৭৫৪ হিজরীর ১১ই শাবান বৃহস্পতিবার মোতাবেক ১১ই সেপ্টেম্বর ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে। আমাদের এ কাফেলায় ক্রীতদাসী ছিল ছয়শ। আমরা প্রথমে কাহির এসে পৌঁছলাম। সেখানে গোচারণ ভূমি প্রচুর। কাহির থেকে এসে জনহীন এক মরুভূমিতে পড়লাম। তিনদিনের পথ বিস্তৃত এই মরুর কোথাও পানি নেই। তারপরে আরেকটি মরুভূমির ভেতর দিয়ে আমরা পনর দিন পথ চললাম। এ মরুভূমিটি জনহীন হলেও এর স্থানে-স্থানে পানি পাওয়া যায়। পনর দিন পর আমরা যেখানে পৌঁছলাম সেখানেই মিশরগামী ঘাট নামক সড়ক তাবাক সড়ককে অতিক্রম করেছে। এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে ভূগর্ভে পানির ধারা প্রবাহিত হয়। সে ধারা লৌহের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এ পানির মধ্যে একখণ্ড বস্ত্র ডুবালে তা কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে।

এ স্থানটি ত্যাগ করে দশ দিন পথ চলার পর আমরা হাগ্‌গারদের দেশে পৌঁছি। এরা অসভ্য শ্রেণীর লোক এবং মুখে আবরণ ব্যবহার করে। আমরা একবার তাদের এক সর্দারের কবলে পড়েছিলাম। সে আমাদের কাফেলা আটক করে রাখে। পরে মুক্তিমূল্য স্বরূপ কয়েকটি বস্ত্রখণ্ড ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে আমরা রেহাই পাই। আমরা যখন এদের দেশে পৌঁছি তখন রমজান মাস চলছে। রমজান মাসে তারা কোনো কাফেলার উপর হামলা করে না। এ সময়ে পথে ঘাটে জিনিস পত্র ফেলে রাখলেও তাদের দস্যুরা অবধি সে সব জিনিষ স্পর্শ করে না। এ পথের ধারে সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যেই এ রীতিটি প্রচলিত। এক মাস আমরা হাগগারদের দেশের ভেতর দিয়ে চলেছি। অঞ্চলটি গাছপালাহীন প্রস্তরময় এবং রাস্তাঘাটও খারাপ। ঈদ-উল-ফেতরের দিনে আমরা যেখানে পৌঁছি সেখানকার লোকেরাও অসভ্য এবং তারাও মুখাবরণ ব্যবহার করে।

অতঃপর আমরা তাবাতের প্রসিদ্ধ গ্রাম বুদা পৌঁছি। এখানকার জমি বালুকাময় ও লবণাক্ত। এখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায় কিন্তু তা সুস্বাদু নয়। তবু স্থানীয় লোকেরা সিজিলমাসার খেজুরের চেয়েও এখানকার খেজুর বেশী পছন্দ করে। এখানে কোনো

রকম ফসল, মাখন বা জলপাইর তেল পাওয়া যায় না । পশ্চিম অঞ্চলের দেশ থেকে এসব জিনিস এখানে আমদানী হয়। খেজুর ও পঙ্গপাল এখানকার অধিবাসীদের খাদ্য। এখানে যথেষ্ট পঙ্গপাল দেখা যায়। খেজুরের মতই এরা পঙ্গপাল সংগ্রহ করে রাখে খাদ্য হিসাবে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। ঠাণ্ডায় পঙ্গপাল উড়ে পালাতে পারে না বলে তারা সূর্যোদয়ের আগে পঙ্গপাল ধরতে যায়।

বুদায় কয়েকদিন কাটিয়ে আরেকটি কাফেলার সঙ্গে জেলকদ মাসের মাঝামাঝি সিজিলমাসায় গিয়ে পৌঁছি। সেখান থেকে জেলহজ্জ মাসের ২রা তারিখে (২৯শে ডিসেম্বর) আমি অসহ্য শীতের মধ্যে তুষারাবৃত পথে রওয়ানা হই। জীবনে বুখারা, সমরকন্দ ও খোরাসানে অনেকবারই তুষারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথ দেখেছি, তুর্কীদের দেশেও সে সব দেখেছি কিন্তু উম্মে জুনায়বার পথের মত খারাপ পথ কোথাও দেখিনি। ঈদ-উল ফেতর পর্বের পূর্বক্ষণে আমি দার-আত-তামা এসে পৌঁছি। রমজানের পরে ভোজনোৎসবের দিনটি আমার সেখানেই কাটে। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আমি আমাদের খলিফার রাজধানী ফেজ এসে পৌঁছি। এখানে আমির-উল-মোমেনি রে দস্ত মুবারক চুম্বনের ও তাঁকে দর্শনের সুযোগ ও সৌভাগ্যলাভ করি। আল্লাহ তার শক্তি বৃদ্ধি করুণ এই আমার কামনা। দীর্ঘ সফরের পর আমি তার স্নেহচ্ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তিনি আমার প্রতি যে অপরিসীম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন সেজন্য পরম করুনাময় আল্লাহ্ তার মঙ্গল করুন এবং তাকে দীর্ঘজীবি করুন যাতে তিনি মুসলমানদের কল্যাণ করে যেতে পারেন।

এখানেই A Donation to those interested in the curiosities of the Cities and Marvels of the Ways শীর্ষক সফরনামা শেষ হয়েছে। এ সফরনামার শ্রুতলিখন সমাধা হয় ৭৫৬ হিজরীর ৩রা জেলহজ্জ (৯ই ডিসেম্বর ১৩৫৫)। আমি আল্লার প্রশংসা ঘোষণা করছি এবং তাঁর প্রিয় যাঁরা তাঁদের শান্তি কামনা করছি।

ইবনে জুযাই বলছেন, "শেখ আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে বতুতার বর্ণিত ও আমার দ্বারা সংক্ষেপিত বর্ণনা এখানেই শেষ হল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই স্বীকার করবেন যে শেখ ইবনে বতুতা তাঁর যুগের একমাত্র সফরকারী। কেউ যদি বলেন যে তিনি ছিলেন মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সফরকারী তবে তিনি অতিশয়োক্তি করলেন বলা যায় না।"

সমাপ্ত

টীকা--------

অনূবাদ ঃ **কবি মহীউদ্দীন**

পরিচ্ছেদ ১

১। সৌর বৎসরের হিসাবে একুশ বছর চার মাস।

২। জিয়ানিদ বংশের প্রথম আবু তাশিফিনের রাজত্বকাল ১৩১৮হতে ১৩৪৮সাল অবধি। এ সময়ে তাঁর রাজ্য আলজিয়ার্স অবধি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তিউনিসের সুলতানের বিরুদ্ধে ১৩২৫ খ্রীষ্টব্দে আবু তাশিফিন এক সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন।

৩। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হতো। এসবের একটি ছিল, কোরাণের বিশেষ কোন আয়াত পাঠ করে স্বপ্নদেশের অপেক্ষা করা। আরেকটি প্রথা, কোরাণের কিছুটা অংশ পাঠ করে তার ভেতর থেকে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। ইবনে বতুতা প্রায়ই এ প্রথা অবলম্বন করতেন।

৪। আলজিয়ার্সের পশ্চাতে অবস্থিত উর্বরা সমতলভূমি।

৫। তখনকার দিনে ইফ্রিকিয়া(তিউনিস) রাজ্যের সীমান্ত জেলা।

৬। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কোন একজন বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে শাস্তি দিবার জন্য মিশরের ফাতেমী বংশীয় খলিফা যাযাবর আরবদের প্রেরণ করেন। সে সময় আরব সৈন্যের দ্বারা তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ার পূর্বাঞ্চল বিধ্বস্ত হয়। সে আক্রমণের মুখে শুধু প্রাচীর বেষ্টিত নগরগুলির জান ও মাল রক্ষা পায়।

৭।ষোড়শ শতাব্দীতে হাফসি বংশের আমলে তিউনিসিয়া ছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল এবং বহু মুর পরিবার স্পেন থেকে সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল।

৮। রমজান মাসের রোজার পরে যে উৎসব বা পর্ব উদযাপিত হয় প্রাচ্য দেশে তাকে ঈদ-উল-ফিতর বা বাইরাম বলে। ৭২৫ খ্রীস্টাব্দে এ পর্ব উদযাপিত হয় ৯ই সেপ্টেম্বর। এই পর্বদিনের নামাজ আদায় করা হয় প্রাচীরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে। সে স্থানকে বলা হয় 'মুসাল্লা'। এ সময় নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে।

৯। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার তখন প্রসিদ্ধ পবিত্রস্থান ছিল কায়রাওয়ান। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য এ দলটি সেখানে যেতে পারেনি।

১০। আলেকজেন্দ্রিয়ার চারটি প্রবেশপথের নাম (পশ্চিম দ্বার, সমুদ্রদ্বার, রসেটা দ্বার ও সবুজ দ্বার) সাম্প্রতিক কাল অবধি শহরের রাস্তার নাম হিসাবে বজায় ছিল। সম্ভবতঃ প্রাচ্যের একমাত্র শহর আলেকজেন্দ্রিয়া যেখানে ইবনে বতুতার সম্মানার্থে তার নামে একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছিল।

১১। ফারোস ও শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন মাইল নির্ধারণ করে ইবনে বতুতা অতিশয়োক্তি করেছেন, যদিও ইদ্রিসি বলেছেন স্থল পথে আলোকগৃহ তিন মাইল এবং সমুদ্রপথে এক মাইল দূরে অবস্থিত। আল-ফাল-কাশান্দি নামক পরবর্তী একজন লেখক এ দূরত্ব এক মাইল বলে বর্ণনা করেছেন।

১২।'পমপিস পিলার' লাল পাথরের একটি স্তম্ভ। রোমানদের সময় প্রাচীন মন্দিরের জায়গায় এটি স্থাপিত হয়েছিল।

১৩। পীর দরবেশদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় পীর ভাই।

১৪। শেখের প্রতি সৌজন্য প্রকাশের জন্য বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫। এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ। এর থেকে ইটালিয়ান ক্যাভিয়ার (bottargo) পাওয়া যায়।

১৬। ইব্‌নে বতুতা এখানে ভুল করেছেন। ১২৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট্ লুইর ক্রুসেড্ অভিযানের পর ইজিপসিয়ান গবর্ণমেন্ট এ শহরটি ধ্বংস করেন ফ্রাঙ্কস্‌দের পুনরাধিকার অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য।

১৭। মূলগ্রন্থের অলংকারপূর্ণ বর্ণনা হচ্ছে রচনার প্রাঞ্জল পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত (এখানে সেটা যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত)। এ রচনা সুষম এবং ছন্দো বদ্ধ বাক্যে গঠিত হয়েছে। গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে এ রকম রচনা পরিদৃশ্যমান। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি এবং বিস্ময়ের ভাব জ্ঞাপন করা। কিন্তু এ সব কেবল বাগাড়ম্বর নয়। ইটালিয়ান ফ্রেস্কোবাল্‌ডি এই শেষ উক্তিটির সত্যতা প্রমাণ করেছেন। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো ভ্রমণ কালে তিনি মন্তব্য করেন যে বাসঘরের অভাবে রাত্রিকালে হাজার হাজার লোক নগরের বাইরে শুইত। ১৩৪৮ এবং ১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দের দুটি মহামারীর ধ্বংসলীলাও এর অন্যতম কারণ।

১৮। আর-রাওদা,এখন এটা রোডা দ্বীপ। রোডার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-সচরাচর উল্লেখিত হয়েছে। এবং আরব্য উপন্যাসেও এর উল্লেখ দেখা যায়।

১৯। এই জাঁকজমকশালী হাসপাতালটির কেবল সম্মুখের দৃশ্য, প্রবেশ কক্ষ (মিনারসহ) এবং কতকগুলি খণ্ডাংশ অবশিষ্ট রয়েছে। এটা নির্মিত হয়েছিল ১২৭৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কালাউন কর্তৃক। সুলতানের সমাধি-স্তম্ভ মধ্যযুগের সারাসিন স্থপতিশিল্প এবং অলংকারের অন্যতম উৎকৃষ্ট মনুমেন্ট্, বর্তমানে অংশতঃ সংস্কার করা হয়েছে। রাস্তার কিছুটা অংশে এখনো পুরানো নাম "দুই প্রসাদের মাঝখানে" বজায় রয়েছে। সম্ভবতঃ এ নামটি এসেছে দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে নির্মিত ফাতেমি প্রাসাদরাজী থেকে।

২০। প্রধান কারাফা অবস্থিত রয়েছে আধুনিক কায়রোর দক্ষিণে—পুরাতন কায়রো এবং মিউকাটাম পাহাড় শ্রেণীর মাঝখানে। পরিসর এবং পরিদৃষ্টির দিক দিয়ে এটা দেখতে শহরের অনুরূপ—এটা হয়ে উঠেছে এখানে উল্লেখিত কবরের উপর নির্মিত অট্টালিকা, কক্ষ, এবং গৃহরাজীর অদ্ভুত রকমের মিশরীয় প্রথা বশতঃ।

২১। ১৪ই শাবানের (হিজরী বছরের অষ্টম সাল) পরের রাতে সমস্ত মসজিদে বিশেষ উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর ঐতিহ্যগত কারণ হচ্ছে এই যে "বেহেশ্‌তে যে লট্ বৃক্ষ বা ভাগ্য-বিটপী রয়েছে এবং যার পাতায় লেখা সমস্ত জীবিত ব্যক্তির নাম সে রাতে সে বৃক্ষের পাতাগুলি কেঁপে উঠে এবং পরবর্তী বছরে যে পাতায় যে ব্যক্তির পূর্ব নির্দিষ্ট মৃত্যু লেখা রয়েছে সেটা ম্লান হয়ে ঝড়ে পড়ে মাটিতে।" (মিচেল কপ্‌টিক্ বছর ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের জন্য মিশরীয় ক্যালেণ্ডার ১৯০০-১৯০১ খৃষ্ট-পরাব্দ)।

২২। আল্-হোসাইন খলিফা আলীর কনিষ্ঠ পুত্র এবং পয়গম্বরের দৌহিত্র। হোসাইন তাঁর অধিকাংশ পরিজন পরিবারসহ নিহত হয়েছিলেন ইরাকের অন্তগর্ত কারবালায়। এ ঘটনা ঘটেছিল ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে যখন দামেস্কের উম্মিয়া বংশের খলিফার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন। এ ভাবে পয়গম্বরের দৌহিত্রের মৃত্যুর উম্মিয়া বংশের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপন্ন করেছিল এবং অদ্যাবধি সুন্নী এবং শিয়া সম্প্রদায় উভয়ে ১০ মহরম তারিখে সেই মৃত্যুর বাৎসরিক অনুষ্টান উদ্‌যাপন করেন। সৈয়দানা হোসেনের মস্‌জিদ(সুলতান হাসানের অধিকতর

প্রসিদ্ধ কলেজ মসৃজিদ থেকে এটা ভিন্ন। কলেজ মসজিদ তখনও তৈরি হয়নি) একটি চিত্তাকর্ষক সৌধ। এটা নগরের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত।

২৩। "সুদানিজ নাইল" অর্থাৎ নাইজারের বিপরীত রূপে এরূপ বলা হয়।

২৪। এ বিভাগ অন্য আরব ভূগোলজ্ঞদের মধ্যে দেখা যায়। তৃতীয় শাখাটি খুব সম্ভব হয় আইবিয়ার (থারমুটিয়াক) শাখা যা লেক বারলাস্ এবং বাইরে সেবেনিটিকের মোহনার ভিতর দিয়ে—কিম্বা লেক সেনজালে প্রবাহিত টানাইটিক শাখা।

২৫। এ নাম দেওয়া হয়েছিল পুরাকালীন মিশরীয় মন্দিরগুলিকে। পিরামিডের ন্যায় এদের চারদিক ঘিরে রচিত হয়েছিল বহু কাল্পনিক কাহিনী। সাধারণের মতে এদের নির্মাতা বলে 'প্রাচীন' হাসিসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একে যুক্ত করা হয়েছিল এনকের সঙ্গে। পিরামিড ব্যতীত মিশরে ইব্‌নে বতুতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মনে হয় অন্য একটি পুরনো কীর্তি। সেটা আইখমিমের মন্দির।

২৬। এটা উল্লেখযোগ্য যে আমাদের পর্যটক লাক্সরের মন্দিরগুলি সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি যদিও আবুল হাজ্জাজের সমাধি (একজন প্রসিদ্ধ আওলিয়া, এখানে এন্তেকাল করেন ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দে) প্রকৃতপক্ষে অবস্থিত আম্মানের মন্দিরের শরহদ্দের মধ্যে।

২৭। বারো, তেরো, এবং চৌদ্দ শতাব্দীতে আইধাব্ ছিল ইয়েমেন এবং ভারতীয় বানিজ্যের শেষ বন্দর, এবং স্থানটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে মিশরীয় সুলতান কর্তৃক ধ্বংস হলে ওর স্থান দখল করে প্রতিদ্বন্দ্বী বন্দর সুয়াকিন্। এর ধ্বংসাবশেষ সনাক্ত করা হয়েছে লোহিত সাগর উপকূলের একটি পানিশূন্য সমতল টিবিতে। এটা হ্যলেব থেকে ১২ মাইল উত্তরে ২২.২০ উত্তরে, ৩৬.৩২পূর্বে। (জিওগ্রাফিকাল জার্ণাল ৬৮ (১৯২৬) এ সি, ডব্লিও' সুরে দেখিয়েছেন ২৩৫-৪০, পৃষ্ঠায় যেখানে দ্রাঘিমা দেওয়া হয়েছে ৩৬"৯"৩২"। কিন্তু ম্যাপের সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই)।

২৮। হুড্রুবিজগন আরব ছিলেন, বেজ্জাজ নন।

২৯। একটি পান্থনিবাস (ফানডাক্, খান কিম্বা কারাওয়ানসারি) সাধারণতঃ একটি চৌকোণ প্রাচীর ঘেরা দালান, মাঝখানে প্রাঙ্গণ। মালপত্র এবং পশুগণের স্থান দেওয়া হয় নীচের তলায় এবং মুসাফিরগণকে উপরের তলায়। উপরের তলার অভাবে সবাই থাকে একত্রে।

৩০। এখন সিনাই মিলিটারী রেলওয়ের একটি ষ্টেশন, উত্তর কান্টারা থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পূর্বে।

৩১। জ্বিন (জেনি) ফেরেশতার অধস্তন, কিছুটা মানুষের ন্যায় সৃষ্টি, তৈরি আগুন দিয়ে এবং এদের রয়েছে অলৌকিক ক্ষমতা। কোরাণ অনুসারে তারা সুলেমানের অধীন ছিল। "তিনি যা চাইতেন তাই ওরা সৃষ্টি করতো তাঁর জন্য—সুউচ্চ প্রাসাদ, প্রতিমূর্তি, পুকুরের মতো থালা, এবং বৃহৎ রান্নার পাতিল।"

গ্রন্থের পরবর্তী একস্থানে ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন যে জ্বিনদের সাহায্যে সুলেমান পার্মিরা পর্বত গড়েছিলেন। (তুলনা করুন বাইবেলের ১ কিংবা ৯,১৮)।

৩২। হেবরনের মসৃজিদ হচ্ছে ক্রুসেডারগণের একটি গির্জা। এটা নির্মিত হয়েছিল আরো অধিক পুরাতন ভিত্তির উপরে(সম্ভবতঃ রোমানদেরও পূর্বে) । এর কতকগুলি পাথরের উল্লেখ রয়েছে ইবনে বতুতার বর্ণনায়। গুহাটি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধর্মপতি এবং তাদের স্ত্রীগণের স্মৃতি স্তম্ভগুলি এখনো ছোট গির্জার প্রধান অংশের দুই ধারে অবস্থিত রয়েছে।

জোসেফের অনুমিত সমাধি বাইরের অন্য একটি ছোট গির্জাতে রক্ষিত আছে। পয়গম্বর লুতের সমাধি কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত।

৩৩। বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে হজরত মোহাম্মদের (ছঃ) রহস্যময় "নিশিথ ভ্রমণ" কিম্বা "উর্ধে আরোহণ" (মেয়ারাজ) সম্বন্ধে। এই আরোহণে তিনি আল্লার দিদার লাভ করেন। যদিও সে সময়ে তিনি বাস করছিলেন মক্কায়, তথাপি প্রবাদ অনুসারে তিনি প্রথমে গমন করেন দূরতম জেরুজালেমের মসজিদে(আল্ মসজিদ আল্-আক্সা) এবং সেখান থেকে আরোহণ করেন স্বর্গীয় ঘোটকী বোরবাখে।

৩৪। বর্তমান প্রাচীর শ্রেণী নির্মিত হয়েছিল অটোম্যান সুলতান সুলেমান "ঐশ্বর্যবান" কর্তৃক। (১৫২০-১৫৬৬)।

৩৫। "রাজকীয়" কিউবিটের মাপ হচ্ছে ২৬ ইঞ্চি।

৩৬। এই রেলিং নির্মাণ করেছিলেন ফ্রাঙ্কগণ ক্রুসেডারদের জেরুজালেম অধিকারের সময়।

৩৭। এই স্বর্গারোহণ মসজিদটি অলিভ পর্বতের পুরোভাগে অবস্থিত। সেটা জেহোশাফাত উপত্যাকার দূরতর অংশে, হিন্নম উপত্যকায় (জেহেনা) নয়।

৩৮। এখানে মনে হয় জেরুজালেম এবং বেথলাহেমের মধ্যে একটি গোলমাল ঘটে গেছে। বেথলাহেমের নেটিভিটি গির্জার গহ্বরে রয়েছে মেঙ্গার এবং জন্মস্থানের মন্দির।

৩৯। আজালুন, এখন কালাত আর-রাবাদ, ঘোরের পূর্ব শৈল শিবার একটি প্রদর্শনীয় দূর্গ ছিল (জর্ডান উপত্যাকায়), জেরাসের ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

৪০। ইব্নে বতুতা সিরিয়ার বিভিন্ন তিনটি পর্যটন জড়িয়ে ফেলেছেন।

৪১। জাহালার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এখানে নুহ পয়গম্বরের সমাদি আছে বলে পূর্বে খ্যাত ছিল। চৌদ্দ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত এ স্থানে বাকার (কয়েলি-সিরিয়া) তলদেশ ঢাকা ছিল একটি হ্রদে বা জলাভূমিতে । একটা প্রবাদ ছিল যে হজরত নুহের কিস্তি জাহালার বিপরীত দিকে দক্ষিণ পূর্বে আন্জারে এসে থেমেছিল।

৪২। ত্রিপলি পূর্ণ উদ্ধার করছিলেন সুলতান কালাউন ১২৮৯ খ্রীস্টাব্দে।

৪৩। অনুরূপ গল্প প্রচলিত ছিল দফতরদার মোহাম্মদ সম্বন্ধে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে কর্দোফানে তুর্কি-মিশরীয় অভিযান কালে। একজন সৈনিকের বিরুদ্ধে একটি স্ত্রীলোক অভিযোগ করেছিল। সেনাপতি এই শর্তে সৈনিকের পেট কেটেছিলেন যে তার পাকস্থলী থেকে যদি দুধ না বের হয় তাহলে স্ত্রীলোকটিকেও কাটা হবে। (জার্ণাল অব্ দি আফ্রিকান সোসাইটি নম্বর ৯৮,জানুয়ারী ১৯২৬, ১৭০ পৃষ্ঠা)।

৪৪। "দশ" ছিলেন হজরত মোহাম্মদের (ছঃ) বিশিষ্ট সহচর বর্গের সদস্য এবং ধর্মপরায়ণ মুসলিমদের বিশেষ ভক্তিভাজন। অন্যদিকে শিয়াগণ এদের দেখতেন যেমন ক্রিশ্চানগণ দেখে থাকেন জুডা ইস্কারিয়টকে। এদের বিশেষ বিদ্বেষ হচ্ছে হজরত ওমরের প্রতি। কেন না তিনি প্রথম এবং নিজেকে দ্বিতীয় খলিফা মনোনয়নের ব্যাপারে দায়ী ছিলেন। হজরত ওমরকে তারা আরো দোষী করেন যে তিনি হজরত আলীকে পয়গম্বরের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন(সমস্ত ঐতিহাসিক যুক্তির বিরুদ্ধে তারা এই উত্তরাধিকার ঘোষণা করে থাকেন)।

৪৫। মূলগ্রন্থের কতকগুলি পৃষ্ঠা ব্যাপি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে আলেপ্পোর বিষয়—প্রধানতঃ ইবনে জুবিয়ার থেকে গদ্যাংশের উধৃতি রয়েছে এতে—এবং প্রসিদ্ধ কবিগণ কর্তৃক রচিত নগরের প্রশংসামূলক কবিতা থেকে সংক্ষিপ্ত সারাংশ।

৪৬। টিজিন অবস্থিত রয়েছে আলেপ্পোর ২৮ মাইল পশ্চিমে।

৪৭। ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউলের মার্কো পলোতে নগরের ধ্বংস বিবরণ সম্বলিত বুমাণ্ডের কাছে লিখিত তার পত্র দেখুন। (মার্কোপলো, ৩য় সংস্করণ কডিয়ার সম্পাদিত) ১, ২৪ টীকা।

৪৮। পেগ্রের দুর্গ। ক্রুসেডারগণ এটাকে বলতেন গ্যাষ্টন কিম্বা গ্যাষ্টিন। আলেকজান্ড্রেটা এবং এন্টিরকের মধ্যস্থিত বেলেন গিরিপথের ভেতর দিয়ে যে প্রবেশ পথ, সেটাকে এখানে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সালাউদ্দীন এটা পুনরাধিকার করেছিলেন।

৪৯। ইউরোপে ঘাতক বলে সুপরিচিত। তারা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের ফাতেমি শাখার একটি উপ-শাখা সম্প্রদায়। এর প্রতিষ্ঠা একাদশ শতাব্দীতে।

৫০। প্রসিদ্ধ আওলিয়া ইব্রাহিম্ ইব্‌নে আদ্‌হামের জন্ম বাল্‌খে। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিক্‌দের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযানের কালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে কথিত। তাঁর জীবন সম্বন্ধে খুব অল্প বিবরণই পাওয়া যায়। কেবল এ টুকুই জানা যায় যে সিরিয়া ছিল তার ধর্মীয় কাজের প্রধান কেন্দ্র। অতঃপর সূফি কাহিনীর বিভিন্ন কালচক্রে তিনি হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আদর্শ—স্পষ্টতঃ এ সব কাহিনী নেওয়া হয়েছে বুদ্ধের প্রাচীন উপাখ্যান থেকে।

৫১। পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের জামাতা এবং চাচাতো ভাই, এবং শিয়াদের মতবাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

৫২। এখানে ইব্‌নে জুবের থেকে একটি সুদীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ গদ্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এ সব অংশে যে আলংকারিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে পাঠকগণ যাতে তা উপভোগ করতে পারেন সেজন্য প্রথম কতকগুলি বাক্যের এরূপ আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া যেতে পারেঃ 'দামাশ্‌কাস্ হচ্ছে প্রাচ্যের বেহেশ্‌ত; এবং তার উজ্জ্বল আলোকের উদয়-স্থান; ইস্‌লাম জগতের শিল্‌মোহর, আমরা উপভোগ করেছি এর আতিথ্য—আর এ হচ্ছে সমস্ত নগরীর দুল্‌হিন, আমরা তার ঘোমটা উন্মোচন করেছি। সে সজ্জিত হয়েছে সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত উদ্ভিদের পুস্পরাশি দিয়ে—এবং দাঁড়িয়েছে সুশোভিত বাগিচার মাঝখানে, মনোহর স্থানের মধ্যে সে জুড়ে রয়েছে একটি সুউচ্চ স্থান এবং অতি অপূর্ব সাজে সজ্জিতা রয়েছে তার নব-বধুর আসনে।" সম্পাদক কর্তৃক ইব্‌নে বতুতার বিবরণ শুরু হওয়ার পূর্বে অন্যান্য অনেকগুলি উদ্ধৃতির অবতারণা করা হয়েছে।

৫৩। এটা একটা সাধারণ প্রবাদ। এর উদ্দেশ্য এই দেখানো যে আরবদের দ্বারা দামাস্‌কাস্ জয় করার সত্তর বছর অতিবাহিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সেন্ট্ জন্ গির্জা একটি মস্‌জিদে পরিণত হয়নি। গির্জাটি ধ্বংস করা হয়নি, কেবল এর ক্রিশ্চান সাজসজ্জা বদল করে তাকে একটি মস্‌জিদের যোগ্য করা হয়েছিল। ইব্‌নে বতুতা মস্‌জিদটির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে যান সেটা তিনি দিয়েছেন তার সময়ে যে রূপ দেখেছিলেন সেইরূপে। এ মস্‌জিদটি তৈমুরলংয়ের দামাস্ কাস্ দখলের সময় আগুনে নষ্ট হয়ে যায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দে। তারপর একাধিকবারের বেশী পুণঃ নির্মিত হয়েছে। বর্তমান নির্মাণ কার্যটি মাত্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের —এবং তিনটি সুন্দর মিনার ব্যতীত এর পূর্বের সৌন্দর্যের খুব স্বল্প নিদর্শনই অবশিষ্ট রয়েছে।

৫৪। উম্মিয়া বংশের খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। এ বংশের খলিফাগণ ৬৬০ থেকে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আব্বাসিয়া বংশ কর্তৃক পরাজিত হয়। এরা রাজধানী স্থাপন করেন বাগবাদে। তাম্রকরদের বাজার এখনো একই অবস্থায় রয়েছে—কিন্তু বর্তমানে এটা দামাস্কাসের অন্যতম সুন্দর শিল্প কোনক্রমেই নয়।

৫৫। মূলতঃ এটা ছিল একটি যান্ত্রিক জল-ঘড়ি। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে জুবের যখন দামাসকাসে আসেন তখনো এটা কার্যকারী ছিল (লা ষ্ট্রেঞ্জের মুসলিম অধীনে প্যালেষ্টাইন, ২৫০ পৃষ্ঠা দেখুন)। কিন্তু তারপর সেটা বেমেরামত পড়ে থাকে। সুরঙ্গ পথগুলি যদিও অনেক দিন হলো অদৃশ্য, তবু উৎসারিত নির্ঝর (বাইজান্টাইন যুগের একটি নিদর্শন) এখনও বর্তমান রয়েছে।

৫৬। যেমন এটা গোঁড়া ধার্মিকদের মতের বিপরীত যে মানুষের কোনো কার্য কিংবা গুণের সঙ্গে আল্লার কোনো কাজের কিম্বা গুণের তুলনা হয় না। চারটি রক্ষণশীল গোঁড়া মতাবলম্বীদের মধ্যে হাম্বলি মত (উপক্রমণিকা, ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অন্য মতগুলির যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা সমর্থন করে না।

৫৭। রেশমের পোশাক পরা মুসলিম শরীয়তের বিরোধী।

৫৮। ইব্‌নে তেমিয়া সম্বন্ধে। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। ভূমিকা দ্রষ্টব্য। যথেষ্ট ভক্তির সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করা হয়। কেননা তিনি ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের অগ্রদূত এবং ইস্‌লামের অন্য সব আধুনিক সংস্কার আন্দোলনের সমর্থক।

৫৯। মুসলিমদের রোজা সূর্যোদয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ উপবাস—এমন কি পানি গ্রহণও নিষিদ্ধ।

৬০। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবতঃ দামাসকাসের ডাক নাম হচ্ছে আল-মাতবাক' অর্থাৎ রান্না ঘর।

৬১। তার স্ত্রী অথবা অন্যতম স্ত্রীকে পিছে ফেলে রেখে—যার সম্বন্ধে নিচে উল্লেখ করেছেন এই স্ত্রীর গর্ভে তার একটি ছেলে হয়েছিল, কিন্তু সে শিশুকালেই মারা যায়।

৬২। আকাবাত আস্‌-সোয়ান, এখন আকাবাত আল্‌-হিজাজিয়া, হিজাজ রেলওয়ের একটি ষ্টেশন। প্রফেসার অলোইজ মিউজিলের ম্যাপে এ স্থানটি ২৯.৫০ উত্তরে, ৩৫.৪৮ পূর্বে অবস্থিত।

ধাত্‌-আল্‌-হজ্জ, একটি ষ্টেশন ২৯.০৫ উত্তরে ৩৬.০৮ পূর্বে অবস্থিত।

মিউজিল কর্তৃক বাল্‌দাকে (উত্তর হেজাজ, ৩২৯পৃঃ) যুক্ত করা হয়েছে আল্‌-বাজ্‌ওয়া উপত্যাকার সঙ্গে—এটা ধাত্‌ আল-হজ্জ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং আল্‌-হাজম ষ্টেশনের সন্নিকট ২৮.৪১ উত্তরে, ৩৬.১৪ পূর্বে অবস্থিত।

৬৩। আল্‌-ওখেদিরের বিরাম স্থান (আল্‌-আখ্‌জার) উঁচু ঢালু বেষ্টিত গভীর উপত্যকায় অবস্থিত—স্থানে স্থানে লাভার দ্বারা ঢাকা। ইবনে বতুতা একে সঙ্গতভাবেই নরক উপত্যাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন (মিউজিল,৩২৯)।' আল্‌-আখজার নামটি (ছোট সবুজ স্থান) স্পষ্টতঃ একটি ব্যঙ্গোক্তি — এটা ২৮.০৮ উত্তরে ৩৭.০১ পূর্বে অবস্থিত।

৬৪। অধার্মিক সামুদ জাতির কথা বার বার কোরাণে উল্লেখিত হয়েছে —অবাধ্যতার জন্য এদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। এটা সম্ভবতঃ উত্থাপিত হয়েছিল এ সব কবরের অস্তিত্ব থেকে যে গুলি ছিল সে সব প্রথম যুগের দক্ষিণ-আরবীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যারা ইয়েমেন এবং সিরিয়ার

বাজারের মাঝখানের ধারে বাসস্থান স্থাপন করেছিল—পরে পুরাতন উত্তর আরবীয় সামুদ জাতির সঙ্গে এদের জড়িত করা হয়েছিল।

৬৫। আল্‌হিজর (মাদাইন্‌ সালি) থেকে আল্‌-ইলার দুরত্ব প্রায় ১৮ ইংরেজি মাইল। আল্‌-হিজর ২৬.৪৯উত্তরে, ৩৭.৫৬ পূর্বে, আল্‌-ইলা ২৬.৩৬ উত্তরে, ৩৮.০৪ পূর্বে অবস্থিত।

৬৬। ৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বদর যুদ্ধ পৌত্তলিক মক্কাবাসিগণ পরাজিত হন স্বল্পসংখ্যক আরব সৈন্যের কাছে। এটাই নব-প্রবর্তিত মুসলিম ধর্মের প্রথম কৃতকার্যতা। এবং মোহাম্মদের (দঃ) কর্মজীবনের অন্যতম সন্ধিকাল।

৬৭। আরবীয় ভৌগলিক হামদানীর মতানুসারে (১৮৪-৫) জুফার ষ্টেশন ছিল রাওহা থেকে ১০৩ আরবী মাইল দূরে—মদিনা থেকে এটা ছিল দ্বিতীয় ষ্টেশন এবং নগর থেকে ৪৭ মাইল দূরে। আরবীয় পরিমাপ ১৯২১ মিটার, ইংরেজি মাইলে ১৬০৯।

খুলেজ হচ্ছে আরবীয় ভৌগলিক ইয়াকুতের বর্ণনা অনুসারে মক্কা এবং মদিনার মাঝখানে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত স্থান—মনে হয় পুরানো ষ্টেশন কুদেদের স্থান দখল করেছে। স্থানটি জুফা থেকে ২৪ মাইল। এবং উস্‌ফান পরবর্তী ষ্টেশন থেকে ২৩ মাইল।

উস্‌ফান এবং মার্‌ (কিম্বা মার্‌ আজ্‌-জুহ্‌রান) এখনও রয়েছে। পরবর্তীটি উস্‌ফান থেকে ২৩ মাইল এবং মক্কা থেকে ১৩ মাইল।

৬৮। মক্কা এবং তীর্থযাত্রার যে বিবরণ মুলগ্রন্থে রয়েছে তা ইবনে জুবেরের থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত—এবং বার্টন কর্তৃক তাঁর মক্কা এবং মদিনার তীর্থযাত্রার ব্যক্তিগত বিবরণে টীকাসহ পুরা ব্যাখা করা হয়েছে। এর উপরে, তীর্থযাত্রার বিবরণ সম্বন্ধে এত বেশী ইংরেজী রচনা রয়েছে যে তার এখানে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

পরিচ্ছেদ ২

১। বাগ্‌দাদ এবং নজফ্‌ থেকে যে পথ মদিনায় গিয়েছে সেটা খলিফা হারুন-উর-রশিদের বেগমের নামানুসারে দারব্‌ যোবেদা বলে পরিচিত। তিনি এ পথের সব জায়গায় পানির চৌব্বাচ্চা নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে সে সব রক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে পথে বিগত বারো শ বছরের কচিৎ কোন পরিবর্তন ঘটেছে। হামদানীর বর্ণনানুসারে মদিনা থেকে ফয়েদ পর্যন্ত যে সব ষ্টেশন ছিল তা হচ্ছেঃ তারাফ (২৪ আরবীয় মাইল) বতন নাখল্‌ (২০ মাইল), উসেলা (২৮ মাইল), মাদিন্‌ আন-নাকিরা (২৬ মাইল), তুজ্‌ (২৫ মাইল), ফয়েদ্‌ (২৪ মাইল) ঃ মোট ১৯৬ আরবীয় মাইল কিম্বা ২৩৪ ইংলিশ মাইল। ইবনে বতুতা স্পষ্টরূপে মধ্যবর্তী দুরত্ব ভ্রমণ করে ছ' দিনে উসেলায় পৌছেন (আমি তার ওয়াদিল অরুস দেখতে পাচ্ছি না), তারপর মাদিন আন-নাকিরার পরিবর্তে অন্য পথ গ্রহণ করেন নাকিরার ভিতর দিয়ে; কারুরাতে এসে ধরেন প্রধান রাস্তা (মাদিনা আন্‌-নাকিরা এবং আল্‌-হাজিরের মাঝখানে, এবং পরবর্তীটি থেকে ১২ মাইল), এবং সেখান থেকে গতি পরিবর্তন না করে চল্‌তে থাকেন। ঝাঁঝরা পাহাড়—আল্‌-মাখ্‌রুকা দেখানো হয়েছে মিউজিলের ১.১,০০০,০০০ ম্যাপে ফয়েদের ২৭ ইংলিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ২৬.৫০ উত্তরে, ৪১.৩৬ পূর্বে, এবং ফয়েদ ২৭.০৮ উত্তরে ৪১.৫৩ পূর্বে।

২। ইয়াকুত বলেন, খাদ্যদ্রব্য এবং ভারী মালপত্রের একটা অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে তাদের দেওয়া হয় যাদের জিম্মায় এ সব রাখা হয়।

৩। ফয়েদ এবং কুফার মাঝখানের মোট ২৭৭ আরবী মাইল কিম্বা ৩৩০ ইংরেজী মাইল ভ্রমণের বিভিন্ন স্তরের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। "শয়তানের গিরিপথ" সম্ভবতঃ মিউজিলের ম্যাপে চিহ্নিত "আস্‌সায়েব্‌" ৩০.১১ উত্তরে, ৪৩.৪২ পূর্বে অবস্থিত। ওয়াকিসাকে দেখানো হয়েছে ৩০.৩৮ উত্তরে, ৪৩.৫১ পূর্বে, লাওজা অবস্থিত ১৬ ইংলিশ মাইল উত্তরে, ওয়াকিসার পূর্বে অল্‌-মাসাজিড্‌ কিম্বা আল্‌-মসজিড্‌ হচ্ছে নাজাফের পশ্চিমে ৫৬ মাইল দক্ষিণে, মুনারাত আলকুরুন মনে হয় উম্মু করুন একটি মন্দির নাজফের ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কাদ্দাসিয়া নাজাফের ১৫ মাইল দক্ষিণে। যে যুদ্ধের কথা ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন সেটা ঘটেছিল ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, হজরত মোহম্মদের (দঃ) ইন্তেকালের পাঁচ বছর পরে। এর ফলে পার্শিয়ান বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং আরবগণ ইরাক অধিকার করেন।

৪। পয়গম্বরের জামাতা এবং চুতর্থ খলিফা, ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। কারবালায় হোসেনের সহ তাঁর কবর শিয়াগণের কাছে একপ্রকার অদ্ভুত ভক্তি পেয়ে থেকে। (১পরিচ্ছেদ,২২টীকা দ্রষ্টব্য)। ক্যাসারিয়া শব্দের অর্থ দেখুন নিচে ২৯ টীকায়।

৫। ২৭ শে রজবের পূর্বরাত্রি লাইলাতেল মিরাজ নামে পরিচিত, কিম্বা পয়গম্বরের স্বর্গারোহন রাত্রি। পরিচ্ছেদ ১, টীকা ৩০ দেখুন।

৬। আহ্‌মদ-আর রিফাই, মৃত্যু ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে, সমাহিত হন উম্‌উবেদায়, আবদুল কাদির আল্‌-জিলানীর ভ্রাতষ্পুত্র এবং রিফাইয়া সম্প্রদায়ের দরবেশদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, এরা কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপ-শাখা, বর্তমানে মিশরের একটি প্রধান সম্প্রদায়। যে সম্প্রদায়কে ইব্‌নে বতুতা আহ্‌মদী দরবেশ নাম দিয়েছেন, বর্তমানে সেটা শেখ্‌ আহ্‌মদ আল্‌-বাদ্‌ওয়াই প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়। ইনি ছিলেন উম্‌উবেদা আশ্রমের শিষ্য মিশরের টানটায়। তার মৃত্যু হয় ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

৭। বসরার সংকোচন সম্পূর্ণভাবে তার ক্ষয়প্রাপ্তির জন্য ঘটে না বরঞ্চ নগরের ক্রমশঃ পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার জন্য।

৮। নুক্রা হচ্ছে মিশরীয় রৌপ্যমুদ্রা, মূল্য প্রায় পাঁচ পেনি। পরিচ্ছেদ ১২, টীকা ১৮ দ্রষ্টব্য।

৯। ইব্‌নে বতুতার শ্রোতাগণ অবশ্য ওয়াকিবহাল আছেন যে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম কানুন শৃংখলাবদ্ধ করা হয় হজরত মোহাম্মদের ওফাতের দুই শতাব্দী পরে বসরাতে। নিচে যে 'অগ্রবর্তীর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সিবাওয়ে—প্রথম বৃহৎ নিয়মবদ্ধ আরবী ব্যাকরণের রচয়িতা।

১০। উবুল্লা বর্তমান বসরা টাউনের ভূমিখণ্ডে অবস্থিত—শাতিল আরবের পশ্চিমে একটি খালের উপরে অবস্থিত ছিল মধ্য যুগের বস্‌রা —এবং আধুনিক শহর জুবেয়ারের এক অথবা দু মাইল পূর্বে।

১১। এখন বন্দর মাসুর, খরমুসার তীরে। খরমুসা হচ্ছে ব-দ্বীপের পূর্বে একটি খাড়ি।

১২। ক্ষুদ্র হাজ্জারাসৃপিদ রাজত্ব লিউরিস্তান পর্বতমালার উপর বারো শতাব্দীতে এবং সমস্ত মংগল যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দুজেইল নদীর তীরে এদের রাজধানী আইধাজ এখন মালামির নামে পরিচিত। আতাবেস (রাজ-প্রতিনিধি) উপাধি ছিল সে সমস্ত ক্ষুদ্র রাজত্বের যারা বারো শতাব্দীতে সালজুক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

১৩। রোক্‌নাবাদের সৌন্দর্যকে অমরতা দান করেছিলেন শিরাজের প্রসিদ্ধ কবি হাফিজ।। তিনি ছিলেন আমাদের পর্যটকের তরুণ সমসাময়িক।

১৪। উলজেতু নামে সুপরিচিত (১৩০৫–১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন) পারস্যের মোগল ইল্‌খান বংশ ধারার অষ্টম ব্যক্তি (তাঁর সমসাময়িক চীনের মোগল সম্রাট কুবলাই খানের (১২৯৪-১৩০৭) পৌত্র উলজায়েতুর সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে নেওয়া ঠিক হবে না)। শৈশব কালে উল্‌জায়েতু ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

১৫। কারাবাগ অবস্থিত ছিল আরাস্‌ নদীর ওপারে তাবরিজের উত্তরে পার্বত্য জেলার মধ্যে (ক্লাভিজোর এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয়ম্যাপ)। গ্রীষ্মকালে উচ্চভূমিতে গমন করার যাযাবর অভ্যাস মংগল সুলতানগণ রক্ষা করে চলতেন।

১৬। ইবুনে বতুতা দেখা যাচ্ছে ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রত্যাবর্তন কালে শিরাজ ভ্রমণের সঙ্গে প্রথম ভ্রমণকে জড়িত করে ফেলেছেন। নিচের উক্তি সমূহ অনুসারে ইন্‌জু পরিবারের শেখ আবু ইসাক ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কাল পর্যন্ত শিরাজ অধিকার করেন নি—যখন তার আত্মীয় এবং পূর্ববর্তী শারাফ উদ্দীন শাহ মাহমুদ ইনজু মংগলদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৩৪৭-তে তিনি তাঁর ক্ষমতার উচ্চস্তরে ছিলেন—এবং ১৩৫৬ কিম্বা ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবার মুজাফাবিদগণ তাকে গ্রেফতার করেন এবং মেরে ফেলেন।

১৭। পারশ্যের সেসিফুনে সাসানিদ নরপতিগণের ইসলাম পূর্ব যুগের বিরাট প্রাসাদ—এর ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায় বোগদাদের কয়েক মাইল নিম্নে।

১৮। প্রসিদ্ধ গোলাপকুঞ্জের (গুলিস্তান) এবং অন্যান্য কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা —মৃত্যু ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯। জেডানকে বিবৃত করা হয়েছে একটি গ্রাম রূপে। আরাজান (এখন বিহ্‌বিহান) এবং দায়রাকের (এখন ফালাহিয়া) মাঝখানে অবস্থিত। পরবর্তী স্থান থেকে এক দিনের পথ এবং আরাজান থেকে তিন দিনের কম (শওয়ার্জের "ইরাণ" গ্রন্থ '৪' ৩৮৪)। হুয়েজা হচ্ছে আধুনিক হইজা, মুহামারা থেকে ৭০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

কুফা (নজফ থেকে কয়েক মাইল উত্তরে) ছিল বসরার সঙ্গে অন্যতম দুর্গ বেষ্টিত নগর, ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আরবগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাদের ইরাক বিজয়ের সময়। হযরত আলীর স্বল্পকালীন রাজত্ব কালে (টীকা ৪ দ্রষ্টব্য) এটা ছিল খলিফার বাসস্থান।

২০। এই উপাধির এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যার জন্য উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

২১। পরিচ্ছেদ ১, টীকা ২২ দেখুন।

২২। প্রকৃত পক্ষে এ সময়ে (১৯১৮ পর্যন্ত) বোগদাদ একটি প্রাদেশিক শহর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এর উচ্চ পদবী আহরিত হয়েছিল ৭৫৭-১২৫৮ পর্যন্ত খেলাফতের কেন্দ্র রূপে—অতঃপর এ নগর মংগলদের হাতে বিপুলভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

২৩। দামাস কাসের হাম্মামখানায় গোসলকারীগণ ছয় থেকে দশখানা তোয়ালে পর্যায়ক্রমে পেয়ে থাকে।

২৪। পারশ্যের মংগল কিম্বা তাতার ইল খানগণের বংশের শেষ ব্যক্তি।

২৫। দিলশাদ ছিলেন জুবানের (চুবান) পুত্র দিমাশক খাজার মেয়ে —একে আবু সাইদ মেরে ফেলেছিলেন।

২৬। মাহাল্লা হচ্ছে চলন্ত শিবির—এতে থাকতো রাজকীয় পার্শ্বরক্ষী এবং সৈন্য। এরা সুলতানের সঙ্গে অভিযানে যেতো।

২৭। তাব্রিজ—মার্কোপলো এবং অন্য সব পশ্চিমী লেখকদের তাওরিজ ছিল পারশ্যে মংগলদের রাজধানী। এ সময়ে এটা পশ্চিম এশিয়ার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে বোগদাদের স্থান দখল করেছিল— এবং এখানে আসতেন বহু সংখ্যক ইউরোপীয় সওদাগর।

২৮। ৮৩৬ এবং ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝখানে সামারা ছিল খলিফাদের অধিস্থান —এবং তাঁদের সময়ে শোভিত হয়েছিল বহু জমকালো এবং সাধারণের অট্টালিকা রাজী দিয়ে, সে সবের চিহ্ন এখনো রয়েছে। মাশুকের দূর্গ সম্ভবতঃ সেই এক নামের প্রাসাদের স্থান দখল করে আছে (আল্ মাশুক, অর্থ প্রিয়তম)—তৈরি করেছিলেন খলিফা মুতামিদ (৮৭০-৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ রাজত্বকাল)।

২৯। ক্যাসারিয়া শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, "একটি সাধারণ স্থান যেখানে বাজার বসে " কিম্বা 'একটি চৌকোণ অট্টালিকা যাতে কামরা রয়েছে, মালগুদাম রয়েছে, এবং পর্যটকদের জন্য ছোটো ছোটো দোকান রয়েছে।" নামটি দেওয়া হয়েছে ল্যাটিন কিম্বা গ্রীক থেকে এবং মূলতঃ সিরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার আরবগণ একে ব্যবহার করতেন, এর উৎপত্তি অজানা। এর উপর যে সব মত প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এটাই সম্ভব যে এর অর্থ হচ্ছে শাসক কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রদত্ত বাজারের দালান (মূলতঃ এসব দেশে সিজার কর্তৃক অনুমোদিত)। একটা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে এটাতে থাককে দেওয়া হয়—কিন্তু এর সমতুল্য কোনো শব্দ বাইজেন্টাইন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বর্তমানে এটা শহরের প্রধান বাজারের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। উত্তর আফ্রিকায় আমি শুনেছি এটা ব্যবহৃত হয় (টেলেমসেন) বিপণী শ্রেণী শোভিত রাস্তার ব্যাপারে। বাজারের গেটের জন্য ব্যবস্থা এখনো আগের মতো সাধারণ। (ডজি, এস, ভি; লা ষ্ট্রেঞ্জ, পূর্ব খেলাফতের দেশ, পৃঃ ৮৯)।

৩০। সিন্জার স্পষ্টতঃ ভুল স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। সম্ভবতঃ মেরিডিন থেকে মশুলের পথে এ স্থান ভ্রমণ করা হয়েছিল।

৩১। দারা হচ্ছে "রোমান সাম্রাজ্যের দূর্গ" পারশ্য সীমান্তের বিপরীতে একটি কেল্লা রূপে তৈরী করেছিলেন জাষ্টিনিয়ান।

৩২। বাগদাদের সালজুক শাসক মেরিডিন দূর্গ হস্তান্তর করেছিলেন দ্বিতীয় গাজীর নিকট ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে—ইনি ছিলেন ক্রুসেডারগণের বিরুদ্ধে অন্যতম দুঃসাহসী মুসলিম যোদ্ধা (লেনপুল)। এর বংশধরগণ মেরিডিনের অরতুকিড্স বলে পরিচিত—তৈমুরলঙের মৃত্যুর পর পর্যন্ত শহর এবং তার পরিপার্শ্বের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এর দ্বাদশ বংশধরগণ আল্-মালিক আস্-সলিহ্ ১৩১২ থেকে ১৩৬৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

৩৩। এ-অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আগে পিছে দৌড়ানো—এটা করা হয় হাজেরার স্মৃতি উপলক্ষে। হাজেরা তার পুত্র ইসমাইলের জন্য পানির তালাসে এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছুটাছুটি করেছিলেন। এটা সাধারণতঃ পায়ে হেঁটে পালন করা হলেও অনেক সময় গাধা কিম্বা উটের পিঠে সোয়ার হয়ে করা হয়। নজদের বর্তমান শাসক সুলতান আবদুল আজিজ আল্-সাউদ এটা সম্পন্ন করেন মোটর গাড়ীতে চড়ে।

১। রাস দাওয়াইর, এর অর্থ বলা হয় "ঘূর্ণীবাত্যার অন্তরীপ" (কিম্বা ঘূর্ণীস্রোত)—কিন্তু আমি কোনো গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখিনি। এটা সেই অগ্রভূমি ছাড়া আর কিছু নয় যাকে এখন বলা হয় রাস্ রইয়া (২০ উত্তরে)—এবং খুব সম্ভব এ নাম ভুল করে লেখা হয়েছে।

২। হালি সঠিক ভাবে 'হ্যালি (ব্যঞ্জন বর্ণের ওয়াই যুক্ত) ইয়াকুবের পুত্র। এটা ছিল সানা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে একটি বড় শহর প্রায় তিরিশ মাইল ভিতরে। কুনফুদার চল্লিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে একটি জেলার মধ্যে যেখানে বছরে তিন ফসল তোলার যোগ্য যথেষ্ট উর্বর ভূমি রয়েছে।

হালির বন্দর জেলার মধ্যে একটি আশ্রিত নোঙ্গর স্থান। এখন একে বলা হয় আসির—১৮.৩৬ উত্তরে ৪১.১৯ পূর্বে অবস্থিত। সে সময়ে হালি ছিল ইয়েমেনের সুলতানের অধীনে। (হামদানী ১৮৮, রেড্‌হাউজ রাজত্বের প্রথম খন্ড, ৩০৭; ভূমির খণ্ড, ১৬৯; আরাবিয়ার হ্যান্ড বুক ১৩৬, ১৪৪)।

৩। সারজা নামের একটি স্থান সান-মক্কা পথের একটি বিশ্রাম স্থান—হালির দশ ষ্টেশন পূর্বের (হামদানী ১৮৮), কিন্তু ইবনে বতুতার গন্তব্য বন্দর ছিল সারজা, লুহাইয়ের নিকটবর্তী একটি নোঙ্গর স্থান (ট্রাসিয়াল ওমানের সারজা থেকে পৃথক)। (কালকাশান্দি পঞ্চম খণ্ড, রেডহাউজ তৃতীয় খণ্ড)।

৪। জাবিদ ছিল সুলতানের শীতকালীন আবাস এবং তাইজ গ্রীষ্মকালের রাজধানী। সমুদ্র উপকূল থেকে জাবিদের দূরত্ব পনেরো আরবী মাইল, আরবী গ্রন্থকারগণ একে বলেছেন ঘালাফিকা—এর বন্দর ছিল আল-অহোয়াব (মুদ্রিত গ্রন্থের আল্ আবোয়াব নয়)। (কালকাশান্দি পঞ্চম খণ্ড, ৯-১০; রেড্ হাউস ৩য়, ১৪৯)।

৫। সাবুত আন্-নখল, আক্ষরিকভাবে "পাম ষ্টার-ডে" জাবিদের সামাজিক জীবনের একটি সুপরিচিত অনুষ্ঠান। রেড্‌হাউজের মতে "এটা ছিল স্থানীয় সাধারণের শনি-দেবতার উৎসব, সম্ভবতঃ এর উদ্ভব ইসলাম-পূর্বের জড়-উপাসকদের কাল থেকে।

৬। ইয়েমেন, আরাবিয়া ফেলিক্সের আরবী নাম-উঁচু মালভূমির উপরে অবস্থিত—দক্ষিণে এবং পশ্চিমে হঠাৎ উপকূল প্রান্তরে এসে নেমেছে। গ্রীষ্মকালের মৌশুমী বৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয় পর্বত মালায়, ফলে প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর। সর্বদা বিপুলভাবে সংস্কৃতি উপভোগ করেছে সমস্ত উপদ্বীপের অন্যদের চেয়ে বেশী। পুরাতন এবং বর্তমান রাজধানী সানা অভ্যন্তরভাগের পর্বতমালায় অবস্থিত। তাইজ অবস্থিত পাহাড়ের ধারের নিকট ৪,০০০ ফিট্ উপরে। রসুলিয়া রাজত্ব, যার পঞ্চম নরপতি ছিলেন আলী (১৩২১-৬৩ রাজত্ব কাল), নিজেদের মুক্ত করেছিলেন ১২৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশর থেকে-এবং পনেরো শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইয়েমেন শাসন করেছেন।

৭। মুসলিম শাসকগণের মধ্যে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যে তাঁরা বিদেশী দূত এবং গুণবান পর্যটকদের আহারের ব্যবস্থা করতেন কিম্বা তাঁদের খরচের পরিমাণ অর্থ দৈনিক দিতেন। সতেরো শতাব্দীতে চার্ডিন তার পারশ্য ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, "ইস্পাহানে শার নিজস্ব বাড়ীর সংখ্যা ছিল তিন শ'র উপরে। সেগুলি খুব বড় এবং সুন্দর এবং প্রায়ই খালি—যথেষ্ট সংস্কারের অভাবে ধ্বংসে নিপতিত। এগুলি বিদেশী দূত এবং সে সব বিশিষ্ট

লোককে দেওয়া হয় যারা ইস্পাহানে আসে।" এর বদলে কতকগুলি ধর্মীয় সংস্থানের মধ্যেও স্থান সঙ্কুলান করা হয়েছে।

৮। ইসলাম জগতে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে নরপতি একটি খোদাই কাঠের পর্দা ঘেরা স্থানে উপাসনা করতেন—একে বলা হত মাকসুরা কিম্বা ঘেরা স্থান। এ প্রথাটি গ্রহণ করা হয়েছিল নরপতির জীবনকে ঘাতকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য।

৯। আস্ সাওয়াহিল ('উপকূল ভূমি'), এটা আরবদের প্রদত্ত উপকূলের একটি অংশের নাম, এ অংশটি এখন কেনিয়া এবং টাঙ্গানিয়া অঞ্চলে নামে পরিচিত— সোয়াহিলি ভাষা থেকে এর উৎপত্তি। জানৃজ্ব শব্দটির উৎপত্তি অজ্ঞাত—মধ্যযুগে এটা ব্যবহৃত হতো পূর্ব আফ্রিকার নিগ্রোদের বুঝার জন্য—এখনো জাঞ্জিবার নামে এটা রক্ষিত রয়েছে।

১০। এটার অর্থ মনে হয় প্রধান ভূখণ্ড থেকে দ্বীপটিতে যেতে দু'দিনের পথ নয় (এর থেকে এটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে কেবল একটি সংকীর্ণ প্রণালী দ্বারা) বরং সোয়াহিল ভূমি দক্ষিণ দিকে শুরু করেছে দুদিনের পথ।

১১। পরিচ্ছেদ এগারোর ১৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। সাধারণ আয়ের এবং সাধারণ ব্যয়ের অন্তর্গত করার পরিবর্তে—যা প্রায়ই বার করা হতো।

১৩। ধোপারের পেছনে রয়েছে একটি উঁচু পাহাড় এতে এসে পড়ে গ্রীষ্মকালীন মৌশুমী বৃষ্টি—এবং তার ফলে স্থানটি ট্রপিক্যাল উদ্ভিদে আবৃত হয় । এর চারপাশের জনতা আরব নয়, সুদানি শ্রেণীর।

১৪। কুরিয়া-মুরিয়া শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ।

১৫। মুসলিম আইন অনুসারে মৃত্যুর পূর্বে জবেহ্ করা না হলে কোনো পশু খাদ্যের জন্য হালাল নয়।

১৬। মাসিরা দ্বীপ, পেরিপ্লাসের অজ্ঞাত লেখকের সারাপিস্ তখনকার দিনে এর কচ্ছপের জন্য প্রসিদ্ধ এবং তখনকার মতো এখনো "মাছ খেকো এক প্রকার দুর্ধর্ষ জাতির দ্বারা অধ্যুসিত। এদের ভাষা আরবী এবং এরা খেজুর পাতার কোমর-বন্দ ব্যবহার করে। (স্যর, এ, টি, ওইল্‌সন্, জিওজ, এফ, ৬৯,২৩৬-৩৭' স্কফের পেরিপ্লাস্ থেকে উধৃত)।

১৭। সুর এবং কালহাট স্থান দুটি ওমানের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত থাকার জন্য গুরুত্ব পেয়েছে। রাস-আল্-হাডের ঠিক উত্তরে আরবের প্রথম স্থান। ভারত থেকে আগত জাহাজ এখানে প্রথম ভিড়ে। কাল্‌হাট হচ্ছে মার্কোপলোর "কালাটু—এক সম্ভ্রান্ত নগর। বন্দরটি খুব বড় এবং ভাল, ভারতের মালবাহী বহু সংখ্যক জাহাজ এখানে আসে।" পতুর্গীজ যুগেও এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

১৮। খাস্ ওমান অভ্যন্তর ভাগে জেবেল আখ্‌দারের ঢালুতে অবস্থিত।

১৯। স্থানীয় ঐতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে নাজ্‌ওয়ায় শাসনকারী ওমানের আজ্‌দাইত ইমামগণের অনুক্রমে ১১৫৪ এবং ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছেদ পড়ে। এ সময়ে ধাহিরার অন্তর্গত মাক্‌নিয়াতের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠি বানু নাভানগণ দেশের প্রভু হয়ে বসেন। ইবুনে বতুতার বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে নাজ্‌ওয়ায় আজ্‌দাইত্ ইমামত্ বর্তমান ছিল কিম্বা

১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। (জি,পি, বেজার, ওমানের ইমাম এবং সিআইদ, ৩৭,৪১; ওয়েলষ্টেড় আরব ভ্রমণ ১ম খণ্ড, ২১৫)।

২০। ওরমুজের দ্বীপ, বন্দর আব্বাসের দক্ষিণ-পূর্বে। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে, পর্তুগীজগণ এ বন্দরটি দখল করেন এবং ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের অধিকারে থাকে—তারপর ইংরেজদের সাহায্যে পার্শিয়ানগণ এটা পুর্নদখল করেন।

২১। "এই ভীষণ সংক্রামক ঝঞ্ঝাকে তারা বাদ সামাউন্ বলে ঃ এর অর্থ হচ্ছে বিষাক্ত বাতাস। এই বাতাস প্রবাহিত হয় ১৫ই জুন এবং ১৫ই আগষ্টের মাঝামাঝি। এই সময়টা গালফের নিকটে অত্যন্ত উত্তপ্ত। এ রকম তুফান আকাশে হু হু করে চলে। আকাশ তখন লাল এবং অগ্নিজ্বালা হয়। এ ঝড় লোকজন মেরে ফেলে এবং তাদের উড়িয়ে নেয়। একটি বিশেষ রকমে মানুষকে আঘাত করে, যেন তাদের শ্বাস রুদ্ধ করে এবং এটা বিশেষভাবে দিনের বেলা ঘটে। এর অদ্ভুত ক্রিয়া ঠিক সাধারণ মৃত্যু নয়। যেটা অত্যন্ত বিস্ময়কর সেটা হচ্ছে এই যে, এর আক্রমণে দেহটা আল্গা হয়ে যায়—কিন্তু তাতে বাহ্যিক আকারের কিছু হানি হয় না। মনে হয় যেন লোকটি ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু যখনি এই ঝড়ে নিহত লোকটির শরীরের কোনো অংশ হাতে ধরবেন তখন সে অংশটা আপনার হাতেই থেকে যাবে।" (চার্ডিন, পারস্য ভ্রমণ (১৯২৭)-১৩৬)।

২২। এটা শোয়ার্জ কতৃর্ক গৃহীত হয়েছে (ইরান ঈম মিটেল্-আল্টার ৩,১৩৩) খাওয়ারিস্তান বলে। (অন্যভাবে সার্ভিস্তান বলা হয়)। স্থানটি সিরাজের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। যদি তাই-ই হয় তাহলে এখানে শহরটির স্থান নির্দেশ করা ইব্নে বতুতার ভ্রান্তিবশতঃ হয়েছে। এ ভুল ঘটেছে ভারত থেকে ১৩৪৭ সালে (১২পরিচ্ছেদের ৩ টীকা দ্রষ্টব্য) ফিরবার সময়ে যে পথ তিনি ধরেছিলেন সেটার ভ্রান্ত স্মৃতি থেকে। সে সময়ে তিনি নিশ্চয়ই খাওয়ারিস্তানের ভিতর দিয়ে সিরাজ গমন করেছিলেন। এটা খুব অসম্ভব ব্যাপার যে একজন আরব খাওয়ারিস্তানকে কাওরি স্তান নামে প্রদর্শন করবেন। অবশ্য স্থানীয় লোকেরা যদি এরূপ উচ্চারণ করে তবে আর কোনো কথা উঠে না।

২৩। বন্দর আব্বাশের ১২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে লার অবস্থিত।

২৪। "মেহ্মানদারী-উপহার"এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র। বিশেষ অতিথিদের এ সব উপহার দেওয়া হয়। (উপরের ৭ টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৫। খুনজুবাল সম্ভবতঃ দুই নাম। দ্বিতীয়টিকে ইয়াকুত উল্লেখ করেছেন ফাল্ বলে এবং বর্ণনা করেছেন একটি শহরের প্রান্তে অবস্থিত একটি বৃহৎ গ্রাম রূপে। সমুদ্র-উপকূলের নিকট ফারস্ প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। তিনি আরো বলেন যে এর অবস্থিতি হরমুজ্ এবং হুজুর মাঝখানের পথে (কিশ্ দ্বীপের বিপরীত দিকে প্রধান ভূভাগের একটি দূর্গ, এখন কালাত্ আল্-ওবাইদ্)। এ নামের প্রথম অংশ আমাদের ম্যাপে হুনজ্ বা হুনজু নামে পরিচিত, ২৭.০৪ উত্তরে, ৫৪.০২ পূর্বে। (শাওয়ার্ জ্, ইরান, ৩য় খণ্ড, ১৩২; ২য় খণ্ড, ৮০; Z.D.M.G.৬৮, ৫৩৩)।

২৬। ইবনে বতুতা এখানে বেশ কিছুটা ভুল করেছেন। সিরাফের পুরাকালীন বন্দর, একদা পার্শিয়ান উপসাগরের একটি বাণিজ্যস্থান, বর্তমান তাহিরির নিকটে অবস্থিত ছিল। কেজ্ কিংবা কিশ্ হচ্ছে একটি দ্বীপ। এটা প্রায় সত্তর মাইল দূরে। বারো শতাব্দীতে এর স্থান দখল করেছিল সিরাফ এবং তেরো শতাব্দীতে এর স্থান নিয়েছিল হরমুজ। আবার সতেরো শতাব্দীতে এর স্থানে বসেছিল বন্দর আব্বাস।

২৭। অধিকতর সঠিক চার্ডিন বলছে ঃ "মুক্তা আহরণকারী ডুবুরিগণ অনেক সময় এক-চতুর্থ ঘণ্টার অর্ধেক সময় কাল পানির তলায় থাকে।"

২৮। পূর্ব আরাবিয়ার ভূর্গভস্থ পানির ধারা বাহারিণের সমুদ্রে পতিত হয়। তুর্কী অধিকারের সময় জাহাজীগণ সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে চামড়ার ব্যাগে করে স্বচ্ছ পানি আনতো কাপ্তানের ব্যবহারের জন্য—পর্তুগীজগণ এভাবেই পাম‌প্‌ যোগে ব্যবহার্য পানি নিজেদের জন্য সরবরাহ করতো। একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, একবার একটি উট আল-হাসাতে একটি উৎসের মধ্যে পরে যায় এবং সেটাকে পরে পাওয়া গিয়েছিল বাহারিণের নিকট সমুদ্রে।

২৯। আল্‌-হাসা বা হাজার মরুদ্যানের পূর্ণ বিবরণ (প্রথমটির মানে নুড়ি এবং দ্বিতীয়টির মানে পাথর) পাওয়া যাবে জিওগ্রাফিকেল জার্ণাল ৬৩(১৯২৪),১৮৯-২০৭ পৃষ্ঠায়। এর প্রধান শহর এখন হোফুফ নামে অভিহিত। এ প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় সেখানে এখনো ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু শিয়া সম্প্রদায়। এদের অধিকাংশ বাহরিণার বংশভূত (বাহারাইণ্‌ শিয়া)। এরা অনেক কাল আগে এই মরুদ্যানে বসবাস শুরু করেন।"

৩০। নাজ্‌দের পূর্ববর্তী প্রধান শহর, বালুকাস্তরে চাপা এ শহরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রাজধানী রিয়াদের ৫৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পড়ে রয়েছে। এবং এটা ২৪.০৭ উত্তরে, ৪৭.২৫ পূর্বে (ফিল্‌বির হার্র অব আরাবিয়া ২য় খণ্ড, ৩১–৪০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পরিচ্ছেদ ৪

১। বিলাদ্‌ আর্‌-রুম প্রকৃতপক্ষে "গ্রীক্‌দের দেশ" যদিও সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বাইজান্‌টাইন প্রদেশ সম্বন্ধে—স্বভাবতঃই এটাকে প্রয়োগ করা হয়েছিল বিশেষভাবে আনাতোলিয়ার সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে । প্রথম শতাব্দগুলির দিকে কতকগুলি অস্থায়ী অধিকারের পরে এ দেশটি শেষবার অধ্যুষিত হয়েছিল ১০৭১ এবং ১০৮১-এর মাঝামাঝি সাল্‌জুক তুর্কিদের দ্বারা। তেরো শতাব্দীর শেষ দিকে খ্রীষ্টানদের (বাইজেন্‌টিয়ার, ত্রেবিজণ্ড এবং আর্মেনিয়া) অধিকৃত কিম্বা ইরানের শাসকদের অধিকৃত কতগুলি জায়গা ছাড়া সমস্ত পেনিনসোলাটি কোনিয়ার সাল্‌জুক সুলতানের পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু তেরো শতাব্দীর কিছু পূর্ব থেকে স্থানীয় প্রধানদের মধ্যে দেশটি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এদের প্রদেশগুলি ক্রমে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ছিল।

২। 'আলেয়া' বন্দর নির্মাণ করেছিলেন রোমের শ্রেষ্ঠতম সাল্‌জুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ ১ম (১২১৯-৩৭), এবং তার নামানুসারে স্থানটির নাম দেওয়া হয় পশ্চিমী সওদাগরদের নিকট আরোস থেকে)। মিশরে কাঠের অভাব হেতু সেখানে বৃহৎ পরিমাণ কাঠ আমদানী করা হতো তার নৌ-বহর ইত্যাদি নির্মাণের কাজে।

৩। 'আদোলিয়া' পশ্চিমী সওদাগরদের নিকট স্যাটালিয়া বলে পরিচিত। আনাতোলিয়ার দক্ষিণ সমুদ্র-উপকূলে এটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ঘাঁটি। এখানে মিশরীয় এবং সাইপ্রিয়ট্‌ বাণিজ্য বেশ প্রবল ছিল। লেবুকে মিশরে এখনো আদালিয়া বলা হয়।

৪। রাতের বেলা এবং শুক্রবারের নামাজের সময় নগরের গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়ার এবং খ্রীষ্টানদের বাইরে রাখার নিয়ম আধুনিক কাল পর্যন্ত ও ভূমধ্যসাগরীয় বহু স্থানে প্রচলিত ছিল; যেমন সাফাক্সে। সম্ভবতঃ এরূপ করা হতো অকস্মাৎ আক্রমণের আশঙ্কায়।

৫। 'ফুতুয়া' নামীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস এখনো প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বিভিন্ন আকারে এদের প্রথম দেখতে পাওয়া যায় বারো শতাব্দীতে—এর উৎপত্তি বলা যেতে পারে সূফী কিন্তু দরবেশ সম্প্রদায়। "ফুতুয়া"পৌরুষেয় শব্দটি বহুকাল ধরে প্রয়োগ করা হয়েছে দরবেশদের ব্যাপারে। এর নৈতিক অর্থ হচ্ছে ক্ষতি থেকে নিরস্ত থাকা—বিনা দ্বিধায় দান করা—এবং কোনো অভিযোগ না করা। আর সূফীর নিদর্শন তালীযুক্ত জামাকে তাঁরা লেবাস আল-ফুতুয়া পৌরুষেয় পোশাক। এটা খুব কড়াভাবে প্রয়োজিত করা হতো "ধর্মযোদ্ধা" দলের ব্যাপারে। বিশেষ করে এ "ধর্মযোদ্ধাগণ যখন অধপতিত হয়ে পড়েন, নিদর্শন দ্বারা এবং হজরত আলী থেকে এবং উৎপত্তির দাবীর দ্বারা সেটা সম্ভবতঃ সেই দলের নির্দশন যেটা কল্পণাপ্রবণ খলিফার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আনাতোলিয়ার অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি মনে হয় স্থানীয় ব্যবসায়ী দল। এতে ছিল সূফিবাদের খুব একটি প্রবল সংমিশ্রণ। আর এতে ছিল স্থানীয় স্ব-শাসনের এবং তুর্কি সুলতানদের অত্যাচার প্রতিরোধের একটি প্রবণতা (সাধারণভাবে থর্ণিং, তুর্কি বিরলিওথেক, ব্যাণ্ড ১৬, বার্লিন ১৯২৩)। এবং ওয়াসিফ বাওট্রস মালী ল্য ট্রেডিশন শেভালেরেস্ কদাস্ আরাবিস্ (প্যারিস্ ১৯৯১ সন পৃঃ ১-৩৩)।

৬। এ অংশটির মানে হচ্ছে এই যে এসারদিরগুল্ এবং কিরিলি-গুল পাড়ী দিয়ে নৌকা যোগে (বেশাহরের হ্রদ, এটা এগারদিরগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে ইব্‌নে বতুতা মনে করেন) আকশাহর এবং বেশাহর-এ পৌঁছানো যায় দু দিনে। ডেফ্রিসেরি মনে করেন যে এই আকাশাহর আক্‌শাহর নয়, এটা হচ্ছে আওশার শহর বা আক্‌শার এগারদিরগুলোর নিকটবর্তী।

৭। ডেফ্রিমেরির মতে গুল্-হিসার ছিল একটি ক্ষুদ্র দূর্গ। পরে এটা ধ্বংস করা হয়। বুল্‌ছুর হ্রদের প্রান্তে এটা অবস্থিত ছিল। অন্যদিকে লা স্ট্রেন্‌জ্ এর অবস্থান স্থল নির্দিষ্ট করেছেন ইষ্টনোজের পশ্চিমে সগুদ্-গুলের ধারে।

৮। উপরে উল্লেখিত ৫ টীকা দ্রষ্টব্য

৯। এটা হচ্ছে সুপরিচিত মেভ্‌লেভি ভ্রাতৃত্ব বা "নৃত্যপর দরবেশের দল"। এটা সংস্থাপন করেছিলেন জালালউদ্দীন তার গুরু শাম্‌সি তাব্‌রিজের (ইব্‌নে বতুতার গল্পের মিষ্টি বিক্রেতা) স্মৃতির উদ্দেশ্যে। জালালউদ্দীনের মৃত্যু হয় ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে কোনিয়াতে। সাধারণতঃ তাঁকে ডাকাত দলে তখন এদের বেলায়ও এটা ব্যবহার করা হয়েছে। বারো শতাব্দীর মাঝামাঝি বাগদাদের এমনি একটি ডাকাত দলে ভর্তি হওয়ার অনুষ্ঠানে পায়জামার উল্লেখ করা হয়েছে "লেবাসে আল ফুতুয়া" বলে (ইব্‌নে আথির ১১,৪১)। কিছু বছর পরে দামাস্কাসে ইব্‌নে জুবেইর নুবুইয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি সিরিয়ার শিয়া সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এই যোদ্ধাদলের নিয়ম ছিল যে, এর কোনো সদস্য যে কোনো প্রকার বিপদেই পতিত হোক না কেন তিনি কারো সাহায্যে নেবেন না। দলের মধ্যে উপযুক্ত লোক নেওয়া হতো এবং ভর্তি হওয়ার সময় দেওয়া হতো পায়জামা।

১১৮২ সালে একজন সূফি শেখ খলিফা আল নাসিরকে লেবাস বা পয়েতবম প্রদান করেন। সাহসী বীর ব্যক্তিদের একটি দল গঠনের ব্যাপারে তিনি ফুতুয়া সংগঠন করার ধারণা গ্রহণ করেন। (সম্ভবতঃ ফ্রান্সিস আদর্শের উপরে)। তিনি নিজেকে স্থাপন করেন এ দলের প্রধান নায়ক এবং তার সময়ের শাসনকারী নরপতি এবং অন্য সব ব্যক্তিদের লেবাস প্রদান করতো দলের নির্দশন রূপে। এর সংস্থাপন অনুষ্ঠানে এই পবিত্র পায়জামা পরা হতো এবং "পৌরুষ পান পাত্রে" করা হতো "কাস্ আল-ফুতুয়া-এতে কোনো শারাব থাকতো না—থাকতো নিমক

মিশানো পানি। এ দলটি তার সূফি পূর্ববর্তীদের কাল্পনিক বংশধারা গ্রহণ করেছিলেন যার প্রথম পুরুষ হিসেবে ধরা হয় খলিফা হজরত আলীকে (২ পরিচ্ছেদ ৪ টীকা দ্রষ্টব্য) এবং নাসিরের রাজত্বের কিছুকাল পর পর্যন্ত তারা টিকে থাকেন একটি অবসন্নকর অবস্থাতে। (কানিয়োতে ইব্‌নে বতুতা যে ভ্রাতৃসংঘ দেখেছিলেন যেটা আনাতোলিয়ার অন্য দল থেকে পৃথক করে দেখা হয়েছে তার পায়জামার বিশেষ পার্শিয়ান সরজী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। (আর, এ নিকলসন সঙ্কলিত "সিলেক্‌টেড পোয়েম্‌স্ অব ফ্রম্ দিওয়ানই শামসি তাবরিজের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

১০। বিরগী হচ্ছে পুরাকাহিনী পিরজিয়ন। এটা কেষ্টার উপত্যকার অন্তর্গত। এখানে ইব্‌নে বতুতার বর্ণনার একটি সুস্পষ্ট ফাঁক রয়েছে। কতকগুলি শহর—পরিদর্শন ব্যতীত তিনি রচিত সমগ্র আনাতোলিয়া অতিক্রম করতে পেরেছেন—এমন কি যদি তিনি মধ্য মালভূমির ভিতর দিয়ে সিভাস থেকে সোজা পথ ধরেও চল্‌তেন। খুব সম্ভব তিনি তার গতিপথ গ্রহণ করেন কিছু কোনিয়ার দিকে এবং সেখান থেকে এগারাদর ভিতর দিয়ে।

১১। এখানে ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে স্মার্ণা দখলের উল্লেখ করা হয়েছে (ইব্‌নে বতুতার পর্যটনের অনেক বছর পরে)। স্মার্ণা দখল করে ছিলেন ক্রুসেড সৈন্যগণ নাইট্‌স্ অব্ সেন্ট জনের সাহায্যে।

১২। ফুজা (ফুগিয়া, পুরাকালীন ফুগিয়া) স্থানটি প্যালায় ব্রজিগণ জ্যাকারিয়ার জিনোইজ পরিবারকে ছেড়ে দিয়েছিল । এটা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ঘাঁটি । সেখানকার য়্যালুমিলন্‌স্ এবং কিয়োজের মাষ্টিক ব্যবসাতে জ্যাকারিয়া পরিবারের পূর্ণ অধিকার কায়েম ছিল (এটা তারা দখল করেছিল ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে)। এ সময়ের ফুজা পুরানো ফোসিয়া (এস্‌কি ফুজা) ছিল কিম্বা নতুন ফোসিয়া (ইয়েনি ফোজা) ছিল সেটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়।

১৩। অটোম্যান সাম্রাজ্যের যে সব বিবরণ আমরা পেয়েছি তন্মধ্যে ইব্‌নে বতুতার বিবরণ হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর। ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুসা তুর্কিদের হাতে সমর্পিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ছিল হজরত ওসমানের মৃত্যুর বছর—এবং নাইসিয়ার পতন ঘটে ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু উভয় নগরের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয় আরো অনেক আগে (এইচ, এ, গিবন্‌সের ফাউণ্ডেশন অব দি অটোম্যান এম্পায়ার, ৪৬—৮ দ্রষ্টব্য)। ওসমানকে ওসমান চুক নাম দেওয়া হয়েছে এ সম্বন্ধে প্রফেসর ক্রেমার্স বলেছেন যে এটা আরবী নাম ওসমান থেকে আসেনি—এসেছে কিজিল আরমাক তীরে অবস্থিত ওসমানজিক্ দূর্গের নাম থেকে (জেড্ ডি, এস, জি, ৮১, LXII f.)।

১৪। মূল গ্রন্থে যে বাক্যটি নেওয়া হয়েছে, যেমন "আমরা তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছি" এর স্থানে আমি শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির এ লেখাটি পছন্দ করি।

১৫। ডেফ্রিমেরী বার্লুকে কাষ্টামুনির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বয়ালুর সঙ্গে একত্র করেছেন।

১৬। অধিক সাধারণভাবে বলা হয় সলঘট্, এখন ক্রিমিয়ার অভ্যন্তরে ষ্টারিক্রিম। এ সময়ে এটা ছিল ক্রিমিয়ার মোঙ্গল শাসনকর্তার আবাসস্থান। এর পরে এটা হয়েছিল স্বাধীন খানাতের বাসস্থান।

১৭। কিপ্‌চাকের কিম্বা গোল্ডেন হোর্ডের খানাত ছিল চারটি প্রধান খানাতের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত। স্থাপিত হয়েছিল তেরো শতাব্দীতে—এবং এ সময়ে এটা ভাগ হয়েছিল ব্লু হোর্ড এবং হোয়াইট হোর্ড নাম দুই ভাগে। যদিও পরবর্তী ব্লু হোর্ড প্রকৃতপক্ষে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং

এদের অধিকার বিস্তৃত ছিল কিভ্ এবং ককেশাস থেকে আরাল সমুদ্র খিভা পর্যন্ত। সুলতান মোহাম্মদ উজবেগ যিনি ১৩১২ থেকে ১৩৪০ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন তিনি ছিলেন ব্লু হোর্ডের খানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৮। কাফা এখন ফিও ডোসিয়া নামে পরিচিত। তেরো শতাব্দীর শেষ দিকে জিওনিজ্‌গণ কৃষ্ণ সাগরের উত্তর তীরবর্তী প্রধান বাণিজ্য ঘাঁটি রূপে পুনর্নির্মাণ করেছিল।

১৯। মুসলিমগণ ঘণ্টাধ্বনিকে মহাপাপ কার্য বলে ঘৃণা করেন। এবং এ কথা পয়গম্বরের উপদেশ বলে মনে করেন যেঃ "যে গৃহে ঘন্টা বাজে সেখানে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না।"

২০। এটাকে আমি গ্রহণ করছি মিয়াস্ নদীর মোহনা বলে। এটা ত্যাগানরগের পশ্চিমে।

২১। ধর্মীয় খয়রাত্ বা জাকাত হচ্ছে শতকরা আড়াই টাকা।

২২। মাজারের ধ্বংসাবশেষ (এখন বার্গোমাজ ডারি) কুমা নদীর তীরে অবস্থিত, আষ্ট্রখানের দক্ষিণ-পশ্চিমে, জার্জওয়াস্কের ১১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ৪৪.৫০ উত্তরে, ৪৪.২৭ পূর্বে।

২৩। বেশতো হচ্ছে ককেশাশের অন্যতম পাদ-পবর্ত। এটা একটি অরণ্যময় পর্বত, ১৪০০ মিটার উঁচু পিয়াতিগরস্কের ঠিক উত্তরে, জর্জিয়স্কির প্রায় ৩৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

২৪। বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিকদের বিবরণে তৃতীয় এন্ড্রোনিকাসের (১৩৩১ সালে এর বয়েস ছিল পঁয়ত্রিশ বছর) মেয়েকে গোল্ডেন হোর্ডের একজন খানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। তবে এর পূর্বের অন্ততঃ দুটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সন্তানের অবৈধ কন্যাদেরকে তারতার প্রধানদের কাছে বিয়ে দেওয়া হতো।

২৫। বুলঘারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত রয়েছে ভলগা নদীর বাম তীরে কামা জংশনের ঠিক নিম্নে। এটা ছিল মধ্যযুগের গ্রেট্ বুল্গেরিয়া রাজ্যের রাজধানী। তেরো শতাব্দীতে মোঙ্গলগণ এটা নিজেদের অধিকারে সংযোজিত করে নেয়। রাশিয়ান এবং সাইবেরিয়ান উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এ স্থানটির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এ কথা বুঝা খুব শক্ত যে মাজার থেকে বুল্গার পর্যন্ত ইব্‌নে বতুতা কি করে দশদিন সময়ে পর্যটন করেছিলেন—কারণ এ দুটি স্থানের মাঝখানের পথ ৮০০ শত মাইল।

২৬। এ শব্দটি উত্তর সাইবেরিয়া সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। ইউল্‌সের মার্কোপলোর ২য় খণ্ড, ৪৮৪-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৭। ইউল্‌সের মার্কোপলোর (২ খণ্ড, ৪৮৮) একটি টীকায় বলা হয়েছে যে মধ্যযুগীয় লেখকগণ যে প্রসিদ্ধ শহরের নামটি বারংবার উল্লেখ করেছেন সেটা এই ইউকাক শহর নয়। এটা ভল্গার তীরে সারাটোভের ছয় মাইল নিম্নে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এটা লোকাচি কিম্বা লোকাক রূপে উল্লেখিত আজব সমুদ্র তীরে একটি ক্ষুদ্র স্থান। এখানকার রূপার খনি সম্বন্ধে ইব্‌নে বতুতা বলেছেন ঃ "মিয়াস নদীর নিকটে বিশেষ নকল রূপার খনি (আজব সমুদ্রে পতিত একটি নদী। এটা টেগানরগের ২২ মাইল পশ্চিমে)....এই খনি থেকে তোলা রূপায় রাশিয়ার রুবল্‌স্ প্রস্তুত হতো।

২৮। ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সুরদাক্ সুরদাক্ বা সুলদায়া, এখন সুদাক। এ স্থানটি কাফার (টীকা ১৮ দ্রষ্টব্য) অভ্যুত্থান কাল পর্যন্ত ইউক্সিনের উত্তর উপকূলের প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। দলটি "কেন যে" ক্রিমিয়ার ভিতর দিয়ে ঘুর পথে গিয়েছিল সেটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে না। খুব

সম্ভব ইবনে বতুতা তার পথের বিবরণে গোলমাল করে ফেলেছেন এবং ষ্ট্যারি ক্রিমে অবস্থানকালে সুরদাকে গিয়েছিলেন।

২৯। মন্দিরটির অবস্থান স্থলের কোনো সুনির্দিষ্ট আভাস নেই। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুসারে স্থানটি ছিল নিপার এবং ক্রিমিয়ার মাঝখানে কোনো এক জায়গায়। বলা হয়েছে এই বাবা সাল্তুক (১৩৮৯ সালে মাল্দর্ভিয়ার অন্তর্গত বাবা দাঘে নির্বাসিত হয়েছিলেন) থেকে সারি সাল্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। বেক্তাশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এর সংযোগ ছিল (এফ, ডব্লিও, হ্যাস্লাকের Ann. Brit. Sch. Athens XIX, ২০৩-৬; XX, ১০৭, টীকা ১ দ্রষ্টব্য)।

৩০। থ্রেসের ভিতর দিয়ে কনষ্টান্টিনেপলের যে পথের বিবরণ ইব্নে বতুতা দিয়েছেন সেটা তাঁর বর্ণনায় একেবারেই বুঝা যায় না।

এখানে, যেমন চীনের ব্যাপারে নামগুলির অপরিচিতি আশ্চর্য রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে—বিশেষ করে কুড়ি বছর কালের পরে যখন স্মৃতি থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে। ১৩৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের সীমান্ত শহর (এ নামটি ইব্নে বতুতার ইতিহাস অপেক্ষা তার এই ভ্রমণই প্রযুক্ত হওয়া উচিত) ছিল দিয়ামপোলিস, অন্যথায় ক্যাভুলি (এখন জ্যাস্বুলি)। এর স্থানে হয়তো "মাহ্তুলি" বস্তে পারে। "খোলটি" মনে হচ্ছে নদী কিম্বা মোহনা। লোকে স্বভাবতঃই মনে করতে পারে এটা দানিউব—যদিও এটাকে ভুলভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফ্যানিকা হচ্ছে সম্ভবতঃ আগাথনিকা যেখানে দিয়ামপোলিস্ থেকে প্রধান রাস্তা তুন্জা (তন্ত্জস) নদী অতিক্রম করেছে কিজিল আগাচরে বা এর নিকটে। মাসলামা ইব্নে আবদুল মানিকের দূর্গ ৭১৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনেপলের বিরুদ্ধে আরব অভিযানের ইতিহাসের গল্পীয় পরিবৃদ্ধির অন্তর্গত। এ অভিযানের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন মাস্লামা।

৩১। কিফালি হচ্ছে গ্রীক কিফেল্ শব্দের অক্ষরান্তরিত শব্দ। এর অর্থ, উপরওয়ালা প্রধান।

৩২। এ সময়ে সম্রাট ছিলেন এন্ড্রোনিকাস, তৃতীয়; দ্বিতীয় এন্ড্রোনিকাসের পৌত্র। তাক্ফুর পদবী (আর্মেনিয়ান তাগাডর=রাজ) মুসলিম লেখকগণ সম্রাটের প্রতি এবং এশিয়ামাইনরের অন্য খ্রীষ্টান রাজাদের প্রতি প্রয়োগ করতেন, সম্ভবতঃ চীন সম্রাটের প্রতি প্রদত্ত পদবীর কাব্যময় সুর ফাগ্ফুর (বাঘ্পুরের স্থানে, চীনে পদবীর পার্শিয়ান অনুবাদ "স্বর্গের পুত্র") পদবী রূপে। এ কথার ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন যে ইব্নে বতুতা কেমন করে সম্রাট দ্বিতীয় এণ্ড্রোনিকাসকে (ইনি ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন, সন্নাসী হন,এবং তার মৃত্যু হয় ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে)জর্জ নামে অভিহিত করেছেন।

৩৩। এখানে যে অনুষ্ঠানে কথা বিবৃত করা হয়েছে সেটার মিল রয়েছে বাইজেন্টাইন দরবারের আনুষ্ঠানিক আচারের সঙ্গে। কনষ্টান্টিনেপল দখলের পরে অটোম্যান সুলতাগণ এটা গ্রহণ করেছিলেন।

৩৪। মুসলিমগণের বিশ্বাস যে যিশুকে শূলে হত্যা করা হয়নি। তাঁকে স্বর্গলোকে তুলে নেওয়া হয় এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁরি অনুরূপ এক ব্যক্তিকে শূলে বিদ্ধ করা হয়।

৩৫। কনষ্টান্টিনেপলের সন্ন্যাসী এবং গীর্জার সংখ্যা মনে হয় এ সময়ে অধিকাংশ পর্যটকের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। বারট্রাণ্ডন দা লা ব্রোকুইয়ার সেখানে ১৪৩২-৩ সালের শীওক কাটিয়েছিলেন। তার হিসেবে সেখানে গির্জার সংখ্যা ছিল ৩,০০০ এবং তিনি বলেছেন, অধিকাংশ অধিবাসী আশ্রমে বাস করতেন। ক্লাভিজো, ৮৮ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

৩৬। বারবার হচ্ছে হাইপারপাইরণের প্রতিবেশী । প্যালোনগ্সের দিনারের খাদমিশ্রণ।

৩৭। তারপর দেশের সুরে অঞ্চলে দুটি শহর ছিল। এ দুটিই পর্যায়ক্রমে গোল্ডেন হোর্ডের খানদের রাজধানী ছিল। পুরানো সারাই অবস্থিত ছিল আধুনিক সেলিট্রেনুগ্রামের নিকটে, আট্রখানে ৭৪ মাইল উপরে—আর নতুন সারাই যা আধুনিক পাবেভ, শহরে মিলিত সেটা ছিল আট্রখানের ২২৫মাইল উপরে। সুলতান মুহম্মদ উজবেগ্ পুরানো সারাই থেকে এ সময় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন নতুন সারাইয়ে—সম্ভবতঃ কিছু বছর পূর্বে। ইব্নে বতুতার বিবরণ নতুন সারাইয়ের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। এর ধ্বংসাবশেষ চল্লিশ মাইলের উপর স্থান ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এবং কুড়ি স্কোয়ার মাইল স্থানে ইহা ব্যাপ্ত। (এফ্, বেলোডিজের, 'ইন্ ল্যাট্ভিজাস্ ইউনিভারসিটেটিস্ রাক্স্তি আক টা ইউনিভারসিটেটিস ল্যাট্ভিয়েনসিজ,১৩খণ্ড (রিগা, ১৯২৬, ৩-৮২পৃঃ)

পরিচ্ছেদ ৫

১। সারাচুক্ বা সারাইজিকের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে উরাল নদীর মুখে গুরিয়েভের নিকট কাস্পিয়ান সমুদ্রের কিছু দূরে।

২। খাওয়ারিজম নামটি ব্যবহৃত হতো সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপী কিছু সময়ের জন্য খোরেজমিয়ার প্রধান শহরের ব্যাপারে। এ জেলাটি এখন খিভা নামে পরিচিত। এ সময়ে সেটা ছিল কুলিয়া উরগেঞ্চের শহর।

৩। কাচের পাত্র এবং কাঠের চামচ তারাই ব্যবহার করতেন, যাদের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা নিরত করতো সোনার পাত্রাদি ব্যবহারে। এটা নিষ্ঠাবান মুসলিম কর্তৃক নিষিদ্ধ।

৪। আলমালিক বা আলমালিগ তেরো শতাব্দীর প্রারম্ভে হঠাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তারমার্শিরিনদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহ যুদ্ধের সময় জামাতেখানাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (টীকা ৭ দ্রষ্টব্য)—এটা তার রাজধানী ছিল। এ স্থানটি অবস্থিত ছিল আইলী নদীর উপত্যাকায়—আধুনিক কুলজা শহরের কিছু দূর উত্তর-পশ্চিমে এটা অবস্থিত ছিল।

৫। কাত্ বা কাথ্ খোরেজমিয়ার পূর্বতন রাজধানী আধুনিক শেখ আব্বাস ওয়ালী শহরের নিকট অবস্থিত ছিল।

৬। এই অভিযোগ-পত্রের গুরুত্ব এখানে নিহিত যে মুস্লিম জগতে বুখারা ছিল পূর্বের অন্যতম একটি ধর্মতন্ত্র অধ্যায়নের ক্ষেত্র।

৭। তুর্কিস্তান এবং অক্সাসের ওপারের দেশগুলির সুলতানকে পূর্ববর্তী লেখাতে পৃথিবীর সাতজন মহা নরপতির অন্যতম বলে ধরা হয়েছে—ইনি চারজন মোগল খানাতের একজন ছিলেন—এতে চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এর শাসকগণ জামাতে-খান্স্ নামে পরিচিত ছিলেন—জামাতের নামানুসারে। ইনি ছিলেন চেঙ্গিস খানের পুত্র। একে এ দেশটি দেওয়া হয়েছিল। তারমাশারিনের ভাগ্য সম্বন্ধে ইব্নে বতুতা একটি কৌতুহলপূর্ণ গল্প বলেন। ইস্লামে তার ধর্মান্তরিত হওয়ায় সম্ভ্রান্ত প্রধানগণ তার উপর বিরূপ হয়ে উঠেন। চেঙ্গিস খানের নীতি ভঙ্গের জন্য তারা তাকে অভিযুক্ত করেন এবং ১৩৩৫ কি ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তারা বিদ্রোহ করেন। তারমাশিরিন অকপাসের ওপারে পালিয়ে যান—কিন্তু ধরা পড়েন

এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন বলে প্রচারিত হয়। অতঃপর একজন ব্যক্তি ভারতে এসে উপনিত হন এবং নিজকে তারমাশিরিন বলে পরিচয় দেন—যদিও তার দাবী সমর্থিত হয়, তথাপি রাজনৈতিক কারণে তিনি সুলতান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন এবং বিতারিত হন। ভাগ্যক্রমে তিনি শিরাজে আশ্রয় পান এবং ইব্‌নে বতুতা তার সঙ্গে ১৩৪৭ সালে তার পূর্ণ সিরাজ ভ্রমণের সময় সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি সেখানে সম্মানিত বন্দীর জীবন যাপন করেছিলেন।

৮। এখন 'শা-জিন্দা'নামে পরিচিত। এ সমাধি বন্দিরটি এখানো সমরকন্দের একটি প্রধান হর্ম্য।

৯। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্থানীয় কার্ট বংশীয় রাজাগণ হিরাতে রাজত্ব করতেন। এই নরপতি হোসেনের অধীনে (সাধারণভাবে মইজউদ্দিন নামে কথিত। রাজত্ব কাল ১৩৩১–৭০) খোরাশানের মধ্যে এ রাজত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়। ইব্‌নে বতুতার পরিদর্শন কালে তিনি বাল্যাবস্থায় ছিলেন—সুতরাং নিম্নোক্ত কাহিনীটি হচ্ছে তার নয় দশ বছর পরের। হোসেনের পুত্র গিয়াস উদ্দীন পীর শা ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর লংয়ের অধীনস্থ হন—এবং ১৩৮৯ সালে তার মৃত্যুতে রাজবংশটি লুপ্ত হয়।

১০। শারাব পানের জন্য ইসলামী আইন অনুসারে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের বিধান রয়েছে।

১১। মেশহেডের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত শহরটি শেখ জাম্ নামে পরিচিত। ইব্‌নে বতুতা যখন খোরাশান প্রদেশে প্রবেশ করেন তখন সেটা পারশ্য এবং ইরাকের মোঙ্গল সুলতান কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল, অন্ততঃ নামে।

১২। মাশ্‌হাদ নামের অর্থ হচ্ছে আর-রিদের সমাধি মন্দির। আর-রিদ পদবীতে শিয়া ইমামগণ পরিচিত। এটা যে ইমামের সমাধি তিনি ছিলেন অষ্টম ইমাম আলী ইব্‌নে মুসা। ৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। খলিফা হারুণ আর-রশিদ ৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তুষে মৃত্যু বরণ করেন, যখন খোরাশানের সীমান্তে একটি অভিযান চালনা করছিলেন।

১৩। এখন তুরাবাত-ই হায়দরী, মেশহেদের দক্ষিণে অবস্থিত। যে ভাবে এ শহর দুটির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ জটিল বলে মনে হয়—এবং বিশেষ করে সারাখুসের অবস্থান জাম্ এবং তুষের মাঝখানে হওয়া চাই—কিম্বা বিস্তাম থেকে ফিরবার পথে এটা হওয়া চাই।

১৪। ক্যাস্‌পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আস্তারাবাদের দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তাম অবস্থিত।

১৫। এখানে পুনরায় বর্ণনার মধ্যে একটি ফাঁক দেখা যায়। ক্যাস্‌পিয়ান থেকে ইব্‌নে বতুতা আফ্‌গানিস্তানের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে একই নামের নদীর তীরে কুন্দুজ অবস্থিত এবং কিছু দূরে দক্ষিণে একই নদীর তীরে অবস্থিত বাঘলান। আফগানিস্থানের পূর্ব অঞ্চলের অর্ধেক গজনী পর্যন্ত এ সময়ে জামাতে খানের অধীনে ছিল।

১৬। ইব্‌নে বতুতা খাওয়াক্ গিরিপথের রাস্তা অনুসরণ করেছিলেন (১৩,০০০ ফিট উঁচু)। এটা কাবুলের উত্তর-পূর্বে।

১৭। গজনীর মাহমুদ, যিনি ৯৯৮ থেকে ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন—তিনি উত্তর ভারতে মুসলিম রাজ্য স্থাপনের পথ রচনা করেন সিন্ধু পাঞ্জাব, এবং নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে নির্মম আক্রমণ দ্বারা।

১৮। বিবরণের ভিত্তিতে একথা স্থির করা কঠিন যে ইব্‌নে বতুতা প্রকৃতভাবে কোন্ পথে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। আফগান রাহাজান দস্যুদের সম্বন্ধে গল্পটি একটা নিয়মিত পথের

নির্দেশ দিচ্ছে—এবং শাশনগর হস্তিনা নগর বলে স্থির করা হয়েছে। এটা পেশোয়ারের নিকটে। এ সব উক্তি একত্রে নির্দেশ করছে খাইবার গিরিপথ। অন্যদিকে পনের দিনের পথে বিস্তৃত একটি মরুভূমির উল্লেখ এবং সে সঙ্গে ইব্‌নে বতুতার গজ্‌নী পরিদর্শন (ভুলভাবে কাবুলের পূর্বে স্থাপন করা হয়েছে) নির্দেশ করছে সুলেমান পর্বতমালার ভিতর দিয়ে কোনো প্রচ্ছন্ন পথের–সেটা সিন্ধু নদীর নিম্নভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পরিচ্ছেদ ৬

১। মুসলিম দেশগুলিতে ডাক ব্যবস্থা পুরাতন যুগের মতো একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল–রাজ্যের প্রয়োজনীয় ব্যাপার সত্বর আদান-প্রদানের জন্য এর ব্যবহার চলতো–সাধারণ নাগরিকদের ব্যবহারে লাগতো না।

২। সামিরদের প্রথা এত পরিষ্কারভাবে তাদের হিন্দু থেকে উৎপত্তির নির্দেশ দেয় যে আরব সামিরাদের সঙ্গে তাদেরকে মেলানো একটি কাল্পনিক বংশধারা বলে মনে হয়, যেটা তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে হিসেব করা হয়। মনে হয় এই সব সামিরা হচ্ছে রাজপুত সামাস– এরা এ সময়ে নিম্ন সিন্ধুর প্রভু হয়ে বসেছিল। অতএব জানানি সম্ভবতঃ রোহ্‌নি এবং সেওয়ানের মাঝের অর্ধপথে অবস্থিত ছিল।

৩। সিন্ধুদেশ গ্রীষ্মের তাপ পড়ে জুন এবং জুলাই মাসে। ইব্‌নে বতুতা যখন সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধুতে পৌঁছেন সেখানে বর্ণনার মধ্যে ন'মাসের একটা ফাঁক পড়েছে বলে দেখা যায়। খুব সম্ভব তার বিবরণ কিছুটা স্থানচ্যুত–অথবা কাফেলা কিছুটা অস্বাভাবিক তাপ ভোগ করেছিল।

৪। ইব্‌নে বতুতা নিম্নে বল্‌ছেন যে ভারতে প্রদেশের শাসক এবং উঁচু পদের কর্মচারীকে রাজা উপাধি দেওয়া হয়।

৫। লাহারির ধ্বংসাবশেষ ("ল্যারিবান্দার") রাহ্‌ প্রণালীর উত্তর দিকে পড়ে আছে– করাচি থেকে ২৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব এবং এর দ্বারাই এটা স্থানচ্যুত হয়েছিল ১৮০০ সালে এর অগভীর প্রবেশ পথের জন্য। "সমুদ্র উপকূলে" কথাটি বলা ঠিক হয় না– কেননা সমুদ্র তীর কয়েক মাইল ভিতর পর্যন্ত জনশূণ্য–কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় সেটা নিয়ত প্লাবিত থাকে।

৬। ইব্‌নে বতুতা যে ধ্বংসাবশেষের কথা বলেছেন সেটা নিশ্চিতরূপে চেনা যায়নি। হেইগ্‌ বল্‌ছেন এগুলি মোরা-মারির ধ্বংসাবশেষ হতে পারে, লাহারি থেকে আট মাইল উত্তর-পূর্বে–এবং এ কথাও বলা হয়েছে। (প্রথমে কানিংহাম কর্তৃক) যে এগুলি দেবুল বা দেবলের। এ স্থানটি ছিল সিন্ধু তীরে অবস্থিত পূর্বের বন্দর, করাচী থেকে ৫৪ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে। ৭১০-৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ আক্রমণের সময় আরবগণ এটা দখল করেছিলেন এবং পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৭। বাখার (ইণ্ডিয়ার গেজেটিয়ারের বুখুর) হচ্ছে সিন্ধু নদের একটি দূর্গ বেষ্টিত দ্বীপ–সুক্কুর এবং রোহরের মাঝখানে অবস্থিত।

৮। এই নদীটি ছিল রুইর পুরাতন প্রণালী। এটা সে সময়ে সম্মিলিত ঝিলাম এবং চেনাবকে মুলতানের নিম্নে যুক্ত করেছিল।

৯। আজুদাহান আবুহানের আগে আসা উচিৎ ছিল।

১০। কুশাই কচিৎ কৃষ্ণকে বুঝায়। এটা হচ্ছে ফরাসী আরবদের ইঙ্গিত। সম্ভবতঃ এর অর্থ গোসাই। মানে ধর্মীয় গুরু। ("একটি দেবতার নামও"। প্লাটের হিন্দুস্তানী ডিক্‌শনারী)।

১১। মাসুদাবাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে নাজাফগড়ের এক মাইল পূর্বে এবং পালেম ষ্টেশনের উত্তর দিয়ে ছ' মাইল পশ্চিমে।

১২। মধ্যযুগীয় দিল্লীর ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে বর্তমান শহরের দশ মাইল খানিক দক্ষিণে 'খাশ দিল্লী' জাহানপানা, এবং সিরি একটি ধারাবাহিক শ্রেণী সাহরাওলি থেকে উত্তর-পূর্বে– তেগলাবাদ খাশ দিল্লীর চার মাইল পূর্বে এবং আধুনিক তোগলাবাদের দু মাইল পূর্বে। সুলতান মাহ্‌মুদ কর্তৃক এ শহরগুলির যে ক্ষতি সাধন করা হয়েছিল সে সব আর কখনো পূরণ করা হয়নি। এ কথা ইব্‌নে বতুতা নিম্নে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ১৩৯৮ সালে তৈমুর (তৈমুল রঙ) আবার এ শহরগুলির উপর ধ্বংসকার্য করে যান। নতুন দিল্লী নির্মাণ করেন মোগল সুলতান শাজাহান (১৬২৭-৫৮)। দিল্লীর প্রথম যুগের মুসলিম সুলতানদের কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে ভূমিকার ২২-২৪ পৃষ্ঠায়।

১৩। নিম্নে কুতুব মিনার এবং আলাই মিনারের বিবরণের ন্যায় এখানেও ইবনে বতুতার হিসাব অতিরঞ্জিত হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের লোহস্তম্ভ মুত্রা থেকে আনা হয়েছিল এবং দিল্লীতে স্থাপিত হয়েছিল এর প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক এগারো শতাব্দীতে। এটার ব্যাস ১৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২৩ ফিট। কুতুব মিনারের উচ্চতা ২৩৮ ফিট, আলাই মিনারের অসম্পূর্ণ অংশের উচ্চতা (ইব্‌নে বতুতা এটা ভুলক্রমে কুতুবুদ্দিনের বলেছেন) ৭০ ফিট–এবং তিনি যতটা বলেছেন ততটা প্রশস্ত নয়।

১৪। এখানে সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌নে তুগ্‌লকের যে চরিত্র আঁকা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৫। দৌলতাবাদ বা দেওগিরি হায়দারাবাদ (দেকান) রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে। সুলতান মুহাম্মদ এটাকে তার রাজধানী করতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতে সামরিক অভিযানের কেন্দ্র হিসাবে স্থানটির গুরুত্বের জন্য। দু বার (বা তিনবার) তিনি দিল্লীর সমস্ত জনতাকে এখানে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে তার জীবদশাতেই এটা দেকানের বাহমনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দখল করে নিয়েছিলেন। পরিচ্ছেদ ৭, টীকা ৭ দ্রষ্টব্য।

১৬। এ সংস্করণে যে অধ্যায়টি স্থান পায়নি তেমনি একটি পূর্বের অধ্যায়ে ইব্‌নে বতুতা শেখ শিহাব উদ্দীনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। সুলতানের অধীনে চাকুরী করার অসম্মতি প্রকাশের দ্বারা তিনি তার বিরাগভাজন হন এবং দিল্লীর নিকটে মাটির তলায় সুরঙ্গ করে কয়েক বছর কাটান। এ সুরঙ্গের তলায় কয়েকটি কামরা, গুদামঘর, রান্নাঘর এবং গোসলখানা ছিল। অতঃপর পুনরায় তাকে দরবারে তলব করা হলে তিনি প্রকাশ্যে মুহাম্মদ শাকে বিশ্বাসঘাতক বলেন–এবং তার উক্তি ফিরিয়ে নিতে বলা হলে তিনি তাতে অসম্মতি জানান এবং দণ্ডিত হন।

১। ইউল বলেছেন এটা রোহিলাখণ্ডের সামবাল–দিল্লী আশী মাইল খানিক পূর্বে অবস্থিত (ক্যাথে, ৪র্থ খণ্ড, ১৮)।

২। জালালী একটি ক্ষুদ্র স্থান–আলিগড়ের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। দিল্লীর একশত মাইলের মধ্যে দেশের অবস্থা এতখানি অরাজক ছিল যাতে করে সুলতান মুহাম্মদের সাম্রাজ্যের চেহারাটা বেশ বোঝা যায়।

৩। মাওরি সম্ভবতঃ ভিণ্ডের নিকটবর্তী উম্‌রী। মার জায়গাটা অজ্ঞাত। কিন্তু গোয়ালিয়রের পূর্বে অবস্থিত।

৪।গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পূর্বে কিছু মাইল দূরে আলাপুরের একটি গ্রাম রয়েছে। জান্‌বিল সম্ভবতঃ ঢোলপুরের রাজা বিধর্মী সুলতান এবং চাম্বাল নদীর মতো একই নাম।

৫। পারওয়ান নিশ্চিতরূপেই গোয়ালিয়র রাজ্যের নারওয়ার (ইব্‌নে বতুতা অন্য জায়গার ন্যায় এখানেও একটি অজানা নামকে অধিক পরিচিত নামে অভিহিত করছেন, যথা আফগানিস্তানের পারওয়ান)–ইণ্ডিয়ান গেজেট অনুসারে এটা "এক কালে দিল্লী এবং দাক্ষিণ্যাতের মাঝখানে পথের উপর একটি বর্ধিষ্ণু শহর ছিল।" আধুনিক মানচিত্রে পারওয়াই নামে একটি স্থান দেখা যায়। স্থানটি নারওয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে, এবং গোয়ালিয়রের ৩০ মাইল দক্ষিণে।

কাজারা নিঃসন্দেহে খাজুরাহো, ছত্তরপুরের ২৭ মাইল পূর্বে এবং পান্নার ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে–এখানে পৌঁছাবার ঘুর পথ সত্ত্বেও। ইব্‌নে বতুতা স্থানটির অবস্থানের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা স্যার আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহামের রিপোর্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়া ১৮৬২-৫, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪১২-৪৩৯ পৃঃ)।

৬। এটা যদি মালওয়ান ধার হয়, তাহলে এ উজ্জয়িনীর পরে আসবে।

৭। দেওগিরির দূর্গ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান গেজেটিয়ারে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, "একটি মোচাকৃতি শিলার উপরে দূর্গটি নির্মিত হয়েছে– ভিত্তি থেকে ১৫০ ফিট এর উচু-ঢাল। যে পাহাড়ের উপর এটা অবস্থিত সেটা সমতলভূমি থেকে খাড়াভাবে ৬০০ ফিট উঁচু। মুসলিমগণ এ স্থানটি ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দখল করেন এবং সুলতান মুহাম্মদ ইব্‌নে তুগ্‌লক দক্ষিণ ভারত আক্রমণ চালাবার ঘাঁটিরূপে স্থানটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এটাকে দৌলতাবাদ নাম দেন এবং এখানে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তার মৃত্যুর পূর্বে একজন বিদ্রোহী শাসক এ স্থানটি অধিকার করেন এবং আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত এটা দিল্লীর অধীনতামুক্ত ছিল।

৮। ক্যাম্‌বে উপসাগরের মাথায় অবস্থিত ক্যাম্‌বে এ সময়ে ভারতের অন্যতম প্রধান সমুদ্র বন্দর ছিল। উপসাগরটি পানি পড়ে ভরে যাওয়ায় এবং বন্যার আক্রমণ প্রবল হওয়ায় বন্দরটির অবনতি ঘটে এবং বর্তমানে এটা কেবল ছোট জাহাজের জন্য ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

৯। কাওয়া একটি ক্ষুদ্র স্থান। ক্যাম্‌বে থেকে উপসাগরের বিপরীত দিকে অবস্থিত।

১০। কান্দাহার নিশ্চয়ই গান্ধারের আরবী রূপান্তর। মধ্যযুগে জাহাজীদের নিকট গান্দার বলে পরিচিত ছিল। এটা অবস্থিত ছিল ছোটো নদী ধান্দারের মোহনার তীরে কাওয়া থেকে দক্ষিণে অল্প দূরে।

জালানসি নামটা সম্ভবতঃ রাজপুত ঝাল্লাস উপজাতির প্রতিরূপ। কাথিয়াওয়ার অন্তর্গত ঝালাওয়ার কিম্বা গোহেলওয়ার নামে এটা এখনো রক্ষিত হয়ে আসছে।

১১। ক্যাম্বে উপসাগরের মুখের নিকট ক্ষুদ্র দ্বীপ—এ সময়ের কিছু পূর্বে পর্যন্ত এটা ছিল সমুদ্র-দস্যুদের ঘাঁটি যখন মুসলিমগণ এটা অধিকার করেন এবং ছেড়ে চলে যান।

১২। স্যাণ্ডাবুর কিম্বা সিণ্ডাবুর নামে দ্বীপটি এবং গোয়া উপসাগর প্রথম দিকে মুসলিম সওদাগরদের নিকট পরিচিত ছিল এবং ইউরোপীয় সওদাগরগণ এটা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল। ষোল শতাব্দীর আগে পর্যন্ত পুরাতন নাম গোয়া প্রচলিত হয় নাই। প্রথম মুসলিমগণ এটা দখল করেন ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরবর্তীকালে এটা একাধিকবার এবং পুনঃ অধিকার করেছেন।

১৩। এ সব মধ্যযুগীয় বন্দরের অনেকগুলি অস্তিত্বই এখন আর বর্তমান নেই। এ সম্বন্ধে ইউল তার ক্যাথে, ৪র্থ খণ্ড, ৭২-৭৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন।

১৪। এই ইলি বা এলি রাজত্ব মাউন্ট ডেলীতে তার চিহ্ন রেখে গিয়েছে। মধ্যযুগীয় বন্দরটি সম্ভবতঃ এখন নিলেশ্বর গ্রামের দ্বারা প্রদর্শিত হচ্ছে। শৈলান্তরীণ থেকে এটা কিছু মাইল উত্তরে।

১৫। কালিকুটনে ইব্‌নে বতুতা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমুদ্র বন্দরের পর্যায়ভূক্ত করেছেন। ষোলো শতাব্দীতে পর্তুগীজ বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ার পর বন্দরটির দ্রুত অবনতি ঘটে। এখানকার শাসকের পদবিকে ইব্‌নে বতুতা সামারি বলেছেন (এটা মুসলিম কর্ণে বিদেশী নামে যোগ্য রূপান্তর। সামারিটানদের কাল্পনিক পূর্ব পুরুষরূপে ধর্মতান্তিকদের কাছে সামারি নামটি পরিচিত)। সামারি হচ্ছে মালয়ালাম শব্দ সামুটিরি বা সামারি মানে "সমুদ্র রাজা"। ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে এর পর্তুগীজ রূপান্তর জ্যামুরিণ অধিক পরিচিত।

১৬। এ সবের উদ্দেশ্য ছিল শান্ত আবহাওয়ায় গুন টেনে নৌকা চালানো। এ কথা ইব্‌নে বতুতা নিম্নে বর্ণনা করেছেন।

১৭। কালিকুট এবং কুইলনের মাঝখানের দুরত্বের যদিও কিছুটা অংশ আভ্যন্তরিক জলপথে ভেদ করা যায় তথাপি সমস্ত পথ জলপথে যাওয়া যায় বলে মনে হয় না। এখানে ইব্‌নে বতুতা তাঁর চীন ভ্রমণ বৃত্তান্তের ন্যায় স্থলপথের বিবরণ অবহেলা করেছেন।

১৮। কুইলনকে ইব্‌নে বতুতা কালিকুটের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এটা অনেক আগে থেকে চীন বাণিজ্যের মাল প্রেরণের বন্দর ছিল। নবম শতাব্দীর আরব এবং পার্শিয়ান জাহাজীগণ এটা কাওলাম-মালয় বলতো। এর প্রতিযোগী কালিকুটের ন্যায় এ বন্দরটিরও অবনতি ঘটে ষোল শতাব্দীতে। ইউল বলছেন ইব্‌নে বতুতা বর্ণিত এর শাসকদের তিরাওয়ারী পদবী তামিল-সংস্কৃতের মিশ্রন তিরু-পাতি "পবিত্র দেবতা" হয়ে থাকবে। (ক্যাথে, চতুর্থ খণ্ড, ৪০)।

১৯। "ইব্‌নে বতুতা সব সময় বিড়ম্বিত হয়েছে—এটা তারই লক্ষণ।" (ইউল)।

২০। শালিয়াত হচ্ছে পর্তুগীজ চিলিয়েত বা চেলি, এখন ভেপুর কালিকুটের সাড়ে ছ'মাইল দক্ষিণে। এখানে সে সব বস্ত্র তৈরী হতো সেগুলি ছিল বিভিন্ন রকমের– এখনো নরম সূতিবস্ত্রকে পালী বলা হয়। সেটা সম্ভব যে এই শহরের নাম এসেছে ফ্রেঞ্চ চেলী থেকে–এবং এর থেকে উদ্ভব হয়েছে আমাদের শাল শব্দটি।

পরিচ্ছেদ ৮

১। মালদ্বীপ যদিও বহুকাল পূর্ব থেকে নাবিক এবং পর্যটকদের কাছে পরিচিত ছিল এবং বারো শতাব্দীতে মুসলিম অধ্যুসিত হয়ে পড়েছিল–তবু ইব্‌নে বতুতার বর্ণনা হচ্ছে অনেক আগের ব্যাপার, এর অধিবাসী এবং দ্বীপটি সম্বন্ধে এ বিবরণ আমাদের জানা আছে। তার প্রদত্ত অনেক নাম এখনো মানচিত্রে দেখা যায়।

২। মালদ্বীপ 'কালু-বিলি-মাস', কালো বোনিতো মাছ আগুনে পুড়ানোর পর কালো হয়ে যায় বলে এর নাম কালো রাখা হয়েছে।

৩। "সরন্দ্বীপের পাহাড়" হচ্ছে আদমের পর্বত চূড়া। সরন্দ্বীপ হচ্ছে সিলনের পুরাতন আরবী এবং পার্শিয়ান নাম। (এর উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত 'সিংহল দ্বীপ' থেকে মানে সিংহের আবাস দ্বীপ)। *ইহা পরে পালি ভাষায় সিহালাম= সেল্যান=সেলনে রূপান্তরিত হয়।*

৪। সিলনের পুরাতন সিনহালিজ রাজ্য ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পাণ্ডিয়াজগণ আক্রমণ করে–এদের নিজেদের রাজ্য ছিল মাবারের অন্তর্গত মাদুরায়–এটা অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল–তারপর তখন সেটা ছিল মুসলিমদের হাতে। আক্রমণকারীদের নেতা ছিলেন আরিয়া চক্রবর্তী। কিন্তু ইব্‌নে বতুতার মুরব্বী সম্ভবতঃ সেই একই নামের কোনো পরবর্তী সেনাপতি। ইনি ১৩৭১ সালে কলম্বো এবং অন্যত্র দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডিয়াদের বসতস্থান ছিল জাফ্‌না দ্বীপে।

৫। আদম পর্বত চূড়ার গর্তটিকে মুসলিমগণ আদমের পায়ের চিহ্ন বলে সম্মান করে থাকেন। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধগণও এটাকে সমভাবে ভক্তি করে থাকেন। তারা মনে করেন এটা শিবের এবং বুদ্ধের পদচিহ্ন।

৬। কুনাকার নিশ্চয়ই কর্ণেগ্যালি (কুরুনাগালা)। এটা পুরাতন সিংহলী রাজবংশের সেই সময়ের আবাস স্থল। কুনার নামটি সংস্কৃত কুন্‌ওয়ার "রাজকুমার" বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭। এ শিকলগুলি এখনো বর্তমান রয়েছে।

৮। দিনওয়ার (এটা ঠিকভাবে কুর্দিস্তান অন্তর্গত মধ্যযুগীয় একটি শহরের নাম–কিরমানশার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত) এখানে দিওয়ানদারার জায়গায় বসেছে। বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ মন্দিরের স্থান এটা (১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুর্তুগীজগণ এটা ধ্বংস করেন)। স্থানটি দন্দ্রা হেডের নিকটে। সিলনের সর্বশেষ দক্ষিণে।

পরিচ্ছেদ ৯

১। হারকাতু আরকটের আধুনিক শহর হতে পারে না। এটা অনেক উত্তরে অবস্থিত। এ ছিল কেবল একটি দূর্গ। কাজেই এর অবস্থান জায়গা সন্দেহজনক। যদিও এর নাম আরকট জেলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (তামিল 'আরু-কাদু' ছয়টি অরণ্য)।

২। জালাল উদ্দীনকে দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ মাবারের সামরিক শাসক পদে নিযুক্ত করেন (মুসলিমগণ এ দেশটি ১৩১১ সালে অধিকার করেছিলেন)। ১৩৩৮ সালে ইনি নিজকে স্বাধীন

বলে ঘোষণা করেন —এবং এর পাঁচ বছর পরে নিহত হন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে কয়েকজন সেনাপতি সিংহাসনে বসেন। এদের মধ্যে গিয়াসুদ্দীন ছিলেন তৃতীয়।

৩। কারোম্যাণ্ডেল সমুদ্র উপকূলের অনেক প্যাটান্‌স এবং প্যাটাম্‌সের মধ্যে ফ্যাটানকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। মধ্য যুগীয় মাবারের প্রধান বন্দর ছিল কাবেরি, পাট্টআনাম কাবেরির একটি মুখে—১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের এক জলপ্লাবনে স্থানটি বিনষ্ট হয়েছে বলে বলা হয়। এটাই যদি ইব্‌নে বতুতার ফ্যাটান হয়ে থাকে তবে এর ধ্বংসকালের তারিখ হবে ১৩৫০ সালের কাছাকাছি (মার্কোপলো, ২য় খণ্ড, ৩৩৫-৩৬)। ফ্যাটান হয়তো নাগাপট্টম। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয় ছিল। ইউল্‌সের মতে স্থানটি আরো অনেক দক্ষিণে রামনাদের কাছাকাছি—এটা অসম্ভব হবে যদি আরকটের সঙ্গে হারকাতু নামের কোনো সম্বন্ধ বিবেচনা করা হয়। (টীকা ১ দ্রষ্টব্য)। মাবার পরিভ্রমণের কোনো এক সময়ে কিম্বা ফ্যাটান থেকে কাওলামের পানে সফরের সময় মনে হয় ইব্‌নে বতুতা কেলুকারির ক্ষুদ্র বন্দরে উপনীত হয়েছে। এটা রামনাদের ১০ মাইল দক্ষিণে। পরে এটাকে তিনি লাগিয়েছেন চীন সমুদ্রের কোনো এক স্থানে (পরিচ্ছেদ ১০ টীকা দ্রষ্টব্য)। এটা আশ্চর্য যে ইব্‌নে বতুতা কেয়াল বা মার্কোপলোর কেইল বন্দরের কথা উল্লেখ করেননি। এটা তামনাপারনি নদীর ডেলটার তুতিকরিনের দক্ষিণে সে সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য বন্দর ছিল (মার্কোপলো, ২য় খণ্ড, ৩৭০-৪ দ্রষ্টব্য)।

৪। ইউলের বর্ণনা অনুসারে এটাকে 'পিজন আইল্যাণ্ড' বলে স্থির করা হয়েছে, অনুরের (হিনাওর) ২৫ মাইল দক্ষিণে।

৫। সুদূর পূর্বাঞ্চলে ইব্‌নে বতুতার যে কোনো ভ্রমণ ইতিহাসের সঙ্গে এ উক্তির সামঞ্জস্য সাধন করা কঠিন। বর্ণনার গতিধারার দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এই দ্বিতীয় সফর তার মালদ্বীপ থেকে যাত্রার এক বছর পরবর্তী কালের পরে ছাড়া হতে পারে নাই।

৬। সুদকাওয়ান স্থানটিকে অনেক সাতগাঁও বলে স্থির করেছেন। এটা হুগলী শহরের উত্তর-পশ্চিমে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর। হিন্দু শাসনের যুগ থেকে পর্তুগীজগণ কর্তৃক হুগলীর প্রতিষ্ঠা কাল পর্যন্ত এটা ছিল বাংলাদেশের ব্যবসায়ী রাজধানী। ইউল এটাকে চিটাগং বলে স্থির করেছেন। এটা সাতগাঁও অপেক্ষা সুবিধাজনক বন্দর ছিল। এবং ইব্‌নে বতুতা একে "মহাসমুদ্রের তীরবর্তী" বন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। সুলতান ফকরুদ্দীনের সঙ্গে চিঠাগাংয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল কি না সেটা অনিশ্চিত (cf, Book of Duarte Barbosa; ২য় খণ্ড, ১৩৯)।

৭। জুন হচ্ছে ইব্‌নে বতুতার যমুনা নামের লিপ্যান্তর। এখানে এটা ব্রহ্মপুত্রকে বোঝাচ্ছে (৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৮। লাখনাওতি (লক্ষমনওয়াতি) মানে লক্ষনাবতী হচ্ছে গৌড়ের পুরাতন নাম। এটা অনেক দিন বাংলার মুসলিম শাসকদের রাজধানী ছিল। এ শহর তারা জয় করেছিলেন ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে। মালদহের নিকটে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বাংলাদেশের তিনটি জেলা এ নাম গ্রহণ করেছিল (টীকা ১৩ দ্রষ্টব্য)। এ জেলা তিনটি ছিল গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে।

৯। এ কথা ইউল সম্পূর্ণভাবে স্থির করেছেন যে (ক্যাথে, ৪র্থ খণ্ড, ১৫১-৫) ইব্‌নে বতুতা যে জেলাটি ভ্রমণ করেছিলেন সেটা সিলেট। সেখানে শাজালালের সমাধি এখনো সম্মানিত হয়ে থাকে (শেখ জালালউদ্দীন) কামরু বলে যে স্থানটির নাম করা হয়েছে সেটা শুদ্ধভাবে কামরূপ।

এটা আসামে যুক্ত একটি জেলার নাম। এ স্থানের ইন্দোচীনে জনসাধারণ মোঙ্গলিয়ান চরিত্রের পরিবাহক।

১০। নীল নদী হচ্ছে মেঘনা। বারাকের বাম তীরে অবস্থিত। বারাক এর একটি শীর্ষস্থানীয় নদী। এখানে এখনো একটি টিলা বা নিচু পাহাড় রয়েছে। একে বলা হয় হাবাং—হবিগঞ্জের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত।

১১। সোনার গাঁও ঢাকা থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। এটা ছিল মুসলিমগণের বঙ্গদেশের অন্যতম পুরাতন রাজধানী এবং এর নাম দেওয়া হয়েছিল বাংলার তিনটি জেলার একটিকে। তৃতীয়টি ছিল সাতগাঁও।

পরিচ্ছেদ ১০

১। বারানাকর স্থানটি ইব্‌নে বতুতা কর্তৃক এর অধিবাসীদের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সে অনুসারে পূর্বে আন্দামান বা নিকোবার দ্বীপগুলির অন্যতম বলে স্থির করা হয়। ইউল দেখিয়েছেন এটাকে বর্মার অন্তর্গত আরাকানের প্রধান ভূমিতে অবস্থিত নিগ্রেস দ্বীপের নিকটবর্তী স্থান বলে। কিন্তু ইব্‌নে বতুতার গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে এটা কোনো দেশের নাম নয়, বরঞ্চ জাতির নাম (ক্যাথে, ৪র্থ খণ্ড, ৯২; মার্কোপলো ২য় খণ্ড, ৩০৯-১২)।

২। জাওয়া নামটি সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়েছে মালয়ের ব্যাপারে। জাওয়া (ক্ষুদ্র) হচ্ছে সুমাত্রা, এবং জাওয়া (বৃহত্তর) হচ্ছে খাশ জাওয়া দ্বীপ এখন সে দ্বীপটিকে জাভা বলা হয়। সুমাত্রায় ইসলামের পরিবর্তন হয় ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ভারতের সওদাগর এবং ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক তেরো শতাব্দীতে। সেই একই শতাব্দীতে শেষ যুগ থেকে দ্বীপটিতে শুরু হয় মুসলিম শাসন– সম্ভবতঃ সুমাত্রা শহর প্রতিষ্ঠার কিছু বছর আগে। আল-মালিক আজ-জহির পদবী গ্রহণ করেন বিভিন্ন মুসলিম শাসক।

৩। কাঁঠাল গাছ সম্বন্ধে ইউল এবং বার্ণেল, হব্‌সন-জব্‌সন দ্রষ্টব্য।

৪। জামুন হচ্ছে এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি ফল। দেখতে জলপাইর মতো, কিন্তু মিষ্টি। এ সম্বন্ধে ইব্‌নে বতুতা প্রথম দিকের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এটা জাম্ব অথবা রোজ-আপেলের মতো নয়। উভয়টি সম্বন্ধে হব্‌সন্-জব্‌সন দেখুন।

৫। কিছু রকমের সরকারী অফিস সম্বন্ধে 'গৃহশ্রেণী' বলে যে শব্দ অনুদিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়েছে। সঠিক ব্যাকরণ অনুসারে 'সারহা' শব্দটি 'গৃহশ্রেণী' সম্পর্কে ব্যবহৃত হতে পারে (যেমন অনুবাদে হয়েছে)– কিন্তু খুব সম্ভব এটা বন্দরের নাম।

৬। মুল-জাওয়া সাধারণতঃ জাভা দ্বীপকে মনে করা হয়েছে—কিন্তু ইউল বিভিন্ন যুক্তি সহকারে এটাকে মালয় উপদ্বীপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। এই মত অনুসারে কাকুল বন্দর এবং শহর মালয় উপদ্বীপের পূর্ব সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বলে ধরতে হয় এবং সেটা কেলানৃটানের নিকটবর্তী।

কামারা নিশ্চিত ভাবেই খামের, ক্যাম্বোডিয়ার পুরাতন নাম। এটা সিয়াম উপসাগরের বিপরীত দিকে অবস্থিত। (ক্যাথে, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৫)।

৭। এই কিছুটা আক্রমণমূলক বাক্য ছিল অমুসলিমদের সালাম জানাবার পদ্ধতি (cf. ২১৪ পৃঃ)– আচ্ছালাম আলায়কুম (আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) কথাটি কেবল মুসলিমদের প্রতি প্রযোজ্য। যদিও ইব্‌নে বতুতাকে মাঝে-মাঝে এ নিয়ম ভাঙতে দেখা যাছে।

৮। 'স্থির সমুদ্রকে' এ স্থানে ইব্‌নে বতুতা আরব-পার্শিয়ান নাম 'আল-বাহার আল্-কাহল নামে অভিহিত করেছেন। অন্য সমসাময়িক লেখকগণও বিভিন্ন নামে এর উল্লেখ করেছেন। (যেমন কালো সমুদ্র, অন্ধকার সমুদ্র) এটা সর্ব পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। সেজন্য এটা মনে হয় আমাদের চীনে সমুদ্র বা কতকগুলি নিকটবর্তী সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে। ইব্‌নে বতুতার বর্ণনায় কথাগুলি থেকে দেখা যায় যে এটা নিয়মিত পথের উপরে ছিল।

৯। রাজা তাওয়ালিসি এবং তার কেলুকারী নগরের পরিচয় নির্ধারণে ইব্‌নে বতুতার ব্যাখ্যাকারীগণ তাদের সমস্ত বিচক্ষণতার ব্যবহার করেছেন। সেলিবিস, তন্‌কিন, ক্যাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, কোয়ানসি প্রদেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, সুলু দ্বীপমালা প্রভৃতি অনেক স্থানের কথা বলা হয়েছে। ইউল অন্যগুলি অপেক্ষা শেষ সিদ্ধান্তটি বেশী সম্ভব বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ কথাও তার আগে স্বীকার করেছেন "কিঞ্চিৎ সন্দেহে ভরে— তাওয়ালিসির ব্যাপারে আট্‌লাসের সে অংশে আমাদের খোঁজ নিতে হবে যেটা পরলোকগত কাপ্তেন গালিভারের সামুদ্রিক সার্ভের মধ্যে রয়েছে।" বর্ণনার বিস্ময়কর বিষয় যোদ্ধা রাজকুমারীর অস্তিত্ব নয়– সেটা হচ্ছে তার তুর্কী নাম (ইব্‌নে বতুতা ইতিপূর্বেই তার নাম দিয়েছেন সুলতান উজবেক খানের চতুর্থী রাণী রূপে।) এবং তুর্কী ভাষা। ডাক্তার ভন মাজিক অনুসরণে ইউল বলছেন যে সেই বীরঙ্গনা নারীর পরাক্রমের কাহিনী হয়তো কেদখানের শক্তিশালিনী কন্যা আইজারুকের গল্প থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাহিনী হয়তো ইব্‌নে বতুতা শুনেছেন সমুদ্রচারী নাবিকদের কাছে থেকে। আইজারুক প্রকৃতপক্ষে তুর্কী নাম। খুব সম্ভব ইব্‌নে বতুতা এটা একই উচ্চারণমূলক উরদুজা নামের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। কেননা বিদেশী নামের ব্যাপারে তার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো ছিল না। এ ভাবে কেলুকারী প্রকৃতপক্ষে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি সমুদ্র বন্দরের নাম ছিল (পরিচ্ছেদ ৯, টীকা ৩ দ্রষ্টব্য)– এটাকে সম্ভবতঃ ইব্‌নে বতুতা রাজা "তেয়ালিসির বন্দরের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। (ক্যোথে, ৪র্থ খণ্ড, ১৫৭-৬০; মার্কোপলো, ২য় খণ্ড, ৪৬৫; জি, ফেরাণ্ড, টেক্স্‌ট রিলেটিফ্‌স এ লা এক্‌সট্রীম ওরিয়েন্ট (৪৩১-৩)>।

পরিচ্ছেদ ১১

১। যে নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে চীনাকে ভেদ করে ক্যান্টেনের সমুদ্রে এসে পড়েছে সেই মহা নদীর বিবরণ পাঠ করলে মন হয় যে এ বিবরণ অনেক সময় প্রমাণ করছে যে ইব্‌নে বতুতার চীন ভ্রমণ একটি নিছক গল্প। এ কথা মনে রাখতে হবে যে ইব্‌নে বতুতা চীনের বর্হিভাগে নিজে ভ্রমণ করেছেন সেটা ব্যতীত চীন সম্বন্ধে তার অধিক কিছু জানা ছিল না। এবং তিনি যে সব বিষয় সংগ্রহ করেছেন সেগুলি বিভিন্ন সংবাদদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত (তার সব সময় নির্ভরযোগ্যও ছিল না)–এবং স্থানে তিনি সে সময়ের সাধারণ মতকে পুণঃপ্রকাশ করেছেন। 'জীবনের নদী' এর প্রথম অধ্যায়ে পিকিং এবং ইয়াংসির মধ্যস্থিত গ্রাণ্ড ক্যানাল। সমুদ্র উপকুলে অবস্থিত সওদারগণ আভ্যন্তরিক জল-পথের ব্যাপারে স্বল্পই জানতেন। এই জল-পথ হ্যাংচাও এবং ইয়াংসিকে পশ্চিম নদী এবং ক্যান্টনের নদীর সঙ্গে সম্ভবতঃ সিয়াংকিয়াংয়ের

ভিতর দিকে যুক্ত করেছিল— এবং তার ফলে পিংকিয়াংয়ের মোহনাকে সমস্ত জল-পথ বলে মনে করেছিলেন। ইব্‌নে বতুতার এই বিবরণকে ব্যাখ্যা করা কঠিন যে জেতুন (তিসুয়ান-চাও-ফু) আভ্যন্তরিক জল-পথের দ্বারা ক্যান্টন এবং হ্যাংচাওয়ের সঙ্গে। এখানে বোধ হয় তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলেছেন। কালিকুট এবং কুইলনের মাঝখানে স্থলপথে ভ্রমণ সম্বন্ধে আমরা যেমন উপরে দেখেছি (পরিচ্ছেদ ৭, টীকা ১৭) ইব্‌নে বতুতা অপ্রয়োজনীয় বলে ভূভাগের বর্ণনা বাদ দিয়েছেন অথবা তার ভ্রমণকাল এবং তার দশ বছর পরে ভ্রমণ বৃত্তান্তের মৌখিক বিবৃতি দেওয়ার সময়ে সম্ভবতঃ সে ভুলে গিয়েছেন। এ কথা লিপিবদ্ধ করা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কতিপয় চীনে সহ অন্য সব লেখকও জেতুনকে সেই একই জল-পথের তীরে অবস্থিত বলে স্থির করেছেন। যেমন হ্যাংচাওও উক্ত জল-পথের উপর রয়েছে, (খান্‌সা বাক কুইন্‌বো)। (ইউল এবং ডান্ মজিক ছাড়াও আরও, হার্টম্যান, দার ইস্‌লাম, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩৪)।

২। পর্ডিনানের ফ্রাইয়ার ওডোরিকও মন্তব্য করেন ফাচোর সম্পর্কে, "পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোরগ এখানে দেখতে পাওয়া যায়"; কিন্তু তিনি আবার ক্যান্টনের রাজহাঁস সম্বন্ধে বলেন যে তারা "বৃহত্তর, সুন্দর এবং সস্তা পৃথিবীর যে কোনো স্থানের রাজহাঁস অপেক্ষা" (ক্যাথে ২য় খণ্ড, ১৮১, ১৮৫)।

৩। প্রথম যুগের একজন পর্যটক (Voyage de Marchand arabe Sulayman--- en 851, অনুবাদক জি, ফেরাণ্ড, পৃঃ ৫৫) আমাদের বলছেন যে চীনেগণ তাদের মৃত ব্যক্তিকে কবর দিতেন যেমন এখনো দিয়ে থাকেন। কিন্তু মার্কোপলো বার বার শবদাহের কথা উল্লেখ করেছেন—মনে হয় এটা চীন দেশে তখন একটি সাধারণ প্রথা ছিল।

৪। বালিস্ত কিম্বা বালিশ হচ্ছে মূলতঃ সাড়ে চার পাউণ্ড ওজনের একটি ধাতব পিণ্ড। তেরো শতাব্দীর শুরুতে এটা ছিল স্তেপ্ অঞ্চলের প্রচলিত মুদ্রা। শব্দটা সম্ভব মোগলগণ চীনে ভাষাতে আমদানী করেছিলেন। চীনে কাগজের অর্থ সম্বন্ধে 'মার্কোপলো' ১ম খণ্ড, ৪২৩ ff. দ্রষ্টব্য।

৫। মার্কোপলোর মতে ব্যবহার-করা নোটের অধিকারীকে নতুন নোট গ্রহণ করার সময় তার মূল্যের উপর তিন পারসেন্ট খরচ দিতে হতো (১ম খণ্ড, ৪২৫)।

৬। ক্যাথে (খিটে) প্রথমে মুসলিমগণ ব্যবহার করেন এং তাদের থেকে ইউরোপীদের পর্যটক এবং ধর্ম-প্রচারকগণ ব্যবহার করেন তেরো থেকে ষোলো শতাব্দীর মাঝে। শব্দটি ব্যবহৃত হয় চীনের উত্তর অংশ সম্বন্ধে দক্ষিণ অংশের সিন্ বা খাশ্ চীনের বিপরীত নাম হিসেবে। নামটি এসেছে কিতে কিম্বা খিতে তুর্কীদের থেকে। এরা একটি রাজ্য স্থাপন করেন। (লিয়ায়ো রাজ্য) এবং দশ ও এগারো শতাব্দীতে পিকিংয়ে রাজত্ব করেন। সিন্‌কিম চীন (চীনা) নাম খুব সম্ভব সেই একই প্রকার গৃহীত হয়েছে তা-সিন্ রাজত্ব থেকে (২৫৫-২০৯ খ্রীঃ পূর্ব শতাব্দী)।

৭। এখানে ইব্‌নে বতুতা পাথর কয়লার সঙ্গে পর্সেল্গিন কাদার একত্র জড়িয়ে ফেলেছেন। সম্ভবতঃ এটা ঘটেছে চীনের সেই প্রথার জন্য যাতে কয়লা চূর্ণ করে নিয়ে কাদার সঙ্গে মেশানো হয় 'মৌলিক জ্বালানী' তৈরী করার জন্য (মার্কোপলো ১ম খণ্ড, ৪৪২-৩ দ্রষ্টব্য)।

৮। এ কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে মধ্যযুগে মুসলিম এবং ক্রিশ্চান উভয় পর্যটকের নিকট যে শহরটি জেতুন নামে পরিচিত সেটা তিস্'ওয়ান চো-ফু (চুয়ান-চৌ-ফু, ২৪-৫৩ উত্তরে, ১১৮-৩৩ পূর্বে)। এই পরিচয়ের পক্ষে যুক্তি এবং চ্যাং-চু-ফুর (এময়) দাবির বিচার দেখা যাবে মার্কোপলোর বিবরণে, ২য় খণ্ড, ২৩৭।

৯। মধ্যযুগীয় ইতালির জেটানির মারফত জেতুনি শব্দ থেকে স্যার্টিন এসেছে বলে ইউল কতকগুলি জোরালো যুক্তি খাড়া করেছেন, (ক্যাথে ৪র্থ, ১১৮)।

১০। সিজিলমাসা ছিল দক্ষিণ মরক্কোর অন্তর্গত তাফিলেল্টের নিকটবর্তী। নিচে ১৪ পরিচ্ছেদ, টিকা দ্রষ্টব্য।

১১। গ্রন্থের এ স্থানে 'দেওয়ান' শব্দটি 'পরিষদ' বলে গ্রহণ না করে (সেটা যে কোনো প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন) গ্রহণ করছি একটি প্রতিষ্ঠানরূপে যা উত্তর আফ্রিকায় এবং মিশরের সে সমস্ত বন্দর নামে পরিচিত যে সব বন্দর বিদেশী বাণিজ্যের জন্য মুক্ত–এর থেকে ইতালিয়ান দুগেন এবং ফ্রেঞ্চ দুয়ান শব্দের উৎপত্তি। এটা একই কালে শুল্ক-গৃহ, মালগুদাম, বাসাগৃহ এর বিদেশী বণিকগণের টাকার বাজার (এ কারণেই ইব্‌নে বতুতা এখানে বাসস্থান পেয়েছিলেন), এবং এর পরিচালক ছিলেন রাজ্যের অন্যতম কর্মচারী (মাসলট্রির Relations et Commerce de l' Afrique' Septentrionale, ৩৩৫ ff. দ্রষ্টব্য)। কয়েক পংক্তি নিচে ইব্‌নে বতুতা ক্যান্টন সম্বন্ধে বলছেন যে দেওয়ান পরিচালকের আওয়াতার মধ্যে এটা অবস্থিত ছিল।—সম্ভবতঃ এর মানে হচ্ছে এই যে সেখানকার বাণিজ্য ঘাঁটি তার সীমার মধ্যে ছিল।

১২। এ অংশটুকুর অর্থ সম্পূর্ণ পরিস্কার। কোরাণ অনুসারে আইনতঃ ভিক্ষা দিতে হবে "বাপ-মা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, দরিদ্র, এবং মুসাফিরদের। জেতুনের মুসলিম সম্প্রদায় এত সমৃদ্ধশালী ছিলেন যে এই ভিক্ষার যোগ্য পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে সেখানে কেবল শেষটিই ছিল।

১৩। আরব এবং পার্শিয়ান লেখকগণ (মার্কোপলোর মতো) মোগলের মহান খান কে কান কিম্বা কা'আন্ বলে অভিহিত করতেন। ইউল যেমন বলেছেন, এটা সাধারণ তুর্কী খান পদবী থাকান থেকে একটা পৃথক পদবী নয়। (শিরতরি, তুয়ো বাঙ্কোর অনুসন্ধান বিভাগের স্মারকলিপি, নম্বর ১, টকিও,১৯২৬,১৯-২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৪। সিন্‌কালান হচ্ছে পার্শিয়ান চিন্ কালানের আরবী রূপান্তর সংস্কৃত মহাচীনের পরিবর্তে–আরবী নাম সিন আস-সিনের অর্থও তাই।

১৫। এখানে বিষয়টি ত্রুটিপূর্ণ–এটা ঘটেছে একটি শব্দ ভুল লেখার জন্য কিম্বা অন্য শব্দ বাদ পড়ার জন্য।

১৬। টিসোয়ান-চু থেকে ক্যান্ টন্ অভিমুখে নদী পথে ইব্‌নে বতুতার পথ নানা কারণে অনিশ্চিত। ইউল একটি পথের কথা বলছেন ফুচো থেকে মিনের দিকে এবং কানের উঁচু সীমা থেকে মিলিং গিরিপথ হয়ে পিকিয়াং অবধি। মনে হয় এটা এক ঘোরালো পর্যটন–অথচ মি এবং টাং নদী পথে সোজা পথ রয়েছে, অবশ্য যদি নদী দুটি নৌ-চলাচলের যোগ্য থাকতো।

১৭। এ মন্দিরটি স্থির নিশ্চয়রূপে সনাক্ত করা হয়নি। ইউল বলেছেন এটা হচ্ছে "বিজয় এবং শ্রদ্ধার মন্দির।"আধুনিক নগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

১৮। গগ্ এবং ম্যাগগের প্রাচীর সম্বন্ধে কোরাণে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্‌কে বলা হয়েছে এর নির্মাতা। এ স্থানটি কোথায় তার নির্ধারণ আরবী ভৌগোলিকদের জন্য একটি সমস্যা। পৃথিবীর জনপদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এ স্থানটি রয়েছে বলে সাধারণের ধারণা এবং চীনের মহাপ্রাচীরের সঙ্গে এটাকে বিজড়িত করা হয়েছে। কিন্তু ইব্‌নে বতুতার হয়তো ধারণা ছিল না যে চীন সেই প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত এবং মনে হয় এলোমেলোভাবে তিনি প্রশ্নটি মীমাংসা করেছেন—সম্ভবতঃ মহাপ্রাচীর সম্বন্ধে কতকগুলি আকস্মিক কথা শুনবার পর।

মার্কোপলোও ফুকিন এবং কিয়ানংসি কিম্বা চি-কিয়াং পর্বত অঞ্চলে একটি মানুষ-খেকো জাতির কথা বলেছেন (২য় খণ্ড ঃ ২২৬ এইচ্ শিমিটখেনার, জিট্‌স্ ক্রিফ্‌ট্ দ্যর জেস্ ফার আর্ডকুণ্ডেজ, বার্লিন, ১৯২৭, ৩৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৯। কান-জান-ফুর স্থান নির্ধারণ এখনও অনিশ্চিত। ইব্‌নে বতুতা কর্তৃক স্থানটি জেতুন এবং খান্‌সার মাঝখানে নির্দিষ্ট করা যদি নির্ভুল হয়ে থাকে—তবে এর স্থান নির্ভর করবে সেই পথের উপরে তিনি যেটা অনুসরণ করেছিলেন। ইউল এটাকে কিয়াংসি প্রদেশ অন্তর্গত ফু-হো তীরবর্তী কিয়েন-চ্যাং-ফুর সহিত এক বলে ধরেছেন—এবং তার পরবর্তী ষ্টেশন বেওয়াম কুত্‌লুকে পো-ইয়াংসির সঙ্গে। এরূপ সনাক্তকরণের বিরুদ্ধে আপত্তি হচ্ছে এই যে (১) এতে করে অন্তর্গত করা হয় হ্যাংচাও পর্বত একটি ঘোরালো পর্যটন এবং তাতে করে হ্যাংচাওকেই সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়; (২) এবং এমন কোনো প্রমাণ নেই যে কিয়েনচ্যাং-ফুর ভিতর দিয়ে এত ঘন ঘন বাণিজ্য পথ রয়েছে (যেমন ইব্‌নে বতুতার পথ থেকে প্রদর্শিত হচ্ছে)।

যেহেতু হ্যাং-চাওতে পৌঁছতে ইব্‌নে বতুতার লেগেছিল ৩১দিন এবং উল্টো পথে মার্কোপলোর ২৭ দিন, সেজন্য এটা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে তারা মূলতঃ একই পথ অবলম্বন করেছিলেন। এক্ষেত্রে কান্-জান্-ফুর জন্য স্বাভাবিক সনাক্তকরণ হচ্ছে ফুচাও। এর স্বপক্ষের হচ্ছে ঃ (১) একজন নিজস্ব গবর্ণর এবং বৃহৎ সৈন্য-নিবাস সহ নগরের পরিসর (যেটা মার্কোপলের বিবরণের সঙ্গে বেশ মিলে যায়); (২) বন্দরে "একটি বৃহৎ জাহাজের আগমন", মার্কোপলো পরিষ্কার রূপে বল্‌ছেন যে "জেতুন থেকে জাহাজগুলি সেই নদী দিয়ে সোজা ফিউজু নগরে এসে পৌঁছে যে নদীর কথা আমি বলেছি—এবং এভাবেই ভারতের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য এখানে এসে থাকে।" ভারতের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য এখানে এসে থাকে।" ফিউচো জেলাকে মার্কোপলো যে নাম দিয়েছেন যেমন চক্কা বা কঞ্চা (নগরের আসল নাম হচ্ছে চিন্‌কিয়ান) তাতে করে হয়তো সেটা কান্-জান্-ফুতে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে ফিউচো থেকে জেতুন যাওয়ার পথ মার্কোপলো কেবল পাঁচদিন বলেছেন—এতে মনে হচ্ছে মিন্ নদীর আরো উজানে কোনো স্থানকে তিনি নির্দেশ করছেন (মিন নদীর নৌ-চলাচল সম্বন্ধে মার্কোপলো ২য় খণ্ড, ২৩৪ দ্রষ্টব্য)।

ডিউলাওরিয়ার বল্‌ছেন কান্-জান্-ফু হয়তো চিন্-কিয়াং-ফুর পরিবর্তে ইয়াংসি এবং গ্রাণ্ড ক্যানালের সন্ধিস্থলে অবস্থিত—এতে করে এ স্থানটি হবে খান্ পা এবং খান-বালিকের (পিকি) মাঝখানে। এ রকমের ভ্রান্ত স্থান নির্ধারণ ইব্‌নে বতুতার ক্ষেত্রে খুব বেশি দেখা যায় না-কিন্তু চিং-কিয়াং-ফু কদাচিং তার বিবরণের যোগ্য বলে মনে হয়। এম্ ফেরাণ্ড মার্কোপলোর কেন্-জানফুকে কান্-জান্-ফু বলে গ্রহণ করেছেন—এটা হচ্ছে চীনের পুরাতন রাজধানী —এখন শেন্-সির উউ নদীর তীরে সি-আন্-ফু আরব ভৌগলিকগণ একে বল্‌তেন খুসদান। এই সনাক্তকরণ এম্ ফেরাণ্ডের মতের মতোই একটি ব্যাপার যাতে তিনি বলেছেন যে ইব্‌নে বতুতা আদৌ চীন দেশ ভ্রমণ করেননি। এ কথা ধরে নেওয়া যথেষ্ট নিরাপদ যে মুস্‌লিম সওদাগরগণ ফিউচাওয়ের স্থানের কান্-জান্-ফু নাম ব্যবহার করেছেন (যেমন সাওয়ান-চাওর স্থানে জেতুনের মতন), অথবা ইব্‌নে বতুতা ওই একই ধ্বনির দুটি নাম একত্র জড়িয়ে ফেলেছেন।

২০। ঘুটা হচ্ছে দামাস্কাসের চারদিকে ঘোরান বৃক্ষ শোভিত প্রশস্ত প্রান্তরের নাম।

২১। চীনের আধুনিক নামচিত্রে এ নামের সম্পর্কিত কিছু অনুসন্ধান করা সময়ের অপব্যয় হবে—এর স্থান নির্ধারিত হতে পারে কেবল উল্লেখিত অন্য শহরগুলির উল্লেখ দ্বারা। এটা সম্পূর্ণ

সম্ভব যে এ-কোনো স্থানের নাম নয়—বরঞ্চ কোনো তুর্কী তাতার সেনাপতির নাম (বেআন কুৎলাঘ="সৌভাগ্যবান বেআন")-এটাই ইব্‌নে বতুতা ভুলক্রমে একটি শহরের নাম বলে গ্রহণ করেছিলেন।

২২। খ্রীষ্টান এবং মুসলিম উভয় পর্যটক দল কর্তৃক এ কথা স্বীকৃত যে, মার্কো পলো যাকে "কিনসের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত নগর...সমস্ত তর্কের অতীত পৃথিবীর সুন্দরতম এবং মহান" বলে অভিহিত করেছেন সেটা বাস্তবিকই চৌদ্দ শতাব্দীতে পৃথিবীর বৃহত্তম নগর ছিল। এতে করে যে প্রশংসাবাদ জেগে উঠে সেটা পরিণত হয় আতিশয্যে, যেমন মার্কোপলো বলেছেন যে "এর রয়েছে শত মাইল পরিসর, এতে রয়েছে বারো হাজার প্রস্তর নির্মিত সেতু এবং অধিকাংশ সেতু এতটা উঁচু যে তাদের তলা দিয়ে বৃহৎ নৌবহর চলে যেতে পারে। সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ইব্‌নে বতুতার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ইউলের ভাষায় "এতে রয়েছে সন্দেহজনক উক্তি।" খান্‌সা নামটি হচ্ছে আরবীর রূপান্তর (একজন আরবীয় মহিলা কবির নামের সঙ্গে সংযুক্ত) আর কিন্‌সে ক্যানসে, ক্যাসে ইত্যাদি হচ্ছে চীনে কিং-সে রাজধানীর ইউরোপীয় রূপান্তর। হ্যাং-চাও হচ্ছে ১১২৭ থেকে ১২৭৬ পর্যন্ত সাং রাজত্বের রাজধানী।

২৩। সিটাডেল বা দূর্গ শব্দের অনুদিত মানে হচ্ছে "শাসক বা গবর্ণর কর্তৃক অধিকৃত অভ্যন্তরিক নগর। শাসকের প্রাসাদ হ্যাং-চাওয়ের কেন্দ্রস্থলে ছিল না—বরঞ্চ এটা ছিল দক্ষিণ প্রান্তে।

২৪। "চেইন অব্ হিষ্টোরিতে" বলা হয়েছে "আশী বছর বয়সে উপনীত হলে একজন ব্যক্তিগত করদান থেকে মুক্ত হয় এবং রাজকীয় কোষ থেকে ভাতা পেয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে চীনেগণ বলেন "যৌবন কালে এ ব্যক্তি ট্যাকস দিয়েছেন এখন সে যখন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তখন তাকে আমরা ভাতা দেবো।" (ফেরাণ্ড সুলেমান সওদাগরের Voyage du marchand Sulayman, ৬৩ পৃঃ)।

২৫। কার্টে মনে হয় ক্যারাটের সংক্ষিপ্ত শব্দ। একটি সাধারণ তুর্কী পদবী—কিন্তু যতদূর জানা যাচ্ছে কোনো চীনে গ্রন্থে এ নামের কোনো শাসকের নাম উল্লেখিত হয়নি। এটা সম্ভব যে তুর্কী সৈন্যগণ তাদের সেনাপতিকে এ পদবী দিয়েছে—গ্রন্থের এ অংশে ইব্‌নে বতুতা আরো অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি চীনে শব্দ নয়। বরঞ্চ তুর্কী কিম্বা পার্শিয়ান। এ ভাবে তিনি তার তুর্কী-ফার্সি পদবী "রাজা" ব্যবহার করেছেন সম্রাটের নাম রূপে। নিচের ৩২ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬। তোয়া কিম্বা তু'ই হচ্ছে একটি তুর্কী শব্দ—এর অর্থ ভোজ কিম্বা উৎসব।

২৭। ইউল মন্তব্য করেছেন যে আনন্দপ্রদ ছন্দ ধ্বনিত হচ্ছে ঠিক এই পংক্তিটিতে—

প্রভাত না হলে মোরা ফিরিব না ঘরে,

কিছুটা মুক্ত অনুবাদ দেওয়া হয়েছে এ ভাবেঃ

আবেগের আলোড়নে বিসর্জিত আমার হৃদয়,
বিক্ষুব্ধ সমুদ্র সম তরঙ্গ আঘাতে;
কিন্তু যবে হয়েছি নিমগ্ন পুনঃ উপসনা মাঝে
বিদূরিত হলো মোর সব দুঃখ তাপ!

কবিতার শেষ পংক্তিটি সঠিক ভাবে পড়া বা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হয় না।

২৮। মার্কোপলোও হ্রদে আনন্দ-বিহারের কথা বলেছেন—কিন্তু নকল যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেননি। (২য় খণ্ড, ২০৫)।

২৯। এ উক্তি সম্পর্কে ইউল যথার্থরূপে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এটা সত্যের এত বিপরীত যে লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে, ইব্‌নে বতুতা আদৌ হ্যাং-চাও ছাড়িয়ে আরো দূরে ভ্রমণ করেছেন কি না" (খ্যাথে ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭)।

৩০। মোগলগণ পিকিংকে বলতেন "খান-বালিক" মানে খানের নগর, পশ্চিমী লেখকগণ বলেছেন ক্যাম্বালু এবং ক্যাম্বালুক। খানিকু নাম ব্যাখ্যা করা হয়েছে একটি বিশেষণ রূপে, কানের নগর (এসিয়াটিক জার্নাল, মে, ১৯১৩, ৭০১ পৃঃ)

৩১। দুইয়ের পরিচ্ছেদ, টীকা ১২ দ্রষ্টব্য।

৩২। সম্ভবতঃ পারশিয়ান পাশ্‌দা বাজার বিকৃতি (টীকা ২৫ দ্রষ্টব্য)। রাজত্বকারী সম্রাট ছিলেন তগন তাইমুর (রাজত্বকাল ১৩৩৩-৭১)।

৩৩। কারাকুরাম হচ্ছে মোঙ্গলদের প্রথম রাজধানী, এর জায়গায় বর্তমানে অবস্থিত রয়েছে আরদেনি-সো, অর্ খন্ নদীর ডান তীরে উর্গা নদীর ২০০ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বাহির মোঙ্গালিয়ার অন্তর্গত কারাবল্‌গাসুনের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে।

বিসবালিক অবস্থিত ছিল বর্তমান গুচেনের উপরে বা নিকটে। জন গেরিয়ার অন্তর্গত উরুমসির পূর্বে।

৩৪। এখানে ইব্‌নে বতুতা একজন তাতার প্রধানের সমাধি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের যথার্থ বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয় তিনি যেটা দেখেছেন সেটা সম্রাটের সমাধি-ক্রিয়া নয়—অবশ্য যদি বর্ণনাটি সরাসরি হয়ে থাকে।

৩৫। যেহেতু এই ফিরোজকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হয়, এবং যেহেতু খানের আবাসস্থল ১৩৭১ খ্রীস্টাব্দে তোগন তাইমুরের মৃত্যুর পরবর্তীকাল পর্যন্ত কারাকুরামে স্থানান্তরিত হয়নি (অবশ্য যদি চীনে দলিল পত্র সত্য হয়ে থাকে), সেজন্য ১৩৫৬ খ্রীস্টাব্দের লেখা গ্রন্থে এই অংশের উপস্থিতি এখনো বর্তমান রয়েছে-সেটা এমন একটি সমস্যা যা ঐতিহাসিকের অপেক্ষা সাইকিক সোসাইটির অনুসন্ধানেই অধিক উপযোগী।

পরিচ্ছেদ ১২

১। সিন্দবাদ কাহিনীর কল্যাণে রুখ্ শব্দটি ইউরোপে যথেষ্ট পরিচিত। কাজেই এটার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই বিপুলকায় পাখির গল্পের মূল উৎস কি, সে সম্বন্ধে ইউল্ মার্কোপলোর বিবরণের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (২য় খণ্ড, ৪১৫-২০)। দু একজন আরবী লেখক এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এবং দেখা যাচ্ছে ইব্‌নে বতুতা এ সম্বন্ধে বেশ বিবেচকের মতো কোনো মত প্রকাশ করেননি। মরীচিকা বা অস্বাভাবিক আলোক প্রতিসরণের দ্বারা এই ব্যাপক প্রচলিত গল্পকে চালু করার ব্যাপারটি সম্বন্ধে তার বর্ণনায় অবশ্য ইঙ্গিত রয়েছে।

২। কুরেয়াত (করিয়াত) এখনো আমাদের মানচিত্রে দেখা যায়। শাবা এবং কাল্‌বা অন্ততঃ এ রকম নামে দেখা যাচ্ছে না—তবু মনে হয় স্থান দুটি বর্তমান রয়েছে। কেননা ওমান উপকূলে এখনো একটি ধারাবাহিক গ্রামশ্রেণী রয়েছে।

৩। কারাজ বা কারজিন ঠিক সাক্কান (মুণ্ড) নদীর তীরে কিছুটা পূর্বমুখী বাঁকে অবস্থিত। ইব্‌নে বতুতার পথ এ স্থান থেকে সিরাজ পর্যন্ত নদীর উপত্যকার উপরের দিকে। বাসা (ফাসা)

এবং শিরাজের মাঝখানের পথে ছিল খাওরিস্তান শহর–এটাই সম্ভবতঃ ইব্‌নে বতুতার কাউরেস্তান (৩য় খণ্ড, ২২ টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুর সুলতান আবু হাসান স্পেনের অভ্যন্তরে সসৈন্য অভিযান করেন এবং তারিফার নিকটবর্তী রিয়ো স্যালাডু নামক স্থানে ক্যাস্টিলের একাদশ আল্ ফন্‌সোর কাছে সেই একই বছরের ৩০শে অক্টোবর সম্পূর্ণ পরাজিত হন। আল্ ফন্‌সো ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে আল্‌জেসিরাস অধিকার করে তার বিজয় সম্পন্ন করেন, কিন্তু বিজ্রাল্টার পুনঃ অধিকারের চেষ্টায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সে সময়ের জিব্রাল্টার অবরোধের বিবরণ ইব্‌নে বতুতা তার পরবর্তী পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

৫। শেখ হাসান এবং সুলতান আবু সাইদের মাঝখানের সম্পর্ক ইব্‌নে বতুতা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছেন (উপরের ১০০ পৃষ্ঠায়)। এই বড় শেখ্ হাসান আমির চুবানের পৌত্র ছোটো শেখ্ হাসানের সঙ্গে আট বছরের সংগ্রামের পর জালাইর কিম্বা ইলকানি রাজত্ব স্থাপন করেন– এবং পনেরো শতাব্দীর প্রথম দিকের বছরগুলি পর্যন্ত তারা ইরান এবং আজারবাইজান শাসন করেন।

৬। হিট্ এবং আনা এখনো আমাদের ম্যাপে দেখা যায়। বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে ইউফ্রেট্ নদীর তীরে অবস্থিত। হাদিজ্জা, এখন কালাত হাবুলিয়া বলে অভিহিত। এটা আনার ৩৫ মাইল নিম্নে ছিল। এবং আন্‌বার ছিল পূর্বে ইরাকের অন্যতম একটি প্রধান নগর হিটের কিছু দূর নিম্নে ইসা খালের মাথায়। এটা হচ্ছে নৌ-চলাচল উপযোগী অন্যতম প্রথম খাল। এই খাল দ্বারা যুক্ত হয়েছে ইউফ্রেটের সঙ্গে তাইগ্রিস। ঘন লোকবসতী এবং বিপুল পরিমাণ ফলের জন্য হিট্ জেলা ছিল বিখ্যাত।

৭। রাহ্‌বার অবস্থান ইউফ্রেটের সঙ্গে যুক্ত কাবুর নদীর সম্মিলন স্থানের আঠারো মাইল নিম্নে নদীর পশ্চিমে একটি খালের ধারে।

৮। সুখ্‌না হচ্ছে মধ্য ইউফ্রেটস্ এবং পামিরার মধ্যবর্তী পথের একটি ষ্টেশন। পামিরা থেকে প্রায় ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

৯। ১ম পরিচ্ছেদের ২৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। এখন তুরস্কের একটি বৃহৎ শহর।

১১। এই মারী হচ্ছে প্রসিদ্ধ "মহামড়ক"। এ বছরের মধ্যে এই মহামারী মুসলিম জগতে অবর্ণনীয় ধ্বংস সৃষ্টি করে। মোঙ্গল এবং তৈমুরলঙের আগমন অপেক্ষা এই দুর্ঘটনা কম ভয়ঙ্কর ছিল না। ইব্‌নে বতুতার হিসাব খুব বেশী আতিশয্যাপূর্ণ নয়– অবশ্য কতকগুলি হিসাব খুব বেশী ধরা হয়েছে। ঐতিহাসিক ইব্‌নে খালদুনের বাবা এই মহামারীতে তিউনিসে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন। তিনি বলেন, "এই সর্বগ্রাসী মহামারী জাতিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, নিয়ে গিয়েছে এ যুগের বংশধরদের, সভ্যতার অনেক অপূর্ব সম্পদ লুপ্ত করে দিয়েছে-নর এবং প্রাসাদরাজী ধূলিসাৎ হয়েছে-পথ এবং পথের নির্দেশন হয়েছে নিশ্চিহ্ন.....এ যেন স্রষ্টা নিজে তার সৃষ্টিকে অধঃপাতের মাঝে আহ্বান করেছেন এবং পৃথিবী তা মেনে নিয়েছে।"

১২। মরক্কোর ম্যারিনিদ রাজত্ব। উপক্রমনিকা ১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১৩। "শত্রু" বল্‌তে এখানে নিঃসন্দেহে ক্রিশ্চানদের মনে করা হয়েছে– কিন্তু বাক্যটিতে কোনোক্রমেই কোনো সংঘবদ্ধ সামুদ্রিক যুদ্ধের উল্লেখ নেই। সে সময়ে একমাত্র খ্রীষ্টান রাষ্ট্র ছিল সিসিলি যার সঙ্গে তিউনিসের ভালো সম্পর্ক ছিল না। এর য়্যাড্‌মিড়াল রোজার ডোরিয়া ১২৮৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে জেরবা অধিকার করেছিলেন। ১৩৩৫ সালে অন্যান্য দ্বীপসহ মুসলিমগণ

এ স্থানটি পূর্ণ দখল করেন– এবং পরবর্তী যুগে সিসিলিয়ানগণ কর্তৃক দ্বীপটি অধিকারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চলেছিল। এটা খুব সম্ভব যে জাহাজটি খ্রীষ্টান জলদস্যুদের হাতে পড়েছিল–সে সব শতাব্দীতে (মাস ল্যাট্রির মতে) এদের অত্যাচার বারবারি জলদস্যুদের অপেক্ষা ছিল বেশী ভয়ঙ্কর (Relations of l' Afrique septentrionale, ১০৪-৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৪। মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক যে সব গ্রন্থ আমি পড়েছি তাতে কোথাও বুলিয়ানা চোখে পড়েনি। আমার মনে হয় স্থানটি হচ্ছে নেবায়েল, একটি ছোটো বন্দর, তিউনিস্ থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। ইদ্রিসির মত অনুসারে সেখানে একটি দূর্গ ছিল।

১৫। পোতাশ্রয়ের বর্ণনা থেকে নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় যে এটা সে সময়ে আরাগনের অধীন ছিল। ক্যাটালান জাহাজ সমূহের প্রাকৃতিক আশ্রয় স্থান। রিজা পর্টোল্যানে একে বর্ণনা করা হয়েছে "bon porto fato per forza of palangade রূপে। ইব্‌নে বতুতা সে ভয় পেয়েছিলেন সেটা ব্যক্ত করা হয়েছে এর ডাকাত প্রকৃতির অধিবাসীদের ক্রিয়াকার্য থেকে। (Les faubourgs de Cagliari servaient de repaire aux forbans মাস ল্যাট্রি, ৪০৫)।

১৬। আল-ওবাদ গ্রামটিকে সিদি বু মাদিনে নামক তীর্থস্থানের নাম অনুসারে সাধারণতঃ সিদি বু মাদিন বলা হয়–টিলেমসেন থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। মস্‌জিদটি নির্মিত হয়েছে ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দে। আল্‌জেরিয়ায় মুরিস স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন।

১৭। আজঘান্‌ঘান্ (লিও আফ্রিকানাসের অজগানুগান) ছিল এক বার্বার উপজাতি। এরা বাস করতো মেলিলা এবং মুলুয়া নদীর মাঝখানের উপকুলের নিকটবর্তী স্থলে।

১৮। উক্তিটি ভৌগলিক ওসারি সমর্থন করেছেন। তিনি বলছেন সোনার মিস্‌কালে (=দিনারের সমান) রয়েছে ১২০ দিরহাম, ষাটটি পুরা দিরহামের সমান এবং তিনটি পুরা দিরহাম মিশর এবং সিরিয়ার একটি দিরহামের সমান। তিনি বল্‌ছেন দিরহাম শব্দটি কোনো বিশেষত্ব ছাড়াই ব্যবহৃত হতো–এর অর্থ হচ্ছে "ক্ষুদ্র দিরহাম।" ম্যারিনিদের বৃহৎ সোনার দিরহামের ওজন ৮৭ গ্রেন, মূল্য ১৪·৫° ফ্রাঙ্ক; আল্‌মরাভিডের ক্ষুদ্র দিনারের ওজন ৬৫ গ্রেন, মূল্য ১০·৯৩ ফ্রাঙ্ক। ইব্‌নে বতুতা ভারতীয় সোনার মোহর তংখার উল্লেখ করেছেন, এর ওজন ১৭৫ গ্রেন, মূল্য আড়াই মরক্কান ডিনার–বৃহৎ দিনার অপেক্ষা ছোট দিনারের ব্যাপারেই এটা অধিক প্রযোজ্য। ১২০ মূল্যের ক্ষুদ্র দিনার ম্যারিনিদের সোনার দিনারের তুলনায় ১২ সেন্টাইম মূল্যের। এর অর্থ যদি আল্‌মরাভিদ দিনার মনে করা হয়ে থাকে তবে এর মূল্য হবে ১০ সেন্টাইম। মিশরের নুক্রা বা দিরহামের উচ্চতম মূল্য ৭৫ সেন্টাইমের কাছাকাছি এবং সাধারণতঃ এর মূল্য ধরা হয় ৫০ এবং ৬০ সেন্টাইমের মাঝামাঝি (ইউলের 'ক্যাথে' ৪র্থ খণ্ড, ৫৪ ff.; ম্যাসিগ্‌নন্, Le Maroc dans les premieres annees du XVIe siecle (আল্‌জার, ১৯০৬) ১০১-২; আল 'ওমারি' মাসালিক আল-আবসার অনুবাদ দেমমবিন্‌স (প্যারিস ১৯২৭), ১ম খণ্ড, ১৭৩ দ্রষ্টব্য)।

১৯। বাক্যটি হচ্ছে পুনরায় সলেমনের পূর্ব স্মৃতি। ১ম পরিচ্ছেদ টীকা ২৮ দ্রষ্টব্য।

২০। আমি এটা নিচ্ছি মিশরের সাধারণ মুনুখিয়ার (Corchorus olitorius) সম্পর্কে।

২১। এখানে ইমামতের অর্থ হচ্ছে খিলাফত। ইব্‌নে বতুতা মনে করেন যে মরক্কোর শাসকগণ বিশেষভাবে আবু ইনান কর্তৃক খলিফা বা মুসলিমগণের নেতা পদবী গ্রহণ করায়

পশ্চিম দেশের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই কয়েক ছত্র পিছে দেন সিংহাসনের পদবী আল্-মুতাওয়াকিল। এ পদবী সুলতান গ্রহণ করেছিলেন বাগ্দাদের খলিফাগণের অনুকরণে। সে সময়ে কোনো সর্বজনসম্মত খলিফা ছিলেন না। কায়রোর নামমাত্র খলিফাগণকে পশ্চিম অঞ্চলের কেউ স্বীকার করতেন না। বর্তমান কাল অবধি মরোক্কোর সুলতানগণ এই পদবী রক্ষা করে চলেছেন।

পরিচ্ছেদ ১৩

১। একাদশ আলফন্সো এবং জিব্রল্টারের অবরোধ সম্বন্ধে ১২ পরিচ্ছেদ এবং ৪ টীকা দ্রষ্টব্য। এ পরিচ্ছেদের অস্বাভাবিক তিক্ত সুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে মুর এবং স্পেনিয়ার্ডদের সে সময়ে মেজাজ ও মনোবৃত্তি যা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আন্দালোসিয়া পুনরায় জয় করার সময়ে এবং পরবর্তী শতাব্দী কালে।

২। ইদ্রিসিতে সুহেইল নামক স্থানের উল্লেখ নেই। 'মাকারি'তে একে বর্ণনা করা হয়েছে মালাকার পশ্চিমে অসংখ্য গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ জেলা রূপে (১ম খণ্ড, ১০৩)। এর ভিতরে রয়েছে সুহেইল পর্বত এবং এটাই আন্দালুসের একমাত্র পর্বত। এখান থেকে দেখা যায় সুহেইলের কনাষ্টিলেশন (Conopus)। ইব্নে বতুতার বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে স্থানটি হচ্ছে মারবেলা এবং মালাগারের মধ্যভাগে উপকূলের বিস্তৃতি।

৩। আল্-হাম্মা, অর্থাৎ উষ্ণপ্রস্রবণ, কিম্বা থার্মা। এটা একটি স্থানের নাম। সমস্ত আরব দেশগুলিতে প্রায়ই এ নামের ব্যবহার দেখা যায়। ইব্নে বতুতার একজন সমসাময়িক ব্যক্তি এ শহর সম্পর্কে বলেছেন ঃ "আলহাম্মার দুর্গ অবস্থিত রয়েছে একটি পর্বতের চূড়ায়। যারা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমন করেছেন তারা বল্ছেন এ শহরের নির্মাণ কার্যের দৃঢ়তা এবং এর পানির উষ্ণতার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানের তুলনা হয় না। সমস্ত অঞ্চল থেকে রোগীগণ এখানে আসে এবং রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত তারা এখানেই অবস্থান করে। বসন্তকালে আল্ মেরিয়ার অধিবাসীগণ সেখানে যান তাদের স্ত্রী এবং পরিজনদের নিয়ে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের উপরে যথেষ্ট ব্যয় করে থাকেন।" (মাসালিক আল্-আবসার)।

৪। স্থানটি এখনো তার বিকৃত আরবী নাম দিনামার কিম্বা আদিনামার রক্ষা করে চলেছে। স্থানটি বেশ সুন্দর এবং লোক-সমাগমে মুখর। এটা গ্রানাডার নিকটবর্তী (স্পেনে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৪৯)।

৫। সুলতান আবুল হাজাজ ইউসুফ প্রথম। ইনি ছিলেন গ্রানাডার নাস্‌রিদ রাজত্বের সপ্তম শাসক। এর রাজত্ব কাল ১৩৩৩ থেকে ১৩৫৪ পর্যন্ত। অন্য সব লেখকের গ্রন্থে তার রোগের প্রকৃতি বিবৃত হয়েছে বলে দেখা যায় না। যেহেতু ইব্নে বতুতা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি, সেজন্য মনে হয় তিনি আল্ হামরার অভ্যন্তর ভাগ দেখেননি। অন্য সব সমকালীন প্রাসাদের তুলনায় আল্‌হামরার গাঠনিক বৈশিষ্ট সম্বন্ধে তার মতামত জানতে পারলে সেটা খুব উপাদেয় হতো।

৬। একটি পাণ্ডুলিপিতে যে বিরা নামক স্থানটি পরিদৃষ্ট হচ্ছে সেটা মুদ্রিত গ্রন্থের টিরা অপেক্ষা অধিক গ্রহনীয়। টিরা নামক কোনো স্থানের উল্লেখ কোনো স্পেনীয় আরবী গ্রন্থে দেখা যায় না। আল্-বিরা হচ্ছে পুরাকালের এল্‌বিরা-মুরদের যুগে এর স্থান দখল করেছিল গ্রানাডা।

বর্তমানে এটা গ্রানাডা থেকে পনেরো মাইল পশ্চিমে। ইব্‌নে বতুতা স্থানটিকে দেখলেন ধ্বংসাবস্থায়। এ ধ্বংসের কারণ ছিল বোধহয় এল্‌বিরার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ ক্যাষ্টিলিয়ানদেরকে ১৩১৯ খ্রীস্টাব্দে পরাস্ত করেন। সম্ভবতঃ শহরটি পরবর্তীকালে পুনঃ নির্মিত হয়েছিল। কেন না গ্রানাডার বিরুদ্ধে ফার্ডিনাণ্ডের শেষ অভিযানের ইতিহাসে এটার উল্লেখ দেখা যায়। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এ শহরটি তিনি অধিকার করেন (প্যাসকুয়াল দ্য গেয়াংগোস, ২য় খণ্ড, ৩৫০-১, ৩৭৭; মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৮০৫; আল ওমারি, দেমোমবাইন্‌দ অনুদিত, ২৪৫ পৃঃ)।

৭। ধাক্‌ওয়ান কিম্বা আক্‌ওয়ানকে একটি গ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন একজন প্রথম যুগের লেখক। এ স্থানটি হচ্ছে মালাকার পশ্চিমে এবং ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ড কর্তৃক স্থানটি অধিকৃত হওয়ার সময়ে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটি বৃহৎ জনবহুল দুর্গবেষ্টিত শহর রূপে (ইব্‌নে আল্‌-আবার, তাক্‌মিলা, ৩৪৮; পি দ্যা গেয়াঙ্গোস, ২য় খণ্ড, ৩৭৪; মাক্কারি, ২য় খণ্ড, ৮০৩)।

৮। মারকুশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে আল্‌মুরভিদ রাজত্বের রাজধানী রূপে। ইদ্রিসির বিবরণ অনুসারে শহরটির দৈর্ঘ্য ছিল এক মাইল এবং তার প্রস্থও ছিল প্রায় অনুরূপ। শহরের যে প্রাচীর এখনো বর্তমানে রয়েছে তার দৈর্ঘ্য প্রায় সাত মাইল। ম্যারিনিদ্‌গণ কর্তৃক এর অবরোধ এবং অধিকারের এবং রাজধানী ফেজে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে শহরটি ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এখানকার কুতুবিয়া মস্‌জিদের মিনার এখনো বর্তমান রয়েছে এবং মুর-শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রূপে এটা এখনো প্রশংসিত।

পরিচ্ছেদ ১৪

১। আট এবং ষোল শতাব্দীর মাঝখানে আট্‌লাস্‌ পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত সিজিলমাসা ছিল একটি প্রধান বাণিজ্যি ঘাঁটি। পুরানো শহরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে ওয়াদি জিজের পাঁচ মাইল ব্যাপি স্থানের উপরে আধুনিক টাফিলেল্‌তের নিকটে।

২। তগৃহাজার নিমক-খনি তাওদেনির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নিমকের জন্য এ স্থানটি নিগ্রো সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

৩। ওয়াদি দ্রা এন্টি-আট্‌লাসের ঢালুকে পরিশ্রুত করে। মাসুফা নামটি মনে হয় সে সময়ে সান্‌হাজাকে দেওয়া হয়েছে-এটা ল্যাম্‌তুনা সহ স্মরণাতীত কাল থেকে পশ্চিম সাহারার প্রধান বংশ ছিল। ইব্‌নে বতুতার বিবরণ অনুসারে মাসুফা তাগৃহাজা থেকে তিমবুকতু পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে এয়ার এবং হোগার পর্যন্ত সমস্ত সাহারা অধিকার করেছিল।

৪। গ্রন্থে যে বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে (এটাকে ক্যান্টারস্‌ এন্‌ক্যান্টারড্‌ বলা যেতে পারে) সেটাকে গ্রহণ করা হয়েছে কোরাণ থেকে। সেখানে এর মানে হচ্ছে "অকথিত সম্পদ।"

৫। তাসারাল সম্ভবতঃ ইদ্রিসির তাইসার। এটা আজাওয়াদ মরুভূমিতে অবস্থিত (কুলি, ১৪-১৫)।

৬। আইওয়ালাতান হচ্ছে ওয়ালাতার বহুবচন। লিও আফ্রিকানাস্‌ অনুসারে স্থানটি গঠিত হয়েছে তিনখানা গ্রাম নিয়ে। আধুনিক ম্যাপে ওয়ালাতা নামে দুটি স্থান দেখা যায়। ইব্‌নে বতুতার ওয়ালাতান হচ্ছে দক্ষিণেরটি –১৭·০২ উত্তরে, ৬·৪৪ পশ্চিমে। তেরো শতাব্দীতে ট্রান্স

সাহারান বাণিজ্য পথের দক্ষিণ টারমিনাস রূপে এটা ঘানার স্থান দখল করেছিল (নিম্নে ২১ টীকা দ্রষ্টব্য)। এটা তৈরি হয়েছিল (হাটম্যান, Mit. Sem. Or. Stud. XV৩. ১৬২ অনুসারে) পুরাতন বার্বার শহর আওদাঘাশতের স্থানে।

৭। বাওবাব গাছ (Adansonia digitata) খুব স্বল্পকাল মধ্যে বৃহৎ ব্যাস লাভ করে থাকে—এবং লোকে তার গুঁড়িতে খোড়ল খুড়ে নিয়ে পানি রাখে। সেজন্য যেখানে ইন্দারা নেই সেখানে এ সব গাছ থাকার জন্য জন-বসতী সম্ভব হয়। এ উদ্দেশ্যে আঠারো শতকে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে এ গাছ পূর্ব সুদানে (কর্ডোফান) আমদানী করা হয়। কিন্তু ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায় কৃত্রিম ফোকড় তৈরি করার কাজ তখনো সেখানে প্রচলিত হয়নি।

৮। কুস্‌কুসু (ফরাসী ভাষায় কাউস-কাউস্) হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একটি সাধারণ ফসল জাতীয় খাদ্য-মোটাভাবে পেষা ময়দা সিদ্ধ করে তৈরি হয় এবং মিঠা চাট্‌নি সহযোগে খাওয়া হয়।

৯। জাঘাতি প্রথম সনাক্ত করেন দেলফসে দিওরার সঙ্গে। লিপার্ট এটাকে বার্থ তিউর-সংঘা নামে পরিচিত গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখিয়েছেন। স্থানটি বা-সিকুন্‌নু বা বাকিকুতেনুর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত (বার্থের ভ্রমণ, ইংল্যান্ডে সম্পাদিত, ১৮৫৭-৭, ৫,৪৮১; Mit sem. Or. St. III৩, ১৯৮—৯)।

১০। ওয়াংগারা (ওয়ানকুর, ওয়েকুর হচ্ছে একটি নাম। এটা পিউলস্ (ফুলানি) এবং সংহে সনিনকে বলে অভিহিত লোকদের দিয়েছেন (পর্তুগীজগণ এদের বলেছেন সারাকুলে), এবং বিস্তৃতভাবে সনিন্‌কে এবং ম্যালিনকে উভয় জাতিকে বুঝায়। এভাবে এটা আধুনিক প্রচলিত শব্দ ম্যান্‌ডে কিম্বা ম্যানডিংসোর সমতুল্য হয়েছে। এটা প্রকৃতপক্ষে ম্যালিন্‌কের নাম। ম্যালিন্‌কে এবং সনিন্‌কে একই পরিবারের অন্তর্গত। পরবর্তীটি উত্তর অঞ্চলের এবং পূর্বোক্তটি মধ্যবর্তী গ্রুপের (দেলাফুসে, এইচ, এস, এন, ১ম খণ্ড, ১১৪—৫, ১২২—৭)।

১১। ইবাদাইত হচ্ছে ইসলামের প্রথম শতাব্দীর একটি বিশেষ গোঁড়া সম্প্রদায়—এরা বিরোধী বা খারিজি নামে পরিচিত। একমাত্র সম্প্রদায়গুলি দেখা যায় ওমান, জাঞ্জিবার, দক্ষিণ, আল্‌জেরিয়ার মজাব জেলায়, ঘার দাইয়া প্রভৃতি স্থানে। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতীবান বলে বিখ্যাত। কিন্তু পুরনো মতের মুস্‌লিম সাধারন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন বা জনসাধারণই তাদের থেকে আলাদা থাকে। অথবা গ্রন্থের এ স্থানে যে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হয়তো মুজাবাইট্ সওদাগরদের একটি ঘাঁটি ছিল (M.S. O.S., Loc. Cit. ও এখানে দ্রষ্টব্য)।

১২। কারসাখুকে দেলাফুসে কারা-সাখু বলে ধরে নিয়েছেন, অর্থাৎ কারারা বাজার, "কঙ্গোকুরুর বর্তমান স্থানের নিকটে এবং এর সম্মুখে। নাইজারের বাম তীরে এবং কারার কয়েক মাইল উত্তরে।"

১৩। গ্রন্থের এ অংশে উল্লেখিত কাবারা তিম্‌বুকতুর নিকবর্তী সেই নামের সুপরিচিত বন্দর বোধ হয় নয়। দেলাফসে এটাকে জাফারাবার (দিয়াফারাবে) একটি নাম বলে মনে করেন।

জাঘা কিম্বা জাঘে, অধিক শুদ্ধভাবে বলা হয় জাকা বা জাগা (দিয়াগা) এটা বলা হয় তাকরুর রাজ্যের আদিম রাজধানীর নামানুসারে। এটা ছিল একটি বৃহৎ জেলা। এর অবস্থিতি নাইজারের উত্তর-পশ্চিম শাখার তীরে এবং জাফারাবার উত্তরে অর্ধেক দিনের সফর। এগারো

শতকের প্রথম দিকে সুদানে ইসলাম প্রচারের ভিত্তিস্থল হচ্ছে এই তাকরুর (মারকুয়াট, বেনিন্-স্যামলাং, ভূমিকা, ১৫০-১, ১৫৪, ২৪১)।

১৪। মূলী খুব সম্ভব সেই জেলাটি পরে যাকে বলা হতো মুরি, নিয়ামের কাছে নাইজার নদীর বাম দিকে অবস্থিত। এর বিপরীত তীরে অবস্থিত কুমবুরি) সম্ভবতঃ ইব্‌নে বতুতার কানবানি)।

১৫। ইব্‌নে বতুতার লিমিউনকে দেলাফুসে এবং মারকোয়ার্ট কেবে (কিবা) জেলার অধিবাসীদের নাম বলে গ্রহণ করেছেন। কুলির মতের সমর্থনে অনেক কিছু বলবার আছে। যেমন অন্য সব আরবী ভৌগলিকের উল্লেখিত লামলামের সঙ্গে লিমিস্‌দের সামঞ্জস্য রয়েছে। ভৌগলিক বাক্‌রী এদের বলতেন দাম্‌দম এবং এদের স্থান নির্দেশ করেছেন গাওগাওর নিম্নে নাইজারের তীরে। শেষোক্ত শব্দটির অর্থ আদমখোর– এ কোনো সুনির্দিষ্ট উপজাতির নাম নয়। ফুলবে ভাষায় এটা হয়েছিল নিয়াম-নিয়াম (ফুল্‌বের নিয়াম=খাওয়া), এটাই বিচিত্রভাবে আরবী রূপে পেয়েছে নাম-নাম এবং ইয়াম-ইয়াম শব্দে। এই শব্দটি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে উভয় আকারে প্রচলিত ছিল। ইব্‌নে বতুতা শুনেছেন "লিমিস্‌দের দেশের ইউফি থেকে সোফালায় স্বর্ণচূর্ণ আনা হতো" (পরবর্তী টীকা দ্রষ্টব্য) সোফালা থেকে ইউফি এক মাসের পথ। এই আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্য সম্পর্কে নিম্নের ৩৩ টীকা দ্রষ্টব্য। নিয়াম-নিয়াম শব্দটি অবশেষে বেল্‌ইজিয়ান কঙ্গোর একটি আদমখোর উপজাতির নামরূপে বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে এটা ভূমধ্যসাগরীয় কেচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। একজন আলবেনিয়ান অশ্বপালকের কাছে এফ্, ডব্লিউ হ্যাজ্‌লাক শুনছেন, সে দেখতে পেয়েছে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রক্তশোষক জীব-সেটার নাম নিয়াম্–নিয়াম সোই। (১) এই জীবটি যকৃৎ খেতে খুব ভালোবাসে, (২) এর দাঁত গাধার দাঁতের মতো, (৩) বৃহৎ পা" (কুলি, ১১২ ff.; হার্টম্যান; in M.S.O.S. XV৩ ১৭২; হ্যাজ্‌লাক্, লোটার্স অন্ রিলিজন এণ্ড ফোক্‌লুর, ৯)।

১৬। নিউপের সঙ্গে কুলির (৯৩ পৃঃ) ইউফির যে একই স্থানে বলে নির্ধারণ যার অবস্থিত জেব্বা এবং লোকোজার মধ্যবর্তী নাইজারের বাম তীরে সেটা পরবর্তী সমস্ত লোকে স্বীকার করেছেন।

১৭। নাইজারকে লাইনের সঙ্গে যুক্ত করে (সম্ভবতঃ বাহার আল্-গাজ্জালের দিক দিয়ে) ইব্‌নে বতুতা অন্ততঃ দুইটি প্রচলিত ভুল মতের স্বল্প ভ্রামাত্মকটি গ্রহণ করেছেন–এ ভুল মত প্রচলিত ছিল মুঙ্গো পার্ক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে। লিও আফ্রিকানাস এবং আরো অনেক প্রাথমিক ভৌগলিকগণ ইদ্রিসির অনুসরণে মনে করতেন নাইজার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত এবং সোনেগাল নদীর সঙ্গে এটাকে অভেদরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

১৮। ১২৭২ এবং ১৩২৩ শতকের মাঝখানে মিশরের সুলতানগণ অনেকবার ক্রিশ্চান রাজ্য নুবিয়া আক্রমণ করেছিলেন। এ সব অভিযান মিশরের সুবিধার পক্ষে কোনো কিছু সাফল্যজনক ছিল না। এতে করে নুবিয়ান রাজ্য শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ে। এবং চৌদ্দ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরব উপজাতি কান্‌জ বা কান্‌জ-আদ্–দৌলার হাতে ডঙ্গোলা পতিত হয়–এরা পূর্বে ছিল আস্‌ওয়ানের উত্তরাধিকারী আমির। ইব্‌নে বতুতা যাকে ইব্‌নে কান্‌জ, আদ-দীন নামে অভিহিত করেছেন–তিনি যদিও নিজে নব-দীক্ষিত নন-তথাপি তাকে নুবিয়ার প্রথম মুসলিম নরপতি বলে গণনা করা যায়। (মারকোয়ার্ট, ২৫২-৪)।

১৯। মাল্লি নামটি হচ্ছে ম্যান্‌ডে বা ম্যান্ডিংয়ের ফুলানি উচ্চারণ। এটা কোনো শহরের নাম নয়, একটি শাসক উপজাতির নাম। এর অবস্থিতি স্থান অনেক দিন থেকে তর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। কুলি (৮১-২ পৃঃ) এর স্থান দিয়েছিলেন সেগুর নিকটে বিন্নি নামে কথিত একটি গ্রামে "সামির উপর দিকে সাত মাইল" এবং সানসারা নদীকে নাইজারের একটি খাড়ী বলে গ্রহণ করেছিলেন। দেলাফোসে (এইচ, এস্‌, এন্‌ ২য় খণ্ড, ১৮১) এ মতটি গ্রহণ করেন যে মাল্লির অবস্থান " ছিল নাইজারের বাম তীরের একটি স্থানে, এটা নিয়ামিনার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং মরিবুগুর দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে কনিনা এবং কনড়ু গ্রামের সমস্তরে।...সুতরাং নিয়ামিনা থেকে কুলিকোরো যাওয়ার বর্তমান পথের কিছুটা পশ্চিমে মাল্লি অবস্থিত। মাল্লির দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত যে নদীটিকে ইবনে বতুতা সানসারা নাম দিয়েছেন বার্থ দেখেছেন সে নামটা এখনো প্রয়োগ করা হয় সেই ক্ষুদ্র নদীটিকে যেটা নিয়ামিনার নিম্নদিকে নাইজারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মারকোয়ার্ট (১০৫, ১৯১) কুলির মতটাই গ্রহণীয় মনে করেন, কিন্তু মাল্লিক স্থান নির্দেশ করেন নদীর কিছুটা নিম্নদিকে সিল্লে (সিলে) থেকে একদিনের পথ উপরে এবং এটাকে কুখা এবং জুগার সঙ্গে অভেদ বলে মনে করেন। এটা হচ্ছে পর্তুগীজদের কুইওকাইয়া।

[এই লেখা এবং ম্যাপ তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেল যে এম, ভাইডাল এবং এম্‌ গেইলার্ড নির্দিষ্টরূপে বললেন যে মাল্লির নাম ছিল নিয়ানি আর এর উপস্থিতি ছিল "বতর্মান নিয়ানি গ্রামের নিকটে সান্‌কারানি নদীর বাম তীরে বালান্‌দুগুর কিছুটা উত্তরে এবং জেলিবার (দাইলিবা) দক্ষিণে। এটা একই সাম্রাজ্যের অন্যতম রাজধানী" অর্থাৎ এর অবস্থান হচ্ছে ১১·২২ উত্তরে, ৮·১৮ পশ্চিমে, ম্যাপে নির্দেশিত স্থানের প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। আল্‌ 'ওমারি'ব মাসালিক আল্‌-আব্‌সার গ্রন্থের অনুবাদ দেমমবাইন্‌স, ৫২ পৃঃ ২ টীকা দ্রষ্টব্য।]

২০। দেলাফোসে বলছেন "দুঘা হচ্ছে বানমালা এবং ম্যালিন্‌কেদের মধ্যে এক প্রকার শকুনের নাম এবং দৈত্যের নামও বটে। অনেক সময় মানুষকেও এ নাম দেওয়া হয়।"

২১। নিম্নলিখিত বিষয়টি হচ্ছে প্রথম যুগের নিগ্রো সাম্রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

প্রাথমিক সুদানী সাম্রাজ্য ছিল ঘাণার সাম্রাজ্য (প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পরবর্তী সোনিনকে শাসকদের পদবী)। কোনো একটি শ্বেতকায় প্রবাসী দল চতুর্থ শতাব্দীর দিকে এই সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মনে হয় একাধিক বার এর রাজধানীর স্থান বদল হয়েছে। নয় থেকে এগারো শতাব্দী পর্যন্ত কুম্‌বির সোনোনকেগণ ছিলেন ঘানা সাম্রাজ্যের প্রভু ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মরক্কোর আল্‌মরভিদ কর্তৃক সাম্রাজ্যটি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত। এর ধ্বংসাবশেষের উপর স্থাপিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্য। এদের একটি ছিল কন্‌তের সোনিন্‌কে রাজত্ব—এর রাজধানী ছিল সসোতে (সান-সাণ্ডিংয়ের পশ্চিমে)। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্যান্টের সোনিকে রাজত্ব কর্তৃক ঘন পুনর্দখল করা হয়েছিল এবং সোনিনকে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। ওয়ালটার প্রতিষ্ঠার কারণও ছিল এটা। ঘানার মুসলিম অধিবাসীগণ কাফের শাসকের অধীনে বাস করতে অস্বীকার করেন—তাই তারা ওয়াল্‌টা বিরার পানির কিনারে নিজেদের জন্য নতুন বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন (টীকা ৬ দ্রষ্টব্য)। বিজয়ী সুমানগুরু ম্যালিনকের ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে নিহত হন। এর নরপতি সুন্‌জাতা বা মারি-জাতা সোনিনকে সাম্রাজ্য সংযুক্ত করে নেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন (৩২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এবং মাল্লিতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঘানা দখল করেন এবং সেটা ধ্বংস করে দেন। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। বংশ পরম্পরা সূত্রে পরবর্তী খ্যাতিবান সম্রাট হন মুসা (ইব্‌নে বতুতার মান্‌সা মুসা)। এর রাজত্বকালে (১৩০৭-৩২) মাল্লি সাম্রাজ্য সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। মুসা ছিলেন সুনজাতার এক বোনের

নাত্ছেলে। তার ছেলে এবং উত্তরাধিকারী মান্সা মাঘানের রাজত্ব কালে একটি সংক্ষিপ্ত সংকোচন ঘটেছিল, কিন্তু মুসার ভাই সুলেমানের রাজত্বকালে (১৩৩৬ -৫৯) মাল্লি তার বিপুল ক্ষমতা এবং সম্মান পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তার মৃত্যুর পরে অবনতি দেখা দেয়—এবং সেটা তীব্রতর হয় গৃহযুদ্ধের দ্বারা। সন্‌ঘে রাজত্বের (টীকা ৩২ দ্রষ্টব্য) উত্থান কাল পর্যন্ত নাইজার রাজত্বগুলির মধ্যে মাল্লি রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল—এবং ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় ছিল।

২২। "সমস্ত অবস্থায়" কথাটার সংযোজন হচ্ছে একটি মৃদু ইঙ্গিত যে ব্যাপারটা তত ভালো নয় যতটা আশা করা গিয়েছিল।

২৩। সাতাশে রমজানের পূর্বরাত্রি লাইলাতেল কাদ্‌রে "ক্ষমতার রাত্রি" বলে কোরাণে উল্লেখিত। এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে এ রাতে বেহেশ্‌তের সব দুয়ার খোলা থাকে এবং ভক্তের প্রার্থনা সাদরে গৃহীত হয়ে থাকে।

২৪। ম্যানডিংগোতে বেম্‌বে মানে হচ্ছে "মঞ্চ"। আল্-'ওমারি' বেম্‌বের বর্ণনা করেছেন একটি আইভরিব বেঞ্চ রূপে।-এটা হস্তিদন্তের খিলানে আচ্ছাদিত।

২৫। অর্থাৎ "সম্রাট সুলেমান" ম্যাণ্ডিগোতে "প্রভুত্ব করেছেন"।

২৬। দেলাফোসে বল্‌ছেন ইব্‌নে বতুতা যে সব প্রচলিত রীতির বর্ণনা করেছেন এটা তারি মতো একটি রীতি। সুদানের অধিকাংশ দেশে এ রীতিটি বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

২৭। উপরের ২১ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮। নিচের ৩১ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। কিউরি মান্‌সার স্থান দেলাফোসে নির্দেশ করেছেন বর্তমান কোক্‌রি এবং মাসামানা গ্রামের নিকটে, স্যান্‌স্যানণ্ডিংয়ের উত্তর-পূর্বে এবং ইব্‌নে বতুতার পূর্বেকার বিরাম স্থান কারসাখু থেকে বেশী দূরে নয় (টীকা ১২ দ্রষ্টব্য)।

৩০। মিমা মনে হয় সে জেলার একটি প্রধান শহর উপরে যেটাকে ইব্‌নে বতুতা জাঘা নামে উল্লেখ করেছেন (টীকা ১৩ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে এ নামটি হ্রদের উপরের অঞ্চল সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হতো (সম্ভবতঃ হ্রদ অঞ্চলসহ)। স্থানটি আধুনিক ম্যাসিনার অংশ বিশেষের সঙ্গে যুক্ত। বার্থের মত অনুসারে মিমার অবস্থান জায়গাটি এখনো বর্তমান—যদিও সেটা পরিত্যক্ত। এটা লিয়ারের কয়েক মাইল পশ্চিমে (Travels Engl. ed. V, 487)।

৩১। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে গাও জয় করার পর মান্‌সা মুসা (তুম্‌বাক্‌তুকে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। ইয়াটেঙ্গার মোসির (উর্ধতর ভল্টা) আক্রমণে ১৩৩৩ সালে শহরটি লুঠ হয় এবং পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সুলেমানের সিংহাসন আরোহণের স্বল্পকাল পরে সেটা পুনরায় নির্মিত করা হয়। হজ্বের সময় মান্‌সা মুসার সঙ্গে কবি আস্-সাহিলির সাক্ষাৎ হয় মক্কাতে-সুলতান তাকে তার সঙ্গে সুদানে ফিরে যেতে সম্মত করেন। তিনি ছিলেন গাও এবং তুম্‌বাকুতুর মস্‌জিদের নির্মাতা। ১৩৪৬ সালে তুমবাক্‌তুতে তার মৃত্যু হয়।

৩২। গাও বা গাওগাও (মূল নাম কুঘার একটি রূপান্তর) কেবল পশ্চিম থেকে নিমকের রাস্তার এবং উত্তর থেকে ট্রান্স-সাহারান পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল না- বরঞ্চ আন্ত মহাদেশীয় পথের ঘাঁটিও ছিল। এগারো শতাব্দীর প্রথম দিকে এটা সংঘে (সংঘয়) রাজ্যের রাজধানী হয়। এটা তখনি ঘটে যখন প্রথম সংঘে রাজত্ব ইস্‌লামে দীক্ষিত হয়। এর

উৎপত্তি বলা হয় বার্বার থেকে। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে মান্‌সা মুসা সোংঘে রাজ্যকে মাল্লি সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন। কিন্তু ১৩৩৫ খ্রীস্টাব্দে রাজবংশটি পুনরায় স্থাপিত হয় (সোন্নি পদবী নিয়ে), যদিও সেটা তখনো অন্ততঃ নামে মাত্র মল্লির অধীন ছিল– অবশ্য মূল বার্বার বংশের শেষ নরপতি সোন্নি আলির রাজত্বকাল শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত (১৪৬৫-৯২)। ইনি মাল্লির বদৌলতে তার রাজ্য বিস্তৃত করেন। তার উত্তরাধিকারী হন তার সোনিনকে সেনাপতি মোহাম্মদ (১৪৯৩-১৫২৯)। ইনি ছিলেন আস্‌কিয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা এবং এর প্রভাবে সোংঘে উন্নীত হয় ক্ষমতার শীর্ষ স্থানে। অতঃপর মরোক্কানদের আক্রমণে সোংঘে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং রাজবংশ লুপ্ত হয়। এরা ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে গাও তিম্‌বুক্‌তু দখল করেন।

৩৩। মাল্লি সাম্রাজ্যে নিমকের পাশাপাশি কড়ির বিনিময় হচ্ছে ১৪ টীকায় উল্লেখিত আফ্রিকা মহাদেশ ব্যাপী অবস্থিত সেকালের বাণিজ্য সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রমাণ–যেহেতু কড়ি কেবল নিরক্ষবৃত্ত এবং মোজামবিকের মাঝখানে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পাওয়া যায় (Grande Encyclopedie s.v. Cauri)। ইব্‌নে বতুতার সময়ে সওদাগরগণ উত্তর থেকে কড়ি আমদানি করতেন (আল্‌-ওমারি ৭৫-৭৬)।

৩৪। বারদামা উপজাতির বিশেষ করে তাদের মেয়েদের বর্ণনার সঙ্গে বার্থের তাগ্‌ হামা উপজাতির বর্ণনার ঘনিষ্ট মিল দেখা যায়। তাগ্‌-হামগণ বাস করতো এয়ারের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে।

৩৫। তাগাদ্দা বা তাকাদ্দা ছিল সে সময়ে তুয়ারেগ দেশের বৃহত্তর শহর। এর বার্বার সুলতান নামে মাত্র মাল্লি সম্রাটের অধীন ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ মাসুফার (সানজাহা) প্রধান শাসক বলে পরিগণিত হতেন। তাগাদ্দার অবস্থান স্থান এখনো অনির্দিষ্ট। বার্থের নির্ধারণের উপর ভিত্তি করে এটাকে আগাদিসের ৯৭ মাইল পশ্চিম উত্তর-পশ্চিমে তেগিদ্দা এন্‌' তিসেম্‌ত্‌ বলে গ্রহণ করা হয়। বার্থ বল্‌ছেন, এর আশেপাশে যদিও তামার অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না, তথাপি এখানকার খনি থেকে এক প্রকার লাল নিমক পাওয়া যায়। গওতিয়ার এবং চাডিও (Missions au Sahara; ২য় খন্ড, ২৫৭) আওগাটা পর্বতশ্রেণীর (২৯·১৫ উঃ ১·৪০ প)ঃ অন্তর্গত তেমেগ্রাউন ছাড়া সাহারায় তামার অভাব উল্লেখ করেছেন–এবং বলেছেন এয়ার এবং আহাগারে যে সব তামা ব্যবহৃত হয় সেগুলি আসে ইউরোপ থেকে। তেগিদ্দায় তামার অভাব সম্বন্ধে এফ, আর, রড, ও বলেছেন। তিনি মনে করেন ইব্‌নে বতুতার তাগাদ্দার খোঁজ নিতে হবে "আগদেসের দক্ষিণে বেশ খানিকটা দূরে (পিপল আর দি ভেইল, ৪৫২-৬)। পরবর্তীজনের মত অনুসারে তেগিদা শব্দের অর্থ "পানি সংগ্রহ করে রাখার ক্ষুদ্র গহ্বর –এ নামটি বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (cf. এইচ, এস, এন্‌, ২য় খণ্ড, ১৯৩; মারকোয়ার্ট, ৯৮)। কিন্তু তাগাদ্দায় তাম্রখনির অস্তিত্ব আল্‌-ওমারি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে মান্‌সা মুসার তথ্যের উপরে (দেম্‌য়বাইন্‌সের অনুবাদ, ১ম খণ্ড,৮০-৮১)।

৩৬। কুবার হচ্ছে গোবির–বর্তমান সকোতরের উত্তর দিকের দেশ-দক্ষিণে তাগাদ্দার দ্বারা সীমায়িত। এখানে তুমবুতুর দক্ষিণ– পশ্চিম জেলার জন্য জাঘের অবস্থান কিনা, অথবা ক্যানেম এবং ওয়াদাই পরিবেষ্টিত মধ্য অঞ্চলের জন্য কি না যা অস্পষ্টভাবে জাঘাওয়া বলে পরিচিত, সেটা অনিশ্চিত।

৩৭। এখানে নাইজেরিয়ার বর্ণু অপেক্ষা অবস্থান ক্যানেমের জন্য। এ সময়ে ক্যানেম সাম্রাজ্য মধ্য সাহারা অতিক্রম করে উত্তর দিকে ফেজান এবং পূর্ব দিকে দার ফুর এবং উত্তর

নাইজেরিয়ার ভিতরে বিস্তৃত হয়েছিল। এই ইদ্রিস (১৩৫৩–৭৬)। একে ষোড়শ শতাব্দীর বর্ণুর প্রসিদ্ধ ইদ্রোসর সঙ্গে জড়িত করা ঠিক হবে না) হচ্ছেন ইব্রাহিম নিকেলের ছেলে। ইনি দক্ষিণ আরবীয় বংশজাত বলে দাবী করেন। ১৩০৭–৩৭ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত ক্যানেমের সুলতান ছিলেন। রাজকার্যের ঐন্দ্রজালিক গুণাবলীর বিশ্বাস হেতু নরপতির এই গোপন অধিবাস (বার্থ ১ম খন্ড, ৬৩৮ -৯; মিক. উত্তর নাইজেরিয়া, ১ম খণ্ড, ২৫৪)।

৩৮। জাওজওয়া অনেক স্থলে ককো বা কুকু বলে উচ্চারিত। এটা হচ্ছে লিও আফ্রিকানসের গাওগাও। স্থানটি হয় ওয়াদাইর ফিট্রে হ্রদের তীরের ফিত্রি কানেমের দক্ষিণ-পূর্ব অথবা এটা হচ্ছে বর্ণোর কুকু (মারকোয়ার্ট ৯৫, ff; Hartmann in M. S. O. S. XV৩, 176 ff.) নুওয়ারতাবুন কিম্বা মুর্তাবুনের কোনো সন্ধান বের করতে আমি সক্ষম হইনি।

৩৯। মরক্কোর রাজার ওয়াস্‌ফান্‌ বা রক্ষিদল ছিল স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর কেন্দ্রস্থল। উপজাতীয় সৈন্য থেকে এরা ছিল ছিন্ন প্রকারের (মাসলিক আল্‌–আসবার দেমবাইন্‌সের অনুবাদ, ইণ্ডেক্‌স্‌ এস, ডি,)। দেমমবাইনের একটি পাণ্ডুলিপিতে ইয়ানতিবুনের স্থানে ইনাতিউন পাঠ করা হয় (এ গ্রন্থেরই ২১০, n. টীকা ২ দ্রষ্টব্য)।

৪০। কাহির হচ্ছে এয়ারের রূপান্তরিত নাম। এ নামটি দেওয়া হয়েছে ইন্‌ আজাওয়া কিম্বা আসিওর দক্ষিণে অবস্থিত স্বল্প লোক বসতিপূর্ণ পাহাড়ের-দেশ। নিম্নে এটা সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যেখানে তুয়াত্‌ এবং মিশরগামী রাস্তা বিভক্ত হয়েছে। এটা আশ্চর্য যে ইব্‌নে বতুতা কাহিরকে প্রধান পর্বত তিন দিনের পথের ফারাক বলে ধরেছেন।

৪১। হ্যাগার বা হোগার হচ্ছে মধ্য সাহারার পর্বত অধিবাসী বার্বার (তুয়ারেগ) উপজাতি। এটা হচ্ছে পুরাকালীন আটলাস পর্বতশ্রেণী–এখন এর অধিবাসীগণের নামানুকরণে আহাগার নামে পরিচিত।

৪২। বুদা তুয়াত উপত্যাকার ২৮ উত্তরে, ০·৩০ পূর্বে উত্তরের শেষ সীমান্তে অবস্থিত। এ জেলাটির বিবরণ এবং ইতিহাসে বিবৃত করেছেন গাওতিয়ার এবং চাদিয়ো মিশন্‌স্‌ সাহারা গ্রন্থে (প্যাসির, ১৯০৮) প্রথম খণ্ড, ২৫০। আরবীয় ভৌগলিকদের মত অনুসারে মারাকুশের অধিবাসীগণও পঙ্গপাল আহার করতো।